

ইসলামী ইবাদত ও বৰ্ণনি মা'লুমাত



মজলিস খোদামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ

ইসলামী ইবাদত

ও

দ্বীনি মা'লুমাত

প্রকাশনায়

মজলিস খোদামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ

৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

www.mkabd.org

mkabangladesh@gmail.com

প্রকাশক

ইশায়াত বিভাগ

মজলিস খোদামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ।

প্রথম সংস্করণ	: ২৫ অক্টোবর ১৯৭৫
দ্বিতীয় সংস্করণ	: ২৫০০ কপি, ১লা অক্টোবর ১৯৮৪
তৃতীয় সংস্করণ	: ১৫০০ কপি, ১৪ অক্টোবর ১৯৯৬
চতুর্থ সংস্করণ	: ২০০০ কপি, ১০ জুন ২০০৫
পঞ্চম সংস্করণ	: ১৫০০ কপি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
ষষ্ঠ সংস্করণ	: ৩০০০ কপি, ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৩
সপ্তম সংস্করণ	: ১০০০ কপি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

মুদ্রণে

: ৰাঢ়-ও-লিভস্

বাংলাদেশ পাবলিকেশন লি. ভবন,
৮৯-৮৯/১ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সপ্তম সংক্ষরণের ভূমিকা

আল্লাহু মানুষ সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য আর তাদের জন্য ইসলামকে মনোনীত করেছেন পরিপূর্ণ ধর্ম রূপে। ইসলামের পাঁচটি স্তুতির মধ্যে চারটি স্তুতি স্তুতি হলো ইসলামী ইবাদত তথা নামায, রোয়া, হজ্জ ও যাকাত।

আল্লাহুর ইবাদতের অনেকগুলো দিক রয়েছে। কিছু ইবাদতের নির্দিষ্ট নিয়মকানুন রয়েছে যা একজন মুসলমানকে সঠিকভাবে জেনে পালন করা উচিত। আর তা জানার এক সহজ মাধ্যম হলো “ইসলামী ইবাদত” বইটি। আমরা চেষ্টা করেছি নতুন এই সংক্ষরণে বইটির কিছু বিষয় সংশোধন করতে যা আগের সংক্ষরণগুলোতে করা সম্ভব হয়নি। সেই সাথে সর্বশেষ কিছু জামাঁতি তথ্যও এই সংক্ষরণে সংযোজন করা হয়েছে। আশাকরি বইটি তার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ।

বইটির এই সংক্ষরণে যারা কাজ করেছেন আল্লাহপাক তাদের প্রচেষ্টা কবুল করণ এবং তাদেরকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করণ। আমীন।

ওয়াস্সালায়

খাকসার

মুনাদিল ফাহাদ

সদর

মজলিস খোদামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

ষষ্ঠ সংক্রণের ভূমিকা

মহান আল্লাহ তাঁলা আমাদের কুরআন মজীদে দোয়া শিখিয়েছেন, **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ**। অর্থাৎ, আমরা কেবল তোমারই (আল্লাহর) ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য চাই। (সূরা ফাতিহা)। ইসলামিক জীবন বিধানে আল্লাহকে চেনার এবং ডাকার পদ্ধতিগুলো সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। সেগুলোকে বাংলাদেশের আহমদী খাদেম-তিফলদের হাতে পোছে দেয়াই এ পুস্তকের উদ্দেশ্য। বাংলাদেশে আহমদী তিফল ও খাদেমদের ইসলামী জ্ঞান আহরণ ও ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি জানার ক্ষেত্রে “ইসলামী ইবাদত ও দ্বিনি মালুমাত” পুষ্টিকাটি এককথায় অনন্য প্রমাণিত হয়েছে। তালিম-তরবিয়তের কাঙ্ক্ষিত মান অর্জনে বর্তমান সংক্রণটি একইভাবে আদৃত হবে বলে খাকসার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী।

জাতির সার্বিক তালিম-তরবিয়তের মানের সাথে যখন কোন প্রকাশনা একাকার হয়ে যায় তখন তার গুরুত্ব ও আঙ্গিক সময়ের চাহিদা পূরণের দাবি করে। এই প্রেক্ষিতে ষষ্ঠ সংক্রণটি প্রকাশনার ক্ষেত্রে মুক্তি সিলসিলাহ মোহতরম মাওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেবের দিক-নির্দেশনা মোতাবেক প্রথমত বইটির নামে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। হয়রত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর কল্যাণময় হেদয়াত মোতাবেক পাকিস্তান থেকে উর্দু দ্বিনি মালুমাত পুস্তকটি আনিয়ে এর প্রয়োজনীয় অংশ অনুবাদ করে অত্র সংক্রণে সংযোজন করা হয়েছে। এই কাজে জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশের তরুণ ও উদ্যমী শিক্ষক জনাব আহমদ জাকির হোসেন ও ছাত্র জনাব হাজারী আহমদ আল মুনিম অঙ্গুষ্ঠ পরিশ্রম করেছেন। তাছাড়াও নব পর্যায়ে সম্পাদনা ও সংকলনে এ দুইজন অনবদ্য ভূমিকা রেখেছেন। পুস্তকটির কম্পোজের দায়িত্ব জনাব সানোয়ার হোসেন সনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পাদন করেছেন। এই পুস্তকটির জন্য প্রচন্দ অলংকরণ করেছেন জনাব তারেক আহমদ সবুজ। সবশেষে পুরো প্রকাশনাটির প্রক রিডিং করেছেন জনাব মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয় সাহেব। ন্যম পরিচ্ছদটি আরও বর্ধিত আকারে সম্পূর্ণ আলাদা পুস্তাকারে প্রকাশ করা হবে বিধায় এই সংক্রণে বাদ দেয়া হয়েছে।

এই সমস্ত কর্মপ্রয়াসটি বাস্তবতায় রূপ লাভের ক্ষেত্রে মোহতরম মাওলানা আলহাজ্জ সালেহ আহমদ সাহেবের ভূমিকা অনুষ্ঠীকার্য। তাঁর দিক-নির্দেশনা, যথাযথ পরামর্শ এবং যথেষ্ট সময় ব্যয় করে পুরো প্রকাশনাটি দেখে দেয়ার জন্য তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন আহমদী ভাই পুস্তকটি প্রকাশের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেছেন। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁর ও তাঁর পরিবারের জন্য সকলের নিকট খাস দোয়ার আবেদন করছি।

মহান আল্লাহ তাঁলা এই প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জায়ায়ে খায়ের দান করছন।
আরীন। ওয়াস্সালাম।

খাকসার

মুহাম্মদ আব্দুল মোমেন

সদর

মজলিস খোদামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

২০ সেপ্টেম্বর ২০১৩

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে মজলিস খোদামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ-এর ইশায়াত বিভাগ ইসলামী ইবাদত পুস্তকের পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করছে, আলহামদুলিল্লাহ। এ সংস্করণে নামাযের নিষিদ্ধ বিষয়, গোসলের আদব-কায়দা, ছাতর ঢাকা ফরয, সিজদা সাহু, আকিকাহ, পঞ্চম খিলাফতকালীন বিশেষ তাহরীক ইত্যাদি সংযোজন করা হয়েছে। অনেক ভুলক্রটি সংশোধনের চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করি এতে পাঠক আরোও বেশি উপকৃত হবেন। বর্তমান সংস্করণ প্রকাশ করতে গিয়ে যারা অক্রূতভাবে খেদমত করেছেন তারা হলেন মৌলভী মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, জনাব শরিফুল হাকিম আহমদ (মোতাম্মাম ইশায়াত), মৌলানা মাহমুদ আহমদ সুমন, জনাব আহমদ জাকির হোসেন এবং আরও অনেকে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সকলেকে উত্তম পুরক্ষারে ভূষিত করুণ, আর্মান।

খাকসার

আবু নঙ্গই আল মাহমুদ
সদর
মজলিস খোদামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

সময়ের চাহিদার প্রেক্ষাপটে পুনরায় আমরা “ইসলামী ইবাদত” পুস্তকখানা প্রকাশ করতে পারায় মহান আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি।

এ সংস্করণে সুরার ধারাবাহিকতায় কুরআন শরীফের বেশ কিছু দোয়া, রসূলে করীম (সা.)-এর দোয়া, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর দোয়াও সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়াও হযরত খলীফাতুল মসীহ ‘রাবে’ (রাহে.)-এর খিলাফত কাল, আমাদের বর্তমান খলীফা খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং মসীহ মাওউদ (আ.), মুসলেহ মাওউদ (রা.) ও খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর কিছু নতুন ন্যয়মসহ সাধারণ ও ধর্মীয় জ্ঞান এর কিছু বিষয় এ সংস্করণে নতুনভাবে সংযোজন করা হয়েছে।

ইসলামী ইবাদতের এ সংস্করণের ফলে এর পাঠ্কগণকে এ বইটি থেকে যথাযথ ফায়দা হাসিল করত মহান আল্লাহ তা’লার প্রকৃত ইবাদত প্রতিষ্ঠা করার পূর্ণ তৌফিক দিন। আমীন।

বর্তমান সংস্করণ প্রকাশ করতে গিয়ে যারা বিশেষভাবে খেদমত করেছেন তাঁরা হলেন সর্বজনাব মৌলভী মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, আলহাজ মওলানা সালেহ আহমদ-মুররুবী সিলসিলাহ, শরিফুল হাকিম আহমদ, গোলাম মোহাম্মদ, মিসেস গোলাম মোহাম্মদ, মোহাম্মদ এহিয়া, মোহাম্মদ রাহিম এবং অন্যান্য যারা যে ভাবেই সহগোগিতা করেছেন আল্লাহ তা’লা তাদের সকলকে মহান পুরক্ষারে ভূষিত করুন, আমীন।

খাকসার

মাহবুবুর রহমান

সদর

মজলিস খোদামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

১০ই জুন, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ

১০ই ইহসান, ১৩৮১ হিঃ শাঃ

ত্তীয় সংস্করণের ভূমিকা

মহান আল্লাহতাআলার অশেষ ফখলে মজলিস খোদায়ুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ ইসলামী ইবাদত পুস্তকের ত্তীয় সংস্করণ প্রকাশ করলো, আলহামদুলিল্লাহ।

পরিত্র কুরআনে জীন্ন ও মানব জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্রক্ষে আল্লাহপাক বলেন, “ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিইয়াবুদুন”- জীন্ন ও মানবকে আমি আমার ইবাদতের জন্যেই সৃষ্টি করেছি। (সূরা আয় যারিয়াত : ৫৭)

ইবাদত একটি ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী অর্থবহ পদবাচ্য। অসার, প্রাণহীন, লোকাচার ও নিছক অনুষ্ঠানসর্বস্ব ইবাদত ব্যক্তি কিংবা সমষ্টিগত জীবনে কোন প্রকৃত কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। চরম নৈতিক অবক্ষয়ে র্জরিত, বহুবিধ কুসংস্কারে নিমজ্জিত, হিংসা-বিদ্যে-অশান্তির প্লানিতে বিপর্যস্ত মানবতার বর্তমান সংকটকালে প্রকৃত ধর্মীয় মূল্যবোধ পুনঃজগ্রাত করার কোন বিকল্প নেই। আলোকিত প্রকৃতিসম্মত ইসলামী উৎকর্ষ ও মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ যুগে খাতমানাবীদ্বন্দ্ব হয়রত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর এক উৎকৃষ্ট উম্মতকে মহান আল্লাহ তা'লা প্রেরণ করেছেন। তিনি হয়রত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)। তাঁর মাধ্যমে প্রকৃত ঈমান যা সুরাইয়া নক্ষত্রে উঠে গিয়েছিল তা পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এসেছে। পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে সত্যামুক্তি পরিভ্রান্তাগণ প্রকৃত ঈমানের স্বাধ গ্রহণ করে তাঁর ঐশ্বী পতাকাতলে জড়ো হচ্ছেন। দিন দিন প্রকৃত ধর্ম ইসলামের খাঁটি মূল্যবোধের মহিমা প্রজ্ঞলিত ও শান্তিত হচ্ছে। বুলন্দ হচ্ছে তৌহীদের আওয়াজ এবং প্রসারিত হচ্ছে এর ব্যাপকতা। মহান স্বষ্টির ঐশ্বী পরিকল্পনার বাস্তবায়নের পথে, তাঁর খাঁটি ইবাদতকে প্রতিষ্ঠার পথ ধরে মানবতার মহান মুক্তির আলোকিত প্রাপ্তরে উপনীত হওয়া আমাদের মূল লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সামান্যতম অবদান রাখতে সমর্থ হলেই আমরা নিজেদেরকে ধন্য জ্ঞান করবো।

এ বলে ইসলামী ইবাদত পুস্তকখানা সবার হাতে অর্পন করলাম।

বর্ধিত কলেবরে প্রকাশিত ইসলামী ইবাদত পুষ্টকের নবতর তৃতীয় সংস্করণে যাঁদের
অবদান অনন্বীক্ষ্য :

মৌলবী মোহাম্মদ মুতিউর রহমান- অক্লান্ত পরিশ্রম করে পুষ্টিকার বহু অংশে প্রয়োজনীয়
সংশোধন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন করেছেন, সম্পূর্ণ
পুষ্টিকার চূড়ান্ত প্রফ দেখে দিয়েছেন।

মাওলানা আব্দুল আয়ীয় সাদেক - পুষ্টিকার সমস্ত আরবী উদ্ধৃতির বাংলা উচ্চারণ লিখে
দিয়েছেন, পুষ্টিকার আরবী অংশের প্রফ দেখে
দিয়েছেন।

মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ- পুষ্টিকার বিভিন্ন অংশে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও
পরামর্শ প্রদান করেছেন, নথমের বর্ধিত অংশের
অনুবাদ ও প্রফ দেখে দিয়েছেন।

মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম - মূল পুষ্টিকার পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত পান্ডুলিপি
পুনর্লিখন, সমস্ত পুষ্টিকার প্রথম ও দ্বিতীয় প্রফ
সংশোধন।

এছাড়া মূল পুষ্টিকার পান্ডুলিপি পুনর্লিখনে যারা
অবদান রেখেছেন, সুলতান আহমদ, নাসের আহমদ
(বাবু), যুলওয়াকার মোহাম্মদ আল কবির, কাওসার
আলম।

প্রকাশনার কাজ চূড়ান্তকরণে জনাব মুরগুল ইসলাম মিঠু ও জনাব সরকার মুহাম্মদ
মুরাদুজ্জামান একনিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। বিশেষ করে বেলজিয়ামে বসবাসরত বাঙালী
আহমদী যুবক আতাগণের আন্তরিক সহযোগিতা প্রশংসার দাবী রাখে। মহান আল্লাহ
তাঁরা তাঁদের সবাইকে সর্বোত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন, আমীন।

তারিখ : ঢাকা

১৪ ই ইথা, ১৩৭৫ হিঃ শাঃ
১৪ই অক্টোবর ১৯৯৬ ইং

খাকসার

মুহাম্মদ সেলিম খান
সদর

মজলিস খোদামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আল্লাহ তা'লার অশেষ ফযলে মজলিসে খোদামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ-এর ইশায়াত বিভাগ ইসলামী ইবাদতের ২য় সংস্করণ প্রকাশ করছে।

মানবের ব্যবহারিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সুখ-শান্তি, প্রগতি ও সমৃদ্ধির যাবতীয় প্রয়োজন ও চাহিদা নিরূপণ এবং সুবিন্যস্ত করেছে ইসলাম। মানব জীবনের এই সুসমৰ্পিত বিন্যাসে তার উপাসনা, জীবন এমনকি মরণও তাকে সুষমামভিত করে।

অতএব জীবন সুন্দর ও সার্থক করার প্রয়াসে মজলিসে খোদামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ সীমিত শক্তিতে নিয়োজিত রয়েছে। বাংলাদেশ মজলিসের উক্ত প্রচেষ্টার অন্যতম সাক্ষর হ'ল ইসলামী ইবাদতের প্রকাশনা।

২য় সংস্করণটির প্রাচ্ছদ-পরিকল্পনা ও প্রকাশনার কাজে জনাব তাসাদুক হোসেন সাহেব, নাযেম ইশায়াত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং নথম সংকলনে ও মুদ্রণ-প্রমাদ হাস করতে প্রফুল্ল রিডিং-এর বিষয়ে বাংলাদেশ মজলিসের ন্যাশনাল মোতামাদ জনাব আবুল জলিল সাহেব অবিরাম চেষ্টার হিসেবে অবিসর্পিত ছিলেন। আল্লাহ তা'লা উভয়কেই নেক কাজের উত্তম জায়া দিন।

এ সংস্করণটি প্রকাশনার বিষয়ে মোহতারম মাহমুদ আহমদ সাহেব- সদর, মজলিস খোদামুল আহমদীয়া মরকায়ীয়া আমাদিগকে সর্বপ্রকার পরামর্শ-নির্দেশ, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দান করেছেন। তাঁর অমূল্য সহযোগিতার প্রতিদানে আল্লাহ তা'লা তাঁকে উৎকৃষ্ট পুরস্কারে ভূষিত করুন, আমীন!!

খুইয়ে যাওয়া ইবাদতের অনুশীলনে আমাদের যুব-জীবন খোদা মিলনের আস্বাদন লাভে সক্ষম হোক। এ কামনা নিয়ে ইতি টানলাম। (সংক্ষেপিত)

১লা অক্টোবর, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ

খাকসার

মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ
ন্যাশনাল কায়েদ

প্রথম সংস্করণের প্রকাশকের কথা

কুরআন করীম পাঠে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহতাআলা জিন্ন এবং মানবকে কেবল মাত্র তাঁহার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন.....। সদর মুরুক্বী মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব এবং মৌঃ ফারংক আহমদ সাহেব পুস্তকের পাঞ্জুলিপি দেখিয়া দিয়াছেন। ইহা ছাড়া বাংলাদেশ জামায়াতে আহমদীয়ার আমীর মোহতরম মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব সাল্লামাহু পুস্তকের পাঞ্জুলিপি দেখিয়া দিয়াছেন এবং অনুগ্রহপূর্বক অনেক মূল্যবান বিষয়াদি সংযোজন করিয়া দিয়াছেন। আমাদের নায়েব সদর জনাব মুহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব অনুগ্রহ করিয়া একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন।

আল্লাহতাআলা সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম পুরক্ষার দান করম্বন, আমীন।

(সংক্ষেপিত)

২০ ফেব্রুয়ারী, ৭৫

ওয়াসসালাম, খাকসার

মোহাম্মদ মুতিউর রহমান,

মোতামাদ

মজলিস খোদামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

ইসলামী ইবাদতের উদ্দেশ্যঃ আল্লাহ্ তাঁলা কুরআন শরীফে সুরা ফাতিহায় আমাদিগকে এই দেয়া শিক্ষা দিয়াছেন।

অর্থাৎ আমাদিগকে সহজ সরল পথ দেখাও।

কুরআন করীমের উপরোক্ত শিক্ষার আলোকে ইসলামী ইবাদত এবং আকায়েদ বিশ্লেষণ করিলে আমাদের শুধু জননই বৃদ্ধি পাইবে না বরং সেই সংস্কেতে আমাদের সকল অহেতুক সংশয় এবং সন্দেহ দূর হইয়া যাইবে এবং আমরা নীতি-জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহকে লাভ করিতে পারিব। আল্লাহ্ আমাদের হাফিয়, নাসীর ও হাদী হউন, আমীন।

(সংক্ষেপিত)

২০ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

নায়েব সদর

মজলিস খোদামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ।

সূচীপত্র

ইসলামী ইবাদত

পরিচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা	
প্রথম পরিচ্ছেদ	কলেমা	শাহ মুস্তাফিজুর রহমান	১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	নামায	শাহ মুস্তাফিজুর রহমান	৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	রোয়া	মুহাম্মদ খলিলুর রহমান	৫৭
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	হজ্জ	আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী	৭২
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	যাকাত	মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	৮৫
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	দোয়া	আলহাজ্জ মুহাম্মদ মতিউর রহমান	১০৮
	ক) কুরআন মজীদের দোয়া		১০৮
	খ) হ্যরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর দোয়া		১৪৮
	গ) হ্যরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.)-এর দোয়া		১৫৭

দীনি মালুমাত

সংকলন : আলহাজ্জ মুহাম্মদ মতিউর রহমান
 মুহাম্মদ হাবীব উল্লাহ
 মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম
 আহমদ জাকির হোসেন

পরিচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
সপ্তম পরিচ্ছেদ	ইসলামের ঘোলিক ধারণা ও প্রাথমিক কাল	১৭৩
	আল্লাহ তাল্লা	১৭৪
	ইসলাম	১৭৫
	কুরআন মজীদ	১৭৬
	বিশ্ব নবী হ্যরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)	১৮৫
	এক নজরে মোস্তফা (সা.) চরিত	১৮৮
	হাদীস শরীফ	১৯৮

পরিচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
	খোলাফায়ে রাশেদীন	১৯৭
	আসহাবে রসূল (সা.) [রসূল (সা.)-এর সাহাবীগণ]	২০৫
	বুর্গানে ইসলাম (ইসলামের প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গ)	২১০
	ইসলামের ইতিহাস	২১২
	বিবিধ (১)	২২০
অষ্টম পরিচ্ছেদ	ইসলামের পুনর্জাগরণ (আখারিন যুগ)	২২২
	হ্যরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী,	২২৩
	প্রতিশ্রূত মসীহ ও ঈমাম মাহদী (আ.)	
	হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর কতিপয় ইলহাম ও ভবিষ্যদ্বাণী	২৩৩
	আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস	২৩৮
	আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়াত (দীক্ষা)	২৩৯
	গ্রহণের দশ শর্ত	
	হ্যরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)	২৪০
	হ্যরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)	২৪৩
	হ্যরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.)	২৫১
	হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)	২৫৭
	হ্যরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)	২৬৯
	বিবিধ (২)	২৮২
নবম পরিচ্ছেদ	জামাতে আহমদীয়া ও এর প্রধান তিন অঙ্গ-সংগঠনের সমক্ষিণ ইতিহাস	২৮৯
দশম পরিচ্ছেদ	তুলনামূলক ধর্মীয় শিক্ষা	২৯৭
একাদশ পরিচ্ছেদ	বাংলাদেশে আহমদীয়াত	৩০১
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ	ঐতিহাসিক উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ও ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা	৩০৮
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ	বিবিধ তাহরীক	৩২২

পরিচেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
চতুর্দশ পরিচেদ	ইংরেজ ইতিহাস এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য	৩২৭
পঞ্চদশ পরিচেদ	অঙ্গ-সংগঠনসমূহের আহাদনামা	৩২৯

ইসলামী ইবাদত

কলেমা

নামায

রোয়া

হজ্জ

যাকাত

দোয়া

ক) কুরআন মজীদের দোয়া

খ) হ্যরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর দোয়া

গ) হ্যরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.)-এর দোয়া

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

প্রথম পরিচ্ছেদ

কলেমা

আল্লাহ্ তা'লার মনোনীত দীন বা ধর্মের নাম ইসলাম। ইসলাম ধর্মের রোকন পাঁচটি, যথা: (১) কলেমা (২) নামায (৩) রোয়া (৪) হজ্জ এবং (৫) যাকাত। ‘আরাকান’ ‘রোকন’-এর বহুবচন। ‘রোকন’ কথাটির অর্থ খুঁটি বা স্তুতি। প্রতিটি মুসলমানের নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং একান্তার সাথে ইসলামের প্রত্যেকটি রোকন পালন করা উচিত। ইসলামী পরিভাষায় কলেমা বলতে নিম্নের বাক্যটিকে বুঝায়-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ)

অর্থ: “আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল”

এ সম্পর্কে যুগ ইমাম হ্যরত আকদাস ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন: “পরিআণের ঘরে প্রবেশ করার দরজা হচ্ছে-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ

“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ।” (ভজাতুল ইসলাম)

হ্যরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ইসলামের কলেমা সম্পর্কে বলেন, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ”-ই আহমদীয়াত (তথা খাঁটি ইসলাম)-এর কলেমা”।

কলেমার বিশেষত্ব

১. কলেমা উচ্চারণে বা বাক্যশক্তির বৈশিষ্ট্য দ্বারা মানবজাতি অপরাপর প্রাণী হতে উন্নততর হতে পেরেছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, “নিশ্চয় মানব জাতির উপর দিয়ে এমন এক যুগ গিয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কোন বস্তুই ছিল না।” (সূরা আদ্ দাহর : ২)। এরপর খোদা তা'লা মানুষকে কথা বলতে শিক্ষা দেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন যজীদে এসেছে “রহমান খোদা কুরআন শিখিয়েছেন, তিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাকে কথা বলতে শিখিয়েছেন” (সূরা আর রহমান : ৩-৫)। “কথা মহাশক্তির উৎস এবং সব কথার মাঝে আল্লাহ্ তা'লার বাক্য সর্বোচ্চ” (সূরা তওবা : ৪০)। আল্লাহ্

তাঁলা ‘কুন’ অর্থাৎ ‘হও’ আদেশ দ্বারা বিশ্ব-চরাচর এবং এর মাঝের সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। অন্যান্য ধর্মপুস্তকেও এর সমর্থন রয়েছে।

২. কোন স্থায়ী কাজ করতে হলে পূর্ব হতে একটি পরিকল্পনা এবং নকশার প্রয়োজন। অনুরূপভাবে, কলেমা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” (আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই) অংশে মানব জীবনের জন্য তৌহীদের (একত্ববাদের) মূল ও পূর্ণ পরিকল্পনা দেয়া হয়েছে। কলেমার “মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ” [মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রসূল] অংশে তৌহীদের শিক্ষার এক জীবন্ত আদর্শরূপে মহানবী হ্যরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কথা বলা হয়েছে। যেহেতু মহানবী (সা.)-এর শরীয়ত তথ্য কুরআন পাকের পর আর কোন শরীয়ত বা ধর্মবিধান আসবে না আর আল্লাহ এবং এ রসূলের আনুগত্যের মাধ্যমেই আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং পুরুষার প্রাপ্তির সব পথ উন্মুক্ত রয়েছে, সেজন্য একমাত্র এই কামেল অর্থাৎ পরিপূর্ণ নবীর নামই কলেমার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। আসলে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মেই কলেমা নেই। এটি ইসলামের একটি অন্য ও অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য।

৩. ‘লা ইলাহা’ কথার অর্থ : ‘নেই কোন উপাস্য’। ‘ইলাহ’ শব্দের অর্থ ভয়, ভঙ্গি এবং ভালবাসার পাত্র। সুতরাং ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ অংশের অর্থ হল আল্লাহ তাঁলার ভয়, ভঙ্গি এবং ভালবাসার মোকাবেলায় যে পাত্রই পথ রোধ করুক না কেন, তাকে আল্লাহর সামনে কুরবানী করতে হবে। তাহলেই আল্লাহকে পাওয়া যাবে। এ ভালবাসার নমুনাস্বরূপ হ্যরত মুহাম্মদ (সা.)-কে কলেমার দ্বিতীয়াংশে উপস্থিতি করা হয়েছে। সেজন্য কুরআন করীমে হ্যরত রসূল করীম (সা.) সম্পর্কে বলা হয়েছে ‘নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূল [হ্যরত মুহাম্মদ (সা.)]-এর মাঝে উৎকৃষ্টতম আদর্শ রয়েছে’। (সূরা আহ্যাব : ২২)। বলা হয়েছে: “বলো, ‘যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার [হ্যরত মুহাম্মদ (সা.)-এর] অনুসরণ কর, (তাহলে) আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের সব অপরাধ ক্ষমা করবেন।’” (সূরা আলে ইমরান : ৩২)

৪. ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ কলেমাকে হ্যরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বোৎকৃষ্ট যিকর বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু শুধু মৌখিকভাবে এ কলেমা পাঠ করার যথার্থ কোন মূল্য নেই। এ কলেমার মাধ্যমে আল্লাহর তৌহীদের শিক্ষা এবং মহানবী (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করার যে ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি আমরা করি তা কাজে পরিণত করার মাঝেই এর সাৰ্থকতা নিহিত।

৫. কলেমা পাঠের মাধ্যমে আমরা মুসলমানরা যে শিক্ষা ও আদর্শের মন্ত্রে দীক্ষিত হই, তা একটি পবিত্র প্রতিশ্রুতি। বাস্তব জীবনে একমাত্র আল্লাহর উপর অবিচল আস্থা রেখে এবং পবিত্র রসূল হ্যরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শকে পূর্ণরূপে অনুসরণ করে আমরা এ পবিত্র কলেমার প্রতি সম্মান দেখাতে পারি এবং আমাদের প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারি। এটিই কলেমার সারমর্ম।

দ্বিতীয় পরিচেছনা

নামায

নামাযের বিশেষত্ব

নামায ফারসি শব্দ। এর আরবি হলো ‘সালাত’। নামায বা সালাত কায়েম করা প্রত্যেক বয়স্ক ও বৃদ্ধিমান মুসলমানের জন্য ফরয বা অবশ্য-কর্তব্য। নামায এক প্রকারের নেয়ামত। এটা সর্বাপেক্ষা উত্তম দোয়া বা প্রার্থনা। মানুষের জন্যে এই প্রার্থনার বিধান দান করে আল্লাহ তাঁলা মানুষের প্রতি অশেষ অনুগ্রহ করেছেন। নামাযের মাধ্যমে আমরা আমাদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করতে পারি, পাপ হতে মুক্তি লাভ করতে পারি। নামায মানুষকে খারাপ কাজ, মন্দ কথা-বার্তা, লজ্জাহীনতা, অশ্লীলতা, বিদ্রোহ প্রভৃতি হতে রক্ষা করে। নামায বিশ্বসীদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পাথেয়-মু'মিনদের মে'রাজ। নামায বেহেশতের চাবি। একে ধর্মের স্তুতি বলা হয়।

আল্লাহ তাঁলা কুরআন করীমে বলেছেন-

إِنَّ الصَّلَاةَ تَهْبَى عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

(ইন্নাস্ সালাতা তানহা আ'নিল ফাহশায়ি ওয়াল মুনকার)

অর্থ: নিশ্চয় নামায (নামাযীকে) অশ্লীলতা এবং মন্দকাজ হতে মুক্ত করে।” (সূরা আনকাবুত : ৪৬)।

সুতরাং নামায পড়া সত্ত্বেও যদি কেউ সেই দোষ হতে মুক্ত না হয়, যেভাবে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে, তাহলে বুঝতে হবে তার নামায অকৃত নামায নয়। নামাযের সাহায্যে আমাদের আত্মা সবল ও সুস্থ থাকে। আমরা অন্যায়, অশ্লীলতা এবং অমূলক সন্দেহ হতে নিজেদের রক্ষা করতে পারি। যেসব কু-অভ্যাস কিছুতেই দূর করা সম্ভব হয় না তা নামাযের মাধ্যমে, বিশেষত তাহাজুন্দ নামাযের মাধ্যমে ও দোয়ার মাধ্যমে দূর করা সম্ভব। যে কেউ যে কোন কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করার জন্যে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে অতি অল্পকালের মাঝেই সে আশ্চর্য ফল পাবে।

নামায পড়া এবং নামায কায়েম করার মাঝে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। নামায পড়ার মাঝে পূর্ণ মনোনিবেশ থাকতে পারে, না-ও থাকতে পারে, কিন্তু নামায কায়েম করার মাঝে কতগুলো বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; যেমন- (ক) বিনা ব্যতিক্রমে যথাসময়ে নামায আদায় করা; (খ) ফরয নামায বা-জামাত আদায় করা, (গ) একাইচিত্ততার সাথে ধীরস্ত্রিভাবে নামায আদায় করা; (ঘ) নামাযে ব্যবহৃত দোয়া-কালামের অর্থ বুঝে নামায পড়া; (ঙ) নামাযের মাঝে অন্তরের আবেগ-অনুভূতি নিজ ভাষায় ব্যক্ত করা এবং আল্লাহ তাঁলার

কৃপা ভিক্ষা করা; (চ) নিজের উপর মৃত্যুসম অবস্থা আনয়ন করা এবং মনে করা যে আল্লাহ সবকিছু দেখতে পাচ্ছেন এবং তিনি সামনেই উপস্থিত আছেন এবং (ছ) আল্লাহর সাহায্য এবং করুণার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। কুরআন শরীফে প্রায় ৮২ বার নামায কায়েমের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ হতেও নামাযের গুরুত্ব উপলক্ষ্য করা যায়।

আল্লাহ তাঁলা বলেছেন -

وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَاٌ لَا سَنَكَ رِزْقًا تَنْحِيْ: تَرْزُقَ فَتَعْلَمَ الْعَاقِبَةَ لِتَقْوَىٰ
৩)

(ওয়া’মুর আহলাকা বিস্মালাতি ওয়াসতাবির আ’লায়হা লা নাস্তালুকা রিয়্কান নাহনু নারযুকুকা ওয়াল আকিবাতু লিতাকুওয়া)

অর্থ: “এবং তুমি তোমার পরিবারবর্গকে নামাযের তাগিদ করতে থাক। আমরা তোমার কাছে কোন রিয়ক চাই না, বরং আমরাই তোমাকে রিয়ক দিচ্ছি। বস্তুত তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্যই উত্তম পরিণাম।” (সূরা ত্বা-হা: ১৩৩)।

অনেকে মূর্খতাবশত নামাযকে একটা ট্যাঙ্ক বলে মনে করে। আল্লাহ তাঁলা উপরোক্ত আয়াতে এরূপ ধারণার খণ্ডন করেছেন। বস্তুত আমরা আমাদের নশ্বর দেহের জন্য যেমন নানাবিধ যত্ন নেই, সেরূপ আত্মার জন্যেও যত্ন আবশ্যক। বরং আত্মা যেহেতু চিরস্থায়ী, সেজন্য দৈহিক যত্নের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে আত্মার খাদ্য তথা নামাযের দিকে দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক, যেন আমরা আত্মাকে সতেজ এবং আটুট রাখতে পারি। মোটকথা নামায মানুষের উপর কোন প্রকার ট্যাঙ্ক নয়, বরং আত্মার জন্যে এটি অতি প্রয়োজনীয়। নামাযের মর্মার্থ না বুঝে অনেকে লোক দেখানোর জন্য নামায পড়ে থাকে। এরূপ নামাযী সম্বন্ধে আল্লাহ তাঁলা বলেছেন :

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُونَ ۝

(ফাওয়ায়লুল্লিল মুসাল্লিন, আল্লায়ীনা হম আন্ সালাতিহিম্ সাহন, আল্লায়ীনা হম ইউরাউন)

অর্থ: “দুর্ভোগ সেসব নামাযীদের জন্যে যারা তাদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন। যারা কেবল লোক দেখানো কাজ (হিসেবে তা) করে।” (সূরা মাউন: ৫-৭)।

মহানবী (সা.) বলেছেন: “নামায মু’মিনের মিরাজস্বরূপ”। দৈনিক পাঁচবার নামাযের মাধ্যমে মু’মিন আল্লাহর সাথে নিয়মিত সাক্ষাৎ লাভ করতে পারে। এছাড়া সে শেষ রাতে তাহাজ্জুদের নামাযের মাধ্যমে রাত্রির নিষ্ঠদ্রুতার মাঝে আল্লাহর অতি কাছে আসতে পারে এবং বিশেষ সাক্ষাৎ লাভ করতে পারে। তখন মু’মিন তার মর্মজ্ঞানা আল্লাহর দরবারে নিঃশেষ করে দেয় এবং আল্লাহর যিকরের (স্মরণের) মাধ্যমে এক অনাবিল শান্তি লাভ করে। ফলে তার বিপদ-বিক্ষুব্ধ অশান্ত হৃদয়ে শান্তি ফিরে আসে।

সেজন্য আল্লাহ তাঁলা বলেছেন-

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ ۖ

(আলা বি যিক্রিল্লাহি তাত্মায়িলুল কুলূব)

অর্থ: “স্মরণ রেখো! আল্লাহর স্মরণেই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে।” (সূরা রাদ: ২৯)।
আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) অধিক পরিমাণে রাত্রি জাগরণ করে নামায পড়তেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكُمْ أَذْنَى مِنْ شُلَّىٰ إِلَيْنَا وَنِصْفَهُ وَثُلَّةً وَطَلِيفَةً مِنَ الَّذِينَ مَعَكُ

(ইল্লা রাবুকা ইয়া’লামু আল্লাকা তাকুমু আদ্না মিন সুলুসাইল লাইলি ওয়া নিস্ফাহু ওয়া সুলুসাহু ওয়া ত্বারিফাতুম্ মিনাল্লায়ীনা মাঁ’আকা)

অর্থ: “নিচ্য তোমার প্রভু-প্রতিপালক জানেন, তুমি দাঁড়িয়ে থাক রাত্রের দুই-ত্বায়াংশের কিছু কম কিংবা কখনও এর অর্ধেকাংশ এবং কখনও বা এক-ত্বায়াংশ এবং (দাঁড়িয়ে থাকে) তাদের এক দলও যারা তোমার সাথে রয়েছে।” (আল মুয়্যাম্বিল: ২১)।

ফরয নামায বা-জামাত পড়তে হবে। কারণ তাতে শুধু ব্যক্তিগত কল্যাণই নয়, সামগ্রিক কল্যাণ লাভ করা যায়। নবী করীম (সা.) বলেছেন, ‘জামাতে নামায আদায় করলে সাতাশ গুণ সওয়াব হয়।’ এর দ্বারা আমরা জামাতে নামাযের গুরুত্ব বুবাতে পারি। মানুষ সামাজিক জীব, তাই সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের মাঝেই শান্তি নিহিত। ফরয ছাড়া অন্যান্য নামায ব্যক্তিগতভাবে একা পড়তে হয়। ঈদের নামায বা-জামাতে পড়তে হয়। এরপে নামায আমাদেরকে আল্লাহর সমীক্ষে ব্যক্তিগতভাবে এবং সম্মিলিতভাবে উপস্থিত করে। বছরে দু’বার ঈদের নামায, প্রতি সপ্তাহে একবার জুমু’আর নামায, প্রত্যহ পাঁচবার ফরয নামায, গভীর রাত্রে তাহাজুদের নামায- এসব ইবাদত ও উপাসনার মাধ্যমে ব্যক্তি, সমাজ এবং জাতি নৈতিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে সংশোধিত হতে পারে এবং সত্যিকার অর্থে শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

নামাযের মাধ্যমে ইতায়াত বা আজ্ঞানুবর্তিতার শিক্ষা লাভ করা যায়। তাছাড়া নেতার অধীনে চলা, সময়ানুবর্তিতা, সামাজিক সাম্য, একতা ও ভ্রাতৃত্ব, দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধতা, একাগ্রচিন্তা, পাপবর্জন এবং পুণ্যার্জন, আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ এবং নির্দর্শন লাভ করা, সামাজিক কদাচার পরিহার, শান্তি ও স্বস্তির মনোভাব, কষ্ট-সহিষ্ণুতা এবং সময়ের সম্মত প্রভৃতি বিষয়ে নামাযে বহু শিক্ষা রয়েছে। (এ প্রসঙ্গে মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব প্রণীত “নামায তত্ত্ব” পুস্তক দ্রষ্টব্য)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন: “নামায কী? এ এক প্রকার দোয়া যা তসবীহ (খোদা তা’লার মহিমা কীর্তন), তাহমীদ (প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন), তাকদীস

(পরিত্রাকারীকৃতন), এবং ইস্তিগফার (নিজের দুর্বলতাসমূহ স্বীকার করে শক্তি প্রার্থনা) ও দুর্লদ [হযরত রসূল করীম (সা.)-এর প্রতি আশিস ও বরকত কামনা] সমন্বিত বিনীত প্রার্থনা। সুতরাং যখন তোমরা নামায পড় তখন অজ্ঞ লোকদের ন্যায় দোয়ায় শুধুমাত্র আরবি শব্দ ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ থেকে না। কেননা, তাদের (অজ্ঞদের) নামায এবং ইস্তিগফার সবই বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ মাত্র। এতে কোন সারবস্তু নেই। তোমরা নামায পড়ার সময়ে খোদা তাঁলার কালাম কুরআন এবং রসূল করীম (সা.)-এর কালামে প্রচলিত দোয়া ছাড়াও নিজের যাবতীয় দোয়া নিজ ভাষাতেই কাতর নিবেদনসহ জানাও, যেন তোমাদের হৃদয়ে সেই কাতর নিবেদনের সুপ্রভাব প্রতিত হয়।”

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) পাঁচ ওয়াক্ত নামায সম্পর্কে বলেছেন- “পাঁচ ওয়াক্ত নামায কী? এ তোমাদের বিভিন্ন অবস্থার প্রতিচ্ছবিস্রূপ। বিপদকালে তোমাদের জীবনে স্বাভাবিক গতিতে পাঁচটি পরিবর্তন সংঘটিত হয় এবং তোমাদের প্রকৃতির পক্ষে তদ্বপ্ত পরিবর্তন আবশ্যিক।

(ক) সর্বথেম পরিবর্তন তখন হয়, যখন তোমাদেরকে কোন আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে অবহিত করা হয়। মনে করো, তোমাদের নামে আদালত হতে এক ওয়ারেন্ট জারী করা হলো। তোমাদের শাস্তি ও সুখে ব্যাঘাত ঘটাবার এটাই প্রথম অবস্থা। বস্তুত এ অবস্থা অবনতির অবস্থার সাথে তুলনীয়। কেননা এ হতে তোমাদের সুখের অবস্থার পতন আরম্ভ হয়। এ অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তোমাদের জন্য যোহরের নামায নির্ধারিত হয়েছে। এর ওয়াক্ত সূর্যের নিম্নগতি হতে আরম্ভ হয়।

(খ) দ্বিতীয় পরিবর্তন তোমাদের উপর তখন আসে, যখন তোমরা বিপদের অতি সঞ্চিকট হও। মনে করো, তখন তোমরা ওয়ারেন্ট দ্বারা ফ্রেফতার হয়ে বিচারকের সামনে উপস্থিত হয়েছ। এ অবস্থায় তরুণ তোমাদের রক্ত শুকিয়ে যেতে থাকে এবং শাস্তির আলো তোমাদের নিকট হতে অপসারিত হওয়ার উপক্রম হয়। সুতরাং তোমাদের এ অবস্থা সেই সময়ের ন্যায় যখন সূর্যের আলো ক্ষীণ হয়ে আসে, সে আলোর প্রতি দৃষ্টিপাতও করা যায় এবং স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়, এখন সূর্য অস্তিমিত হবার সময় সন্ধিকটে। এরপ আধ্যাত্মিকতার প্রতি লক্ষ্য রেখে আসরের নামায নির্ধারিত হয়েছে।

(গ) তৃতীয় পরিবর্তন তোমাদের উপর তখন আসে যখন এ জাতীয় বিপদ হতে মুক্তি লাভের আশা সম্পূর্ণরূপে দূর হয়— অর্থাৎ, তখন যেন তোমাদের নামে চার্জশীট লেখা হয় এবং তোমাদের ধৰ্মস সাধনের জন্য বিরচন্দ্রবাদীদের সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করা হয়। এ অবস্থায় তোমাদের স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পায় এবং তোমরা নিজেদের কয়েদী জ্ঞান করতে থাক। সুতরাং এ অবস্থা সেই সময়ের সদৃশ্য যখন সূর্য অস্তিমিত হয় এবং দিবালোকের সব আশার অবসান হয়। এরপ আধ্যাত্মিক অবস্থার সাথে সংযোগ রেখে মাগরিবের নামায নির্ধারিত করা হয়েছে।

(ঘ) চতুর্থ পরিবর্তন তোমাদের উপর তখন আসে, যখন বিপদ তোমাদের উপর প্রকৃতই

পতিত হয় এবং এর ঘন অন্ধকার তোমাদের আচ্ছাদিত করে ফেলে। অর্থাৎ, চার্জশীট প্রস্তুত ও সাক্ষ্য গ্রহণের পর শাস্তির আদেশ তোমাদের শুনানো হয় এবং কারাদণ্ডের জন্যে কোন পুলিশের নিকট সোপর্দ করা হয়। সুতরাং এ অবস্থা সে সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রাখে যখন রাত্রি আরম্ভ হয় এবং গভীর অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। এরপ আত্মিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে এশার নামায নির্ধারিত হয়েছে।

(৫) এরপর যখন তোমরা এক দীর্ঘকাল এ বিপদের অন্ধকারে অতিবাহিত কর, তখন পুনরায় তোমাদের প্রতি খোদা তা'লা করণা উদ্বেলিত হয়ে ওঠে এবং তোমাদেরকে অন্ধকার হতে মুক্তি দান করে। যেমন অন্ধকারের পর পুনরায় প্রভাত দেখা যায় এরপর সেই আলো দিনের উজ্জ্বলতা নিয়ে প্রকাশিত হয়। এরপ রূহানী অবস্থার মোকাবেলায় ফজরের নামায নির্ধারিত হয়েছে।

খোদা তা'লা তোমাদের প্রকৃতিগত পরিবর্তনের পাঁচটি অবস্থা লক্ষ্য করেই তোমাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায নির্ধারণ করেছেন। এ হতে তোমরা উপলব্ধি করতে পার, এসব নামায শুধু তোমাদের আত্মিক মঙ্গলের জন্যেই নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা যদি এসব বিপদ হতে মুক্তি পেতে চাও, তবে এ পাঁচ ওয়াক্তের নামায পরিত্যাগ করো না। এগুলো তোমাদের অভ্যন্তরীণ ও আত্মিক পরিবর্তনের প্রতিবিম্বস্বরূপ। নামাযে আসন্ন বিপদের প্রতিকার রয়েছে। তোমরা অবগত নও, উদীয়মান নব দিবস তোমাদের জন্যে কী নিয়তি (কায়া ও কদর) নিয়ে উপস্থিত হবে। সুতরাং দিনের শুরুতেই তোমরা তোমাদের মাওলা (প্রকৃত অভিভাবক)-এর কাছে সবিনয় নিবেদন করো, যেন তোমাদের জন্য মঙ্গলময় এবং আশিসপূর্ণ দিনের আগমন হয়।” (কিশতিয়ে নৃহ)

হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.) আরও বলেছেন, “স্মরণ রেখো, নামায এমন এক জিনিস, এ দিয়ে দুনিয়াও সাজানো যায় এবং ধর্মও সাজানো যায়। কিন্তু বেশির ভাগ লোক যে নামায পড়ে, সেই নামায তাদের অভিশাপ দেয়। যেমন, আল্লাহু তা'লা বলেছেন-

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝ أَلَّاَدِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝

(ফাওয়ায়লুল্লিল মুসাল্লীনাল্লায়ীনা হুম আন সালাতিহিম সাল্লুন)

অর্থ: দুর্ভোগ সেইসব নামাযীদের জন্যে যারা তাদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন। (সূরা মাউন : ৫-৬)। নামায এমন এক জিনিস, যা পড়লে সব রকম মন্দ কাজ এবং নির্লজ্জতা হতে রক্ষা পাওয়া যায়।” (মালফুয়াত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৬)

নামাযে রংকু, সিজদা ইত্যাদির তাৎপর্য

[যুগ-ইমাম হ্যরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বক্তব্যের আলোকে]

“নামায ওঠা বসার নাম নয়। নামাযের সারবস্তি ও আত্মা হলো দোয়া— যা নিজের মাঝে এক প্রকার স্বাদ ও আনন্দ সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে আরকানে নামায (দাঁড়ানো, রংকু, সিজদা ইত্যাদি) আদব দেখানোর পদ্ধতি। আরকানে নামায আধ্যাত্মিক ওঠা-বসাস্বরূপ। মানুষকে আল্লাহ তা'লার দরবারে দণ্ডায়মান হতে হয়। আর দাঁড়ানোও সেবকগণ কর্তৃক (প্রভুকে) সম্মান দেখানোর একটি পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।

রংকু এর দ্বিতীয় অংশ। এটি ব্যক্ত করে যে, আদেশ পালনের প্রস্তুতি হিসেবে মাথাকে যেন সম্পূর্ণ বুঁকিরে দেয়া হয়েছে। আর সিজদা হলো চূড়ান্ত সম্মান ও পরম বিনয় এবং অস্তিত্ব বিলুপ্তির পরিচায়ক। ইবাদতের আসল উদ্দেশ্যে এ আদব ও পদ্ধতি খোদা তা'লা স্মারকচিহ্ন হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। দেহকে আধ্যাত্মিক পদ্ধতির মাঝে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার খাতিরে এক বাহ্যিক পদ্ধতিও রেখে দেয়া হয়েছে। এখন যদি বাহ্যিক পদ্ধতিতে (যা অভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক পদ্ধতির এক প্রতিবিম্ব) কেবল বানরের মত অনুকরণ করা হয় এবং একে যদি এক বড় বোঝা মনে করে বাইরে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করা হয়, তাহলে তুমিই বলো, এর মাঝে কি স্বাদ ও আনন্দ লাভ হতে পারে? আর যখন পর্যন্ত স্বাদ ও আনন্দ না লাগে ততক্ষণ এর তাৎপর্য লাভের অধিকারী কীভাবে হবে? যখন আত্মাও সম্পূর্ণ বিলীন ও বিনত হয়ে ঐশ্বী দরগাহে পতিত হয় এবং নামাযী যে কথা বলে তার আত্মাও যেন সঙ্গে সঙ্গে তা বলতে থাকে— সেই সময়ে এক সুখ ও জ্যোতি এবং স্বষ্টি লাভ হয়।” (মালফুয়াত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৪-৬৫)

“স্মরণ রেখ, নামাযে নামাযীর অবস্থা আর তার বক্তব্য উভয়ই একীভূত হওয়া জরুরী। কখনো-কখনো সংবাদ চিত্রের আকারে দেখানো হয়ে থাকে। এমন চিত্র দেখানো হয় যদ্বারা দর্শকের এ উপলব্ধি হয় যে তার ইচ্ছা এরূপ। নামাযের মাঝেও ঐশ্বী আকাঙ্ক্ষার চিত্র এরূপ। নামাযের মাঝে যেভাবে জিহ্বা দ্বারা কিছু পাঠ করা হয় সেভাবেও অঙ্গ-প্রতঙ্গের সংঘালনেও কিছু দেখিয়েও দেয়া হয়। যখন মানুষ দণ্ডায়মান হয় এবং (আল্লাহ তা'লার) প্রশংসা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করে সে অবস্থার নাম রাখা হয়েছে কিয়াম (দণ্ডায়মান হওয়া)। এখন সব মানুষই অবগত আছে, প্রশংসা ও গুণকীর্তনের যথার্থ অবস্থা কিয়াম-ই। বাদশাহের সামনে যখন তাঁর গুণকীর্তন করতে যাওয়া হয় তখন তো তা দাঁড়িয়ে উপস্থাপন করতে হয়। তাই একদিকে বাহ্যিকভাবে কিয়ামকে রাখা হয়েছে অন্য দিকে মৌখিকভাবে প্রশংসা ও গুণকীর্তনও রাখা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এটাই যেন আধ্যাত্মিকভাবেও আল্লাহ তা'লার সামনে দণ্ডায়মান হয়। প্রশংসা কোন এক কথার উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তি যদি সত্যবাদী হয়ে কারও প্রশংসা করে তাহলে সে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে যায়। সে ব্যক্তি যে ‘আল্হামদুলিল্লাহ’— অর্থাৎ, সব প্রশংসা

আল্লাহর বলে তার জন্যে এটা আবশ্যিক হয় যে, সে যথার্থভাবে তখনই আলহামদুলিল্লাহ্ বলতে পারে যখন তার পরিপূর্ণভাবে দৃঢ় বিশ্বাস জন্যে সব রকম প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'লার। স্বষ্টির সাথে অন্তরে যখন এ কথা সৃষ্টি হবে তখন এটাই আধ্যাত্মিক কিয়াম। কেননা, অন্তর এর উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আবার এটা উপলব্ধি করে যে, সে দণ্ডায়মান রয়েছে। অবস্থা অনুযায়ী দণ্ডায়মান হয়ে গেছে যেন আধ্যাত্মিক কিয়ামের সৌভাগ্য লাভ হয়।

এরপে রংকুর মাঝে ‘সুবহানা রাবিয়াল আযীম’ (পবিত্র আমার প্রভু অতি মহান) পাঠ করা হয়। নীতিগত কথা হল, যখন কারও মহস্ত মেনে নেয়া হয় তখন তার প্রতি বিনত হওয়া জরুরী। মহস্তের চাহিদা হল, তাঁর উদ্দেশ্যে যেন রংকু করা হয়— অর্থাৎ, বিনত হয়। অতএব মুখ দিয়ে বলা হলো— ‘সুবহানা রাবিয়াল আযীম’ এবং কার্যত রংকু করে বিনত হয়ে দেখানো হলো— অর্থাৎ, এটা কথার সাথে কাজেও দেখানো হলো। এরপে তৃতীয় কথা ‘সুবহানা রাবিয়াল আলা’ (পবিত্র আমার প্রভু অতি উচ্চ) ‘আলা’ হলো উলার তফযীল (সর্বাধিক অর্থে বুঝানো)। এর প্রত্যাশা হলো সিজদা। এজন্যে এর সাথে কার্যত চিত্র হলো সিজদায় নিপত্তি হওয়া। এ স্বীকৃতির যথার্থ অবস্থা হলো তাৎক্ষণিকভাবে বিলীন হওয়া।

এ কথার সাথে ঢটি শারীরিক অবস্থা সম্পৃক্ত। প্রথম চিত্র এর আগে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রত্যেক প্রকারের কিয়ামের কথা বলা হয়েছে। জিহ্বা শরীরের একটি অঙ্গ, সে-ও বলল। আর সে-ও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। তৃতীয় জিনিস অন্যটি। যদি তা অংশ না নেয় তাহলে নামায হয় না। সেটা কী? সেটা অন্তর বা মন। এর জন্যে আবশ্যিক, অন্তরেরও কিয়াম হোক। আর আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে দেখেন, প্রকৃতই সে প্রশংসন্সাও করছে এবং দণ্ডায়মানও হয়েছে এবং তার অন্তরও দণ্ডায়মান হয়ে প্রশংসন্সা করছে। কেবল দেহই নয় মনও দণ্ডায়মান আছে। আর যখন ‘সুবহানা রাবিয়াল আযীম’ বলে তখন যেন লক্ষ্য করে, কেবল এতটুকুই নয় যে মহস্তের স্বীকৃতি দিচ্ছে বরং সাথে-সাথে বিনতও হচ্ছে এবং সাথে-সাথে অন্তরও বিনত হয়ে গেছে। এভাবে তৃতীয় দৃশ্য খোদার সামনে সিজদায় পতিত হওয়া। তাঁর উচ্চ মর্যাদা সম্মুখে রেখে এর সাথেই দেখবে, ঐশ্বী দরগাহে আত্মাও পড়ে আছে। সোজা কথা যতক্ষণ এ অবস্থার সৃষ্টি না হয় তখন স্বষ্টি আসে না। কেননা ‘ইউকিমুনাস সালাতা’ তারা নামায প্রতিষ্ঠা করে- এর অর্থ এটাই। (মালফুয়াত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৩-৪৩৫)।

“নামাযের মাঝে যতগুলো দৈহিক বিভিন্ন অবস্থাদি রয়েছে এ সবের সাথে অন্তরও যেন সেভাবে অনুকরণ করে। যদিও শারীরিকভাবে দণ্ডায়মান হও তাহলে মনকেও খোদার আনুগত্যের জন্যে দণ্ডায়মান করো। যদি বিনত হও তো অন্তরকেও সেভাবে বিনত করো। যদি সিজদা করো তাহলে মনেরও সেভাবে সিজদা করা উচিত। মনের সিজদা হলো, কোন অবস্থায়ই যেন খোদাকে ছেড়ে দেয়া না হয়। যখন এক্ষে অবস্থা হবে তখন

পাপ দূরে সরে যেতে শুরু করবে।” (মালফুয়াত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৭৬)।

“খোদা তাঁলা আত্মা ও দেহের সাথে একটি নিবিড় সম্পর্ক রেখে দিয়েছেন। আর দেহের প্রভাব সর্বদাই আত্মার উপরে পড়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন ব্যক্তি ভান করে কাঁদতে চায় তাহলে অবশ্যে তার কান্না এসেই যাবে এবং এভাবে যে ভান করে হাসতে চায় অবশ্যে তার হাসি পেয়েই যায়। এভাবে নামাযের মাঝে দেহের উপর যেসব অবস্থার সৃষ্টি হয় যেমন, দণ্ডযামান হওয়া বা রুক্ষ করা, এর সাথে মনের উপরও প্রভাব সৃষ্টি হয়। দেহের মাঝে যতটুকু শ্রদ্ধা-ভক্তির অবস্থা প্রদর্শিত হয় ততটুকু আত্মায়ও সৃষ্টি হয়। যদি খোদা নিজের পক্ষ থেকে সিজদা করুল না করেন তবুও সিজদার সাথে আত্মার একটি সম্পর্ক আছে। এজন্যে নামাযের মাঝে শেষ পর্যায়ে সিজদাকে রাখা হয়েছে, যখন মানুষ শ্রদ্ধা-ভক্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন সে সিজদাই করতে আকাঙ্ক্ষা করে। পশ্চদের মাঝেও এ অবস্থার লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। কুরুকেও যখন তার প্রভু আদর করে তখন এসে তার পায়ের উপর নিজের মাথা রেখে ভালোবাসার সম্পর্কের প্রকাশ সিজদার আকারে করতে থাকে। এ থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়, দেহের সাথে আত্মার একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এভাবেই মনের অবস্থাসমূহের প্রভাব শরীরের ওপর প্রতিফলিত হয়ে যায়। যখন মন বিনীত হয় তখন দেহের ওপরে তার প্রভাব ছেয়ে যায় এবং অঙ্গ ও বিমর্শ অবস্থার প্রকাশ পায়। যদি দেহ ও মনের মাঝে সম্পর্ক না থাকে তাহলে এরূপ কেন হয়? রক্তকে প্রবাহ্মান রাখাও হৃৎপিণ্ডের একটি কাজ। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই, হৃৎপিণ্ড শরীরে পানি সিঞ্চনের জন্যে একটি ইঞ্জিনস্বরূপ। এর সম্প্রসারণ ও সংকোচনে সব কিছু হয়ে থাকে।

মোটকথা, দেহ ও মন উভয়েরই কার্য পাশাপাশি চলছে। মনের মাঝে যখন বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায়, তখন দেহের মাঝেও তা সৃষ্টি হয়। এ জন্যে যখন মনে প্রকৃতই বিনয় ও শ্রদ্ধা ভক্তির অবস্থা সৃষ্টি হয় তখন শরীরে এর প্রভাব স্বতই সৃষ্টি হয়ে যায়। আর এভাবেই শরীরের ওপর একটি পৃথক প্রভাব পড়ে আর মন এতে প্রভাবান্বিত হয়ে যায়। এ জন্যে জরুরী, যখন নামাযের জন্যে খোদার সকাণে দণ্ডযামান হও তখন অবশ্যই নিজের অঙ্গিতে বিনয় ও শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রকাশ করো। যদিও এ সময়ে এটা এক প্রকার কপটতাস্বরূপ। কিন্তু আন্তে-আন্তে এর প্রভাব স্থায়ী হয়ে যায় আর প্রকৃতই মনে সেই শ্রদ্ধা-ভক্তি ও আত্মবিলীনতার গুণ সৃষ্টি হতে থাকে।” (মালফুয়াত, ৪ৰ্থ খণ্ড, পৃ. ৪২১-৪২২)।

“আর আমি প্রথমে কিয়াম, রুক্ষ ও সিজদা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছি। এতে মানবিক অনুনয়-বিনয়ের আকৃতি ও নকশা দেখানো হয়েছে। প্রথমে কিয়াম করা হয়। যখন এতে উন্নতি লাভ হয়, তখন রুক্ষ করা হয় আর যখন পুরোপুরি বিলীনতার ভাব সৃষ্টি হয় তখন সিজদায় পতিত হয়ে যায়। আমি যা কিছু বলি তা অন্ধ অনুকরণ বা আচরণ হিসাবে বলি না বরং নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলি। বরং প্রত্যেকেই একে এভাবে পড়ে এবং পরীক্ষা

করে দেখতে পারে। এ ব্যবস্থাকে সর্বদা স্মরণ রাখো আর এ থেকে উপকৃত হও। যখন কোন দুঃখ বা দুর্দশায় পতিত হও তখনই নামাযে দস্তায়মান হয়ে যাও এবং যে দুর্দশা ও কষ্টে পতিত হয়েছ তা সবিস্তারে আল্লাহ'র সমীপে নিবেদন করো। কেননা অবশ্যই খোদা আছেন আর তিনিই একমাত্র অস্তিত্ব যিনি মানবকে প্রত্যেক প্রকারের কষ্ট ও দুর্দশা থেকে বের করতে পারেন। তিনি নিবেদনকারীর নিবেদন শুনেন। তিনি ছাড়া আর কেউ সাহায্যকারী হতে পারে না। মানুষ বড়ই দুর্বল, যখন সে দুর্দশায় পতিত হয়। সে উকিল, চিকিৎসক অথবা অন্যান্য লোকদের প্রতি মনোযোগ দেয়। কিন্তু খোদা তাঁ'লার কাছে মোটেও যায় না। মু'মিন সে, যে সর্বপ্রথম খোদা তাঁ'লার কাছে দ্রুত গমন করে।"

(মালফুয়াত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১১৩১)।

নামাযের ওয়াক্ত বা সময়

দিনে পাঁচবার নামায পড়া ফরয। এ পাঁচবার নামাযের ওয়াক্ত বা সময় হচ্ছে:

ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা।

- ফজর: ভোরের আলো প্রকাশের শুরু হতে সূর্য ওঠার পূর্ব পর্যন্ত।
- যোহর: দুপুরের সূর্য হেলে যাওয়ার পর হতে প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার অনুরূপ হওয়া পর্যন্ত। ঘড়ির সময়ানুযায়ী নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে যোহরের সম্পূর্ণ সময় প্রায় তিন ঘন্টা হয়ে থাকে। যোহরের নামায গ্রীষ্মকালে কিছুটা দেরী করে আর শীতকালে তাড়াতাড়ি আদায় করা উত্তম।
- আসর: প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার দ্বিগুণ হবার থেকে শুরু করে পশ্চিম আকাশে লাল বর্ণধারণ করার আগে তথা সূর্য-ভোবার পূর্ব পর্যন্ত।
- মাগরিব: সূর্য অস্ত যাবার পর থেকে পশ্চিমাকাশে লালিমা শেষ না হওয়া পর্যন্ত।
- এশা: সূর্য ডোবার এক বা সোয়া ঘন্টা পর—অর্থাৎ, রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত।

মের অঞ্চলে যেখানে দিন বা রাত্রি অনেক দীর্ঘ হয়ে থাকে সেখানে সময় অনুমান করে ঘড়ির সময়ানুসারে নামায, রোয়া ইত্যাদি পালন করতে হবে। (ফিকাহ আহমদীয়া, পৃ. ৩৭-৩৮)

নামাযের নিষিদ্ধ সময়

নিম্নোক্ত সময়ে যেকোন ধরনের ফরয কিংবা নফল নামায পড়া নিষেধ।

- (১) সূর্য উদিত হবার সময় থেকে এক বর্ষা পরিমাণ উপরে উঠা পর্যন্ত।
- (২) ঠিক দুপুর বেলা যখন সূর্য একেবারে মাথার উপরে থাকে। যদিও জুমু'আর দিন এ সময়ে মসজিদে দুই রাকা'ত নফল নামায পড়ার অনুমতি আছে।

(৩) সূর্য অন্তিমিত হবার সময় ।

- এছাড়া নিম্নলিখিত সময়ে কেবল নফল নামায পড়া মাকরহ বা অপছন্দনীয় ।
 - ফজরের নির্ধারিত সময়ের পর থেকে নিয়ে সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত সময়ে ২ রাকাত সুন্নত ছাড়া আর কোন নফল নামায পড়া বৈধ নয় ।
 - আসরের নামায পড়ার পর নফল নামায পড়া বৈধ নয় ।
 - ঈদের দিন সূর্য উঠার পর ঈদগাহে বা ঈদের নামাযের স্থানে কোন নফল পড়া বৈধ নয় ।
 - ঈদের নামাযের আগেও নয় এবং পরেও নয় ।
 - নামায বা-জামাত হচ্ছে এমন অবস্থায় মসজিদে নিজে নিজে সুন্নত বা নফল পড়া বৈধ নয় ।
 - এছাড়া তদ্বা বা ঘুমে আচ্ছন্ন অবস্থায়ও নামায নিষেধ । এরূপ অবস্থায় প্রথমে ঘুমিয়ে নিতে হবে । ঘুম হতে উঠে পরে নামায পড়তে হবে ।
 - খানা কা'বা- অর্থাৎ, মসজিদুল হারামে যে কোন সময়ে সুন্নত বা নফল নামায পড়া যেতে পারে । কেননা, সেখানে সব সময় কা'বার তাওয়াফ প্রদর্শন করা যেতে পারে এবং প্রত্যেক বার তাওয়াফের পর দুই রাকাত নামায পড়া জরুরী । একে তাওয়াফের নামায বলে ।
 - সূর্যগ্রহণের সময় ‘নামাযে কসুফ’ যেকোন সময় পড়া যায় । সূর্য উঠছে বা ডুবে যাচ্ছে, ঠিক দুপুর বেলা বা আসরের নামাযের পর যখনই গ্রহণ লাগে নামায আরম্ভ করে দেয়া আবশ্যিক । কেননা, এ নামাযের কারণ হলো সূর্যগ্রহণ । এটা যে সময় লাগুক না কেন সে সময়েই এ নামায পড়তে হবে ।
- দিনের বিভিন্ন সময় নামায পড়তে নিষেধ করার মাঝে এ প্রজ্ঞা নিহিত, যেন এ দিকে মনোযোগ নিবন্ধ থাকে যে আসল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তাঁরার আনুগত্য ও অনুবর্তীতা । খোদা যখন নামায পড়তে বলবেন তখন পড়বে, আর যখন বলবেন নামায পড়বে না- তখন উভয় সময়-সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নামায পড়া পুণ্যের কাজ হবে না । কেননা পুণ্য ও প্রকৃত ইবাদত সেটাই যা আল্লাহ তাঁলা পছন্দ করেন ।
- এসব সময়ে নামাযের নিষেধাজ্ঞার মাঝে এ প্রজ্ঞাও নিহিত- এর মাঝে কোন-কোন সময় বিশেষ করে সূর্য উদিত ও অস্ত যাওয়ার সময় মুশরিক ও মৃত্তি পূজারীরা তাদের মিথ্যা উপাস্য দেবতাদের উপাসনা করে থাকে । যেহেতু এসব সময় শিরক ও কুফরীর চিহ্নে পরিণত হয়ে গিয়েছিল তাই তোহীদ (একত্ববাদ)-এর অনুসারীদের কুফরী ও শিরকের এ চিহ্ন থেকে দূরে রাখার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং ইসলামের বিশেষ ইবাদতের সঠিক সঠিক সময় নির্ধারণ করা হয়েছে । এটা নিজের মাঝে আধ্যাত্মিক কল্যাণরাজি বহন করে থাকে । উক্ত নিষেধাজ্ঞা থেকে এ প্রজ্ঞার প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যে, কোন সময় এমন হওয়া উচিত যাতে মানবীয় মেধা অবসর লাভ করে । নচেৎ ধারাবাহিক ব্যস্ততার কারণে তা অকেজো হয়ে যাবে । মহানবী (সা.) একবার বলেছেন, “মানুষ

যখন নামায পড়তে-পড়তে হাঁপিয়ে যায় তখন তার বিশ্রাম নেয়া আবশ্যিক।” এ সকল উদ্দেশ্যকে দৃষ্টিপটে রেখে এসব সময় আবশ্যিক অবসর রাখা হয়েছে যেন কোন খেয়ালী ব্যক্তি আবার চবিশ ঘন্টাই নামায পড়তে লেগে না যায়। আর তার জন্য কিছু সময় এমনও এসে যায় যাতে সে অবসর হতে এবং নামায পরিহার করতে বাধ্য হয়। (ফিকাহ আহমদীয়া, পৃ. ৪৫-৪৬, অনুবাদ: আলহাজ মুহাম্মদ মুতিউর রহমান)

নামাযের রাকা'ত

নামাযের নাম	প্রথম সুন্নত	ফরয	শেষের সুন্নত	নফল
ফজর	২ রাকা'ত	২ রাকা'ত		
যোহর	৪ রাকা'ত	৪ রাকা'ত	২ রাকা'ত	২ রাকা'ত
আসর	৪ রাকা'ত	৪ রাকা'ত		
মাগরিব		৩ রাকা'ত	২ রাকা'ত	২ রাকা'ত
এশা	৪ রাকা'ত	৪ রাকা'ত	২ রাকা'ত	২ রাকা'ত
বিতর	এশার নামাযের পর তিন রাকা'ত বিতর নামায পড়তে হয়। এটা ওয়াজিব। অথবা তাহজুত নামাযের পরও এ নামায পড়া যায়।			

নামাযের আদব

- ১) পরিক্ষার-পরিচ্ছন্ন অবস্থায় কিবলামুখী- অর্থাৎ, কা'বামুখী হয়ে নামায পড়তে হয়। দু'জনের মাঝে খালি জায়গা না রেখে কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে নামাযের জামাতে কাতার সোজা করা উচিত।
- ২) নামাযে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ ধ্যান আল্লাহ তা'লার দিকে নিবন্ধ রাখতে হয়। হ্যরত রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَمَا نَكَرَ تَرْهَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرْهَةً فَإِنَّهُ يَرْكَ

- (আন তা'বুদ্দাল্লাহ কাআল্লাকা তারাহ ওয়া ইন লাম তারুন তারাহ ফাইল্লাহ ইয়ারাকা)
- অর্থ: তুমি আল্লাহ তা'লার ইবাদত এমনভাবে করো যেন তুমি খোদাকে দেখতে পাচ্ছ। যদি তুমি তাকে দেখতে না পাও, তবে মনে করো খোদা নিশ্চয় তোমাকে দেখছেন।
- ৩) প্রত্যেক ওয়াজের নামায ঠিক সময়ে নিষ্ঠার সাথে আদায় করতে হয়। ফরয নামায মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করাই উত্তম। একান্ত অপরাগ হলে ঘরে অন্তত পরিবারের সবাইকে নিয়ে জামাতে নামায পড়া উচিত। কেননা হাদীসে এসেছে, “বা-জামাত নামায আদায় করলে সাতাশ গুণ অধিক সওয়াব পাওয়া যায়।” (মুসলিম,

কিতাবুস সালাত)।

- ৪) নামাযে বা পার্থ করা হয়, তা ধীরে-ধীরে বুরো পার্থ করা উচিত।
- ৫) নামায পড়ার সময়ে চোখ খোলা রাখতে হয় এবং এদিক-সেদিক না তাকিয়ে সিজদার জায়গার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হয়।
- ৬) নামায পড়ার সময় দেয়ালে বা কোন কিছুতে ঠেস দেয়া বা এক পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ানো ঠিক নয়। কাতার সোজা রাখা, কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে নামায পড়া আবশ্যিক।
- ৭) নামাযে নির্ধারিত আরবি দোয়া ছাড়াও মাত্তাভায় সিজদায় আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করা উচিত।
- ৮) নামাযীর সম্মুখ দিয়ে যাতায়াত করা নিষেধ। এর গুরুত্ব বোঝাবার জন্য হ্যরত রসূল করিম (সা.) বলেছেন, “কাউকে যদি ৪০ বছর দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, তবুও সে যেন নামাযীর সম্মুখ দিয়ে না যায়।”
- ৯) মসজিদে নামায ছাড়াও অন্য সময় খোদা তা'লার যিকর বা গুণগান করা উচিত। এছাড়া কখনো-কখনো ঘরেও সুন্নত বা নফল নামায পড়া উচিত অথবা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বা-জামাত নামায পড়া উচিত, যাতে করে বাড়ি-ঘরও খোদা তা'লার যিকর থেকে খালি না থাকে। (মুসলিম, কিতাবুস সালাত)।
- ১০) নামায বা-জামাত হতে থাকলে তৎক্ষণাতে শামিল হওয়া উচিত। ফজরের নামাযের সুন্নত ফরয নামায আদায় করার পূর্বে পড়া না হয়ে থাকলে ফরয নামাযের পর অবশ্যই পড়ে নিতে হবে। মাগরিব ও এশা নামায জমা হয়ে থাকলে মাগরিব ও এশার দুই রাকা'ত সুন্নত নামায আদায় করা জরুরী নয়। কেউ যদি ইমামের রংকুকালীন অবস্থায় রংকুতে শামিল হয়ে যায় তাহলে তিনি গ্রেড রাকা'ত পেয়েছেন বলে ধরা হবে। যখন নামায শুরু হয়ে যায় তখন দৌড়ে শামিল হওয়া ঠিক নয়। বরং ধীর-স্থিরভাবে এসে নামাযে যোগ দেওয়া উচিত। (মুসলিম, কিতাবুস সালাত)।
- ১১) নামাযের জন্য শরীর, জামা-কাপড়, জায়নামায প্রভৃতি অবশ্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। নামায খোদার দরবারে গৃহীত হওয়ার জন্য এ সমস্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া আবশ্যিক। এ জন্য নামাযের আগে ওয় এবং প্রয়োজন হলে গোসল করে নিতে হবে।
- ১২) অসুস্থ ব্যক্তি অপারগ অবস্থায় দাঁড়িয়ে না পারলে বসে, শুয়ে বা ইশারায় নামায পড়বে।
- ১৩) যদি কেউ সুন্নত বা নফল নামায পড়তে থাকে এবং তখন ফরয নামাযের জামাত আরঙ্গ হয়ে যায়, তবে তার সেই নামায ছেড়ে দিয়ে অথবা অতি দ্রুত সংক্ষেপ করে জামাতে শামিল হওয়া জরুরী। কেননা বা-জামাত ফরয চলাকালীন সময়ে সুন্নত নামায হয় না। জুম'আর খুতবা চলাকালীন সময়ে কেউ মসজিদে উপস্থিত হলে তখন তাড়াতাড়ি

দুই রাকা'ত সুন্নত আদায় করে নিতে হবে। কেননা খুতবা শুনাও ফরয। তখন সুন্নত না পড়লে এক্ষেত্রে পরে সানী খুতবার সময়ে তাড়াতাড়ি দুই রাকা'ত সুন্নত পড়ে নিতে হবে। (ফিকাহ আহমদীয়া, পৃ. ১৬২)।

১৪) অমগরত অবস্থায় যানবাহনের ওপর বসা অবস্থায়ও নামায পড়া যায়।

১৫) পবিত্র কুরআনের আয়াত ছাড়া আর সব দোয়াই রূক্ষ ও সিজদাতে করা যায়।

নামাযের শর্তসূচনা

যেরূপে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মহার্যাদাসম্পন্ন কাজ শুরু করার পূর্বে উপযুক্ত প্রস্তুতির প্রয়োজন, তদ্বপ্র নামাযের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতকে শুন্দ ও পরিপূর্ণভাবে আদায় করার জন্য কিছু বিষয় পূর্বে করা আবশ্যক যেগুলিকে ‘নামাযের শর্ত’ বলা হয়। নামাযের শর্ত হল পাঁচটি। এগুলো হল-

- ১) সময়
- ২) পবিত্রতা (সুযোগ-সুবিধানুযায়ী গোসল, ওয়ু বা তৈয়ামম প্রভৃতি দ্বারা)। এমনকি নামাযের স্থানও পবিত্র হওয়া আবশ্যক।
- ৩) সতর ঢাকা- অর্থাৎ, নগ্নতা ঢাকা।
- ৪) কিবলা- অর্থাৎ, কাঁবা ঘরের দিকে মুখ করা।
- ৫) নিয়ত (ফরয, সুন্নত, নফল প্রভৃতি যে নামায পড়া হয় তার নিয়ত করা)।

ওয়ুর নিয়ম

১. প্রথমে (বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম) পাঠ করা।
২. দুই হাতের কঙ্গি পর্যন্ত ধোয়া।
৩. তিনবার ভালভাবে কুলি করে উত্তমরূপে মুখ পরিষ্কার করা। প্রয়োজনে দাঁত মাজা।
৪. তিনবার নাকে পানি দিয়ে বাম হাতে নাক ভালভাবে পরিষ্কার করা।
৫. তিনবার অঞ্জলি ভরে পানি নিয়ে সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল ধোয়া।
৬. দাড়ি ঘন হলে আঙ্গুল দিয়ে খিলাল করে নেয়া।
৭. তিনবার করে প্রথমে পুরো ডান ও পরে বাম হাত কনুই পর্যন্ত ধোয়া।
৮. দু'হাত ভিজিয়ে নিয়ে প্রথমে মাথা, পরে কান ও ঘাড় মুছে ফেলা। একে মাসাহ করা বলে।
৯. প্রথমে ডান ও পরে বাম পা গোড়ালী পর্যন্ত ধুয়ে ফেলা।
- মোজা মাসাহ: যিনি মুসাফির (সফররত) নন তিনি সকালে ওয়ু করে মোজা পরে থাকলে পরবর্তী সকাল পর্যন্ত পা না ধুয়ে শুধু মোজার উপর ভিজা হাত বুলিয়ে নিবেন। আর যিনি মুসাফির তিনি ওয়ু করে মোজা পায়ে রেখে থাকলে তিনদিন পর্যন্ত ওয়ু করে

মোজায় মাসাহ্ করতে পারবেন। (মেশকাত)। পাগড়ী মাসাহ্ করার ব্যাপারে হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, এ ব্যাপারে মতভেদ আছে, তবে আমার দৃষ্টিতে জায়েয়। (ফিকাহ আহমদীয়া, পঃ ৫৭)।

১০। হাত ও পা ধোয়ার সময় আঙুল খিলাল করা।

• নেট : নিয়মিত দাঁত মাজা রসূল করিম (সা.)-এর একটি বিশেষ সুন্নত। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর উম্মতকে বিশেষভাবে তাগিদ প্রদান করেছেন। মহানবী (সা.) বলেছেন, “যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর না হতো তাহলে আমি প্রত্যেক নামায়ের পূর্বে মেসওয়াক করার আদেশ দিতাম।” (সহীহ বুখারী, কিতাবুল জুমু’আ)।

তৈয়ম্মম

পানি না পাওয়া গেলে বা পাওয়া খুবই দুর্ক হলে, কিংবা পানি ব্যবহার করলে রোগ বৃদ্ধি পাবার আশঙ্কা থাকলে ওয় বা গোসলের পরিবর্তে তৈয়ম্মম করাই যথেষ্ট। (সূরা নিসা : ৪৪)। বিসমিল্লাহ্ পাঠ করে উভয় হাত পরিষ্কার পরিত্র মাটি, পাথর বা দেয়ালে ঘষে প্রথমে সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল এবং পরে দু’হাত কনুই পর্যন্ত বা কেবল কজি পর্যন্ত মুছে ফেলতে হয়। হাত মোছার সময় আঙুল খিলাল করা ভাল।

ওয়ু করার পরের দোয়া

أَشْهِدُ أَنْ لِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ط
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

(আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইলাহাহ ওয়াহ্দাহ লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আল্লা
মুহাম্মাদান আবদুহ ওয়া রাসূলুহ। আল্লাহম্মাজ আলনী মিনাত্তাওয়্যবীনা ওয়াজআলনী
মিনাল মুতাতাহহিরীন)

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিছি, আল্লাহহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি এক-অধিতীয়, তাঁর
কোন অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিছি, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল।
হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারীগণের অন্তর্ভুক্ত করো এবং পরিত্রাতা অর্জনকারীদের
অন্তর্ভুক্ত করো।

(শার্দিক: আল্লাহম্মা- হে আল্লাহ!, ওয়াজআলনী- এবং আমাকে করো, মিনাত্তাওয়্যবীনা-
তওবাকারীগণের অন্তর্ভুক্ত, মিনাল মুতাতাহহিরীন- পরিত্রাতা অর্জনকারীগণের অন্তর্ভুক্ত)
গোসল ও তৈয়ম্মম করার পরও এ দোয়া পাঠ করতে হয়।

যেসব কারণে ওয় থাকে না, পুনরায় করতে হয়

- প্রস্তাব বা পায়খানা করলে কিংবা প্রস্তাব বা পায়খানার রাস্তা দিয়ে কিছু বের হলে।
- ঘুমালে।
- দেহের কোন স্থান হতে রক্ত, পুঁজ প্রভৃতি গড়িয়ে পড়লে।
- বমি করলে।

তৈয়ম্বমও উপরোক্ত কারণে ভঙ্গ হয়ে যায়।

গোসলের আদব কায়দা

গোসলের ফরয তিনটি। যথা:-

- (১) কুলি করা।
- (২) পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা।
- (৩) এরপর পানি ঢেলে সমস্ত শরীর এমনভাবে ধুয়ে ফেলা যেন কোন স্থান শুকনো না থাকে।

গোসলের উন্নত নিয়ম হল, খুতু অনুযায়ী গোসলকারী গরম বা ঠাণ্ডা পরিষ্কার পানি দিয়ে গোসল করবে। প্রয়োজনে প্রথমে প্রস্তাব-পায়খানা করে শৌচকর্ম করে নিবে। পরে ওয় করবে— অর্থাৎ, বিসমিল্লাহ পাঠ করে হাত ধোত করবে। এরপর কুলি করে নাক পানি দিয়ে পরিষ্কার করবে। হাত কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নিবে। মাথা মাসাহ করবে। পরে সমস্ত শরীরে তিনবার পানি ঢালবে। প্রথমে ডান দিকে পরে বাম দিকে। গোসলের সময় ভালভাবে শরীর মলে পরিষ্কার করা আবশ্যিক। সাবান বা ময়লা পরিষ্কার করার জন্যে কোন সুবিধাজনক উপকারী জিনিস ব্যবহার করাও গোসলের আদবের অন্তর্ভুক্ত। যেসব অবস্থায় গোসল করা ফরয সেসব অবস্থায় গোসল না করে মানুষ নামায পড়তে পারে না, কুরআন করিম পাঠ করতে পারে না এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে মসজিদে যেতেও নিষেধ করা হয়েছে। পূর্ণরূপে গোসল করার পর আর ওয় করার প্রয়োজন হয় না।

(ফিকাহ আহমদীয়া, পৃষ্ঠা. ৫১, অনুবাদ: আলহাজ্জ মুহাম্মদ মুতিউর রহমান)

সতর ঢাকা ফরয (অবশ্যকর্তব্য)

নামাযের তৃতীয় শর্ত হলো সতর ঢাকা— অর্থাৎ, নগ্নতা ঢাকা। পোশাকের কারণে মানুষকে মর্যাদাসম্পন্ন মনে হয়। তাই পরিষ্কার এবং সতর ঢাকে এমন পোশাক পরিধান করে যেন মানুষ নামাযে যায়। পুরুষের সতর হলো কমপক্ষে নাতি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা। নচেৎ নামায হবে না। মহিলারা নামায পড়ার সময় কেবল মুখ খোলা রাখবে। তবে শর্ত হল, যেন কোন না-মাহরাম (যার সাথে বিয়ে বৈধ এমন পুরুষ) সেখানে না থাকে। মহিলারা

কজি পর্যন্ত এবং পায়ের গোড়ালির নিচ অংশ পর্যন্ত উন্মুক্ত রাখতে পারে। তবে তাদের চুল, লজ্জাস্থান, দুই বাহু, পায়ের গোছা এবং দেহের বাকী সমস্ত অংশ পর্দায় আবৃত রাখতে হবে। ফিলফিলে পাতলা কাপড়, যার ভেতর দিয়ে দেহ দেখা যায়, নামায়ের সময় পরিধান করা উচিত নয়। টিলাটালা কাপড় পরিধান করা উচিত। আঁটসাঁট কাপড়, যাতে সিজদা দিতে বা বৈঠকে বসতে কষ্ট হয়, এমন কাপড় পরা ঠিক নয়। খালি মাথায় নামায পড়া বা মাথায় তোয়ালে অথবা ঝুমাল দিয়ে নামায পড়াও অপছন্দনীয়। একইভাবে চাদর/লুঙ্গি, কাপড় এভাবে পরিধান করাও অনুচিত যা যেকোন সময় খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং এতে করে লজ্জাস্থান প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

পোশাক সম্পর্কে সাধারণ নির্দেশ হল, পুরুষ রেশমী পোশাক পরবে না। আর এমন পোশাকও পরবে না যাতে গর্ব, অহংকার ও উদ্দ্রিত্য প্রকাশ পায়। সব সময় সতর ঢাকা যেন উদ্দেশ্য হয় এবং গান্ধীর্ঘপূর্ণ সাদাসিধা পোশাক পরা আবশ্যিক। কারো কাপড় অপবিত্র হলে এবং এতে অপবিত্রতা লেগে থাকলে আর তার কাছে বদল করে নেওয়ার আর কোন কাপড় না থাকলে নামায পড়ার সময় হলে সেই কাপড় নিয়েই নামায পড়ে নেবে। কাপড় পবিত্র নয় বা তার দেহে কোন কাপড় নেই এদিকে জ্ঞাপন করা উচিত নয়। কেননা, কাপড়-চোপড়ের পবিত্রতার চেয়ে অন্তরের পবিত্রতাকে প্রাধান্য দেয়া আবশ্যিক। সুতরাং এটি কিভাবে জায়েয হতে পারে, কাপড় অপবিত্র এ ধারণায় মনকে অপবিত্র করে নেয়া আর এই বাহানায় নামায ছেড়ে দেয়া? (তফসীরে কবীর, ফিকাহ আহমদীয়া, পৃ. ৬৪-৬৫, অনুবাদ: আলহাজ্জ মুহাম্মদ মুতিউর রহমান)।

আযান

নামায়ের সময় যেসব বাক্যের মাধ্যমে নামায়িদের আহ্বান করা হয় একে আযান বলে। যিনি আযান দেন তাকে বলা হয় মুয়ায়িন। ওয়ু করে আযান দেয়া উচিত। মুয়ায়িন সাহেবকে কিবলামুখী হয়ে কোন উঁচু জায়গায় বা মসজিদের মিনারের ওপর দাঁড়িয়ে দু'কানে শাহাদাত আঙুল দিয়ে আযানের নিম্নোক্ত বাক্যগুলি শুন্দ ও উচ্চকণ্ঠে এবং সুমধুর সুরে উচ্চারণ করতে হয়।

আযানের কালাম (বাক্যাবলী)

اللَّهُ أَكْبَرُ . اللَّهُ أَكْبَرُ .

(আল্লাহ আকবার)

অর্থ: আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। (চারবার)

أَشْهُدُ أَنَّ لِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ

(আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। (দু'বার)

أَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ

(আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ)

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রসূল। (দু'বার)

حَيٌّ عَلَى الصَّلَاةِ

(হাইয্যা আলাস সালাহ)

অর্থ: নামাযের দিকে এস। (দু'বার ডান দিকে মুখ করে বলতে হয়।)

حَيٌّ عَلَى الْفَلَاحِ

(হাইয্যা আলাল ফালাহ)

অর্থ: সফলতার দিকে এস। (দু'বার বাম দিকে মুখ করে বলতে হয়।)

اللَّهُ أَكْبَرُ . اللَّهُ أَكْبَرُ

(আল্লাহ্ আকবার)

অর্থ: আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। (দু'বার)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)

অর্থ: আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই।

ফজরের আযানের সময় “হাইয্যা আলাল ফালাহ” বলার পর দু'বার

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النُّومِ

(আস্সালাতু খায়রুম্ মিনান্ নাওম)

অর্থ: (নিদ্রা অপেক্ষা নামায উত্তম) বলতে হয়। (দু'বার)

ইকামত

ফরয নামায আরঞ্জ করার পূর্বে ইকামত বলতে হয়। ইকামত আযানের মতই। তবে আযানের বাক্যগুলো ইকামতের সময় চারবারের স্থলে দু'বার এবং দু'বারের স্থলে একবার করে কিছুটা দ্রুত উচ্চারণ করতে হয়। কিন্তু শেষে ‘আল্লাহ্ আকবার’ দু'বার বলতে হয় (মিশকাত, কিতাবুল আযান)। এছাড়া ‘হাইয্যা আলাল ফালাহ’ বলার পর দু'বার

قَدْ قَامَتِ الصَّلُوةُ

(কাদকামাতিস্স সালাহ্)

বলতে হয়। এর অর্থ হচ্ছে, এখনই নামায আরঞ্জ হচ্ছে। মুয়ায়িন অনুপস্থিত থাকলে অন্য যে কেউ ইমামের অনুমতি সাপেক্ষে ইকামত বলতে পারেন। ইকামতের সময় কানে আঙ্গুল দিতে হয় না কিংবা ডানে ও বামে মুখ ফেরাতে হয় না।

আযান দেয়ার সময় আযানের শ্রোতাগণ মুয়ায়িনের বাক্যগুলো মনে মনে আওড়াবেন তবে মুয়ায়িন যখন ‘হাইয্যা আলাস্সালাহ্’ এবং ‘হাইয্যা আলাল ফালাহ্’ উচ্চারণ করবেন তখন শ্রোতারা বলবেন-

لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

(লা হাওলা ওয়ালা কুউয়াতা ইল্লাবিল্লাহ)

এর অর্থ: আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোন অসৎ কর্ম হতে বিরত থাকা এবং কোন সৎকাজ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। এছাড়া মুয়ায়িন যখন ফজরের আযানে বলবেন ‘আস্সালাতু খায়রম মিনাল্লাওম’ তখন শ্রোতাদেরকে বলতে হবে ‘সাদাকতা ওয়া বারাকতা’ এর অর্থ হলঃ আপনি সত্য বলেছেন, কল্যাণের কথা বলেছেন।

আযানের শেষে পঠিতব্য দোয়া

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّাمَّةِ وَ الصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اتْ مُحَمَّدَ الْوَسِيْلَةُ
وَالْفَضِيْلَةُ وَ الدَّرْجَةُ الرَّفِيْعَةُ وَابْعَثْنِي مَقَائِمًا مَحْمُودًا إِلَّيْدِي وَعَدْتَهُ، إِنَّكَ
لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ。(বخارী কাব আদান)

(আল্লাহমা রাববা হাযিহিদ দাওয়াতিতাম্মাতি ওয়াস্স সালাতিল কুয়িমাহ্ আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফায়িলাতা ওয়াদারাজাতার রাফিয়াহ্ ওয়াব্ আসলু মাকামাম্মাহমুদা নিল্লায়ী ওয়া’আতাহ্, ইল্লাকা লা তুখলিফুল মী’আদ।)

অর্থ: হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও চিরস্থায়ী নামাযের (তুমিই) প্রভু। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নৈকট্যের মাধ্যম, অফুরন্ত কল্যাণ এবং সুউচ্চ মর্যাদা দান কর। এবং তাঁকে সর্বাপেক্ষা প্রশংসিত মর্যাদায় (মাকামে মাহমুদে) আবির্ভূত করো, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ। নিশ্চয় তুমি কখনও প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না।

(শান্তিক: রাবু-প্রভু, হায়হি- এই, দাওয়াত- আহ্বান, তামাত- পরিপূর্ণ, ওয়াসালাতি- এবং নামায, ওয়াসিলাতা- নৈকট্যের মাধ্যম, ওয়াল ফায়িলাতা- এবং মহত্ত্ব, ওয়াবআসহ- এবং তাঁকে আবির্ভূত করো, মাকামামাহমুদা- সর্বাপেক্ষা প্রশংসিত মর্যাদা, ইন্নাকা- নিশ্চয় তুমি, লা তুখ্লিফু- তুমি ব্যতিক্রম কর না, মী'আদ- প্রতিশ্রুতি)।

মসজিদের আদব

মসজিদ বলতে সিজদা করার স্থানকে বুঝায়। এটা খোদা তা'লার ইবাদতের স্থান। এর যথাযথ আদব ও সমান করা কর্তব্য। মসজিদে উচ্চকগ্নে কথবার্তা বলা, বাকবিভন্না, ঝগড়া, মারামারি ও গালিগালাজ ইত্যাদি এমন কিছু করতে নেই। এগুলো মসজিদের মর্যাদার হানিকর। মসজিদ সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যিক। এতে সুগন্ধি ব্যবহার পছন্দনীয়।

মসজিদে প্রবেশ করার সময়ে নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করতে হয়-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَسُولُ اللَّهِ أَغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي آبَوَابَ رَحْمَتِكَ

(বিসমিল্লাহিস্ সালাতুর ওয়াসু সালামু আ'লা রাসুলিল্লাহ আল্লাহুম্মাগ্ফিরলি যুনুবী ওয়াফতাহ্লি আবওয়াবা রাহমাতিকা)

অর্থ: আল্লাহর নামে (প্রবেশ করছি), আল্লাহর রসূলের ওপর দুরুদ ও শান্তি (প্রেরণ করছি)। হে আল্লাহ! আমার পাপ ক্ষমা কর এবং আমার জন্যে তোমার রহমতের দরজাগুলো খুলে দাও। (তিরমিয়ী, আবওয়াবুস সালাত, ফিকাহ আহমদীয়, পৃ. ২১৯)।

(শান্তিক: বিসমিল্লাহি- আল্লাহর নামে, সালাত- প্রার্থনা, ওয়াসসালামু- এবং শান্তি, আ'লা- ওপর, রাসুলিল্লাহি- আল্লাহর রসূল, আল্লাহুম্মা- হে আল্লাহ, ইগফির্লি- আমাকে ক্ষমা করো, ইফতাহ লি- আমার জন্যে খুলে দাও, আবওয়াবা- দরজাসমূহ, রাহমাতিকা- তোমার রহমত)

মসজিদে প্রবেশ করার সময় ‘আস্সালামু আলাইকুম’ বলতে হয়। নামায পড়া ছাড়াও অন্য সময়ে মসজিদে আল্লাহ তা'লার গুণগান বা যিকর করা উচিত। মসজিদে কখনও কোন অশ্লীল বা গর্হিত কাজ করতে দেয়া বা করা রীতিমত অন্যায়। পাকপবিত্র অবস্থায় মসজিদে যেতে হয়। কাঁচা পিঁয়াজ, রসুন, মূলা প্রভৃতি দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস খেলে মুখ ভাল করে না ধুয়ে মসজিদে যাওয়া ঠিক নয়। মসজিদে থু-থু ফেলা, নাক বাড়া বা হাত-পা,

শরীর মোড়ায়ুড়ি করা উচিত নয়। (মুসলিম)।

মসজিদ হতে বের হবার সময় উল্লিখিত দোয়াটি পাঠ করতে হয়। তবে ‘ওয়াফতাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা’ স্থলে ‘ওয়াফতাহলী আবওয়াবা ফাযলিকা’ পড়তে হয়। এর অর্থ- আমার জন্য তোমার ফযলের দরজাগুলো খুলে দাও। কুরআন ও হাদীসে মসজিদে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.)-ও এ ব্যাপারে তাগিদ প্রদান করেছেন।

নামাযের রীতি বা পদ্ধতি

নামায পড়ার জন্যে কিবলা বা কা'বামুখী হয়ে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে নিম্নলিখিত আয়াতটি (তওজীহ) পাঠ করার পর দু'হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে তকবীরে তাহ্রীমা- অর্থাৎ, ‘আল্লাহ আকবর’ বলে হাত দু'টিকে বুকের উপর এমনভাবে বাঁধতে হয়, যেন ডান হাতের কজি বাম হাতের কজির উপর থাকে এবং ডান হাতের আঙ্গুলের সামনের অংশ বাম হাতের কনুই প্রায় স্পর্শ করে। (মিশকাত দ্রষ্টব্য)। এরপর সানা, তা'আবুজ ও তাসমীয়া পাঠ করতে হয়। সানা ও তা'আবুজ প্রথম রাকাতের শুরুতে পাঠ করার পর আর পাঠ করতে হয় না।

নামাযের নিয়ত হিসেবে সাধারণভাবে যে বাক্যগুলো প্রচলিত আছে হ্যরত রসূল করিম (সা.) বা সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এ রকম কোন নিয়ত পাঠ করেননি। তিনি (সা.) নিম্নোক্ত কুরআনী আয়াত পাঠের মাধ্যমে নামায শুরু করতেন। মিশকাত শরীফে ধারাবাহিকভাবে নামাযের যে নিয়ম-কানুন দেয়া হয়েছে এতে প্রচলিত নিয়তের কোন উল্লেখ নেই। হ্যরত ইয়াম গায়্যালী (রহ.) তাঁর ‘কিমিয়ায়ে সাআ'দাত’ পুস্তকে লিখেছেন, ‘নিয়ত করার বিষয়, পড়ার বিষয় নয়’।

জায়নামাযে দাঁড়িয়ে নিচের কুরআনী আয়াত পড়তে হয়-

وَجْهُهُتْ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا آتَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

(ওয়াজ্জাহতু ওয়াজ্জিহিয়া লিল্লায়ী ফাতারাস্স-মাওয়াতি ওয়াল আর্যা হানীফাওঁ ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন)

অর্থ: আমি আমার পূর্ণ মনোযোগ একনিষ্ঠভাবে তাঁরই দিকে নিবন্ধ করছি, যিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সুরা আনআম : ৮০)।

(শার্দিক: ওয়াজ্জাহতু- আমি নিবন্ধ করছি, ওয়াজ্জিহিয়া- আমার পূর্ণ মনোযোগ, লিল্লায়ী- তাঁরই দিকে, ফাতারা- যিনি সৃষ্টি করেছেন, সামাওয়াতি- আকাশসমূহ, ওয়া- এবং, আরয়- পৃথিবী, হানীফা- একনিষ্ঠভাবে, মা- না/নই, আনা- আমি, মিন- অন্তর্ভুক্ত, আল- মুশরিকীন- মুশরিকদের)।

সানা

سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ
(সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা ওয়াতারারাকাসমুকা ওয়া তা'আলা জাদুকা ওয়া
লা ইলাহা গায়রুকা)

অর্থ: হে আল্লাহ! পবিত্রতা তোমারই এবং প্রশংসা তোমারই, পরম মঙ্গলময় তোমার
নাম! তোমার মর্যাদা অতি উচ্চ। আর তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই।
(শান্তিক: সুবহানাকা- তুমি পবিত্র, আল্লাহুম্মা- হে আল্লাহ, ওয়া- এবং, বিহামদিকা-
তোমার প্রশংসাসহ, তারারাকা- পরম মঙ্গলময়, ইসমুকা- তোমার নাম, তা'আলা- অতি
উচ্চ, জাদুকা- তোমার মর্যাদা, লা- নেই, ইলাহা- উপাস্য, গায়রুকা- তুমি ছাড়া)।

তা'আবুয

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ

(আ'উযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম)

অর্থ: আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।
(শান্তিক: আ'উযু- আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি, বিল্লাহি- আল্লাহর নিকট, মিন- থেকে,
শায়তানির রাজীম- বিতাড়িত শয়তান)।

তাসমিয়া

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম)

অর্থ: আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি), যিনি পরম করণাময় অ্যাচিত-অসীম দানকারী,
বারবার কৃপাকারী।
(শান্তিক: বিসমিল্লাহ- আল্লাহর নামে, রাহমান- পরম করণাময়, রাহীম- বারবার
কৃপাকারী)।

সূরা আলু ফাতিহা

(এটি মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহসহ ৭ আয়াত এবং ১ রংকু আছে)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٢﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣﴾ إِيَّاكَ

نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٤﴾ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٥﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَثْتَ

عَلَيْهِمْ ﴿٦﴾ غَيْرِ الْمَغْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

(বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আলহামদুলিল্লাহি রাবিল আলামিন। আররাহমানির রাহীম। মালিকি ইয়াওমদ্বিন। ইয়্যাকানা'বুদু ওয়া ইয়্যাকানাস্তাউন। ইহদিনাস্সিরাতাল মুস্তাকীম। সিরাতল্লায়ীনা আন'আমতা আলায়হিম গায়রিল মাগদুবি আলায়হিম ওয়ালাদ দেয়াল্লীন) [আয়ীন]

অনুবাদ: (১) আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অ্যাচিত-অসীম দানকারী, বারবার কৃপাকারী, (২) সব প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি জগৎসমূহের প্রভু-প্রতিপালক, (৩) পরম করুণাময়, অ্যাচিত-অসীম দানকারী, বার বার কৃপাকারী, (৪) বিচার দিবসের মালিক, (৫) আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি, (৬) তুমি আমাদেরকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর, (৭) তাদের পথে, যাদেরকে তুমি পুরক্ষার দিয়েছ, যারা (তোমার) ক্রোধভাজন হয়নি এবং যারা পথভঙ্গ হয়নি।

সূরা ফাতিহার পর কুরআন শরীফের যে কোন একটি সূরা বা সূরার অংশ-বিশেষ পাঠ করে 'আল্লাহ আকবর' বলে 'রংকু' দিতে হয়। সূরার অংশ-বিশেষ পাঠের বেলায় ছোট আয়াত হলে কমপক্ষে তিনটি আয়াত পড়তে হয়, তবে আয়াত দীর্ঘ হলে একটিও পড়া যায়। নিম্নে কুরআন শরীফের তিনটি সূরা অর্থসহ দেয়া হল:

সূরা আলু ইখলাস

(এটি মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহসহ এ সূরায় ৫ আয়াত এবং ১ রংকু আছে)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ أَللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴿٤﴾

(বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। কুল উয়াল্লাহ আহাদ। আল্লাহস্স সামাদ। লাম ইয়ালিদ

ওয়ালাম্ ইউলাদ। ওয়ালাম ইয়াকুন্নাহু কুফুওয়য়ান আহাদ)

অর্থ: “(১) আল্লাহর নামে, যিনি পরম করণাময়, অ্যাচিত-অসীম দানকারী, বারবার কৃপাকারী। (২) তুমি বল, ‘তিনিই আল্লাহ এক-অদ্বিতীয়। (৩) আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ সর্বনির্ভরস্থল। (৪) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। (৫) আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।”

সূরা আলু ফালাক

(এটি মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহসহ এ সূরায় ৬ আয়াত এবং ১ রূপকু আছে)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾
 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿٢﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٤﴾ وَ
 مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٥﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٦﴾

(বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। কুল আউয়ু বিরাবিল ফালাক। মিন শার্রি মা খালাক। ওয়া মিন শার্রি গাসিকিন ইয়া ওয়াকাব। ওয়া মিন শাররিন নাফ্ফাসাতি ফিলউকাদ। ওয়া মিন শার্রি হাসিদিন ইয়া হাসাদ)

অনুবাদ: “আল্লাহর নামে যিনি পরম করণাময়, অ্যাচিত-অসীম দানকারী, বারবার কৃপাকারী। (২) তুমি বল, ‘আমি আশ্রয় চাই এক সৃষ্টিকে বিদীর্ণ করে আরেকে সৃষ্টির উন্নেষকারী প্রভুর কাছে। (৩) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন এর অনিষ্ট থেকে, (৪) এবং অন্ধকার বিস্তারকারীর অনিষ্ট থেকে যখন তা ছেয়ে যায় (৫) এবং সম্পর্ক-বন্ধনে (বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য) ফুৎকারকারণীদের অনিষ্ট থেকে, (৬) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।”

সূরা আনু নাস

(এটি মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহসহ এ সূরায় ৭ আয়াত এবং ১ রূপকু আছে)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾
 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿٢﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٣﴾ رَبِّ الْأَنْوَسِ ﴿٤﴾ مِنْ شَرِّ الْأَوْسَاطِ ﴿٥﴾
 الْخَنَّاسِ ﴿٦﴾ الَّذِي يُسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٧﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٨﴾

(বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। কুল আউয়ু বিরাবিন্নাস। মালিকিন্নাস। ইলাহিন্নাস। মিন শার্রি ওয়াস ওয়াসিল খান্নাস। আল্লায়ী ইউওয়াসবিসু ফী সুদুরিন্নাস। মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস)

অনুবাদ: “(১) আল্লাহর নামে, যিনি পরম করণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী, বারবার কৃপাকারী, (২) তুমি বল, ‘আমি মানুষের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে আশ্রয় চাই, (৩) যিনি মানুষের অধিপতি, (৪) মানুষের উপাস্য, (৫) কুপ্রোচনা সৃষ্টিকারীর অনিষ্ট থেকে, যে কুপ্রোচনা দিয়ে সটকে পড়ে, (৬) যে মানুষের অন্তরে কুপ্রোচনা দেয়, (৭) সে জিনের (উচ্চ শ্রেণীর মানুষের) অন্তর্ভুক্তই হোক আর সাধারণ মানুষের অন্তর্ভুক্তই হোক’।”

বি. দ্র.

- ১) মহানবী (সা.) ওপরের তিনটি সূরা সকাল-সঞ্চ্যায় পাঠ করতে বলেছেন। এতে বিভিন্ন রকম আপদ-বিপদ হতে রক্ষা পাওয়া যায়।
২. হাদীসে আছে- লা সালাতা ইল্লা বিফাতিহাতিল কিতাব- অর্থাৎ, সূরা ফাতিহা ছাড়া কোন নামায হয় না। উল্লেখ্য, এ কারণেই বা-জামাত নামাযে ইমামের সাথে মুক্তাদিকেও মনে-মনে সূরা ফাতিহা পড়তে হয়।

রংকুর তসবীহ

রংকুতে নিম্নলিখিত তসবীহ তিন, পাঁচ, সাত বা আরও অধিকবার বেজোড় সংখ্যায় পাঠ করতে হয়।

سُبْحَانَ رَبِّيِ الْعَظِيمِ ط

(সুব্হানা রাবিয়াল আযীম)

অর্থ: পবিত্র আমার প্রভু অতি মহান।

(শার্দিক: সুব্হান- পবিত্র, আযীম- অতি মহান, রাবিব- আমার প্রভু-প্রতিপালক)। এ তসবীহ পাঠের পর সোজা হয়ে দাঁড়াবার সময়ে যে তাসমীয়া ও তাহরীদ পড়তে হয় তা হল:

তাসমীয়া

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَوْدَهُ ط

(সামি'আল্লাহ লিমান্ হামিদাহ)

অর্থ: আল্লাহ তাঁর প্রশংসাকারীর কথা শুনেছেন।

(শার্দিক: সামি'আ- শুনেছেন, লিমান্- তার জন্য, হামিদাহ- যে তাঁর প্রশংসা করেছে)

তাহ্মীদ

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

(রাবরানা ওয়া লাকাল হামদ্। হামদান্ কাসীরান তাইয়েবান মুবারাকান ফীহে) অর্থ: হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক, সব প্রশংসা তোমারই। (ইহা সেই) প্রশংসা, যা অফুরন্ত ও পবিত্র, যার মধ্যে আছে অশেষ কল্যাণ।

(শাব্দিক: রাবরানা- হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক, লাকা- তোমার জন্যে, আল হামদ-সব প্রশংসা, হামদান- প্রশংসা, কাসীরান- অফুরন্ত, তাইয়েবান- পবিত্র, মুবারাকান- কল্যাণময় বা বরকতময়।)

এরপর ‘আল্লাহ আকবর’ বলে সিজদায় যেতে হয়। সিজদায় নিম্নোক্ত তসবীহ তিন, পাঁচ, সাত কিংবা আরও অধিক বার বিজোড় সংখ্যায় পড়তে হয়।

سُبْحَانَ رَبِّيِ الْأَعْلَى

(সুবহানা রাবিয়াল আ'লা)

অর্থ: পবিত্র আমার প্রভু-প্রতিপালক অতি উচ্চ।

(আ'লা- অতি উচ্চ)

পরপর দু'বার সিজদা দিতে হয় ও সিজদা হতে উঠতেও ‘আল্লাহ আকবর’ বলতে হয়। দুই সিজদার মাঝে নিম্নের দোয়াটি পড়তে হয়-

দুই সিজদার মধ্যবর্তী দোয়া:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَاغْفِنِي وَاجْزِنِي وَارْزُقْنِي

(আল্লাহম্মাগফিরলী ওয়ারহাম্মনী ওয়া'আফিনী ওয়ারফা'নী ওয়াজরুরনী ওয়ারযুক্মনী) (ফতওয়া আল জালাতুত দায়েমা-২, বাব দুয়াউল ইমামে বেনাফসেহী খাসসা)

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার প্রতি দয়া কর, আর আমাকে সুপথে পরিচালিত কর, আর আমাকে সুস্থ রাখ ও আমাকে আধ্যাত্মিকভাবে উন্নতি দান কর আর আমার অবস্থা শুধরে দাও এবং আমাকে রিয়ক দাও।

(শব্দার্থ: আল্লাহম্মা- হে আল্লাহ, ইগ্ফিরলী- আমার অপরাধ ক্ষমা করে দাও, ওয়ার হাম্মনী- এবং আমার প্রতি দয়া কর, ওয়াহ্দিনী- এবং আমাকে সুপথ দেখাও, ওয়া'আফিনী- এবং আমাকে সুস্থ রাখ, ওয়ারফা'নী- এবং আমাকে আধ্যাত্মিকভাবে উন্নীত কর, ওয়াজরুরনী- এবং আমার অবস্থা শুধরে দাও, ওয়ারযুক্মনী- এবং আমাকে রিয়ক দান কর)।

এ দোয়ার সাথে রসূলুল্লাহ (সা.) ‘ইয়া রাবি যিদ্নী ইলমান’ এ দোয়াটিও পাঠ করতেন।
এর অর্থ হল- হে আমার প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও।

‘আল্লাহ আকবর’ বলে দাঁড়িয়ে পূর্বের ন্যায় দ্বিতীয় রাকা’ত পাঠ করে বসতে হয়। বসার সময়ে বাম পায়ের পাতা বিছিয়ে এর ওপরে বসতে হয় এবং ডান পায়ের পাতা আঙুলের ওপর ভর করে খাড়া রাখতে হয় এবং হাত দু’টিকে হাঁটুর কাছে দু’উরুর ওপরে সোজা করে রাখতে হয়। এরপর নিম্নলিখিত তাশাহুদ, দুরুদ শরীফ এবং অন্যান্য মাসনুন দোয়া পাঠ করে উভয় দিকে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করতে হয়।

তাশাহুদ

الْتَّحَيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَاوَاتُ وَالطَّبَيِّبُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّلَاحِينَ
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

(আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াস্সালাওয়াতু ওয়াত্তাইয়েবাতু আস্সালামু আলায়কা আইয়াহান্নাবীয়ু ওয়া রাহমাতল্লাহি ওয়াবারাকাতুল্ল আস্সালামু আলায়না ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্ সালিহীন। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু)

অর্থ: সব মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহর জন্যে। হে নবী (সা.)! আপনার ওপর শান্তি এবং আল্লাহর আশিস ও কল্যাণ বর্ষিত হোক! শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের ওপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাগণের ওপর!

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল।

(শান্তিক: আত্তাহিয়াতু- সব মৌখিক ইবাদত, আস্সালাওয়াতু- সব দৈহিক ইবাদত, আত্তাইয়িবাতু- সব আর্থিক ইবাদত, আস্সালামু- শান্তি, আলায়কা- আপনার ওপর, ইবাদি- বান্দাগণ, সালিহীন-পুণ্যবানগণ)

দুরুদ শরীফ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ أَلِيٍّ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ أَلِيٍّ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ○ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ أَلِيٍّ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
وَعَلَىٰ أَلِيٍّ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ○

(আল্লাহমা সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিঁও ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন্ কামা সাল্লায়তা আ'লা ইবরাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

আল্লাহমা বারিক আ'লা মুহাম্মাদিঁও ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন্ কামা বারাক্তা আ'লা ইবরাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ)

অর্থ: হে আল্লাহ! অনুগ্রহ (ও আশিস) বর্ষণ কর মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুগামীদের প্রতি যেরূপ তুমি অনুগ্রহ (ও আশিস) বর্ষণ করেছিলে ইবরাহীম (আ.) এবং ইবরাহীম (আ.)-এর অনুগামীদের প্রতি। নিশ্চয় তুমি মহা প্রশংসাময়, মহা মর্যাদাবান।

হে আল্লাহ! বরকত (কল্যাণ) বর্ষণ কর মুহাম্মদ (সা.) এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুগামীদের প্রতি যেরূপ তুমি বরকত (কল্যাণ) বর্ষণ করেছিলে ইবরাহীম (আ.) এবং ইবরাহীম (আ.)-এর অনুগামীদের প্রতি। নিশ্চয় তুমি মহা প্রশংসাময়, মহা মর্যাদাবান।

(শার্দিক: সাল্লি- অনুগ্রহ (আশিস) বর্ষণ কর, আ'লা-ওপর, কামা- যেরূপ, সাল্লায়তা- তুমি অনুগ্রহ বর্ষণ করেছিলে, ইন্নাকা- নিশ্চয় তুমি, হামীদ- মহাপ্রশংসাময়, মাজীদ- মহামর্যাদাবান, বারিক- তুমি বরকত বর্ষণ কর)।

দোয়া মাসুরা

(এক)

رَبَّنَا اتَّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

(রাববানা আতিনা ফিদুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আযাবান্নার)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে এ দুনিয়াতে এবং পরকালে যাবতীয় মঙ্গল দান কর এবং আগুনের আয়াব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর। (সূরা বাকারা : ২০২)।

(দুই)

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي صَلِّ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَاءِ ۝ رَبَّنَا اغْفِرْ لِنِي
وَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحَسَابُ ۝

(রাবিজ'আলনী মুকীমাস্ সালাতি ওয়া মিন যুরিয়াতী রাববানা ওয়া তাকবাল দু'আ-রাববানাগফিরলী ওয়ালি ওয়ালিদাইয়া ওয়ালিল মু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসাব)

অর্থ: হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার সন্তানগণকে নামায কায়েমকারী

করো। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আর তুমি আমার দোয়া করুল কর। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! যেদিন হিসাব-নিকাশ অনুষ্ঠিত হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং সব মুমিনদেরকেও ক্ষমা করো। (সূরা ইবরাহীম : ৪১)

(তিন)

اللَّهُمَّ إِنِّي طَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبُ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً
مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

(আল্লাহু ইন্নী যালামতু নাফ্সী যুলমান কাসীরাওঁ ওয়ালা ইয়াগফিরহ্য যুনুবা ইল্লা
আন্তা ফাগ্ফিরলী মাগ্ফিরাতাম মিন ইনদিকা ওয়ার হামনী ইল্লাকা আনতাল গাফুরহর
রাহীম)

অর্থ: হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আমার প্রাণের ওপর অনেক যুলুম (অন্যায়-অত্যাচার) করেছি। তুমি ছাড়া কেউ শুনাহ মাফ করতে পারে না। অতএব তোমার পক্ষ হতে তুমি আমাকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দাও এবং আমার প্রতি দয়া কর। নিশ্চয় তুমিই পরম ক্ষমাশীল ও বার বার কৃপাকারী।

সালাম

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

(আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ)

অর্থ: আপনাদের ওপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক!

তিন রাকা'ত ও চার রাকা'ত নামায পড়ার নিয়ম

তিন রাকা'ত নামায পড়তে হলে দুই রাকা'ত পাঠ করে তাশাহুদ পাঠের পর 'আল্লাহ আকবর' বলে দাঁড়াতে হয়। এরপর সূরা ফাতিহা পাঠের পর যথারীতি ঝুকু, সিজদা করে তাশাহুদ, দুর্জন শরীফ ইত্যাদি পাঠ করে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করতে হয়।

চার রাকা'ত নামায পড়তে হলে দু রাকা'ত পড়ে তাশাহুদ পাঠ করে দাঁড়াতে হয়। যথানিয়মে আরও দু রাকা'ত নামায পড়ে বসে তাশাহুদ, দুর্জন শরীফ ইত্যাদি পাঠ করে নামায শেষ করতে হয়।

চার রাকা'ত নামাযে প্রথম দুই রাকা'তে শুধু সূরা ফাতিহার সাথে কোন সূরা বা সূরার অংশ মিলিয়ে পাঠ করতে হয়। পরের দুই রাকা'তে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হয়।

সিজদা সাহাও

নামাযে এমন যদি কোন ভুল-ক্রটি হয়ে যায় যাতে নামাযে বড়ই দুর্বলতা সৃষ্টি হয়ে যায়, যেমন: ভুলে ফরয়ের ধারাবাহিকতা বদলে যায় বা কোন ওয়াজিব যেমন মাঝখানের বৈঠক থেকে যায় কিংবা রংকুর সংখ্যার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যায় তখন এ ক্রটিকে শুধরিয়ে নেয়ার জন্যে অতিরিক্ত ২টি সিজদা দেয়া আবশ্যক। একে ‘সিজদা সাহাও’ বলে। অর্থাৎ, ভুল-ক্রটিকে শুধরে নেয়ার সিজদা। এ সিজদা ২ বার দিতে হয়। এ সিজদা নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহুদ, দুর্বল শরীফ এবং মাসনূন দোয়াগুলো পাঠ করার পরে দেয়া হয়। শেষ দোয়া করা হলে পরে তকবীর বা ‘আল্লাহ আকবর’ বলে দু’টি সিজদা করা হয়ে থাকে। এতে সিজদার তসবীহ ‘সুবহানা রাবিআল আ’লা’ পাঠ করা হয়। এরপর বসে ‘সালাম’ ফিরানো হয়ে থাকে, ভুল-ক্রটি এবং সব রকম দুর্বলতা থেকে মহামহিম আল্লাহ তাঁর সন্তাই পবিত্র আর মানুষ দুর্বল। তার এ ভুল-ক্রটি যেন উপেক্ষা করা হয়। আর এর কুফল থেকে যেন তাকে রক্ষা করা হয়।

মোটকথা ওয়াজিব পরিহার এবং রংকু পরে করার দরজন সিজদা সাহাও আবশ্যিক হয়ে থাকে। যেমন ভুলে রংকু এবং সিজদা যদি ছেড়ে দেয়া হয়। নামাযের মাঝে বা পরে এটা স্মরণে এলে তাশাহুদ পাঠ করার আগে সেই রোকন পুরো করে পরে তাশাহুদ ও দুর্বল শরীফ প্রভৃতি পাঠ করে এর পরে ক্রটি শুধরে নেয়ার জন্যে সিজদা সাহাও আবশ্যিক হয়ে থাকে। যেমন, যেসব রাকা’তে উচ্চ আওয়াজে কিরাত পাঠ করা উচিত ছিল তা পাঠ করা হয়নি অথবা সূরা ফাতিহার পর কোন সূরা বা সূরার কোন অংশ পাঠ করা হয়নি বা মাঝখানের বৈঠক করতে ভুলে গেছে অথবা নির্ধারিত রাকা’তের সংখ্যা থেকে অধিক রাকা’ত পড়ে নিয়েছে— এসব অবস্থার দরজন এ সিজদা করার ফলে এসব ক্রটি-বিচ্যুতি শুধরে যাবে।

কোন ব্যক্তি নামায শেষ হয়ে গেছে বলে সালাম ফিরিয়ে নিলেন কিন্তু তখনও তিনি মসজিদেই ছিলেন, মনে হল কোন রাকা’ত বা রাকা’তের অংশবিশেষ রয়ে গেছে তখন তিনি থেকে যাওয়া অংশ পূর্ণ করবেন। এরপর তাশাহুদ প্রভৃতি পাঠ করে সিজদা সাহাও করবেন। এভাবে তার নামায পুরো হয়ে যাবে। এমনিভাবে রাকা’তের সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হলে যেমন বুঝা যায়নি এক রাকা’ত বা দুই রাকা’ত পড়েছেন, তিনি রাকা’তই পড়েছেন বা চার রাকা’ত এক্ষেত্রে কম অংশটি ধরে বাকী অংশ পড়ে নিয়ে যথারীতি সিজদা সাহাও করবেন।

ইমাম যদি এমন ভুল-ক্রটি করেন যাতে সিজদা সাহাওর প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে তার সাথে সাথে মুক্তাদীগণের জন্যে সিজদা সাহাও করা আবশ্যিক হবে। কিন্তু কেবল মুক্তাদীর মাধ্যমে এমন কোন ভুল যদি সংঘটিত হয় তাহলে ইমামের অনুসরণের কারণে

সেই ভুলের জন্যে ধৃত হবে না এবং এর জন্যে সিজদা সাহাও দিতে হবে না। (ফিকাহ
আহমদীয়া, পৃ. ৯৯-১০০)

নামাযের পরবর্তী দোয়া

নামায আদায় করার পর নিম্নলিখিত দোয়াগুলো নির্ধারিত সংখ্যায় পড়তে হয়।

سُبْحَنَ اللَّهِ
সুব্হান্ল্লাহ্

--- আল্লাহ্ পবিত্র (৩৩ বার)

الْحَمْدُ لِلَّهِ
আল্হামদুল্লাহ্

--- সব প্রশংসা আল্লাহ্ (৩৩ বার)

أَكْبَرُ
আল্লাহু আকবার

--- আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ (৩৪ বার)

নিম্নের দোয়া দু'টি একবার করে পড়তে হয়।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَ
هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(লা ইলাহা ইল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হয়া
আ'লা কুণ্ডি শায়ইন কাদীর)

অর্থ: আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি এক-অদ্বিতীয়। তাঁর কোন অংশীদার নেই।
সব আধিপত্য এবং প্রশংসা কেবল তাঁরই। আর তিনি সব কিছুর ওপরে সর্বশক্তিমান।

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارِكَتْ يَا ذَالْجَلَلِ وَالْأَكْرَامِ

(আল্লাহভ্য আনতাস্ সালামু ওয়া মিনকাস্ সালামু তাবারাক্তা ইয়া যালজালালি ওয়াল
ইক্রাম)

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমই পূর্ণ শান্তি এবং তোমার কাছ থেকে সব শান্তি। মহাকল্যাণময়
তুমি, হে মহাপ্রাতাপশালী, হে মহা সম্মানের অধিকারী!

হয়রত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে)-এর নির্দেশক্রমে প্রত্যেকবার নামাযের পর ১১
বার ‘লা ইলাহা ইল্লাহু’ মৃদুস্বরে পাঠ করা উচিত। এ প্রসঙ্গে আঁ-হ্যরত (সা.)-ও
বলেছেন, “আফযালুয় যিক্রি ‘লা-ইলাহা ইল্লাহু’।”

অর্থ: “সর্বোত্তম যিক্রি হলো- ‘আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই’।”

তিলাওয়াতে সিজদাহ্

পরিব্রহ্ম কুরআন মজীদের ১৪টি আয়াতের মধ্যে যে কোন একটি তিলাওয়াত করার সময় অথবা শুনার সময় মানুষ দাঢ়ানো বা বসা যে কোন অবস্থায়ই হোক না কেন সিজদায় চলে যেতে হবে। এরপি সিজদা করাকে ‘তিলাওয়াতে সিজদাহ্’ বলে। এ সিজদায় ‘তসবীহ’ তথা ‘সুবহনা রাবিয়াল আলা’ পড়া ছাড়াও এ দোয়া পাঠ করার কথা হাদীস থেকে পাওয়া যায়:

سَجَدَ وَ جَهِيْ لِلّهِيْ لَذَّى خَلْفَهُ وَ شَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ بَهْوَ لِهِ وَ قُوَّتِهِ

(সাজাদা ওয়াজহি লিল্লায়ি খালাকাহ ওয়া শাক্তা সাম'আহ ওয়া বাসারাহ বিহাওলিহি ওয়া কুওয়্যাতিহি)

অর্থ: আমার চেহারা সেই সত্ত্বার সম্মুখে সিজদাবনত যিনি একে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তাঁর অপরিসীম শক্তির মাধ্যমে একে শুনার এবং দেখার ক্ষমতা প্রদান করেছেন।

আয়াতুল কুরসী

পরিব্রহ্ম কুরআনের সূরা বাকারার ২৫৬ নং আয়াতকে ‘আয়াতুল কুরসী’ বলে। এতে আল্লাহ তাঁ’লার তৌহীদ বা একত্ববাদকে ও তাঁর বড়-বড় গুণকে অত্যন্ত মানুষের সাথে সুন্দরতম ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রতি নামায়ের পরে আয়াতুল কুরসী পাঠ করা উত্তম। আঁ-হযরত (সা.) বলেছেন, “আয়াতুল কুরসী কুরআন শরীফের মহোত্তম আয়াত।” (মুসলিম)।

اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ^١ الْحَقُّ الْقَيْوُمُ^٢ لَا تَأْخُذْهُ سُنْتُهُ^٣ وَلَا تُوْمَّ^٤ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ^٥ مِنْ ذَالِكِ^٦
يَعْلَمُ عِنْدَهُ^٧ إِلَّا بِإِذْنِهِ^٨ يَعْلَمُ مَا يَبْيَغِيهِمْ^٩ وَمَا خَلَفُهُمْ^{١٠} وَلَا يُبَيِّعُونَ^{١١} بِئْتِيْ^{١٢} مِنْ عِلْمِهِ^{١٣} إِلَّا بِمَا شَاءَ^{١٤}
وَسَعَ^{١٥} كُرْسِيُّهُ^{١٦} السَّمَاوَاتِ^{١٧} وَالْأَرْضِ^{١٨} وَلَا يُؤْدَهُ حَظْقَهُمَا^{١٩} وَهُوَ^{٢٠} أَعْلَى^{٢١} الْفَلَقِ^{٢٢}

(আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লা হাইয়াল কাইয়াম, লা তা'খ্যুহু সিনাতুও ওয়ালা নাওম, লাহু মা ফিস্সামাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরয়, মান্যাল্লায়ি ইয়াশফাউ ইন্দাহ ইল্লা বিইয়নিহী, ইয়া'লামু মা বায়না আয়দীহিম ওয়ামা খালফাহুম, ওয়ালা ইউহীতুনা বিশায়ইম মিন ইলমিহি ইল্লা বিমা শাতা, ওয়াসি'আ কুরসিয়েহুন্স সামাওয়াতি ওয়াল আরয়, ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফ্যুহুমা ওয়া হ্যাল আলীয়ুল আয়ীম)

অর্থ: “আল্লাহ-তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব-জীবনদাতা, চিরস্থায়ী-স্থিতিদাতা। তন্দা ও নিন্দা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে যা আছে সব তাঁরই। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে শাফায়াত (সুপারিশ) করতে পারে? তাদের সম্মুখে যা আছে এবং তাদের পশ্চাতে যা আছে এবং সবই

তিনি জানেন, তিনি যা চান তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর সিংহাসন আকাশসমূহ এবং পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি অতীব উচ্চ, মহিমান্বিত।” (সুরা বাকারাঃ ২৫৬)

মোনাজাত

মনে রাখা দরকার, নামায়ই সর্বাপেক্ষা উত্তম দোয়া। নামায়ের মাঝে কুরআন ও হাদীসের আরবি দোয়া করার পরও মাত্তভাষায় দোয়া করা কর্তব্য। নামায়ের শেষে হাত উঠিয়ে প্রচলিত মোনাজাত করার কোন বিধান নেই। হ্যরত রসূলুল্লাহ (সা.) কেবল নামায়ে ইন্সিস্কা- অর্থাৎ, বৃষ্টির জন্যে যে নামায পড়া হয় তাতে হাত উঠিয়ে দোয়া করতেন। নামায়ের অবস্থায় মনে কোন প্রকার কুধারণার উদয় হলে পাঠ করা উচিত।

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ

(আউয়ু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজিম)

অর্থ: আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় থার্থনা করছি।

ইমাম হওয়ার শর্ত

সুস্থ, সাবালক, মুসলমান এবং যিনি কুরআনের অধিক জ্ঞান রাখেন তিনি ইমামতির অধিক হকদার। যদি কুরআনের জ্ঞানের দিক থেকে অনেকে সময়েগ্যতাসম্পন্ন হন তাহলে যিনি সবচেয়ে বেশি বয়স্ক তিনি ইমামতি করবেন। সে মুসলমান- যে ব্যক্তি হ্যরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-কে প্রতিশ্রূত মসাই- এবং ইমাম মাহদী বলে বিশ্বাস করে না, তার পিছনে নামায পড়া আল্লাহ- কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়েছে। কেননা আল্লাহ- ও তাঁর রসূল (সা.) যুগ ইমামকে মানার জন্যে বিশেষভাবে তাগিদ করেছেন। অতএব একপ ব্যক্তি যুগের ইমামকে না মানার কারণে আল্লাহ- ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হয়েছে। তাই এ সমস্ত ব্যক্তিদের পিছনে নামায পড়া যাবে না। হাদীসে এসেছে, ‘ফা ইমামুকুম মিনকুম’- অর্থাৎ, তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্যে থেকে হবেন।

বিতরের নামায

পূর্বেই বলা হয়েছে এশার নামাযের পর বিতরের নামায পড়তে হয়। এ নামায তাহাজ্জুদের পরেও পড়া যায়। কিন্তু শেষ রাত্রে ওঠার নিশ্চয়তা না থাকলে এশার পর পড়ে নেয়াই অধিকতর শ্রেয়। এ নামায ওয়াজিব নামাযের অন্তর্ভুক্ত।

‘বিতর’ অর্থ বেজোড়, মাগরিবের ফরয নামায যেমন প্রতিদিনের ফরয নামাযকে বেজোড় করে তেমনি বিতর নামায সুন্নত ও নফল নামাযকে বেজোড় করে। হাদীস শরীফেও এসেছে, ‘আল্লাহ বিতর- অর্থাৎ, বেজোড়, অতএব তিনি বেজোড়কে পছন্দ করেন।’ (বুখারী)। বিতরের নামায ও রাকা’ত। প্রত্যেক রাকা’তে সূরা ফাতহার পর যথাক্রমে সূরা আলা, সূরা কাফিরন এবং সূরা ইখলাস পড়া সুন্নত। অন্য সূরাও পড়া যায়। বিতরের দ্বিতীয় রাকা’তের পরে বৈঠকে বসে তাশাহুদ পাঠ করার পর সালাম ফিরিয়ে ‘আল্লাহু আকবর’ বলে দাঁড়িয়ে তৃতীয় রাকা’ত পড়াও জায়ে। এরপর তৃতীয় রাকা’তে ঝুঁকুর পরে দাঁড়িয়ে দোয়া কুনুত পড়তে হয়। পরে সিজদা করে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করতে হয়। (ফিকাহ আহমদীয়া, পৃ. ১৯৭)।

দোয়া কুনুত

اللَّهُمَّ إِنَا سَعَيْنَاكَ وَسَتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُتَبَّثُ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَشَكُورُكَ
وَلَا تَنْهَرُكَ وَنَخَلُمُ وَنَتَرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ ۝ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنُسْجُدُ
وَإِلَيْكَ نَسْعُى وَنَحْفِظُ وَنَرْجُوا رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقٌ ۝

(আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাইনুকা ওয়া নাস্তাগফিরুকা ওয়া নুমিনুবিকা ওয়া নাতাওয়াকালু আলায়কা ওয়ানুস্নী আলায়কাল খায়রা ওয়া নাশ্কুরুকা ওয়া লা নাক্ফুরুকা ওয়া নাখ্লাউ ওয়া নাতরকু মাইয়্যাফজুরুকা, আল্লাহুম্মা ইয়্যাকানা'বুদু ওয়ালাকা নুসাল্লী ওয়া নাস্জুদু ওয়া ইলায়কা নাস্তা'আ, ওয়া নাহ্ফিদু ওয়া নারজু রাহমাতাকা ওয়া নাখ্শা আয়াবাকা ইন্না আয়াবাকা বিল কুফফারি মুলহিক)

অর্থ: হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি আর আমরা তোমারই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আমরা তোমার ওপর ঈমান আনয়ন করি ও আমরা তোমার ওপর ভরসা করি আর আমরা উত্তমভাবে তোমার গুণগান করি এবং আমরা তোমারই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি ও আমরা তোমার অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না আর যে তোমার অবাধ্যতা করে আমরা তাকে দূরে সরিয়ে দেই ও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। হে আল্লাহ! আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই উদ্দেশ্যে নামায পড়ি আর তোমারই উদ্দেশ্যে সেজদা করি ও তোমারই দিকে আমরা দৌড়ি এবং আমরা তোমার কাছে দাঁড়ি আর তোমারই করণার আকাঙ্ক্ষা করি ও তোমার শাস্তিকে ভয় করি। নিশ্চয় তোমার শাস্তি অস্বীকারকারীদের ওপরে আপত্তি হবে।

(শব্দার্থ: আল্লাহুম্মা- হে আমার আল্লাহ, ইন্না- নিশ্চয় আমরা, নাস্তাইনুকা- আমরা তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি, ওয়ানাস্তাগ্ফিরুকা- এবং আমরা তোমারই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি,

ওয়া নুমিনুবিকা- আমরা তোমারই উপর বিশ্বাস স্থাপন করি, ওয়া নাতাওয়াকান্তু আলায়কা- এবং আমরা তোমারই উপর ভরসা করি, ওয়া নুস্নী আলায়কাল্খায়রা- এবং আমরা তোমারই গুণগান করি, ওয়া নাশ্কুর্রকা- এবং আমরা তোমারই কৃতজ্ঞতা করি, ওয়া লা নাক্ফুর্রকা- এবং আমরা তোমার অকৃতজ্ঞতা করি না, ওয়া নাখ্লাউ ওয়ানান্তর্কু মাইয়্যাফজুর্রকা- এবং যে তোমার অবাধ্যতা করে তাকে আমরা দূরে সরিয়ে দিই ও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি, আল্লাহম্মা- হে আমার আল্লাহ, ইয়্যাকানাবুদু- আমরা তোমারই ইবাদত করি, ওয়ালাকা নুসাল্লী- এবং তোমারই উদ্দেশ্যে নামায পড়ি, ওয়া নাসজ্জুদু- এবং আমরা তোমারই উদ্দেশ্যে সেজদা করি, ওয়া ইলায়কা নাস'আ- এবং আমরা তোমার দিকে দৌড়াই, ওয়া নাহফিদু- এবং আমরা তোমার কাছে দাঁড়াই, ওয়া নারজু রাহমাতাকা- এবং আমরা তোমার রহমতের আশা করি, ওয়া নাখশা আযাবাকা- এবং আমরা তোমার শাস্তিকে ভয় করি, ইন্না আযাবাকা বিল কুফ্ফারি মুলহিক্- নিশ্চয় তোমার আযাব অস্বীকারকারীদের ওপর আপত্তি হবে)।

জুমু'আর নামাযের বিবরণ

প্রতি শুক্রবার যোহরের প্রথম ওয়াকে [যোহরের ওয়াকের শুরুর দিকে] জামা'তের সাথে জুমু'আর নামায পড়া ফরয। দুপুরের পর সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে যাওয়া মাত্রেই জুমু'আর নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়। ইমাম ছাড়া আর দুজন লোক থাকলেই জুমু'আর নামায পড়তে হবে। জুমু'আ নামায প্রত্যেক স্থানেই পড়া যায়। তবে জুমু'আর নামাযের জন্য একমাত্র শর্ত হল শাস্তি ও নিরাপত্তা বিরাজমান থাকতে হবে। অন্যথায় যোহরের নামায পড়তে হবে। খুতবা ছাড়া জুমু'আর নামায জায়েয নয়। সুন্নত নামায পড়া হলে খুতবা দেয়ার পর জুমু'আর ফরয নামায পড়তে হয়।

জুমু'আর ফরয নামায দু রাকা'ত। ফরযের পূর্বে চার রাকা'ত সুন্নত নামায পড়তে হয়। ফরযের নামাযের পর দুই রাকা'ত সুন্নত নামায পড়তে হয়।

প্রকৃতপক্ষে জুমু'আর নামায যোহরের ফরয নামাযের স্থলভিয়িঙ্গ বা কায়েম মোকাম। এর মাঝে দুই রাকা'ত ফরয নামায রেখে বাকী দুই রাকা'তের পরিবর্তে খুতবাকে ফরয করা হয়েছে। এ জন্যে খুতবা শুনাও ফরয। খুতবা চলাকলীন সময়ে কেউ মসজিদে উপস্থিত হলে তখন তাড়াতাড়ি দুই রাকা'ত সুন্নত নামায আদায় করে নিবে। আর তখন সুন্নত না পড়লে সানী খুতবার সময়ে তাড়াতাড়ি সংক্ষেপে দুই রাকা'ত সুন্নত পড়ে নিতে হবে। এখানে একটি মাস্লা জেনে রাখা উচিত, ফজরের ফরয নামাযের পূর্বেকার এবং জুমু'আর নামাযের পূর্বেকার সুন্নত লম্বা করতে নেই। হ্যরত রসূল করিম (সা.) এ দুই সুন্নত নামায তাড়াতাড়ি পড়তেন। ইমাম সাহেব খুতবা দেয়ার উদ্দেশ্যে বসলে মুয়ায়্যিন

দাঁড়িয়ে আযান দিবেন। প্রথম খুতবা দেয়ার পর ইমাম সাহেবে একবার বসে খানিকটা শ্রান্তি দূর করে উঠে দ্বিতীয় খুতবা প্রদান করবেন। (ফিকাহ আহমদীয়া, পৃ. ১৬২)।

জুমু'আর খুতবা (বক্তৃতা)

যে কোন ধর্মীয় বক্তৃতা দেয়ার প্রারম্ভে যেমন নিম্নলিখিত কলেমা পড়তে হয়, তেমনি জুমু'আর খুতবা দেয়ার পূর্বেও এ রকম পড়তে হয়:

أَشْهَدُ أَنَّ لِلَّهِ إِلَّا إِلَهٌ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
أَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

(আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাহাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহু ওয়া রাসূলুহু আম্মা বাঁদু ফাআউয়ু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম)

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই। তিনি এক-অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা এবং রসূল। এরপর আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর অশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং পরম করুণাময়, অ্যাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী আল্লাহর নামে শুরু করছি।

এরপর সূরা ফাতিহা পাঠ করে খুতবা আরম্ভ করতে হয়। খুতবার বিষয়বস্তু সময়োপযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। ধর্মীয়, সামাজিক, জাতীয় কোন বিষয় বা সমস্যার ওপরেই বক্তৃতা হওয়া উচিত। বক্তৃতা কুরআন ও হাদীসের আলোকে সম্পন্ন করতে হবে। সেজন্য বিষয়বস্তুকে সামনে রেখে বক্তৃতার শুরুতেই কুরআন বা হাদীস হতে উদ্ভৃত দেয়া উচ্চত। এছাড়া হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.) বা তাঁর খলীফাগণের অথবা বিশেষ করে হ্যরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ (আই.) প্রদত্ত যে কোন খুতবা বা খুতবার অংশবিশেষ পাঠ করে খুতবা দানের কার্য সমাধা করা উচিত। যেহেতু হ্যরত খলীফাতুল মসীহ (আই.) সবসময় সময়োপযোগী খুতবা দিয়ে থাকেন এবং তা এমটিএ বা জামাতের পত্রিকার মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছে সেহেতু এ খুতবা পাঠ করা সর্বোত্তম। খলীফায়ে ওয়াক্ত তথা যুগ-খলীফার খুতবা জামাতের রাহকে জীবিত রাখে। সেজন্যে এর পাঠ অগ্রগণ্য। বর্তমানে এমটিএ-এর মাধ্যমে যুগ-খলীফার খুতবা প্রতি শুক্রবার সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। এ খুতবা দেখা ও শুনা আমাদের সবার কর্তব্য।

জুমু'আর দ্বিতীয় খুতবা

الْحَمْدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَغْوِذُ
بِاللّهِ مِنْ شَرْفِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِي اللّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ
يُضِلِّهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَشَهَدَ أَنَّ لَآللّهِ إِلَّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ
شَهَدَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
عِبَادُ اللّهِ رَجَمُوكُمُ اللّهُ أَنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْمَعْدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَا
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعْظُمُ لَعْنَكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُو اللّهَ يَذْكُرُكُمْ
وَادْعُوهُ يَسْتَجِبُ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّهِ أَكْبَرُ

(আলহামদু লিল্লাহি নাহ্মাদুহু ওয়ানাস্তাউন্হু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নুমিলুবিহী ওয়া
নাতাওয়াক্কালু আলায়াহি ওয়া নাউয়ুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়ামিন সাইয়েয়েআতি
আমালিনা, মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাইয়্যায়লিল্লাহু ফালা হাদিয়া লাহু।
ওয়া নাশ্হাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু ওয়ানাশহাদু আল্লা
মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহ ইল্লাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল আদ্লি ওয়াল ইহসানি ওয়া ইতারিয়িল
কুরবা ওয়া ইয়ানহা আনিল ফাহশায়ি ওয়াল মুন্কারি ওয়াল বাগয়ি, ইয়ায়িয়ুকুম
লা'আল্লাকুম তায়াকারণ। উয়্যকুরল্লাহা ইয়ায়কুরকুম ওয়াদ'উহ ইয়াস্তাজিব লাকুম
ওয়ালায়িকরণ্লাহি আকবার)

অর্থ: সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা কীর্তন করি এবং আমরা তাঁরই
সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁরই কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি, তাঁরই প্রতি ঈমান আনি, তাঁর ওপরেই
ভরসা রাখি। আমরা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি আমাদের নফ্স বা প্রবৃত্তির প্ররোচনা
হতে এবং আমাদের নিজেদের কাজের কুফল হতে। আল্লাহ যাকে সৎপথ প্রদর্শন করেন
এরপর তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন
এরপর তাকে কেউ পথ প্রদর্শন করতে পারে না। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন
উপাস্য নেই, তিনি এক অদ্বিতীয় তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমরা আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি,
মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল।

আল্লাহর বান্দাগণ! তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। নিশ্চয় আল্লাহ আদেশ
দেন ন্যায়বিচার এবং অনুগ্রহ করার জন্য, আতীয়-স্বজনের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের

জন্য এবং আল্লাহু অশ্বীল কথা বলতে, অসঙ্গত কাজ ও বিদ্রোহ করতে নিষেধ করেন। এসব তোমাদের এজন্য বলা হচ্ছে, যেন তোমরা উপদেশ প্রাপ্ত হও। আল্লাহকে স্মরণ কর, আল্লাহ তোমাদের স্মরণ করবেন, তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, তিনি তোমাদের প্রার্থনা করুল করবেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর যিক্রিই (স্মরণই) সর্বাপেক্ষা উত্তম।

জুমু'আর নামায সম্পর্কে কয়েকটি জরুরী কথা

(১) জুমু'আর নামাযের জন্য জামা'ত আবশ্যক। জুমু'আর নামায প্রত্যেক বালেগ (প্রাণ্ত-বয়স্ক) ও সুস্থ মুসলমানের জন্য ফরয। কিন্তু অসুস্থ, উন্নাদ, মুসাফির, বিকলঙ্ঘ ও স্ত্রীলোকদের জন্য আবশ্যক নয়। যদি তারা শামিল হয় তাহলে তারা জুমু'আ পড়বে অন্যথায় যোহর নামায পড়বে। পর্দার ব্যবস্থা থাকলে মহিলাদের মসজিদে জুমু'আর নামায পড়া উচিত। মহিলাদের জন্যে পর্দার ব্যবস্থা করা জামাতের দায়িত্ব। হ্যারত খলীফাতুল মসীহ সামী (রা.) বলেছেন, “সাধারণ অবস্থায় নির্দেশ হল, পুরুষ ও মহিলারা যেন একস্থানে (পর্দায়) জুমু'আর ফরয (দায়িত্ব) পালন করেন।” (আল্ ফযল ১১ অক্টোবর, ১৯৪৮)।

(২) জুমু'আর দিনে গোসল করা, আতর বা সুগন্ধি দ্রব্য ইত্যাদি ব্যবহার করা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাক পরা সুন্নত। নবী করিম (সা.)-একে ছোট দিদ বলেছেন।

(৩) জুমু'আর দিন ফজরের ওয়াকে ফরয নামাযে প্রথম রাকা'তে সূরা হা-মিম্ আস্-সাজ্দা এবং দ্বিতীয় রাকা'তে সূরা দাহর পড়া সুন্নত।

(৪) জুমু'আর ফরয নামাযের প্রথম রাকা'তে সূরা জুমুআ এবং দ্বিতীয় রাকা'তে সূরা মুনাফিকুন অথবা প্রথম রাকা'তে সূরা আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকা'তে সূরা গাশিয়া পড়া সুন্নত।

(৫) শুধুমাত্র জুমু'আর দিন রোখা রাখা জায়েয নয়। তবে আগে-পিছে মিলিয়ে রাখলে হবে।

(৬) জুমু'আর দিনের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে আঁ-হ্যারত (সা.) বলেছেন, “সর্বোত্তম দিন হল শুক্রবার। এ দিন আমার ওপর অনেক বেশি দুর্দণ্ড প্রেরণ কর। কেননা এ দিন তোমাদের এ সকল দুর্দণ্ড আমার সামনে পেশ করা হয়।” (আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত)।

ঈদের নামায

‘ঈদ’ শব্দটির অর্থ, যে খুশী বা আনন্দ বারবার আসে। আল্লাহ তা’লা মুসলমান জাতির জন্যে বছরে দু’টি উৎসব নির্ধারিত করেছেন। একটি ঈদ-উল-ফিতর এবং অপরটি ঈদ-উল-আয়হিয়া। এ দু’টি উৎসবের বৃহদাংশ নামাযের মাধ্যমে উদযাপিত হয়। ঈদের নামায সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ (তাগিদকৃত সুন্নত)। ঈদের নামায বছরে দু’বার পড়তে হয়। জামাত ছাড়া এ নামায হয় না। প্রথম ঈদের নামাযের রোয়া শেষ হওয়ার পর ১লা শাওয়াল তারিখে পড়তে হয়। প্রথম ঈদের নামাযের নাম ঈদ-উল-ফিতর বা রোয়া ভঙ্গের ঈদ এবং দ্বিতীয় ঈদের নামাযের নাম ঈদ-উল-আয়হিয়া বা কুরবানীর ঈদ। যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখ এ নামায পড়তে হয়।

ঈদের নামাযের পদ্ধতি

ফজরের পর সূর্য কিছু ওপরে উঠলেই ঈদের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং দ্বি-থহরের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। ঈদের নামায দুই রাকা’ত। বিনা আযান ও ইকামতে এ নামায আদায় করতে হয়। এর পূর্বে কোন নফল নামায নেই। তাকবীরে তাহ্রীমা বেঁধে প্রথম রাকা’তে অন্যান্য নামাযের ন্যায় সানা পড়তে হয়। এরপর হাত ছেড়ে দিয়ে সাতবার তকবীর—অর্থাৎ, ‘আল্লাহ আকবর’ বলতে হয়। প্রতিবারই হাত কাঁধ বা কান পর্যন্ত উঠিয়ে আবার ছেড়ে দিতে হয়। সাতবার তকবীর দেয়া হয়ে গেলে হাত বেঁধে যথারীতি সূরা-কিরাত পড়তে হয়। দ্বিতীয় রাকা’তে কিরাত পড়ার পূর্বে পুনরায় পাঁচবার তকবীর পড়তে হয়। দুই রাকা’তে নামাযের নির্দিষ্ট তকবীর ছাড়া ঈদের নামাযে উল্লেখিতভাবে অতিরিক্ত ১২টি তকবীর পড়তে হয়। (তিরমিয়ী, পৃ. ৭০, সুনানে ইবনে মাজাহ, পৃ. ৯১)।

দুই রাকা’ত নামায পড়া হয়ে গেলে জুম্মার খুতবার ন্যায় ঈদের নামাযেও ইমাম সাহেব খুতবা প্রদান করবেন। খুতবা সময়োপযোগী হওয়াই বাঞ্ছনীয়, খারাপ আবহাওয়ার দরুণ বা অন্য কোন কারণে ঈদগাহে (খোলা মাঠ—যেখানে ঈদের নামায পড়া হয়) যাওয়া সম্ভব না হলে জামে মসজিদে ঈদের নামায পড়া জায়েয়। ঈদগাহে এক পথে যাওয়া এবং অন্যপথে আসা সুন্নত। ঈদের দিনে মেসওয়াক করা, গোসল করা, আতর বা অন্য সুগন্ধি দ্রব্য ও সুরমা ব্যবহার করা, নতুন বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করা এবং উত্তম খাদ্য গ্রহণ করা সুন্নত। ঈদ-উল-ফিতরের নামাযের পূর্বে কিছু খেয়ে মসজিদে যাওয়া আর কুরবানীর ঈদের নামাযের পর নামায থেকে এসে কিছু খাওয়া সুন্নত। ঈদের নামাযের জন্য আসা-যাওয়ার রাস্তা যদি পৃথক হয় তাহলে তা মুস্তাহাব এবং অধিক সওয়াবের কারণ। ঈদ-উল-ফিতরের নামাযের পূর্বে জামাতের নিয়ম অনুযায়ী রোয়ার ফিতরা দান করা এবং ঈদ-উল-আয়হার নামাযের পর সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের কুরবানী করা কর্তব্য। ধনী, গরীব, বৃদ্ধ ও এক দিনের শিশু পর্যন্ত সকল মুসলমানের জন্যে বিনা

ব্যতিক্রমে ফিতরানা সম্পূর্ণ বা অর্ধেক হিসাবে দেয়া ওয়াজিব। ঈদগাহে যাতায়াতের সময় ঈদ-উল-ফিতরে এবং ঈদ-উল-আয়হায় নিম্নলিখিত তকবীর পাঠ করা উচিত-আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

অর্থ: আল্লাহু সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহু সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহু ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আল্লাহু সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহু সর্বশ্রেষ্ঠ, সব প্রশংসা আল্লাহর।

এ তকবীর ঈদ-উল-ফিতরের দিন মহানবী (সা.) নিজের ঘর থেকে বের হয়ে ঈদগাহে পৌছানো পর্যন্ত পড়তেন। (সুনান আব্দ দারকুত্তীনী, কিতাবুল ঈদায়েন, হাদীস নং-৬) এরপে যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ ফজরের নামাযের পর হতে শুরু করে ১৩ তারিখ আসরের নামায পর্যন্ত উক্ত তকবীর প্রতি ফরয নামাযের পর তিনবার করে উচ্চৎসরে পাঠ করতে হয়। ঈদগাহে আসা-যাওয়ার পথে নবী করীম (সা.) এবং তাঁর সাহাবাগণ (রা.)-ও এ তকবীর বেশি বেশি পড়তেন।

কুরবানী

কুরবানী সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ (তাগিদকৃত সুন্নত) এবং ওয়াজিব (অবশ্য কর্তব্য)। কুরবানীর জন্যে নির্বাচিত পশু অবশ্যই হালাল, হষ্ট-পুষ্ট, নিখুঁত হতে হবে। অসুস্থ, দুর্বল, ল্যাংড়া, কান কাটা, শিং ভাঙা, অঙ্গ পঞ্চের কুরবানী জায়েয নয়। ছাগল, ভেড়া বা দুশ্মা হলে বয়স অন্তত এক বছর হতে হবে। গরু, মহিষ হলে বয়স কমপক্ষে দুই বছর হওয়া চাই। উটের বয়স ৩ বছর হতে হবে। গরু, উট জাতীয় প্রাণীতে কুরবানী সাতটি হিস্যায় (অংশে) দেয়া যায় এবং ছাগল, ভেড়া, দুশ্মা জাতীয় প্রাণীর ক্ষেত্রে একটি হিস্যায় দেয়া যায়। একটি হিস্যায় একজনের জন্যেও হতে পারে, একটি পুরো পরিবারের জন্যও হতে পারে। এভাবে হয়রত রসূল করীম (সা.) বা হয়রত মসীহ মাওউদ (আ.) বা তাঁর খলীফাগণ অথবা মৃত পিতা-মাতার পক্ষ হতেও কুরবানী দেয়া যায়। উল্লেখ্য, হয়রত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) আহমদী জামাতের কেন্দ্র রাবওয়াতে সব মিস্কীনের পক্ষ হতে একটি পশু কুরবানী দিতেন।

যিনি কুরবানী দিবেন তিনি যিলহজ্জ মাসের প্রথম তারিখ হতে কুরবানী দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত চুল, দাঢ়ি, নখ ইত্যাদি কর্তন করা হতে বিরত থাকবেন। এছাড়া তিনি ঈদের দিন কুরবানীর পূর্ব পর্যন্ত রোয়া থাকবেন এবং সম্ভব হলে কুরবানীর মাংস দিয়ে রোয়া খুলবেন। এটা মহানবী (সা.)-এর সুন্নত। কুরবানী করার সময় হল ১০ যিলহজ্জ ঈদের নামাযের পর থেকে ১২ যিলহজ্জ সূর্য ডোবার আগ পর্যন্ত। কুরবানীর মাংস সদকা নয়। মানুষ নিজেও খেতে পারে এবং আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বন্ধবদেরকেও খাওয়াতে পারে। তবে উক্ত হল, তিনটি অংশ করা। একটি অংশ নিজে রাখবে, অপরটি আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে বণ্টন করবে আর অন্যটি গরীবদের মাঝে বিতরণ করবে। (ফিকাহ আহমদীয়া, পৃ. ১৮২-৮৩)।

আকীকাহ

সন্তান জন্মগ্রহণের পর ৭ম দিনে তার মাথার চুল কামানো, সেই চুলের সম্পরিমাণ ওজনের রূপা বা সোনা সদকা হিসেবে গরীবদের মাঝে বণ্টন করা এবং নাম রাখা উপলক্ষে পশু জবাই করাকে আকীকা বলে। আকীকা করা সুন্নত। (ইবনে মাজাহ, বাবুল আকীকাহ, পৃ. ২২৮)। হাদীসে এর কল্যাণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, “আকীকা দিয়ে শিশুর বিপদ দূর কর।” (বুখারী)। আকীকা অর্থ পশু জবাই করা। পুত্র সন্তানদের বেলায় দু'টি ছাগল বা দুষ্পা এবং কন্যা সন্তানদের বেলায় একটি ছাগল বা দুষ্পা জবাই করতে হবে। আকীকাহৰ পশু যেন মোটাতাজা ও উত্তম হয়। যদিও কুরবানীর পশুর ন্যায় এক্ষেত্রে পশুর বয়সের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যে শিশুর আকীকা দেয়া হবে না সেক্ষেত্রে জন্মের দিনই তার নাম রাখা যাবে। এতে কোন সমস্যা নেই। (বুখারী, কিতাবুল আকীকাহ)।

আকীকার মাংস নিজেরা খেতে পারে। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকেও দিতে পারে। রান্না করে ভোজেরও আয়োজন করতে পারে। গরীবদেরও এর অংশ থেকে দেয়া উচিত। সামর্থ্যে না কুলালে দু'টি পশুর বদলে একটি পশুতেও আকীকাহ সম্পন্ন হতে পারে। (ফিকাহ আহমদীয়া, পৃ. ১৮৩)।

তাহাজ্জুদ নামায

তাহাজ্জুদ নামায নফল এবং সব নফল নামাযের সেরা। সেজন্যই কুরআন ও হাদীসে এ নামায নিয়মিত পড়ার তাগিদ দেয়া হয়েছে এবং এর অনেক ফয়লত ও কল্যাণ বর্ণিত হয়েছে। শেষ রাতে ঘুম হতে উঠে এ নামায পড়তে হয়, সেজন্যে এর নাম তাহাজ্জুদ অর্থাৎ, শেষ রাতের নামায। এ নামাযের সময় হল, রাত্রি দ্বি-প্রহরের পর হতে সুবুহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত। রসূলুল্লাহ (সা.) এ নামায সাধারণত দু রাকা'ত করে আট রাকা'ত পড়তেন। সময় বিশেষে দুই বা চার রাকা'ত পর্যন্তও পড়তেন। এরপর বিতরের নামায আদায় করতেন। কিন্তু সাধারণভাবে এশার সাথেই বিতরের নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সেজন্য এশার নামাযের পর যে ব্যক্তি বিতরের নামায পড়েছে তাকে তাহাজ্জুদের সময় বিতরের নামায পড়তে হবে না। উল্লেখ্য, তাহাজ্জুদের নামায বা-জামাত আদায় করাও জায়েয়। একাকী পড়া উত্তম। বা-জামাত পড়ার সময়ে এ নামাযে সূরা কুরাত উচ্চঃস্বরে পাঠ করা উচিত।

তারাবীহ নামায

তারাবীহ নামাযের অর্থ আরামের নামায। রমযান মাসে শেষ রাতে তাহজ্জুদ নামায পড়তে কষ্ট হয় বিধায় সন্ধ্যা রাত্রে এ নামায জামাতের সাথে পড়া হয়। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হ্যারত উমর (রা.)-এর সময় এ নামাযের অধিক প্রচলন হয়। তারাবীহের নামায রমযান মাসের এক বিশেষ ইবাদত। রমযান মাসে তারাবীহ নামায ২ রাকা'ত করে ৮ রাকা'ত পড়তে হয়। কেউ যদি চায় তাহলে সে ২০ রাকা'ত বা তার চেয়ে বেশি পড়তে পারে, তবে সর্বোত্তম হল ৮ রাকা'ত পড়া। কেননা হৃষুর (সা.) বেশিরভাগ সময় আট রাকা'ত পড়তেন। বা-জামা'ত তাহজ্জুদ নামায আদায়ে অসুবিধা বিধায় সবার সুবিধার্থে এশার নামাযের পর তারাবীহের নামায আদায় করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বা-জামাত তারাবীহের নামায পড়েও তাহজ্জুদের নামায পড়া যায়। রমযানের চাঁদ উঠলে সেই রাত থেকে শেষ রমযানের রাত পর্যন্ত প্রত্যেক রাতে এশার নামাযের ফরয এবং ২ রাকা'ত সুন্নত আদায়ের পরেই তারাবীহের নামায পড়তে হয়। বা-জামাত তারাবীহের নামাযে সারা মাসে কুরআন করাম এক খতম পড়া উত্তম। ৭ দিনের পূর্বে কুরআন খতম করা নিষিদ্ধ। তারাবীহের নামাযের সাথে বিতরের নামায জামা'তের সাথে পড়া যায়। (ফিকাহ আহমদীয়া, পঃ.-২০৮)

কসর নামায

সফরের নিয়তে নিজ গ্রাম বা শহরের বাইরে গেলে কসর নামায পড়তে হয়। (সূরা নিসা : ১০২)। কসর অর্থ সংক্ষিপ্ত করা— অর্থাৎ, ভ্রমণ বা সফরের অবস্থায় ৪ রাকা'ত ফরয নামাযের স্থলে ২ রাকা'ত পড়তে হয়। তবে ফজর ও মাগরিবের নামায সম্পূর্ণ পড়তে হবে। সফরকালীন অবস্থায় ফজর ও জুমু'আর সুন্নত এবং বিতর নামায ছাড়া বাকী সকল সুন্নত নামায মাফ হয়ে যায় তথা পড়তে হয় না। নফল পড়তে পারে, না পড়লেও সমস্যা নাই। সফরে জমা নামায আদায় করাও জায়েয়।

সফরে কসর নামায সম্পর্কে সঠিক মতামত হল, কমপক্ষে ৩ দিন থেকে নিয়ে অধিক ১৫ দিন পর্যন্ত কোন স্থানে অবস্থানের নিয়তে সফর করলে কসর পড়তে হয়। অবশ্য কোন মুসাফিরকে যদি ২/৪ দিন থাকার নিয়ত করেও একাদিক্রমে ১৫ দিনের বেশি থাকতে হয়, তবে তাকে কসর নামাযই পড়তে হবে। কিন্তু এভাবে একাদিক্রমে এক মাসের বেশি কসর নামায পড়া যাবে না। হ্যারত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে ‘সফর কাকে বলে’ এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, “সফরের নিয়তে যদি তিন ক্রোশ = তিন হাজার গজ) যাওয়া হয় তাহলে কসর করতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে নিয়তের পাশাপাশি তাকওয়ার দিকে দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। যদি কেউ প্রতিদিন সাধারণ কাজের জন্য সফর করে তাহলে তা সফর নয় বরং সফর হল যেটিকে মানুষ বিশেষভাবে গ্রহণ

করে আর সে নিয়তেই ঘর থেকে বের হয়।”

যে ব্যক্তিকে চাকুরী বা ব্যবসায়িক কাজে কিংবা পেশাগত কারণে সবসময় সফরের মাঝে থাকতে হয় বা অনেক দূর রাস্তা অতিক্রম করতে হয় তার এ ভ্রমণ বা যাতায়াত কখনই সফর বলে বিবেচিত হবে না। অনেকে বলে থাকে, বর্তমান সময়ে তো যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক স্বাচ্ছন্দ্যতা ও সহজলভ্যতা আছে, এফ্ফেক্টে কসর না করলে কি সমস্যা? এর উত্তর হল- সফরকালীন অবস্থায় নামায কসর করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) এই ব্যাখ্যা দেননি, অমুক সুবিধা হলে সফর আর অমুক সুবিধা না হলে সফর নয়। আসল কল্যাণ হল, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর আদেশ পালন করা। নিজের পক্ষ থেকে অজুহাত ও কারণ ব্যাখ্যা করার অবকাশ নেই।

স্থানীয় বা মুকিম ইমামের পিছনে কোন মুসাফির নামায পড়লে তাকে সম্পূর্ণ নামায পড়তে হবে। কিন্তু মুসাফির ইমাম হলে তিনি দুই রাকাত নামায পড়ে সালাম ফিরাবেন এবং মুকিম-মুজাদী বাকী দুই রাকাত একা একা পড়ে নিবেন। আর সে দুই রাকাতে প্রথম রাকাত থেকে বা-জামা’ত নামায পাওয়া মুজাদী কেবল সূরা ফাতিহা পড়বেন। ট্রেন, বাস বা উড়োজাহাজে সফরকালে নিজ স্থানে বসে নামায পড়া যাবে। কিবলার দিকে মুখ করার সুযোগ না থাকলে যেদিকে মুখ করে বসে থাকবেন, সে দিকেই মুখ করে নামায পড়া যাবে। কারণ আল্লাহ্ তাঁলা বলেছেন, “তোমরা যে দিকেই মুখ ফেরাও সে দিকেই আল্লাহ্ আছেন।” (সূরা বাকারা : ১১৬)। [ফিকাহ আহমদীয়া, পৃ. ১৮৯-১৯৩]।

জমা নামায

সফরে, অসুস্থতায়, বৃষ্টি-বাদলের দরুণ, আবহাওয়া প্রতিকূল থাকলে, ধর্মীয় কারণে বা অন্য কোন অবস্থা বিশেষে বাধ্য হলে যোহর ও আসরের ফরয নামায এবং মাগরিব ও এশার ফরয নামায একত্রে আগে বা পরে পড়া জায়েয। হ্যরত রসূল করিম (সা.) কোন-কোন সময়ে উল্লেখিত কারণ ছাড়াও নামায জমা করেছেন। (তিরমিয়ী)। যোহর ও আসরের নামায, যোহর অথবা আসরের সময়ে এবং মাগরিব ও এশার নামায, মাগরিব অথবা এশার সময়ে জমা করা যায়। নামায জমা করার ক্ষেত্রে আগে, পরে বা মাঝে সুন্নত নামায পড়তে হয় না এবং প্রত্যেক ওয়াক্তের নামায পৃথক-পৃথক ইকামতের সাথে পড়তে হয়। এশার নামায জমা করলে সুন্নত পড়তে হবে না। তবে বিতরের নামায পড়তে হবে। হজের সময় আরাফাতে যোহরের সাথে আসরের নামায এবং মুজদালিফাতে মাগরিবের সাথে এশার নামায জমা করে পড়া হয়।

যারা নামায জমা করেন না তারা মনে করেন এটি বিদ্যাত বা নতুন সৃষ্টি। প্রকৃতপক্ষে এটি বিদ্যাত নয় বরং নবী করিম (সা.)-এর সুন্নত থেকে এর সনদ পাওয়া যায়। এমনকি নবী করিম (সা.) মদীনায় থাকাকালে অসুস্থতা বা বৃষ্টি-বাদল ছাড়াও নামায জমা করেছিলেন।

(মুসলিম, বাব জামআ বায়না সালাতাইনি ফিল হায়রি)। নামায জমা হবে কি হবে না তা ইমাম এবং মুজাদীদের উপর নির্ভরশীল। যদি মুজাদীরা অধিকাংশ জমা করার ব্যাপারে মতামত দেয় তবে ইমামের তাদের মতামতের সম্মান করা উচিত। এরপে ইমাম যদি মনে করে নামায জমা করা দরকার এবং তিনি যদি নামায পড়ানো শুরু করে দেন তখন মুজাদীদেরকে কোন উচ্চবাচ্য না করে তার অনুসরণ করা উচিত। তবে উপরোক্ত কারণ ছাড়া বাহানা করে নামায যেন জমা করা না হয় সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

ইস্তিখারার নামায

কোন বিশেষ ধর্মীয় অথবা জাগতিক কাজ আরম্ভ করার পূর্বে এবং কোন ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত বা ফয়সালায় উপনীত হতে না পারলে বা দ্বিধাত্ব হলে খোদা তালার কাছে হেদয়াত ও মঙ্গল কামনা করে যে নামায পড়া হয়, একে ইস্তিখারার নামায বলে। রাতে শোবার পূর্বে এ নামায পড়তে হয়।

ইস্তিখারার নামায ২ রাকা'ত। প্রথম রাকা'তে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকা'তে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস পড়তে হয়। উভয় রাকা'ত নামায পড়া হলে— অর্থাৎ, তাশাহুদ, দুরুদ শরীফ ইত্যাদি পাঠ করে অতি মিনতি ও বিনয়ের সাথে নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করতে হয়-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَغْرِيكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ
فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغَيْوَبِ
اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرُ خَيْرٌ لِّي فِي دِينِي وَمَحَاسِنِي وَعَاقِبَةُ أَمْرِي فَاقْدِرْتَهُ
لِي وَيُسْتَرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنِّي كُنْتُ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرُ شَرًّا لِّي فِي دِينِي وَ
مَحَاسِنِي وَعَاقِبَةُ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْبُلْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ
أَرْضِنِي بِهِ

(আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুক্কা বিইলমিকা ওয়া আস্তাকুন্দিরুক্কা বিকুন্দরাতিকা ওয়া আসঅ-
লুকা মিন ফাযলিকাল্ আযীম। ফাইনাকা তাকুন্দিরু ওয়ালা আকুন্দিরু ওয়া তা'লামু ওয়া
লা আ'লামু ওয়া আন্তা আ'ল্লামুল গুয়ুব।

আল্লাহুম্মা ইন্ন কুন্তা তা'লামু আল্লা হাযাল আমরা খায়রুল্লী ফী দীনি ওয়া মা'আশী ওয়া
আ'কিবাতি আম্রী ফাকুন্দিরহ লী ওয়া ইয়াস্সিরহ লী সুম্মা বারিক লী ফীহি, ওয়া ইন্ন
কুন্তা তা'লামু আল্লা হাযাল আমরা শারুল্লী ফী দীনি ওয়া মা'আশী ওয়া আকিবাতি আম্রী
ফাস্রিফহ আল্লী ওয়াসরিফনী আনহ ওয়াক্দির লীয়াল্ খায়রা হায়সু কানা সুম্মা আরফিনী

বিহী)। [বুখারী, তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ]।

অর্থ: হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার জ্ঞান থেকে মঙ্গল কামনা করছি, তোমার অসীম কুদরত (শক্তি ও মহিমা) থেকে কুদরত প্রার্থনা করছি এবং তোমার অসীম ফয়ল ভিক্ষা করছি। কেননা, তুমি শক্তিশালী পক্ষান্তরে আমি শক্তিহীন, তুমি সর্বজ্ঞ, আমি অজ্ঞ আর সকল অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে তুমি সর্বজ্ঞ।

হে আল্লাহ! যদি তুমি জানো, এ কাজ (এ স্থলে কাজের কথা উল্লেখ করতে হবে) আমার জন্যে, আমার ধর্ম ও দুনিয়ার জন্যে এবং আমার উন্নতির জন্যে উন্নত হয় ও এর শেষ পরিণতি কল্যাণকর হয় তাহলে তুমি আমার জন্যে একে নির্ধারিত এবং সহজলভ্য করে দাও এবং আমার জন্যে এতে বরকত ঢেলে দাও। কিন্তু তুমি যদি জানো, এ কাজ আমার জন্যে আমার ধর্ম ও দুনিয়ার জন্যে এবং আমার উন্নতির জন্যে ক্ষতিকর এবং এর শেষ পরিণতি আমার জন্যে অকল্যাণকর হয় তাহলে একে আমার কাছ হতে দূর করে দাও এবং আমাকে উক্ত কাজ হতে ফিরিয়ে রাখ এবং যেখানে আমার জন্যে মঙ্গল নিহিত রয়েছে তাই আমার জন্যে নির্ধারিত করে দাও আর আমাকে এতেই সন্তুষ্ট করে দাও।
(শব্দার্থ: আল্লাহসুল্লাহ- হে আল্লাহ, ইন্নী- নিশ্চয়ই আমি, আস্তাখীরু- মঙ্গল কামনা করছি, ইলম- জ্ঞান, ওয়া- এবং, আস্তাকদিরু- আমি কুদরত (শক্তি ও মহিমা) প্রার্থনা করছি, আসআলু- আমি চাছিভিক্ষা করছি, তাকদিরু- তুমি পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতা রাখ, তালামু- তুমি জ্ঞান রাখ, গুরুব- অপ্রকাশিত বিষয়সমূহ, ইনকুস্তা তালামু- তুমি যদি জানো, খায়র- মঙ্গল, মা'আশী- আমার উন্নতি, আকিবাতি-শেষ পরিণতি, আম্র- বিষয়, আকদিরহ লী- এ আমার জন্য নির্ধারিত করে দাও, শাররুল্লী- আমার জন্য অকল্যাণকর, ওয়াসরিফ্নী আন্হ- এবং আমাকে উক্ত কাজ হতে ফিরিয়ে রাখো, খায়রা হায়সু- যেখানে মঙ্গল নিহিত রয়েছে, আরবিনী বিহী- এতেই আমাকে সন্তুষ্ট করে দাও।

কসুফ ও খসুফের নামায

সূর্যগ্রহণকে কসুফ এবং চন্দ্রগ্রহণকে খসুফ বলে। এ উভয় গ্রহণের সময়ে মসজিদে গিয়ে বা-জামাত দু' রাকাত নামায পড়তে হয়। তবে আয়ান বা ইকামত দিতে হয় না। এ নামাযের ক্রিয়াত আওয়াজ করে পড়তে হয়। গ্রহণকালের দীর্ঘতা হিসেবে এ নামাযের প্রতি রাকা'আতে কমপক্ষে দু'বার করে রংকু দিতে হয়। কোন বর্ণনায় ত রংকুর কথাও এসেছে। অর্থাৎ, ক্রিয়াত পড়ার পর রংকু দিতে হবে এরপর রংকু থেকে উঠে কুরআনের আরো কিছু অংশ পড়ে পুনরায় রংকু দিতে হবে এবং তারপর সিজদা হবে। এ নামাযে সূরা ক্রিয়াত, রংকু, সিজদা লম্বা করতে হয়। নামায শেষ করার পর ইমাম সাহেব খুতবা দান করবেন। (আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত)। গ্রহণের সময় সদকা, দান-খয়রাত ও তওবা-ইস্তিগফার করতে হয়।

জানায়ার নামায

মৃত ব্যক্তির লাশ দাফন করার পূর্বে তার রহের মাগফিরাতের জন্য যে নামায পড়া হয় একে জানায়ার নামায বলে। জানায়ার নামায ফরযে কিফায়া (যে ফরয সবার পক্ষ হতে কিছু লোক আদায় করলেই চলে, তা না হলে সবার ওপর গুনাহ বর্তাবে)। মসজিদে বা অন্য কোন স্থানে এ নামায পড়া যায়। ইমাম লাশ সামনে রেখে লাশের বক্ষস্থল বরাবর দাঁড়িয়ে নামায পড়াবেন। মুক্তাদীদেরকে এক, তিন, পাঁচ বা অনুরপভাবে বেজোড় সংখ্যায় কাতরবন্দী হয়ে দাঁড়াতে হবে। এ নামাযে আযান ও ইকামত নেই। রুকু, সিজাদও নেই। এ নামাযে সর্বমোট চারবার তকবীর পাঠ করতে হয়। প্রথম তকবীরের পর সানা ও তাসমীয়াহ পাঠ করার পর সূরা ফতিহা পাঠ করতে হয়। দ্বিতীয় তকবীরের পর দুর্দণ্ড শরীফ পড়তে হয়। এরপর তৃতীয় তকবীর দিয়ে নিম্নোক্ত দোয়া পড়ার পর চতুর্থ তকবীর দিয়ে সালাম ফিরাতে হয়।

জানায়ার নামাযের দোয়া

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيْتَنَا وَ مَيْتَنَا وَ شَاهِدَنَا وَ غَائِبَنَا وَ صَغِيرَنَا وَ كَبِيرَنَا وَ ذَكَرِنَا وَ أَنْثَنَا
 اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنْ أَنْفُسِنَا فَاحْبِبْهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَ مَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنْ أَنْفُسِنَا فَتَوَفَّهُ عَلَى
 الْإِيمَانِ ۖ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لَا تَفْعِلْنَا بَعْدَهُ ۖ

(আল্লাহুভূমাগফিরলি হায়িনা ওয়া মাইয়িতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া সাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উন্সানা। আল্লাহুম্মা মান আহইয়ায়তাহ মিন্না ফাআহয়ী আ'লাল ইসলামি ওয়া মান তাওয়াফফায়তাহ মিন্না ফাতাওয়াফফাহ আ'লাল ঈমানি। আল্লাহুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহ ওয়ালা তাফতিন্না বাদাহ)

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যকার জীবিত, মৃত, উপস্থিত, অনুপস্থিত, ছোট, বড়, পুরুষ, মহিলা সবাইকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের মাঝে যাকে জীবিত রেখেছ, তাকে তুমি ইসলামের ওপরেই জীবিত রাখ এবং আমাদের মাঝে তুমি যাকে মৃত্যু দান কর তাকে ঈমানের সাথেই মৃত্যু দান কর। হে আল্লাহ! তার (মৃত ব্যক্তির) ভাল কাজ হতে আমাদেরকে বশিষ্ট রেখো না এবং তার পরে আমাদেরকে কলহ-ফাসাদের মাঝে নিষ্কেপ করো না। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল জানায়েয)

(শব্দার্থ: আল্লাহুম্মা- হে আল্লাহ! ঈগফির- তুমি ক্ষমা করে দাও, হাইয়িনা- আমাদের জীবিতগণ, মাইয়িতিনা- আমাদের মৃতগণ, শাহিদিনা- আমাদের উপস্থিতগণ, গায়িবিনা- আমাদের অনুপস্থিতগণ, সাগীরিনা- আমাদের ছোটগণ, কাবীরিনা- আমাদের বড়গণ, যাকারিনা- আমাদের পুরুষগণ, উন্সানা- আমাদের স্ত্রীলোকগণ, আহইয়ায়তা- তুমি

জীবিত রেখেছ, তাওয়াফ্ফায়তা- তুমি মৃত্যু দিয়েছ, মান- যাকে, মিল্লা- আমাদের মাঝে থেকে, লা তাহরিমনা- তুমি আমাদেরকে বঞ্চিত রেখো না, আজর- [ভাল কাজের] পুরস্কার, ফিতনা-কলহ, বিবাদ/বিপর্যয়)।

মহিলা হলে ‘আজরাহ’ এবং ‘বাদাহ’-এর স্থলে যথাক্রমে ‘আজরাহ’ এবং ‘বাদাহা’ পড়তে হবে। জানায়ার নামায দুইজনের হলে যথাক্রমে ‘আজরাহ্মা’ এবং ‘বাদাহ্মা’, অনেকজন হলে ‘আজরাহ’ স্থলে ‘আজরাহ্ম’ এবং ‘বাদাহ’ স্থলে ‘বাদাহ্ম’ পড়তে হবে।

নাবালকের জানায়ার দোয়া

اللَّهُمَّ اجْعِلْ لَنَا سَلَفًا وَ فَرَطًا وَ ذُخْرًا وَ أَجْرًا وَ شَافِعًا وَ مُشْفِقًا

(আল্লাহুহ্মাজ্বালহু লানা সালাফাওঁ ওয়া ফারাতাওঁ ওয়া যুখরাওঁ ওয়া আজরাওঁ ওয়া শাফিআওঁ ওয়া মুশাফ্ফিন্স্কি’আন)

অর্থ: হে আল্লাহ! তাকে আমাদের পক্ষ থেকে কল্যাণ সাধনের অগ্রদৃতস্বরূপ এবং আরাম ও মঙ্গলের উপকরণস্বরূপ গণ্য করো আর তাকে আমাদের জন্য উভয় প্রতিদানের কারণ করো এবং তাকে আমাদের জন্যে এমন সুপারিশকারী গ্রহণ করো যার সুপারিশ গৃহীত হয়। (বুখারী, কিতাবুল জানায়েম)

(শব্দার্থ: আল্লাহুহ্মা- হে আল্লাহ!, ইজআলহু লানা- তুমি তাকে আমাদের জন্য বানাও, সালাফান- কল্যাণ সাধনের অগ্রদৃতস্বরূপ, ওয়া- এবং, ফারাতান- আরাম সাধনের অগ্রদৃতস্বরূপ, যুখরান- মঙ্গলের উপকরণস্বরূপ, আজরান- প্রতিদানের কারণ, শাফিআন- সুপারিশকারী, মুশাফ্ফিআন- তোমার দরবারে গৃহীত সুপারিশকারীস্বরূপ) নাবালিকা হলে ‘আজ্বালহু’ স্থলে ‘اجْعَلْ’ (‘ইজআলহু’), ‘শাফিআন’ স্থলে ‘শَافِعًا’ পড়তে হবে।

গায়েবী জানায়ার নামায

মৃত ব্যক্তির লাশের অনুপস্থিতে গায়েবী জানায়ার নামায আদায় করতে হয়। এমনকি একাধিক মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যেও এ নামায পড়া যায়। নিয়ম-কানুন সাধারণ নামাযে জানায়ার অনুরূপ।

মৃতের গোসলের নিয়ম

সামান্য গরম পানিতে কুল গাছের পাতা ভিজিয়ে মৃতকে গোসল দেয়া সুন্নত। কুল পাতা পাওয়া না গেলে সাবান দিয়েও গোসল দেয়া যায়। মৃত ব্যক্তির গোসলের পূর্বে পেট টিপে (চাপ দিয়ে) মল-মূত্র বের করা জরুরী নয়। ওয়ু করিয়ে গোসল আরম্ভ করা এবং কর্পুর

লাগিয়ে গোসলের কাজ শেষ করা উচিত। শহীদের জন্যে ওয়ু-গোসল এবং কাফন জরুরী নয়। তাঁকে রঙমাখা কাপড়-চোপড়সহ দাফন করতে হয়। যথারীতি পর্দার মাঝে মৃতকে গোসল দেয়া উচিত। মৃত মহিলার গোসল মহিলাগণ কর্তৃক যেন সাধিত হয়।

কাফন

মৃত ব্যক্তিকে যে কাপড় পড়ানো হয় তাকে ‘কাফন’ বলে। মৃত ব্যক্তি পুরুষ হলে তিন প্রস্ত এবং মহিলা হলে পাঁচ প্রস্ত কাপড় পড়ানোর নিয়ম প্রচলিত আছে। নতুন কাপড়ের অভাবে লাশ ঢাকার মত পরিষ্কার পুরানো কাপড়ও ব্যবহার করা চলে। এর অভাবে কলা পাতা, ঘাস ইত্যাদি দিয়েও লাশকে ঢেকে দাফন দেয়া যায়।

পুরুষের কাফন

- ১) লিফাফা: মাথা হতে পা পর্যন্ত।
- ২) ইজার: কোমর হতে পা পর্যন্ত।
- ৩) পিরহান: ঘাড় হতে গোড়ালি পর্যন্ত।

স্ত্রীলোকের কাফন

- ১) লিফাফা: মাথা হতে পা পর্যন্ত।
- ২) ইজার: কোমর হতে পা পর্যন্ত।
- ৩) পিরহান: ঘাড় হতে গোড়ালি পর্যন্ত।
- ৪) সীনাবন্দ: বগল হতে জানু পর্যন্ত।
- ৫) দমনী: মাথার চুল বাঁধার জন্য।

কবর যিয়ারাত

যেখানে মৃত ব্যক্তিকে দাফন বা সমাহিত করা হয় একে কবর বলে। অনেকগুলো কবরের স্থানকে কবরস্থান বা গোরস্থান বলে। বর্তমান যুগে কবরকে ধিরে নানা প্রকার বিদাতি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। কবরকে নানা প্রকার স্থাপনা নির্মাণ করে সাজানো, ফুল দেয়া, বাতি, আগরবাতি, মোমবাতি জ্বালানো হয়ে থাকে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এগুলো কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এমনকি তিনি মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত এ ব্যাপারে উম্মতকে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি (সা.) সেসব মহিলাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন যারা কবরে বাতি জ্বালায়। বাংলাদেশেও অনেক কবর বা মাজার রয়েছে যেখানে অর্থ কামানোর উদ্দেশ্যে নানা রকম অনেসলামিক ও বিদাতি কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। কবরের সুরক্ষা এবং স্মৃতির জন্যে কবরকে সাদামাটাভাবে এক-আধ হাত উঁচু

করে বাঁধানো যেতে পারে বা ঘের দিয়ে রাখা যেতে পারে, এর বেশি নয়। কবর মৃত্যুকে স্মরণ করায়, আর মৃত্যু আল্লাহকে স্মরণ করায়। কবর যিয়ারত মানে কবর দর্শন। কবরস্থানে গেলে মানুষের মৃত্যুকে স্মরণ হয়, মন বিগলিত হয়। আল্লাহর কাছে যেতে হবে তা মনে আসে। আর দোয়ার আবেগ সৃষ্টি হয়। সেজন্যে কেবল ইসলামে কবর যিয়ারতের বিধান রয়েছে। এ যুগের ইমাম হযরত মসিহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.) কবর যিয়ারত সম্বন্ধে বলেন, “কবরস্থানে এক প্রকার আধ্যাত্মিকতা থাকে”। সকাল বেলায় কবর যিয়ারত করা সুন্নত। এটা পুণ্যের কাজ। এতে মানুষের নিজের অবস্থান সম্বন্ধে স্মরণ হয়। মানুষ এ দুনিয়াতে মুসাফিরের ন্যায়। আজ মাটির ওপরে তো কাল মাটির নিচে। হাদীস শরীফে আছে, যখন মানুষ কবরের কাছে আসে তখন বলে: “আস্সালামু আলায়কুম ইয়া আহলাল কুবুরী মিনাল মু’মিনীনা ওয়াল মু’মিনাত ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লাহ বিকুম লাহিকুন। আসআলুল্লাহ লানা ওয়া লাকুমুল আ’ফিয়াতা”— অর্থাৎ, “হে কবরবাসী মু’মিন পুরুষ ও মু’মিন নারীগণ! তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহ চাইলে নিশ্চয় আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হবো। আমাদের জন্য ও তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাচ্ছি।” (মুসলিম, কিতাবুল জানায়ে)

কবরবাসীর জন্যে মাগফিরাত বা ক্ষমার দোয়া করা উচিত। আর নিজের জন্যও খোদার কাছে দোয়া করা আবশ্যক। মানুষ সবসময় খোদার দরবারে দোয়ার মুখাপেক্ষী।

মৃত ব্যক্তির জন্যেও দোয়া করা উচিত। তার মর্যাদা উন্নীত হওয়ার জন্যে আর তিনি যদি কোন অপরাধ করে থাকেন তাহলে তার অপরাধ ও পাপ ক্ষমার জন্যে এবং তার ভবিষ্যতে বংশধরদের জন্যে দোয়া করা উচিত।

মৃত ব্যক্তির নামে কুলখানী, কুরআনখানী, ফাতেহাখানী, চল্লিশা, খতমে কুরআন প্রভৃতি বৈধ নয়। এগুলো বিদাত। বরং তার নামে দোয়া, ইস্তেগফার, সদকা-খয়রাত প্রভৃতি করলে বা গরীবদের খাবার খাওয়ালে এর পুণ্য থেকে তার লাভ হয়।

কবরে যিনি শুয়ে আছেন যদি তিনি বুর্যুর্গ হন বা সাধারণ লোকও হন তবুও তার কাছে কিছু চাওয়া, কামনা করা সম্পূর্ণ নিয়েধ। কেননা, তার রূহ কবজ হয়ে গেছে, আমল বন্ধ হয়ে গেছে। তার আর কোন কিছু করার নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজকাল মায়ারে গিয়ে এটাই বেশির ভাগ করা হয়ে থাকে। কবরে চুমু দেয়া, সিজদা করা সম্পূর্ণ নিয়েধ। (ফিকাহ আহমদীয়া, পৃ. ২৫৭-২৬৬)।

ইস্তিসকার নামায

প্রয়োজনের সময় কিংবা ঠিক সময়মত বৃষ্টি না হলে অথবা বৃষ্টির অতিরিক্ত প্রয়োজন দেখা দিলে আল্লাহ তাঁলার ফযল ও দয়া আকর্ষণের জন্যে খোলা ময়দানে বা-জামাত এ নামায পড়তে হয়। এ নামায দু’রাকা’ত। এতে আযান বা ইকামত নেই। ইমাম উচ্চকণ্ঠে

কিরাত পড়ে দু'রাকা'ত নামায আদায় করবেন। এরপর সবাই কিবলামুখী হয়ে দু'হাত উর্ধ্বে তুলে খুব জোরে জোরে, আবেগ উঞ্চিত কঢ়ে নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করবেন-

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغْيِثًا مَرِيًّا مَرِيًّا فَاعْغِيْرْ صَارِعَ جَاهِلَ -
اللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَ اسْنُرْ رَحْمَتَكَ وَ احْسِنْ بَدْكَ الْمَيْتَ ط
اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا -

(আল্লাহুম্মাসকিনা গায়সাম্ মুগীসান মারীয়ান মারীয়ান নাফি'আন গায়রা যার্রিন আজি-লান গায়রা আজিলিন। আল্লাহুম্মাস্কি ইবাদাকা ওয়া বাহায়িমাকা ওয়ানশুর রাহমাতাকা ওয়া আহ্যি বালাদাকাল মাইয়িতা। আল্লাহুম্মাসকিনা আল্লাহুম্মাসকিনা আল্লাহুম্মাসকিনা) অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে মুষলধারে বৃষ্টির পানি দান কর। এমন পানি যা আমাদের সকল ভয়-ভীতি ও হতাশাকে দূরীভূত করে, এমন পানি যা উপকারী, ক্ষতিকারক নয়। (সেই পানি যেন) দ্রুত আসে, বিলম্বে যেন না আসে। হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দাগণকে এবং তোমার সকল জীব-জন্মকে পানি পান করাও এবং তোমার রহমতকে বিস্তৃতি দান কর আর এ মৃত শহরকে পুনরায় সংশ্লিষ্ট কর। হে আল্লাহ! আমাদেরকে পানি পান করাও। হে আল্লাহ! আমাদেরকে পানি পান করাও। হে আল্লাহ! আমাদেরকে পানি পান করাও।

[শব্দার্থ: আল্লাহুম্মাসকিনা গায়সাম্ মুগীসান- হে আল্লাহ! আমাদেরকে মুষলধারে বৃষ্টির পানি দাও, মারী'আন- (এমন পানি যা) আমাদের হতাশা দূর করে, সব কিছু সবুজ শ্যামল করে, নাফিয়ান- (সেই পানি) কল্যাণজনক হয়, গায়রা যার্রিন- (কারো জন্যে) ক্ষতিকারক না হয়, আজিলান- (সেই পানি যেন) দ্রুত আসে, গায়রা আজিলিন- বিলম্বে না আসে, আল্লাহুম্মাসকি ইবাদাকা- হে আল্লাহ! পান করাও তোমার বান্দাগণকে, ওয়া বাহায়িমাকা- এবং তোমার সব জীব-জন্মকে, ওয়ানশুর রাহমাতাকা- এবং তোমার রহমতকে তুমি ছড়িয়ে দাও, ওয়া আহ্যি বালাদাকাল মাইয়িতা- এবং তুমি তোমার এ মৃত শহরে জীবন সঞ্চারিত করে দাও, আল্লাহুম্মাসকিনা- হে আল্লাহ! আমাদেরকে পানি পান করাও]

দোয়ার পর মহানবী (সা.) নিজের চাদর উল্টিয়ে দিয়ে খোদা তাঁলার কাছে এ দোয়া করতেন- ‘তুমি এভাবেই আকাশ ও পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন করে দাও’। এছাড়া রসূল করিম (সা.) কখনও-কখনও এ নামাযের আগে কিংবা পরে খুতবাও প্রদান করতেন।

ইশ্রাকের নামায

সূর্য উঠার পর হতে বেলা এক প্রহর বা ৩ ঘন্টা তথা এক বর্ষা পরিমাণ সূর্য উঠা পর্যন্ত এ নামাযের ওয়াক্ত বা সময়। এ নামায দুই বা চার রাকাত পড়তে হয়। এটা নফল—অর্থাৎ, অতিরিক্ত নামাযের অন্তর্ভুক্ত।

চাশ্তের নামায

ইশ্রাকের নামাযের কিছুক্ষণ পর হতে দ্বি-প্রহর হওয়ার কিছু পূর্ব পর্যন্ত এ নামাযের ওয়াক্ত। দুই বা চার রাকাত এ নামায পড়তে হয়। এ নামায নফলের অন্তর্ভুক্ত। এ নামাযকে সালাতুর্য ঘোষণা বলা হয়।

আওয়াবীন নামায

মাগরিব নামাযের পর এবং এশার নামাযের পূর্বে ৬ রাকাত নফল নামায পড়া হয় একে সালাতুল আওয়াবীন বলা হয়ে থাকে। এ নামাযও নফল নামাযের অন্তর্ভুক্ত।

সালাতুল হাজত

কোন মুশকিলের সম্মুখীন হলে বা দুনিয়াবী কোন প্রকার প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী হলে অথবা বিশেষ কোন অভাব পূরণের জন্যে এ নফল নামায পড়তে হয়। এ নামায দু' রাকাত। নামাযে বেশি বেশি হামদ, সানা ও দুরুদ এবং নিম্নবর্ণিত দোয়াটি পাঠ করা উচিত। উল্লেখ্য, কুরআনের দোয়া ছাড়া সব দোয়াই সিজদা এবং রংকুতে পড়া যায়। এখানে অভাব মুক্তির একটি দোয়া দেয়া হলো—

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ ۖ سَبَّحَ اللَّهُ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۖ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَلَمِينِ ۖ أَسْأَلُكَ مُؤْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَّىْمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيَّةَ مِنْ كُلِّ
بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ ۖ لَا تَذْعُ لِي زَنْبِي إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هُمَا إِلَّا فَرَجَتْهُ وَلَا
حَاجَةٌ هِيَ لَكَ رَضَا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۖ

(লা) ইলাহা ইলাহাত্তুল হালীমুল কারীম। সুবহানাল্লাহি রাবিল আরশিল আয়ীম ওয়াল হামদুল্লাহি রাবিল আলামীন। আস্তালুকা মুওজিবাতি রাহমাতিকা ওয়া আযাইমা মাগফিরাতিকা ওয়াল গানিমাতা মিনকুল্লি বিরারিন ওয়াস্স সালামাতা মিনকুল্লি ইসমিন। লা তাদ'উলি যামবান ইল্লা গাফারতাহ ওয়া লা হাম্মান ইল্লা ফাররাজতাহ ওলা হাজাতানহিয়া।

লাকা রায়ান ইল্লা কায়াইতাহা ইয়া আরহামার রাহিমীন)

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি পরম সহিষ্ণু, অতীব দয়ালু, আল্লাহ পবিত্র, মহান আরশের প্রভু। সব প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক। (হে এ সব গুণের অধিপতি আল্লাহ!) আমি তোমার নিকট সেসব কাজের তৌফিক চাচ্ছি যেগুলো তোমার রহমতের উপকরণ এবং তোমার মাগফিরাতকে (ক্ষমা) নিশ্চিত করে এবং সবরকম অতিরিক্ত পুণ্য ও সবরকম পাপ হতে নিরাপত্তা কামনা করি। হে সর্বাধিক করুণাকারী! তুমি আমার কোন পাপ ক্ষমা না করে ছেড়ে না, আমার কোন চিন্তা দূরীভূত না করে ছেড়ে না এবং আমার কোন প্রয়োজন যা তোমার সন্তুষ্টির কারণ হতে পারে, পূর্ণ না করে ছেড়ে না।

(শব্দার্থ: হালীমুল কারীম- পরম সহিষ্ণু, পরম দয়ালু, সুবহান- পবিত্র, রাবু- প্রভু-প্রতিপালক, আ'রশিল আয়ীম- মহান আরশ, আস্তালুকা- আমি তোমার কাছে চাচ্ছি, মুজিবাতি রাহমাতিকা- তোমার রহমতের উপকরণ, আ'যাইমি মাগফিরাতিকা- তোমার ক্ষমার নিশ্চয়তা, আল গানীমাতা মিন কুল্লি বিরারিন- সবরকম অতিরিক্ত পুণ্য, ওয়াস্স সালামাতা মিন কুল্লি ইসমিন- সবরকম পাপ থেকে নিরাপত্তা, না তাদ'উলি যামবান ইল্লা গাফারতাহ- আমার কোন পাপকে ক্ষমা না করে ছেড়ে না, ওয়া লা হাস্মান ইল্লা ফাররাজতাহ- কোন চিন্তা দূরীভূত না করে ছেড়ে না, ওয়া লা হাজাতান ইল্লা ক্ষায়াতাহা- এবং এমন কোন প্রয়োজন যা তোমার সন্তুষ্টির কারণ হতে পারে পূর্ণ না করো ছেড়ে না, ইয়া আরহামার রাহিমীন- হে সর্বাধিক করুণাকারী)

বিবাহের খুতবা

বিবাহের মজলিসে উপস্থিত সকলের সামনে দাঁড়িয়ে নিম্নলিখিত খুতবা পাঠ করতে হয়:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكّلُ عَلَيْهِ وَ
 نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْبِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ
 وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
 لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ
 الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نُفُسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلَ عَنْ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۖ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۗ يُضْلِعُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَ
يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۚ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَنْتَرُنَفْسًا مَا قَدَّمْتُ لَغِدِيِّ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

(আলহামদু লিল্লাহি নাহ্মাদু ওয়া নাস্তাস্টুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়ানু'মিনুবিহী
ওয়ানাতাওয়াক্কালু আলায়হি ওয়া নাউয়ু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়ামিন
সাইয়েত্তেআতি আমালিনা মাইয়্যাহ্ডিহিল্লাহু ফালা মুয়িল্লালাহু ওয়া মাইয়্যেলিল্লাহু ফালা
হাদিয়া লাহু । ওয়া নাশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাহু ওয়াহাদু লা শারীকা লাহু ওয়া
নাশহাদু আল্লা মুহাম্মাদ আ'বদু ওয়া রাসূলু । আমা বাঁদু ফা'আউয়ু বিল্লাহি মিনাশ
শায়তনির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ।

ইয়া আইয়ুহান্নাসুত্তাকু রাবরাকুমুল্লায়ী খালাফ্তাকুম মিনাফসিঁও ওয়াহিদাতিন ওয়া
খালাকা মিনহা যাওজাহা ওয়া বাস্সা মিনহুমা রিজালান কাসীরাওঁ ওয়া নিসাআ,
ওয়াত্তাকুল্লাহাল্লায়ী তাসাআলুনা বিহী ওয়াল আরহাম, ইল্লাহাহা কানা আলায়কুম রাকীবা ।
ইয়া আইয়ুহান্নায়ীনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়া কুলু কাওলান্ সাদীদা ইয়ুসুলিহ লাকুম
আমালাকুম ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম ওয়ামাইয়ুতি'ইল্লাহা ওয়া রাসূলু ফাকুদ
ফায়া ফাওয়ান আয়ীমা ।

ইয়া আইয়ুহান্নায়ীনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়ালতানযুর নাফসুম মা কুদামাত লিগাদ,
ওয়াত্তাকুল্লাহা ইল্লাহাহা খাবীরুম বিমা তাঁমালুন)

অর্থ: সব প্রশংসা আল্লাহর । আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি,
তাঁর কাছে আমরা ক্ষমা ভিক্ষা করি, তাঁর প্রতি ঈমান আনি, তাঁর ওপরই ভরসা রাখি ।
আমরা আমাদের নফস বা প্রবৃত্তির কুপ্রোচনা হতে এবং নিজেদের খারাপ কাজ হতে
আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি । আল্লাহ যাকে সৎপথ দেখান তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে
পারে না, এবং আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন, তাকে কেউ হেদায়াত দান করতে
পারে না ।

আর আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি এক অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমরা আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল।

এরপর আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহর নামে (আরঙ্গ করছি) যিনি পরম করণাময়, অ্যাচিত-অসীম দানকারী, বারবার কৃপাকারী।

“হে মানবমন্ত্রী! তোমরা তোমাদের প্রভুর তাকওয়া অবলম্বন কর, যিনি তোমাদেরকে একই আত্মা হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন, আর তাদের উভয় হতে বহু নর ও নারী বিস্তার করেছেন, এবং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যাঁর দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে আবেদন কর, এরপে রক্তসম্পর্কের আত্মীয়তার বন্ধনের ক্ষেত্রেও (তাকওয়া অবলম্বন কর)। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষণকারী।” (সূরা নিসা: ২)

“হে যারা ঈমান এনেছে! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সহজ সরল কথা বল। তাহলে আল্লাহ তোমাদের কাজকে সংশোধিত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে চলবে সে নিশ্চয় মহা সফলতা লাভ করবে।” (সূরা আহ্মাব: ৭১-৭২)।

“হে যারা ঈমান এনেছো! তোমার আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং প্রত্যেককেই চিন্তা করে দেখা উচিত, আগামীকালের জন্য সে অগ্রে কি প্রেরণ করেছে। এবং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। তোমরা যে কর্মই কর, সে সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ সবিশেষ খবর রাখেন।” (সূরা হাশর: ১৯)।

বিয়ে-শাদীর কাজে তাড়াহড়ো করা ঠিক নয়। উল্লেখিত আয়াতসমূহে বারবার তাকওয়া বা খোদাভীতির কথা বলা হয়েছে। সুতরাং খোদাভীতিকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দান করে বিয়ের সমন্বয় স্থির ও বিবাহ কার্য সমাধা করা বাস্তুনীয়। সমন্বয় স্থির করার পূর্বে ইস্তিখারা করে নেয়া উত্তম। বিবাহের সাথে নিম্নলিখিত বিষয়াদি ছাড়া অন্যান্য প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানাদির সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। এগুলো বিদাত এবং আহমদীদের এ থেকে বিরত থাকতে হবে। মসজিদ বা অন্য কোন সুবিধামত স্থানে জামাতের আমীর, প্রেসিডেন্ট, মুরুরী অথবা মোয়াল্লেম বা অন্য কোন স্থানীয় ব্যক্তি বিবাহের এলান (ঘোষণা) করবেন। যথারীতি জামাত কর্তৃক নির্ধারিত বিয়ের ৪ কপি ফরম পূরণ করতে হবে। বিয়ের এলানের পূর্বে জামাত কর্তৃক নির্ধারিত বিয়ের ফরম যথাযথভাবে পূরণ হয়েছে কিনা, ছেলে-মেয়ের স্বাক্ষর আছে কিনা তা দেখে নিতে হবে। দেশের আইন অনুযায়ী বিয়ে রেজিস্ট্রি করতে হবে। পাত্র পক্ষ সামান্য খোরমা বা মিষ্টি দ্রব্যের ব্যবস্থা করবেন। নববধূকে স্বামী গৃহে নিয়ে গেলে দাওয়াতে ওলীমা বা বৌভাত করা সুন্নত। এ ব্যাপারে সব খরচাদি পাত্রপক্ষকে বহন করতে হবে।

মোহরানা

মোহরানা এক প্রকারের দেনা এবং অবশ্য পরিশোধযোগ্য। (সূরা নিসা : ৫ ও ২৫ নং আয়াত)। সম্ভব হলে বিবাহের সময় এটা স্ত্রীকে দিতে হয় নচেৎ পরে স্ত্রীর সম্মতিক্রমে যথাসম্ভব শীত্র দেয়া বিধেয়। মোহরানা আদায়ের পূর্বে স্ত্রী মারা গেলে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হয়ে এটা উত্তরাধিকারীদের মাঝে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী বণ্টন করতে হবে। স্বামীও উত্তরাধিকার হিসাবে তার নির্ধারিত অংশ পাবে। অবশ্য স্ত্রী খুশি হয়ে ষেচ্ছায় মোহরানা মাফ করে দিলে তা পরিশোধের প্রশ্ন আর উঠে না। (সূরা নিসা : ৫)। কিন্তু জবরদস্তি করে মাফ নেয়া শরীয়তবিরোধী। মোহরানার পরিমাণ নির্ধারণ সম্বন্ধে শরীয়তে ধরা-বাঁধা কোন নিয়ম নেই। তবে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের রেওয়াজ অনুযায়ী, মোহরানার সর্বোচ্চ পরিমাণ পাত্রের দু'বছরের আয়। যেহেতু ইসলাম পুরুষকে চার স্ত্রী রাখার অধিকার দিয়েছে, সেজন্যে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে সাধারণত বিবাহকালীন প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য পাত্রের ৬ মাসের রোজগারের পরিমাণ টাকা মোহরানা হিসেবে নির্ধারণ করার ব্যবস্থা রেখে এক স্ত্রীর জন্য ৬ মাসের আয়ের পরিমাণ মোহরানা ধার্য করা যেতে পারে। যেখানে পাত্রের কোন সম্পত্তি বা আয় নেই, সেখানে মোহরানার পরিমাণ ধার্য করা যেতে পারে না, সেক্ষেত্রে স্বামী পরবর্তী সময়ে উপার্জনশীল হলে স্ত্রীকে প্রচলিত জামাতী প্রথা অনুযায়ী মোহরানা দিতে বাধ্য থাকবে।



ত্রৃতীয় পরিচ্ছেদ

রোয়া (সিয়াম)

ইসলামী ইবাদতের গুরুত্বপূর্ণ রোকন বা স্তুতি হলো সিয়াম বা রোয়া পালন। চান্দ্র বছরের নবম মাসের নাম রম্যান। রম্যান মাসের নাম পূর্বে ছিল ‘নাতেক’ (তফসীর গ্রাহ্য- ফাতহ আল-কাদীর)। রম্যান শব্দটি ‘রম্য’ মূল ধাতু হতে এসেছে। এর অর্থ পিপাসায় উত্তপ্ত হওয়া। হ্যারত মসীহ মাওউদ (আ.) এ সম্বন্ধে বলেছেন, “আরবী ভাষায় সুর্যের তাপকে রম্য বলা হয়। যেহেতু রম্যান মাসে রোয়াদার পানাহার ও যাবতীয় দৈহিক ভোগ-বিলাস হতে বিরত থাকে এবং আল্লাহর আদেশসমূহ পালন করার উদ্দেশ্যে নিজের প্রাণে ব্যগ্রতার তাপ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, সেজন্য এ আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক উভয় প্রকার তাপের সহমিশ্রণে রম্যান হয়েছে। আভিধানিকগণ বলে থাকেন, রম্যান গ্রীষ্মকালে এসেছিল বলে একে ‘রম্যান’ বলা হয়েছে। আমার মতে এ ধারণা ঠিক নয়। কেননা আরব দেশের জন্যে এতে কোন বিশেষত্ব থাকতে পারে না। আধ্যাত্মিক তাপের অর্থ আধ্যাত্মিক অনুরাগ ও দর্শ-কর্মে উদ্দীপনা। ‘রম্য’ এমন উত্তাপকেও বলা হয় যাতে পাথর প্রভৃতি পদার্থ উত্তপ্ত হয়।” (আল হাকাম, ২৪ জুলাই, ১৯০১ইং)।

রম্যান মাসের নামকরণের কারণসমূহ:

- (ক) এ মাসে রোয়া রাখার ফলে পিপাসার জন্যে উত্তাপ ও দহনের সৃষ্টি হয়।
- (খ) এ মাসের ইবাদতসমূহ মানুষের দেহ হতে পুঞ্জীভূত সূক্ষ্ম পাপরাশিকে দূরীভূত করে।
- (গ) এ মাসের ইবাদতসমূহ মানুষের হস্তয়ে এমন এক ভালোবাসা এবং অনুরাগের উত্তাপ সৃষ্টি করে যাতে সে ঐশ্বীপ্রেম ও মানবপ্রেমের দীক্ষা লাভ করতে সক্ষম হয়। (তফসীরে

সগীর, সুরা বাকারার ১৮৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

হ্যরত রসূল করিম (সা.)-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের দিতীয় বছর মুসলমানদের ওপর রমযানের রোয়া ফরয করা হয়। রমযানের ইতিহাস, নিয়ম-কানুন, উদ্দেশ্য এবং আদর্শ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'লা কুরআন করীমে সুরা বাকারার ২৩ নং রূক্তে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। রমযানুল মোবারকের কতগুলো বিশেষত্ব নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

১) রোয়ার হাকীকত (তাৎপর্য):

হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.) রোয়ার হাকীকত বা তাৎপর্য সম্বন্ধে লিখেছেন “অল্ল আহার এবং ক্ষুধা সহ্য করাও আত্মশুদ্ধির জন্য আবশ্যক। এতে দিব্যদর্শন শক্তি- অর্থাৎ, কাশকী শক্তি বৃদ্ধি পায়। মানুষ শুধু খাদ্য গ্রহণ করে বাঁচে না। যে অনন্ত জীবনের প্রতি দৃষ্টি দেয়া একেবারেই পরিত্যাগ করে, সে নিজের ওপর ‘ঐশ্বী কোপ’ (কহরে ইলাহী) আনয়ন করে। কিন্তু রোয়াদারকে লক্ষ্য রাখতে হবে, রোয়ার অর্থ শুধু এটা নয়, মানুষ অনাহারের থাকবে। বরং খোদার যিকর- অর্থাৎ, তাঁর স্মরণে ব্যস্ত থাকা উচিত। মহানবী (সা.) রমযান মাসে অনেক বেশি ইবাদত করতেন। এ দিনগুলোতে পানাহারের চিন্তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ তা'লার প্রতি মনোনিবেশ করা দরকার। দুর্ভাগ্য সেই ব্যক্তির, যে দৈহিক প্রয়োজনে খাদ্য গ্রহণ করে, কিন্তু আধ্যাত্মিক খাদ্যের প্রতি উক্ষেপ করে না। বাহ্যিক খাদ্যে দৈহিক শক্তি লাভ হয়। একইভাবে আধ্যাত্মিক খাদ্য আত্মাকে কায়েম রাখে এবং এতে আত্মার শক্তিগুলো সতেজ হয়। খোদার কাছে সাফল্য চাও। কারণ তিনি সামর্থ্য দিলেই সব দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাবে।”

আহারে দেহ শক্তিশালী হয় এবং রোয়ার মাধ্যমে অনাহারের ফলে আত্মা শক্তিশালী হয়। জড় অনাহারকে যিকরে ইলাহী দিয়ে পূরণ করতে হয়। কারণ যিকরে ইলাহী আত্মার খোরাক। জড়খাদ্য ও তোগবিলাসে আত্মা মৃতবৎ হয়ে যায় এবং রোয়ার মাধ্যমে যিকরে ইলাহীতে আত্মা জাহাত, সতেজ ও ঐশ্বী শক্তিতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.) আরো বলেছেন-

“কেবল অভুক্ত এবং পিপাসার্ত থাকাই রোয়ার উদ্দেশ্য নয়, বরং এর একটি তাৎপর্য এবং প্রভাব আছে যা অভিজ্ঞতায় বোঝা যায়। মানুষের প্রকৃতির মাঝেই এটা নিহিত আছে যে, মানুষ যত কম খায় ততই তার আত্মশুদ্ধি এবং দিব্যদর্শন শক্তি বৃদ্ধি পায়। খোদার অভিপ্রায় এটাই, একটি খাদ্যকে কম করে অপর একটি খাদ্যকে বর্ধিত করা। রোয়াদারের সবসময়ই এর প্রতি দৃষ্টি দেয়া কর্তব্য। খোদা তা'লার যিকর বা স্মরণেই সময় কাটানো উচিত যেন সংসারের মোহ দূর হয় এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করা যায়। অতএব রোয়ার উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন এক খাদ্য ত্যাগ করে অন্য খাদ্য গ্রহণ করে। রোয়া আত্মার প্রশান্তি এবং তৃষ্ণির কারণ হয়। যে লোক শুধু খোদার জন্যেই রোয়া রাখে

এবং তার রোয়া কোন আচার-অনুষ্ঠানের রোয়া হয় না, তার উচিত সে যেন সারাক্ষণ হামদ (প্রশংসা কীর্তন), তসবীহ (আল্লাহর পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা) এবং তাহলীলের (আল্লাহর তৌহীদ ঘোষণা) মাঝে নিজেকে নিয়োজিত রাখে, যাতে তার দ্বিতীয় খাদ্যের (আধ্যাত্মিক খাদ্যের) সৌভাগ্য লাভ হয়।” (আল হাকাম: ১৭/০১/১৯০৭ ইং)

আল্লাহ তা'লার খাবারের প্রয়োজন হয় না। আমরা রোয়া রেখে অনাহারে থেকে যেমন আল্লাহ তা'লাকে অনুসরণ করি, তেমনি যিকরের মাধ্যমে তাঁর গুণাবলীকে স্মরণ করে সেগুলোকেও আমাদের চরিত্রে নকল ও প্রতিফলিত করার সুযোগ দানই হলো রোয়ার বিধানের উদ্দেশ্য। ঐশ্বী বিধানসম্মত রোয়া মানুষকে ঐশ্বী রঙে রঙিন করে। হ্যরত রসূল করিম (সা.) বলেছেন, “আল্লাহ তা'লা বলেন, ‘প্রত্যেক পুণ্যের জন্য আমি কোন না কোন বক্তৃর আকারে পুরস্কার নির্ধারিত করেছি। কিন্তু রোয়া আমারই জন্য এর রোয়ার পুরস্কার আমি স্বয়ং।’” এর অর্থই হচ্ছে, সফল রোয়াদারের মাধ্যমে আল্লাহ তা'লা স্বীয় জ্যোতি ও শক্তির বিকাশ করে থাকেন।

হ্যরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) রোয়ার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন: “আমাদের দেহে দৈনিক যে রুহানী বিষ সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্য আল্লাহ তা'লা একটি ব্যবস্থা করেছেন এবং সারা বছর যে বিষ জমা হয় তা দূর করার জন্যে আরও একটি ব্যবস্থা করেছেন। অর্থাৎ, দৈনিক যে আধ্যাত্মিক বিষ সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্যে তিনি দৈনিক পাঁচবারের নামাযের ব্যবস্থা করেছেন এবং সারা বছর যে বিষ জমা হয় তা দূর করার জন্যে রম্যানে এক মাসের রোয়া রাখার ব্যবস্থা করেছেন। রোয়া না রাখার ফলে বছরব্যাপী পুঁজীভূত বিষ বাঢ়তেই থাকে এবং এর ফলে সেই ব্যক্তির মাঝে এরূপ কাঠিন্য এবং এরূপ দৃষ্টিহীনতার সৃষ্টি হয় যে খোদা তা'লা তার সামনে এলেও তাকে সে চিনতে পারে না। যেমন কোন ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি হারালে তার অত্যন্ত নিকটাত্মীয় সামনে এসে দাঁড়ালেও সে তাকে দেখতে পারে না। অনেকে মনে করে, তারা রোয়া রেখে খোদার প্রতি অনুগ্রহ করেছে। এরূপ মনে করার মত নির্বুদ্ধিতা আর কিছুই নেই। চিকিৎসক কোন রংগীর চিকিৎসার প্রয়োজনে রক্তক্ষরণ করালে যদি সে রংগী মনে করে যে, সে রক্ত দিয়ে ডাঙ্গারের বড়ই উপকার করেছে, তাহলে তার চেয়ে বড় মূর্খ আর কে আছে? ঔষধ যতই তিক্ত হোক তা রংগীর জন্যে কল্যাণজনক। তদ্রূপ যখন কেউ রম্যান মাসে রোয়া রাখে, তখন সে খোদা তা'লার উপর অনুগ্রহ করে না; বরং এটা তার উপর খোদা তা'লার অনুগ্রহ যে, তিনি এরূপ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সুতরাং এ মাসের প্রতি সম্মান দেখানো আমাদের বিশেষ কর্তব্য। আমরা এই দিনগুলোকে যত বেশি সন্দেহবহার করবো, আমাদের অন্তরের পুঁজীভূত বিষ ততই দূর হয়ে যাবে, যেগুলো ভিতরে ভিতরে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনকে নষ্ট করে দিচ্ছিল।” (দৈনিক আল ফযল: ১৯/১২/১৯৬৫ ইং)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) রম্যানের ইবাদত সম্বন্ধে বলেন:

“মাহে রম্যান পাঁচটি ইবাদতের সমষ্টি। প্রথমটি হলো রোয়া রাখা। দ্বিতীয়: ফরয নামায ছাড়াও রাত্রি জাগরণ— অর্থাৎ, রাত্রে নফল ইবাদতসমূহ (তারাবীহ, তাহজুদের নামায ইত্যাদি) আদায় করা এবং বিনয়ের সাথে নিজ প্রভুর কাছে সব ধরনের মঙ্গল কামনা করা। তৃতীয়: বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা। চতুর্থ: দান-খয়রাত করা এবং পঞ্চম: প্রবৃত্তির কুপরোচনা হতে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করা।

২) রোয়ার ঐতিহাসিক দিক:

يَا يَهُا الَّذِينَ امْنَوْا كَتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ تَسْقُونَ ﴿١﴾

(ইয়া আয়হাল্লায়ীনা আমানু কুতিবা আল্লায়কুমুস সিয়ামু কামা কুতিবা আল্লায়ীনা মিন কাবলিকুম লাল্লাকুম তাভাকুন)

অর্থ: হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের ওপর রোয়া বিধিবদ্ধ করা হলো, যেরূপে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের ওপর এটা বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। (সূরা বাকারা: ১৮৪)।

রোয়াকে ফরয করার সাথে-সাথে আল্লাহ তাল্লা ঐতিহাসিক এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক সম্বন্ধেও ইঙ্গিত করে বলেছেন, এ রোয়ার নির্দেশ কোন অভিনব ব্যাপার নয় এবং এতে কোন অসহ্যনীয় কষ্টও নেই। ধর্মের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, বিশ্বের সব ধর্মেই রোয়া অবশ্যপালনীয় ব্যবস্থা ছিল। হযরত মূসা (আ.)-এর অনুবর্তিতায় ইহুদীরা রোয়া পালন করে। বাইবেলে হযরত মূসা (আ.) সম্বন্ধে লিখিত আছে, “সেই সময় মোশী (মূসা) চালিশ দিবারাত্রি সেখা সদা প্রভুর সাথে অবস্থান করলেন, পানাহার করলেন না। আর তিনি সেই দুই প্রত্নে নিয়মের বাক্যগুলো— অর্থাৎ, দশ আজ্ঞা লিখলেন।” (যাত্রা পুন্তক, ৩৪:২৮)

হযরত ঈসা (আ.) রোয়া রাখতেন এবং তাঁর অনুবর্তিতায় খ্রিস্টানরা রোয়া পালন করে। ইঞ্জিলে আছে, “তখন যীশু দিয়াবল (শয়তান) দ্বারা পরীক্ষিত হবার জন্যে আত্মা দ্বারা প্রাপ্তরে নীত হলেন। আর তিনি চালিশ দিবারাত্রি অনাহারে থেকে শেষে ক্ষুধার্ত হলেন।” (মথি, ০৪ : ২-৩)। এভাবে দেখা যায়, মিশরীয়দের মাঝেও রোয়ার প্রচলন ছিল। গ্রীকরা রোয়া রাখতো এবং হিন্দু ধর্মেও উপবাসব্রত পালনের প্রচলন আছে। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকাতে FASTING শীর্ষক অংশে লেখা আছে: BY THE GREATER NUMBER OF RELIGION IN THE LOWER, MIDDLE AND HIGHER CULTURES ALIKE FASTING IS LARGEY PRESCRIBED. অর্থাৎ, সভ্যতার নিম্ন, মধ্য এবং উচ্চ পর্যায় নির্বিশেষে অধিকাংশ ধর্মেই উপবাসের (রোয়ার) প্রচলন রয়েছে। উল্লেখ্য, একমাত্র ইসলাম ধর্মই রোয়ার নিয়ম-কানুন এবং গুরুত্ব সম্বন্ধে পূর্ণসং নির্দেশনা

প্রদান করেছে এবং একে এক স্থায়ী ও নির্দিষ্ট রূপ দান করেছে।

৩) তাকওয়ার পথ:

রোয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো ‘লা’আল্লাকুম তাত্ত্বাকুন’ (সূরা বাকারাঃ: ১৮৪)- অর্থাৎ, রোয়ার বিধান এ জন্য দেয়া হয়েছে, রোয়া রেখে যেন রোয়াদারের মাঝে নিষ্ঠা এবং উত্তম চরিত্র জন্মে। সুতরাং কেউ যদি রোয়া রেখে এ ফল না পায়, তবে বুঝতে হবে, সে রোয়ার তাংপর্য বুঝেনি এবং সে সঠিকভাবে রোয়া পালন করেনি। প্রকৃতপক্ষে সে রোয়া রাখেনি, শুধু উপবাস ছিল এবং তার উপবাস থাকা আল্লাহহ তাঁলার অভিপ্রায় ছিল না। একজন বুদ্ধিমান, সাবালক এবং সুস্থ মুসলমান প্রভাত হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, যৌনসম্পর্ক, মিথ্যা, গালি-গালাজ, পরনিন্দা, পরচর্চা (গীবত) এবং সব ধরনের মন্দ কাজ হতে বিরত থাকে, এ সময়ে কুরআন পাঠ এবং এর অর্থ অনুধাবনে ব্রত থাকে, ফরয নামাযসহ তারাবীহ এবং তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে, দীন দরিদ্রের সেবা করে এবং ভক্তিপূর্ণ হাদয়ে যিকরে ইলাহী বা খোদার স্মরণে মশগুল থাকার চেষ্টা করে। কেবল এ সমুদয় বিষয় দ্বারা রোয়া এবং তাকওয়ার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অর্জন করা যায়। রম্যানের মহা বরকতপূর্ণ দিনগুলোতে রোয়াদারের চিত্ত এবং দেহের প্রতিটি অংশ কার্যত অনুভব করতে থাকে, তার মাঝে রোয়ার ফলে এক প্রকার বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। এভাবে রোয়ায় ইসলাহে নফ্স বা আত্মশুন্দি হয়ে থাকে।

৪) আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও দৈহিক সংযম:

প্রতি বছর রোয়া আমাদের কাছে ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণরূপে এসে থাকে। মাহে রম্যানে নির্দিষ্ট সময়ে রোয়া রাখতে হয়, নির্দিষ্ট সময়ে ইফতার করতে হয়, তারাবীহ এবং তাহাজ্জুদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। পিপাসা এবং ক্ষুধার জন্যে মানুষের অনুভব-শক্তি সতেজ হয়। ফলে তার বিবেক বুঝতে পারে, জাতির সেসব দরিদ্র এবং অনুভূত ব্যক্তিদের অবস্থা কিরূপ যাদের খাওয়ার পয়সা নেই। যেমন, এতীম এবং বিধবাদেরকে কত কী যে সহ্য করতে হয়। রোয়াদার যদি চেতনাশীল হয় তাহলে সে সহজে বুঝতে পারে, মানবতার কত বড় শিক্ষা রয়েছে এ রোয়ার মাঝে! সব শ্রেণীর লোকের মাঝে ঘনিষ্ঠতা, ঐক্য, সাম্য, প্রেম, হৃদয়তা, শৃংখলাবোধ, পরিশ্রম, কষ্টসহিষ্ণুতা, অনুবর্তিতা, উত্তম ব্যবহার, সৌজন্য, সংযম এবং সর্বোপরি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের প্রচেষ্টা- এসব বিষয়ের জন্যে মাহে রম্যানে পবিত্র সাধনা এবং বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ রোয়ার মাধ্যমে মিথ্যা, অহংকার, স্বেচ্ছাচরিতা, প্রবৰ্থনা, মিথ্যাবাদিতা, অপব্যয়, নেশাপ্রিয়তা, পাষাণচিত্ততা, নিলজ্জতা ইত্যাদি কদাচারণসমূহ সমাজদেহ হতে বিদ্রোত হয়ে শুধু ব্যক্তি চরিত্রাই নয়, জাতীয় চরিত্রেও উন্নতি সম্ভবপর হয়। কিন্তু রোয়া রেখে যদি অসৎ কাজ পরিহারের প্রচেষ্টা না থাকে এবং সংগৃহ অর্জনের উদ্যম না থাকে

তাহলে সেই রোয়া রাখা নির্থক ।

এ সম্পর্কে হয়রত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেছেন, “অনেক লোক ছেট-ছেট কষ্টে ভীত হয় । এ শ্রেণীর লোকও সারা মাস রোয়া রাখে এবং কষ্ট করে । এতে তারা প্রমাণ করে, তারা উপবাস করতে এবং এর কষ্ট সহ্য করতে সক্ষম । এরূপে তাদের কষ্ট স্বীকার করার অভ্যাস হয়ে যায় । অতএব এ শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, ধর্মের সেবার জন্যে অধিকতর উদ্যমী হওয়া আবশ্যিক এবং কষ্ট দেখে ভীত হওয়া উচিত নয় । লক্ষ্য করা উচিত, কাজ করার সংকল্প বা নিয়ত করা ও না করার মাঝে কত প্রভেদ রয়েছে । রমযান মাসে নিয়ত করা হয় যেন রোযাদার দিবাভাগে ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করে । কিন্তু অন্য সময়ে এ নিয়ত থাকে না বলে তখন দু' ঘন্টার ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করা যায় না । সুতরাং নিয়ত বা সংকল্পের দ্বারা বড়-বড় কাজ করা সম্ভব । অনুরূপভাবে আমাদের নিয়ত এবং সংকল্পকে এভাবে দৃঢ় করে নেয়া উচিত যেন আমরা খোদার ধর্ম প্রচারে কোন ত্রুটি না করি এবং ধর্মের বিষয়ে কোন কষ্টকে কষ্ট বলে মনে না করি ।” (দৈনিক আল্ফ্যল: ১২/২/১৯৬৪ ইং)

খোদার জন্যে এবং তাঁর ধর্মের জন্যে যাদের হৃদয়ে ভালোবাসা আছে এবং যারা শুধু দুনিয়ার ভালোবাসায় আত্মাহারা হয়নি তাদের জন্যে রমযানের ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং অনুপম সাধনার মাঝে এরূপ সংকল্প গ্রহণ করার মহান শিক্ষা রয়েছে ।

৫) রমযানে কুরআন পাঠের গুরুত্ব:

রমযানে কুরআন পাঠের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তাঁলা বলেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

(শাহীর রামায়নাল্লায়ী উন্ন্যিলা ফীহিল কুরআন)

অর্থাৎ, “রমযান সেই মাস যাতে অবতীর্ণ করা হয়েছে কুরআন ।” (সূরা বাকারাঃ: ১৮৬) রমযান মাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব হলো, এ পবিত্র মাসে কুরআন করিম নাযিল করা হয়েছিল । আর প্রতি বছর এ মাসে জীব্রাইল (আ.)-এর মাধ্যমে হয়রত মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে বছরের অন্যান্য সময়ে এবং পূর্বে যতখানি কুরআন অবতীর্ণ হতো, তা পুনরাবৃত্তি করা হতো । হয়রত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের শেষ বছরের রমযান মাসে হয়রত জীব্রাইল (আ.) তাঁর কাছে দু'বার প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত কুরআন করিম আবৃত্তি করেন । (বুখারী) । এতে তিনি বুরতে পারেন, কুরআন করিম নাযিল সমাপ্ত হয়েছে ।

এ পবিত্র মাসে রোযার কল্যাণ, আজ্ঞানুবর্তিতা এবং কুরআন পাঠ- এসব ইবাদত একত্রে মানবচিত্তে এক আশ্চর্য আধ্যাত্মিক অবস্থা সৃষ্টি করে । মহানবী (সা.) বলেন, “রমযান ও কুরআন বান্দার জন্যে সুপারিশ করবে । রোয়া বলবে, ‘খোদা! আমি তাকে পানাহার

এবং কৃপ্তবৃত্তি হতে নিবৃত্ত রেখেছি, তাই তুমি তার জন্যে আমার সুপারিশ করুল কর।’ কুরআন বলবে: ‘আমি তাকে রাত্রে নিদা হতে বিরত রেখেছি এবং তাকে ঘুমাতে দেইনি, এ কারণে তার জন্যে আমার সুপারিশ করুল কর।’ তাদের সুপারিশ করুল করা হবে।’ (বায়হাকী)

রোয়া রেখে কুরআন করিম পাঠ করা, এর অর্থ বুঝতে চেষ্টা করা এবং এর অনুশাসনাদি পালন করার মাধ্যমে মানুষের আধ্যাত্মিক দর্শনশক্তি সতেজ হয়। সে শয়তানি চিন্তাভাবনা ও প্রভাব হতে নিরাপদ থাকে। অধিকস্তু মানুষ এক অনাবিল আধ্যাত্মিক প্রশাস্তি এবং পরম সম্পদ লাভ করে— যা শুধু অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই উপলব্ধি করা যায়, ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

সুনিয়ন্ত্রিত সুখাদ্য যেমন দেহকে সুস্থ, সবল ও আনন্দময় করে, তেমনি সুনিয়ন্ত্রিত ইসলামী রোয়া আত্মাকে সুস্থ, সতেজ ও উর্ধ্বরূপামী করে। বস্তুত মাহে রমযানের পৰিত্র দিনগুলো বড়ই বরকতপূর্ণ। যে নিতান্তই দুর্ভাগ্য এবং অপরিণামদশী, একমাত্র সে-ই এ কল্যাণ হতে নিজেকে বঞ্চিত রাখে এবং অন্যান্য দিনের মতই পানাহারে মন্ত থাকে।

৬) আল্লাহর নৈকট্য এবং দোয়া করুণিয়ত:

রোয়ার মাধ্যমে বান্দার হৃদয় যখন বিগলিত হয় এবং তার পার্থিব লালসাঙ্গুলো স্তমিত হয়ে আসে, তখন তার আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহ বিকাশ ও পরিবর্ধন লাভ করতে থাকে এবং তার আত্মা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠে। বান্দার এ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'লা বলেন:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادٌ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دُعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ^۱ فَلَيْسَتِّجِيْوَالِ
وَلَيُؤْمِنُوا بِّ لَعَلَّهُمْ يَرْسَدُونَ^۲

(ওয়া ইয়া সাআ-লাকা ইবাদী আল্লী ফাইনি কারীব, উজীবু দাঁওয়াতাদ্দাঁয়ি ইয়া
দা'আনি, ফাল ইয়াসতাজীবু লী ওয়াল ইউমিনু বী লা'আল্লাহুম্ ইয়ারগুন)

অর্থ: “এবং আমার বান্দাগণ আমার সমন্বে তোমাকে যখন জিজেস করে তখন (বল যে) আমি নিকটেই আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপর ঈমান আনে যাতে তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়।” (সুরা বাকারা: ১৮৭)।

আল্লাহ তা'লা প্রতি পূর্ণ আস্তা রেখে তাঁর বিধান অনুযায়ী রোয়া রাখলে দোয়া করুল হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'লা বান্দার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। সেজন্যে কোন বিপদ আপনে পড়লে এ আদেশের অনুশীলনে রোয়া রেখে দোয়া করলে বিপদ কেটে যায়।

৭) হারাম জিনিস পূর্ণরূপে বর্জনের শিক্ষা:

মাহে রময়ানে মুসলমানরা আল্লাহ্ তালার নির্দেশে সাময়িকভাবে হালাল খাদ্য-বস্তু এবং কামনা-বাসনাকে পরিহার করে। তাদের হাতের কাছে উপভোগ্য সব বস্তু থাকা সত্ত্বেও তারা সেগুলো ভোগ করে না। একমাস ধরে এ সাধনার ফলে সে শিক্ষা লাভ করে যে, আল্লাহর আদেশে সে যদি হালাল দ্রব্যসমূহ পরিত্যাগ করতে পারে, তাহলে সেসব জিনিস এবং লোভ-লালসাকে কত বেশি গুরুত্ব দিয়ে পরিত্যাগ করা উচিত, যেগুলো আল্লাহ্ তালা নিষেধ করেছেন। সেজন্য আল্লাহ্ তালা রোয়া সংক্রান্ত বিষয়ের পরেই বলেন- “তোমরা জেনে শুনে একে অন্যের মাল (ধন সম্পদ) অন্যায়ভাবে খেয়ো না এবং অন্য লোকের সম্পত্তির কোন অংশ আত্মসাং করার জন্য শাসন কর্তৃপক্ষকে কিছু (ঘৃষ) দিও না।” (সূরা বাকারা : ১৮৯)। এ আয়াতে রোয়ার ফলে সমাজ কিভাবে উপকৃত ও দোষমুক্ত হতে পারে এর নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৮) রোয়ার আরও কয়েকটি বিশেষ উপকারী দিক:

- (ক) সম্পূর্ণ একমাস রোয়া এজন্য রাখতে হয় যেন এতে প্রত্যুত্তি অবদমিত হয় এবং মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের যোগ্যতার জন্য একটি পূর্ণ সময় পায়।
- (খ) চাঁদের হিসাবে রোয়া রাখার ফলে সব মৌসুমেই অভিজ্ঞতা জন্মে এবং রোয়ার উদ্দেশ্য বছরে বছরান্তের পূর্ণতা লাভ করতে পারে।
- (গ) বিশেষ মাসে রোয়া রাখার উদ্দেশ্য হল সবাই জাতিগতভাবে একসঙ্গে বিশেষ অনুকূল পরিবেশের মাঝে রোয়া রেখে এর পূর্ণ কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হওয়া।

দান-খয়রাত ও ফিতরানা

রোয়ার মাস বিশেষ দান-খয়রাতের এক সুবৰ্ণ সুযোগ আনয়ন করে। রোয়ার সাধনা এবং কৃচ্ছতা মালী কুরবানীর সাথে একত্র হয়ে এক মহান আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি করে। যাকাত, সদকা, ফিতরানা এবং অন্যান্য দান-খয়রাতের মাধ্যমে সমাজের গরীব-দুঃখী সবাই এ মহান সাধনায় অংশগ্রহণ করতে পারে এবং পবিত্র ঈদের খুশীতে শামিল হতে পারে। এ জন্যে হাদীসে এসেছে, মাহে রময়ানে রসূল করিম (সা.) বাড়ের গতিতে দান খয়রাত করতেন। বস্তুত সকল প্রকার রূহানী সাধনার সাথে মালী কুরবানীর এক মহান ত্যাগজনিত তৃষ্ণিতেই এ পবিত্র মাসের উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হয় এবং সত্যিকার অর্থে ঈদের মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

রোয়ার প্রকারভেদ

রোয়া সাধারণত দুই প্রকার: ১) ফরয রোয়া, ২) নফল রোয়া। ফরয রোয়ার উদাহরণ

হচ্ছে- রমযানের রোযা, রমযানের (ছুটে যাওয়া) রোযার কায়া, যিহারের (শ্বীকে মা বলে ফেলার কারণে) কাফফারার রোযা, জেনে-শুনে রোযা ছেড়ে দেওয়ার কারণে কাফফারার ৬০টি রোযা, কসম খাওয়ার কাফফারার রোযা, মানতের রোযা ইত্যাদি। আর নফল রোযার উদাহরণ হচ্ছে- শাওয়ালের ৬ রোযা, আশুরার রোযা, হ্যরত দাউদ (আ.)-এর রোযা- অর্থাৎ, একদিন রোযা রাখবে এবং একদিন খাবার খাবে- এভাবে ধারাবাহিকভাবে নফল রোযা রাখা, আরাফাতের দিনের রোযা, প্রত্যেক চান্দমাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ রোযা রাখা ইত্যাদি। (ফিকাহ আহমদীয়া, পৃ. ২৭২)।

রোযা কাদের ওপর ফরয

১। আল্লাহ তাঁলা কুরআন মজীদে জানিয়েছেন, “ফামান শাহিদা মিনকুমুশ শাহুরা ফালইয়াসুমহু’- অর্থাৎ, রমযান মাসে যে কেউ জীবিত এবং সুস্থ থাকে তার জন্য রমযান মাসে রোযা রাখা ফরয। (সূরা বাকারা: ১৮৬)।

২। প্রত্যেক প্রাণবয়স্ক, বুদ্ধিমান, সুস্থ, মুকীম (অবস্থানকারী) মুসলমান পুরুষ এবং মহিলার ওপর রমযান মাসের রোযা রাখা ফরয। বছরের শেষ রমযান মাসের রোযাই ফরয। বাকী অন্যান্য রোযা নফল।

৩। তবে রোগী ও মুসাফীর ব্যক্তিকে এর বাইরে রাখা হয়েছে। (সূরা বাকারা: ১৮৫)। রোগ-যুক্তির পর এবং সফর হতে ফেরার পর সে অন্য কোন দিনে এ সকল রোযা পূর্ণ করবে।

- যারা দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতায় আক্রান্ত এবং এ থেকে আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা ক্ষীণ বা এরূপ দুর্বল ব্যক্তি যাদের পক্ষে পরেও রোযা রাখা সম্ভব নয়, তারা এর পরিবর্তে নিজ নিজ সামর্থ্যন্যায়ী ফিদিয়া আদায় করে দিবে।

- কুরআন কর্মে অসুস্থ এবং মুসাফিরের জন্য রোযা না রাখার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু রসূল (সা.) গর্ভবতী মহিলা, স্তন্যদাত্রী মাকেও অসুস্থের আওতাভুক্ত বলে গণ্য করেছেন। এরপ্রভাবে সেই বালক-বালিকাও অসুস্থতার অন্তর্ভুক্ত যার দৈহিক বৃদ্ধি সাধিত হচ্ছে। এ অবস্থায় রোযা রাখার ফলে তার স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। এমন কমবয়সী ছেলে-মেয়েদের রোযা রাখার জন্য মা-বাবার বাধ্য করা উচিত নয়।

- দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী ছাত্র, যে পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত রয়েছে, সে-ও অসুস্থ বলে গণ্য হবে। কেননা পরীক্ষার দিনগুলোতে তার মস্তিষ্কের ওপর এমন চাপ থাকে যে, অনেকে পাগল হয়ে যায়। অনেকে গুরুতর অসুস্থ পর্যন্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং এর মাঝে কি-ই-বা উপকারিতা আছে, একবার রোযা রাখবে এবং তারপর চিরদিনের জন্য রোযা

রাখা থেকে বঞ্চিত থাকবে? (ফিকাহ আহমদীয়া, পৃ. ২৭৩ ও ২৯০-২৯১)।

• রোয়া অবস্থায় ক্ষুধা-পিপাসার কারণে প্রাণহানির আশঙ্কাজনক অবস্থার সৃষ্টি হলে রোয়া ভঙ্গ করতে হবে।

রোয়ার জন্য নিয়ত আবশ্যক

যে ব্যক্তি রোয়া রাখবে, তার অবশ্যই রোয়া রাখার নিয়ত করা উচিত। মহানবী (সা.) বলেন, “মান লাভ ইয়াজমাঁয়িস সাওমা কাবলাল ফাজরি ফালা সিয়ামা লাল” – অর্থাৎ, যে সকালের পূর্বে রোয়া রাখার নিয়ত করবে না তার কোন রোয়া নেই। (তিরমিয়ী, কিতাবুস সাওম)। নিয়ত করার জন্য নির্ধারিত কোন বাক্য মুখ দিয়ে বলতে হবে এমন কোন আবশ্যকতা নেই। মূলত নিয়ত হচ্ছে সেই সংকল্পের নাম যে, সে কোন নিয়তে খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করছে। নফল রোয়াতে দিপ্তহরের পূর্ব পর্যন্ত নিয়ত করা যেতে পারে। তবে এটি শর্তসাপেক্ষ। (ফিকাহ আহমদীয়া, পৃ. ২৭৪)।

রোয়ার নিষিদ্ধ দিন

নিম্নোক্ত দিনগুলোতে রোয়া রাখা নিষেধ:

- ১) ঈদ-উল-ফিতরের দিন এবং ঈদ-উল-আযহার দিন রোয়া রাখা নিষেধ। (মুসলিম)।
- ২) ১১, ১২ ও ১৩ যিলহজ আইয়ামে তাশ্রীকের দিনগুলোতে রোয়া রাখা নিষেধ। (তিরমিয়ী)।
- ৩) সন্দেহের দিন। (তিরমিয়ী)।
- ৪) রম্যানের শুভাগমনের উদ্বোধনে রোয়া রাখা নিষেধ। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত)।
- ৫) শুধুমাত্র জুমু'আর দিন রোয়া রাখা নিষেধ। পূর্বে অথবা পরে একদিন যোগ করে রোয়া রাখা যেতে পারে। (বুখারী)।
- ৬) স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর নফল রোয়া নিষেধ। (বুখারী ও মুসলিম)।

যে সকল কারণে রোয়া ভঙ্গ হয়

জেনে-শুনে খাবার খাওয়া, পান করা এবং যৌন সম্পর্ক করার ফলে রোয়া ভঙ্গে যায়। টিকা লাগালে, ইচ্ছা করে বমি করলে, স্বেচ্ছায় বীর্যপাত করলে রোয়া ভঙ্গে যায়। যদি কেউ ভুল করে রম্যানের রোয়া ভঙ্গে ফেলে তবে তার গুনাহ হবে না, কিন্তু কায়া আবশ্যক। রোয়া রাখা অবস্থায় মহিলাদের মাসিক শুরু হলে অথবা শিশু জন্ম দেওয়ার কারণে নিফাসের রক্ত চলাকালীন সময়ে রোয়া ভঙ্গে যায়। অবশ্য পরবর্তীতে সেসব

দিনের রোয়ার কায়া আবশ্যিক। রম্যানের রাত্রে স্ত্রী-সহবাস নিষেধ নয়।

যে সকল কারণে রোয়া ভঙ্গ হয় না

যদি কেউ ভুল করে কোন কিছু খেয়ে ফেলে তাহলে তার রোয়া যেমন ছিল তেমনি থাকবে— অর্থাৎ, রোয়া ভঙ্গ হবে না। কেননা হ্যুর (সা.) বলেছেন, “যদি কেউ ভুল করে রোয়া অবস্থায় কিছু খেয়ে ফেলে, তাহলে এতে করে তার রোয়া ভঙ্গ হবে না। সে তার রোয়া পূর্ণ করবে, কেননা তাকে আল্লাহ্ তালাই খাইয়েছেন।” (বুখারী, কিতাবুস সাওয়ম)

পেটে বা গলায় অনিচ্ছাকৃত বা অসাবধানতাবশত ধোয়া, মশা, মাছি, ধূলা-বালি চলে গেলে কিংবা কুলির পানি অজ্ঞাতসারে গিলে ফেললে রোয়া ভঙ্গ হয় না। এরূপে কানে পানি গেলে অথবা ঔষধ দিলে, কফ ফেললে, থুথু গিলে ফেললে, অনিচ্ছাকৃত বামি করলে, চোখে ঔষধ দিলে, দাঁত থেকে রঞ্জ বের হলে, বসন্তের টিকা লাগালে, মেসওয়াক বা ব্রাশ করলে, ধ্বাণ নিলে, নাকে ঔষধ দিলে, মাথায় বা দাঢ়িতে তেল দিলে, শিশু বা স্ত্রীকে চুম্ব দিলে, দিনের বেলায় সুমানোর সময় স্বপ্নদোষ হলে, মাথায় পানি দিলে, সুগন্ধি ব্যবহার করলে, আয়না দেখলে, শরীর মর্দন করলে এবং সেহীরীর সময় ফরয গোসল না করার কারণে রোয়া ভঙ্গ হয় না। হ্যরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, রসূল করিম (সা.) গোসল না করা অবস্থায় প্রভাত হলে (ফজরের নামায়ের পূর্বে) গোসল করতেন এবং রোয়া রাখতেন। (বুখারী ও মুসলিম)। দিনের বেলায় মহিলারা সুরমা লাগাতে পারে। পুরুষদের দিনের বেলায় সুরমা ব্যবহার সম্পর্কে হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, “দিনে সুরমা লাগানোর কি-ই-বা প্রয়োজন রয়েছে, রাতে ব্যবহার করণ।” (ফিকাহ আহমদীয়া, পঁ. ২৭৭-২৭৯)।

খাদ্যবস্তু এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে একটি মূলনীতি হ্যরত ইবনে আবুস (রা.) কর্তৃক এরূপে বর্ণিত হয়েছে: (ইচ্ছাকৃতভাবে) শরীরে প্রবেশ করানো হয় এরূপ প্রত্যেক বস্তুতে রোয়া ভঙ্গ হয় এবং (অনিচ্ছাকৃতভাবে) শরীর হতে বের হয় এরূপ বস্তুতে রোয়া নষ্ট হয় না।

ইচ্ছাকৃত রোয়া ভঙ্গের কাফফারা

যদি কেউ জেনে-বুঝে খাবার খায় বা পান করে, কারো অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে রম্যানের রোয়া ভাঙ্গে, দিনে স্ত্রী-সহবাস বা স্বেচ্ছায় বীর্যপাত করার মাধ্যমে রোয়া ভঙ্গে ফেলে, তাহলে তাকে একটি রোয়ার জন্য লাগাতার ৬০টি রোয়া রাখতে হবে অথবা ৬০ জন মিসকীনকে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী একবেলা খাবার খাওয়াতে হবে অথবা প্রত্যেক

মিসকীনকে দুই সের গম অথবা তার সমপরিমাণ মূল্য আদায় করতে হবে। কিন্তু তার যদি ৬০টি রোয়া রাখা বা ৬০ জন মিসকীনকে খাবার খাওয়ানোর সামর্থ্য না থাকে তাহলে তাকে আল্লাহ তা'লার কৃপা ও দয়া এবং অনুকম্পার ভরসা করতে হবে। এমতাবস্থায় তার জন্য প্রকৃত ইঙ্গেফার, অশুশোচনা করা, নিজ ভুলের স্বীকারোক্তি এবং পুনরায় এরপ কাজ না করার দৃঢ় সংকল্পই যথেষ্ট হবে। (ফিকাহ আহমদীয়া, পৃ. ২৯৮)।

তারাবীহ নামায

রম্যান মাসে এশার নামাযের পর তারাবীহ নামায পড়তে হয় এবং সাধ্যমত শেষ রাতে তাহজুদের নামাযও পড়তে হয়। তারাবীহের নামায সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নামায অধ্যায়ে করা হয়েছে। সাধারণত বিতরের নামায ও ৮ রাকা'ত তারাবীহসহ সর্বমোট ১১ রাকা'ত নামায পড়তে হয়। (বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত)। হ্যরত ইমাম সুযুতী (রহ.) লিখেছেন, ১১ রাকা'তই লোকের মিলিত মত (ইজমা)। কেউ চাইলে ২০ রাকা'ত বা এরও অধিক পড়তে পারে। (ফিকাহ আহমদীয়া, পৃ. ২০৮)।

ই'তিকাফ

রম্যানের ২০ তারিখ ফজরের নামাযের পর থেকে শুরু করে রম্যানের শেষ ১০ দিন শাওয়ালের চাঁদ দেখার পূর্ব পর্যন্ত ‘ই'তিকাফ’ করা সুন্নত। কুরআন মজীদে এ সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে, “ওয়া আন্তুম আকিফুনা ফিল মাসাজিদ।” (সূরা বাকারা: ১৮৮)। সহীহ হাদীসে হ্যরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, “মহানবী (সা.) রম্যানের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করতেন। আল্লাহ তা'লা তাকে ওফাত দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর এ রীতি অব্যাহত ছিল।”

ই'তিকাফের ফয়লিত সম্পর্কে হ্যরত রসূল করিম (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য এক দিন ই'তিকাফে বসে, আল্লাহ তা'লা তার ও জাহানামের মধ্যে এমন তিনটি পরিখা সৃষ্টি করে দিবেন যাদের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্বের চাইতেও অধিক দূরত্ব থাকবে।” (সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ই'তিকাফ)।

ই'তিকাফের জন্য জামে মসজিদে বসতে হবে। কেননা হাদীসে এসেছে, “লা ই'তিকাফা ইল্লা ফি মাসজিদিন জামিয়ন”- অর্থাৎ, ই'তিকাফ এমন মসজিদে করতে হবে যেখানে নিয়মিত বা-জামাত নামায হয়ে থাকে। (আবু দাউদ)। তবে একান্ত বাধ্য হলে বা আশে-পাশে জামে মসজিদ না থাকলে ঘরেও ই'তিকাফে বসা যায়। মহিলারা মসজিদ কিংবা ঘরে উভয় স্থানেই ই'তিকাফে বসতে পারে। তবে তাদের জন্য ঘরে ই'তিকাফে বসা উত্তম।

মু'তাকিফ (ই'তিকাফকারী ব্যক্তি) মসজিদের নিভৃত কোণে পর্দার অন্তরালে বসবেন, কুরআন করিম পাঠ করবেন, খোদার স্মরণে নিমগ্ন থাকবেন, বাজে কথা বলা কিংবা অপ্রয়োজনীয় কথা থেকে বিরত থাকবেন। আবু দাউদ নামক হাদীস গ্রন্থে হ্যরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, “ই'তিকাফের দিনগুলোতে রংগী দেখতে যাবে না, জানায়ার যাবে না, স্ত্রী সহবাস/আলিঙ্গন করবে না, শুধু জরুরী প্রয়োজনে (মসজিদের) বাইরে যাবে, রোয়া রাখবে।” রংগী দেখতে যাওয়া এবং জানায়ার নামাযে শরীক হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে। (ফিকাহ আহমদীয়া)।

ফিতরানা

ঈদ-উল-ফিতরের ফিতরানা প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব। জামাতের বায়তুল-মাল বিভাগ এক ‘সা’— অর্থাৎ, প্রায় শৌনে তিন সের খাদ্যশস্য ‘সদকাতুল ফিতর’ (ফিতরানা) অথবা এর মূল্যের সমান ফিতরানা নির্ধারণ করেছেন। ঈদের দিন সূর্য উদয়ের পূর্বে ভূমিষ্ঠ শিশুর জন্যেও ফিতরানা দেয়া ওয়াজিব। ফিতরানা ঈদের নামাযের আগেই আদায় করা উচিত। কেননা গরীব রোয়াদার যেন ফিতরানার অর্থ দিয়ে ঈদের খুশীতে অংশগ্রহণ করতে পারে। ফিতরানা দেয়া কারও ওপর কোন প্রকার অনুগ্রহ নয়। এটা আমাদের জন্যে ইবাদতের অঙ্গ। এমনকি যে ব্যক্তিকে ফিতরানার সাহায্য দেয়া হয়, তার নিজের পক্ষ থেকেও ফিতরানা দেয়া কর্তব্য। যে সম্পূর্ণ ফিতরানা দিতে অক্ষম সে অর্ধেক হারেও আদায় করতে পারে। সকলের অংশগ্রহণের ফলে সদকাতুল ফিতরের ফাউন্ট একটি সাধারণ ফাল্ডে পরিণত হয়। সুতরাং এ থেকে যারা উপকৃত হয় তাদের মনে হীনমন্যতার ভাব সৃষ্টি হয় না।

রোয়া সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়

- রমযান মাসের চাঁদ দেখার পর অথবা অধিকাংশ লোকের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য পাওয়ার পর অথবা শা'বান মাসের ত্রিশ দিন পার হবার পর দিন হতে রমযানের রোয়া শুরু হয়ে যায়। যদি ২৯ শা'বান আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার পরেও কয়েকজন লোক চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয় এবং তা সঠিক বলে প্রতীয়মান হয় তাহলে পরদিন হতে রোয়া শুরু করতে হবে। (মুসনাদ ইমাম আহমদ হাখল এবং অন্যান্য হাদীস)।
- রোয়া রাখার জন্য সুবেহ সাদেকের পূর্বে সেহরী খেতে হবে (বুখারী)। কোন কিছু না খেয়ে রোয়া রাখা ঠিক নয়। এটা করা অপচলনীয়। এমতাবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে। সেহরী দেরী করে খাওয়া এবং সূর্যাস্তের সাথে-সাথেই ইফতার করাকে হ্যরত রসূল করিম (সা.) পছন্দ করতেন। (তিরমিয়ী, আবু দাউদ)।

- যদি জানা যায়, খাওয়ার সময় প্রভাত হয়ে গিয়েছিল বা যখন ইফতার করা হয়েছিল তখনও সূর্য অস্ত যায়নি তাহলে সে রোয়া হবে না, রোয়া কায়া করতে হবে। (বুখারী)
- সূর্যাস্ত হওয়ার পর এ দোয়া পড়ে ইফতার করতে হবে- “আল্লাহম্মা ইন্নি লাকা সুমতু ওয়াবিকা আমানতু ওয়া আ’লা রিয়কিকা আফতারতু।” অর্থাৎ, “হে আল্লাহ! নিশ্চয় তোমার জন্যই আমি রোয়া রেখেছি, তোমার উপর ঈশ্বর এনেছি এবং তোমার দেয়া রিয়িক দিয়ে ইফতার করছি।” (আবু দাউদ, বাব: কাওলুল ইনাদাল ইফতার)
- খেজুর, দুধ অথবা পানি দিয়ে ইফতার করা সুন্নত। রসূল (সা.) এ সম্পর্কে বলেছেন, “যখন ইফতার করবে তখন খেজুর দিয়ে ইফতার কর- কেননা এতে বরকত রয়েছে। যদি এটি সহজলভ্য না হয় তাহলে পানি দিয়ে ইফতার কর- কেননা এটি অত্যন্ত পবিত্র জিনিস।” (তিরমিয়ী, বাব: মা ইয়াসতাহিলু আলাইহিল ইফতার)
- অন্যদেরকে ইফতার করানো খুবই পুণ্যের কাজ। এ সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, “যে রোয়াদারকে ইফতার করাবে তার জন্য রোয়াদারের সমপরিমাণ পুণ্য রয়েছে, কিন্তু এতে করে রোয়াদারের পুণ্যে কোন কমতি হবে না।” (তিরমিয়ী, কিতাবুস সাওম)
- শাওয়ালের ডটি নফল রোয়া রাখাও অতি উত্তম। হাদীসে আছে, “যে ব্যক্তি রম্যানে রোয়া রাখে এবং এরপর শাওয়াল মাসের ছয়টি রোয়াও রাখে, সে যেন সারা বছর রোয়া রাখল।” (মুসলিম)। এছাড়া হ্যরত রসূল করিম (সা.) প্রত্যেক চান্দু মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে নফল রোয়া রাখতেন। যে মুসলিমান যুবক দরিদ্রতাবশত বিয়ে করতে অক্ষম তার জন্য প্রয়োজনমত নফল রোয়া রাখা খুবই উপকারী। এতে প্রবৃত্তি দমন হয়ে চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা হয়।
- সারা বছর রোয়া রাখা উচিত নয়। (বুখারী)। সারা বছর রোয়া রাখলে অন্যান্য অসুবিধা ছাড়াও রোয়ার যে উদ্দেশ্য তা ব্যাহত হয়। কারণ তখন রোয়া রাখা শরীরের পক্ষে এমনভাবে অভ্যাস হয়ে যায় যে, রোয়ার ফলে যে বিশেষ উত্তাপ ও দহন সৃষ্টি হওয়ার কথা, তা হতে পারে না। ফলে আতঙ্গন্ধি এবং রোয়ার অন্যান্য উপকারিতা লাভ করা সম্ভব হয় না।
- সহীহ হাদীসে আছে, যখন রম্যান মাস আসে তখন বেহেশতের দরজাগুলোকে উন্মুক্ত করা হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় আর শয়তানকে শৃঙ্খলাবন্ধ করা হয়। রোয়া মু’মিনের জন্যে ঢালস্বরূপ। যে মিথ্যা কথা এবং তদনুযায়ী কাজ ত্যাগ করে না, আল্লাহর কাছে তার খাদ্য বা পানীয় পরিত্যাগ করার কেন মূল্য নেই। রম্যান মাসে এক মহিমান্বিত রাত আছে যা হাজার মাস হতে উত্তম। যাকে এ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে সে সব ধরনের মঙ্গল হতে বঞ্চিত এবং দুর্ভাগ্য।

- রোয়া রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে হ্যারত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য:

“যার অন্তর এ কথায় আনন্দিত যে রমযান এসেছে এবং সে এ প্রতীক্ষায় ছিল রোয়া এলেই রাখবে, অথচ অসুস্থতার জন্যে রোয়া রাখতে পারে না— এরূপ ব্যক্তি আকাশে রোয়া হতে বাধ্যত হবে না। দুনিয়ার অনেক লোক বাহানা খুঁজে এবং ভাবে, দুনিয়ার মানুষকে আমি যেরূপ ধোকা দিচ্ছি সেভাবে খোদাকেও ধোকা দিচ্ছি। বাহানাকারী নিজের পক্ষ হতে সমস্যা বানিয়ে নেয় এবং ওজরগুলোকে শামিল করে সমস্যাগুলোকে সঠিক সাব্যস্ত করে। কিন্তু খোদার দৃষ্টিতে সেগুলো সঠিক নয়। ওজর ও বাহানার দরজা খুবই বিস্তৃত। মানুষ চাইলে এ দিয়ে সারা জীবন বসে নামায পড়তে পারে এবং রোয়া একেবারেই না রাখতে পারে। কিন্তু খোদা তার নিয়ত ও ভাবধারা অবগত। যার সততা ও আন্তরিকতা আছে— খোদা জানেন, তার অন্তরে মর্মবেদনা রয়েছে, খোদা তাকে প্রকৃত পুণ্য হতে অধিক দান করেন। কারণ, মর্মবেদনা মর্যাদার বিষয়। বাহানাকারী ব্যক্ত্যার উপর ভরসা করে, কিন্তু আল্লাহ তা'লার কাছে এ ভরসার কোন মূল্য নেই।”

(আল হাকাম, ১০/১২/১৯০২, পৃ. ০৯)।

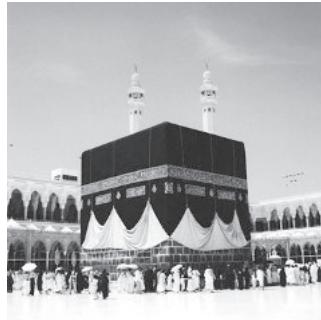
প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে সার্বিক অর্থে সাধনার এক অপূর্ব সওগাত নিয়ে প্রতিবছর মাহে রমযান আসে। দৈহিক ও আধ্যাত্মিক তথা সার্বিক কল্যাণের জন্যে রমযানের কৃচ্ছতার মাঝে যে মহান সংকল্প ও শিক্ষা নিহিত তা পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের মাঝেই এ মাসের সার্থকতা রয়েছে। নিছক আচার-অনুষ্ঠান ও বাহ্যিকতার মাঝে বিশেষ কোন সার্থকতা নেই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হজ

হজ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম। হজের আভিধানিক অর্থ হলো সংকল্প বা ইচ্ছা করা। ইসলামী পরিভাষায় শরীয়তের যথাযথ বিধান অনুযায়ী কা'বা শরীফের যিয়ারতের (দর্শনের) উদ্দেশ্যে গিয়ে নির্ধারিত ইবাদত পালন করাকে হজ বলা হয়।

পবিত্র
কাবা শরীফ



হজের সময়

হজ করার জন্য নির্দিষ্ট মাস নির্ধারিত রয়েছে যাকে ‘আশহুরুল মালুমাত’- অর্থাৎ, হজের মাস বলা হয়েছে। এ মাস হল তিনটি, যথাঃ শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ। এদেরকে আশহুরুল হজ বা হজের মাস এজন্যই বলা হয়, কেননা এ মাসগুলোতে হজের প্রস্তুতি, চারিত্বগত সংশোধন এবং হজের কার্যাবলী যথা ইহরাম বাঁধার সূচনা হয়ে যায়। আর এ হজের সর্বশেষ সময়সীমা যিলহজ মাসের ১৩ পর্যন্ত হয়ে থাকে। কুরআন করীমের সূরা বাকারার ১৯৮ নং আয়াতে এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

হজ কাদের ওপর ফরয

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাঁলা বলেছেন, “ওয়ালিল্লাহি আলান্নাসি হিজ্জুল বাযাতি মানিস্তাতা-আ ইলায়াহি সাবীলা”- অর্থাৎ, “কা'বা গৃহের হজ সেসব লোকের উপর বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যারা সেখানে যাবার সামর্থ্য রাখে।” (সূরা আলে ইমরান: ৯৮)। হ্যরত রসূলে করিম (সা.) বলেছেন, “সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি হজ আদায় করল না, সে ইহুদী না খিস্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করল, সে বিষয়ে আমার কোন পরওয়া নেই।” (তিরমিয়ী)।

নিম্নে বর্ণিত যোগ্যতার অধিকারীর ওপরেই হজ ফরয করা হয়েছে:

- (১) মুসলমান।
- (২) সুস্থান্ত্রের অধিকারী।

(৩) প্রাণ-বয়ক্ষ বুদ্ধিমান।

(৪) সংসার পরিচালনার পর হজে যাওয়ার মত আর্থিক সংগতি এবং হজ থেকে ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত পরিবারের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলোর ব্যবস্থা যার আছে।

(৫) রাস্তার নিরাপত্তা।

(৬) স্ত্রীলোকের জন্য মাহরাম (যাদের সঙ্গে বিবাহ অবৈধ) সঙ্গী থাকা। স্ত্রীলোকের মাহরাম সঙ্গী না নিয়ে হজ্জযাত্রা নিষিদ্ধ হওয়ার বিবরণ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীসে দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া আল্লাহ্ তা'লা সূরা বাকারার ১৯৮ নং আয়াতে হজ্জযাত্রীকে উপযুক্ত পাথেয় সঙ্গে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

হজের স্থান

যে সকল স্থানে হজের কার্যাবলী পালন করতে হয় বা হজ সম্পাদন করতে যেতে হয় কিংবা এমন সব স্থান যা হজ করার এলাকার আওতাভুক্ত তা হলো-

১) কা'বাগৃহ: পৃথিবীর সর্বপ্রথম গৃহ।

২) হাতিম: কা'বাগৃহের উত্তরপ্রাচীরের সাথে অর্ধবৃত্ত আকারে কিছু খালি স্থান। তোয়াফে এ স্থানকে অস্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়ে থাকে।

৩) হাজরে আসওয়াদ: যাকে তোয়াফকালে চুম্বন করতে হয়।

৪) মূলতাযাম: হাজরে আসওয়াদ এবং কা'বার দরজার মধ্যবর্তী উত্তর-প্রাচীরের অংশকে ‘মূলতাযাম’ বলা হয়। হাজীরা ফিরে যাওয়ার সময় কা'বার এ অংশের সাথে বুক মিলিয়ে থাকে।

৫) রূকনে ইয়ামেনী: কা'বাগৃহের দক্ষিন-পশ্চিম পার্শ্ব যেহেতু ইয়েমেনের দিকে এজন্য এই কোণকে ‘রূকনে ইয়ামেনী’ বলা হয়। তোয়াফের সময় এই কোণকে স্পর্শ করা অথবা চুম্ব দেয়া মুস্তাহাব।

৬) মুতাফ: কা'বাগৃহের চতুর্পার্শ্বে মর্মর পাথর দিয়ে তৈরী একটি বৃত্ত। এ স্থানেই কা'বাগৃহের চারপাশে প্রদক্ষিণ করতে হয়। তোয়াফ একটি ইবাদত যা কা'বাগৃহকে সাতটি চক্র দিয়ে শেষ করতে হয়।

৭) মাকামে ইবরাহীম: তোয়াফের সাত চক্র দেয়ার পর দুই রাকাত নামায পড়া ওয়াজিব। এই দুই রাকাত নামায ‘মাকামে ইবরাহীমে’ আদায় করলে অধিক সওয়াব হয়।

৮) যময়ম: মাকামে ইবরাহীমের বাম দিকে এবং কা'বা থেকে উত্তর দিকে একটি কূপ। কা'বার দিকে মুখ করে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে যময়মের পানি পান করা হয়ে থাকে।

৯) মসজিদুল হারাম: কা'বার চতুর্পার্শ্বে দীর্ঘ ও বৃত্ত আকারের উন্মুক্ত প্রাঙ্গনের সুবিস্তৃত ও প্রশস্ত মসজিদ যেখানে মানুষ বৃত্তের আকারে কাতার বানিয়ে এবং কা'বাগৃহের দিকে

মুখ করে নামায পড়ে থাকে ।

১০) **সাফা ও মারওয়া পাহাড়:** মক্কায় মসজিদে হারামের নিকটবর্তী দক্ষিণ দিকের দু'টি ছেট-ছেট পাহাড়- যেখানে হাজীরা হজ্জ ও উমরাহ করার সময় দৌড়ে থাকেন ।

১১) **মক্কার বাইরের স্থান:**

ক) **মিনা:** এ স্থানে শয়তানকে পাথর মারা হয় । হাজীরা মক্কা থেকে এখানে ৮ যিলহজ্জ চলে আসেন । এ স্থানেই ঐ দিনের যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায এবং ৯ যিলহজ্জ ফজরের নামায পড়া হয় । এ ময়দানেরই একপাশে সেই মহান কুরবানীর স্থান যেখানে প্রতি বছর হ্যরত ইবরাহীম ও হ্যরত ইসমাঈল (আ.)-এর কুরবানীর স্মৃতির স্মরণে লক্ষ-লক্ষ পশু যবাই করা হয়ে থাকে ।

খ) **মুয়দালিফা:** আরাফাত হতে মিনায ফিরার পথে ‘মাশআরচল হারাম’ পাহাড়ের পাদদেশে এ স্থানে রাত্যাপন এবং মাগরিব ও এশার নামায পড়তে হয় ।

গ) **আরাফাত:** মক্কা থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে প্রায় ৯ মাইল দূরে সেই মহান স্থান- যেখানে ৯ যিলহজ্জ হাজীরা একত্রিত হয়ে থাকেন ।

হজ্জের রোকন

হজ্জের তিনটি রোকন বা ফরয (অবশ্য পালনীয়) কর্ম রয়েছে । এগুলো হলো-

১) ইহরাম অর্থাৎ, নিয়ত করা ।

২) উকূফে আরাফাহ- অর্থাৎ, ৯ যিলহজ্জ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান ।

৩) তোয়াফে যিয়ারত যাকে তোয়াফে ইফায়া-ও বলা হয় । অর্থাৎ, সে তোয়াফ যা আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের পর ১০ যিলহজ্জ অথবা এর পরবর্তী তারিখগুলোতে কাঁবা গৃহে করা হয়ে থাকে । ৯ যিলহজ্জ যদি কোন ব্যক্তি আরাফাতের ময়দানে অল্প সময়ের জন্য হলেও অবস্থান না করতে পারে তাহলে তার হজ্জ হবে না । তাকে পুনরায় পরবর্তী বছর ইহরাম বেঁধে হজ্জ করতে হবে ।

হজ্জের প্রকারভেদ

হজ্জ তিন প্রকার । তা হলো-

(১) **হজ্জ মুফরাদ:** সেই হজ্জ যাতে মিকাত (এমন স্থান যেখান থেকে মক্কায় আসার নিয়তে ইহরাম বাঁধা হয়) হতে শুধুমাত্র হজ্জ করার নিয়তে ইহরাম বাঁধা হয় । এতে উমরাহ করতে হয় না ।

(২) **হজ্জ তামাতো:** তামাতো শব্দের অর্থ হল উপকৃত হওয়া । অর্থাৎ, হাজীর একই সফরে দু'টি কল্যাণ লাভ করা । প্রথমত: উমরাহ করা, দ্বিতীয়ত: হজ্জ করা । এ জন্য হাজী হজ্জের মাসগুলোতে সর্বপ্রথম শুধু উমরাহ্র জন্য ইহরাম বেঁধে উমরাহ্র পর- অর্থাৎ,

বায়তুল্লাহ্‌র তোয়াফ ও সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সাত চক্র দেয়ার পর মাথার চূল কর্তন করে ইহরাম খুলে ফেলবে। এরপর ৮ যিলহজ্জ বা এর পূর্বে নতুন করে হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জের অনুষ্ঠান পূর্ণ করবে। হজ্জে মুফরাদ ব্যক্তির জন্য ১০ যিলহজ্জ কুরবানী আবশ্যক নয়, কিন্তু হজ্জে তামাতো পালনকারী ব্যক্তির জন্য ১০ যিলহজ্জ কুরবানী করা আবশ্যক। যদি কুরবানী দেয়া সম্ভব না হয় তাহলে এর পরিবর্তে ১০টি রোয়া রাখবে। এর মধ্যে থেকে তিনটি হজ্জের দিনগুলোতে— অর্থাৎ, ৭, ৮, ৯ যিলহজ্জ তারিখে আর বাকী সাতটি রোয়া ঘরে ফিরে আসার পর রাখতে হবে।

(৩) হজ্জে কিরান: হজ্জে কিরান এমন হজ্জকে বলা হয়, যাতে মিকাত (ইহরাম বাঁধার নির্ধারিত স্থান) হতে হজ্জ এবং উমরাহ উভয় একসাথে আদায় করার নিয়তে ইহরাম বাঁধা হয় এবং মকায় পৌছে সর্বপ্রথম উমরাহ করবে তারপর ইহরাম না খুলে সে ইহরামেই হজ্জের অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি পালন করবে। হজ্জে কিরান সম্পাদনকারী ব্যক্তির জন্যও ১০ যিলহজ্জ কুরবানী করা আবশ্যক। অন্যথায় ওপরে বর্ণিত নিয়মনৃযায়ী রোয়া রাখবে।

মানাসিকে হজ্জ বা হজ্জের অনুষ্ঠানাবলী

(ক) ইহরাম, (খ) তোয়াফ বা বায়তুল্লাহ্ পরিক্রমণ, (গ) সারী বা সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সাত চক্র দেয়া, (ঘ) উকুফে আরাফাত বা আরাফাতে অবস্থান, (ঙ) মুজদালিফা ও মীনাতে অবস্থান, (চ) রমি বা কংকর নিক্ষেপ করা, (ছ) কুরবানী করা, (জ) তোয়াফে বিদা প্রভৃতি। নিচে উক্ত অনুষ্ঠানগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হল:

ক) ইহরাম:

হজ্জের বিশেষ পোশাক সেলাইবিহীন দু'টি চাদর। একটি পরিধান করতে হয় এবং অপরটি শরীরে জড়িয়ে নিতে হয়। এ নির্দেশ শুধু পুরুষের বেলায় প্রযোজ্য। মহিলারা সাধারণ পোষাক পরিধান করতে পারেন, তবে মুখ আবৃত করা নিষেধ। ইহরাম বাঁধার পূর্বে গোসল করা উচিত। ইহরামের জন্য দু' রাকা'ত নামায পড়ার পর নিয়ত করার বিধান আছে। মুহরিম তথা ইহরাম বাঁধা ব্যক্তির জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো নিষিদ্ধ যোষণা করা হয়েছে। যথা : মাথা (শুধু পুরুষের জন্য) ও মুখ আবৃত করা, সুগন্ধি ব্যবহার, কেশ মুক্তন, নখ কাটা, শিকার করা, কোন প্রাণী হত্যা করা, ঝগড়া-বিবাদ করা, গালমন্দ অথবা বাজে কথা বলা, বিবাহ করা বা বিবাহ পড়ান, সহবাস ইত্যাদি। ইহরাম অবস্থায় উচ্চঃস্বরে ‘তালবীয়া’ পাঠ করতে হয়। তালবীয়ার বাক্যগুলো এরূপ-“লাবায়িকা আল্লাহুম্মা লাবায়িক, লাবায়িকা লা শারীকা লাকা লাবায়িক, ইন্নাল হামদা ওয়ান্ন নি'আমাতা লাকা ওয়াল মূলকা, লা শারীকা লাকা”- অর্থাৎ, “উপস্থিত, হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত; আমি উপস্থিত, তোমার কোন শরীক নেই, আমি উপস্থিত; নিশ্চয় সব

প্রশংসা এবং অশেষ অনুগ্রহের তুমিই অধিকারী এবং তুমি আধিপত্যেরও (মালিক),
তোমার কোন অংশীদার নেই।” ইহরাম, হজ্জ ও উমরাহ্বর জন্য তালবীয়া পাঠ করা
একান্ত জরুরী। হজ্জের ৩টি ফরযের মধ্যে এটিও অন্যতম।

খ) তোয়াফ:

দোয়া সহকারে পবিত্র কা'বা গৃহকে সাতবার প্রদক্ষিণ করাকে ‘তোয়াফ’ বলে। প্রথম তিন
চক্রের দ্রুত পদক্ষেপ সহকারে এবং কাঁধ দুলিয়ে প্রদক্ষিণ করাকে ‘রমল’ বলে। প্রথম
তোয়াফকে ‘তোয়াফে কুদুম’ বলা হয়। তোয়াফের ক্ষেত্রে হাতিম (কা'বার পরিত্যক্ত
স্থান)-ও কা'বাগৃহের অঙ্গর্গত। কা'বাগৃহের যে কোণে ‘হাজরে আসওয়াদ’ (কালো
পাথর) অবস্থিত সেই কোণ হতে তোয়াফ শুরু করতে হয়। প্রতি চক্র শেষে কালো
পাথরকে চুম্বন করতে হয়। চুম্বন করা সম্ভব না হলে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলেও চলবে।
উল্লেখ্য, হ্যারত উমর (রা.) একদিন তোয়াফকালে চুম্বন করতে গিয়ে বলেছিলেন, “হে
পাথর! আমি জানি তোর ভাল-মন্দ করার কোনই ক্ষমতা নেই, কিন্তু আমার প্রিয় নবীকে
চুম্বন করতে দেখেছি বলে আমিও তোকে চুম্বন করলাম।” (বুখারী ও মুসলিম)। হাজরে
আসওয়াদের পূর্ব কোণকে ‘রুকনে ইয়ামনী’ বলে। সেই কোণকেও স্পর্শ বা চুম্বন করা
যায়। সাত তোয়াফের পর মাকামে ইবরাহীমে দু রাকা'ত নামায পড়ার বিধান আছে। ১০
যিলহজ্জ মীনাতে কুরবানী করার পর ১০, ১১ বা ১২ তারিখের মধ্যে বাযতুল্লাহ্বর তোয়াফ
করা হজ্জের অন্যতম ফরয। এ তোয়াফকে “তোয়াফে যিয়ারত” বলে।

গ) সায়ী:

সাফা পাহাড় হতে শুরু করে মারওয়া পাহাড় পর্যন্ত সাতবার চক্র দিয়ে আসাকে ‘সায়ী’
বলে। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি স্থানে হ্যারত বিবি হাজেরার স্মৃতি স্মরণার্থে তাঁর
অনুকরণে দৌড় দিতে হয়। হজ্জ এবং উমরাহ্কারীদের জন্য এটিও একটি অনুষ্ঠান।
সায়ীর পর যময়মের পানি পান করা সুন্নত।

ঘ) উকুফে আরাফাত:

৯ যিলহজ্জ সূর্য ঢলে পড়ার পর হতে সূর্যাস্তের পর পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানে অবস্থান
করাকে ‘উকুফ’ বলে। সেদিন যোহর ও আসরের নামায জমা করে পড়া এবং দোয়া ও
ইস্তেগফারের মাঝে সময় অতিবাহিত করতে হয়। এটি হজ্জের একটি প্রধান ফরয।
রসূলে করিম (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি ৯ যিলহজ্জ দিনে অথবা রাত্রে যে কোন এক
মুহূর্তে আরাফাতে অবস্থান করেছে তার হজ্জ সম্পূর্ণ হয়েছে।” আরাফাতে অবস্থানও
হজ্জের অন্যতম প্রধান ফরয।

ঙ) মুজদালিফা ও মীনাতে অবস্থান:

৮ যিলহজ্জ হতে ৯ যিলহজ্জ আরাফাতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মীনাতে অবস্থান করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া সুন্নত। আবার ১০ যিলহজ্জ হতে ১২ অথবা ১৩ যিলহজ্জ পর্যন্ত মীনায় থাকতে হয়। আরাফাত হতে মীনায় ফেরার পথে ‘মাশআরঞ্জ হারাম’ পাহাড়ের পাদদেশে মুজদালিফা নামক স্থানে রাত্রিযাপন ও সেখানে মাগরিব ও এশার নামায জমা করে পড়ার বিধান আছে।

চ) রমি করা বা কংকর নিক্ষেপ:

জামারাতুল আকাবা, উলা ও উসতাতে পাথর নিক্ষেপকে ‘রমি’ বলে। ১০ যিলহজ্জ দ্বিপ্রহরের পূর্বে শুধু আকা’বাতে এবং ১১ ও ১২ তারিখে (সন্তুষ্ট হলে ১৩ তারিখেও) সূর্য ঢলে পড়ার পর যথাক্রমে উলা, উসতা ও আকা’বাতে সাতটি করে কংকর নিক্ষেপ করতে হয়। সাধারণত একে রূপকভাবে শয়তানের উপর পাথর নিক্ষেপ করা হিসেবে অভিহিত করা হয়।

ছ) কুরবানী করা:

কিরান ও তামাতো হাজীদেরকে প্রথম দিন ‘রমি’ (প্রস্তর নিক্ষেপ) করার পর ১২ তারিখের মধ্যে মীনায় কুরবানী করতে হয়। কুরবানীর পর মন্তক মুক্তন করার রীতি আছে। যারা কুরবানী করার সামর্থ্য রাখে না তারা দশটি রোয়া রাখবে। (সূরা বাকারা : ১৯৭)।

জ) তোয়াফে বিদা:

বিদেশী হাজীদেরকে মক্কা ত্যাগের পূর্বে শেষ বারের মত কা’বা শরীফের ‘তোয়াফ’ করতে হয়। তাই বিদায় কালের তোয়াফকে ‘তোয়াফে বিদা’ বলা হয়।

হেরেমের সীমা

মক্কা শরীফ হতে কোন দিকে তিন মাইল, কোন দিকে সাত মাইল এবং জেদার দিক হতে দশ মাইলের মধ্যবর্তী স্থানকে হেরেমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ নির্ধারিত সীমার মধ্যে শিকার করা, কোন প্রাণীকে বিতাড়িত করা এবং ঘাস বা বৃক্ষ কর্তন করা নিষিদ্ধ। তবে প্রয়োজনবোধে হিংস্র ও ক্ষতিকর প্রাণী বধ করার অনুমতি আছে।

মিকাত

এটি হলো হেরেমের সীমানায় ইহরাম বাঁধার নির্ধারিত কতগুলো স্থান। তারত, বাংলাদেশ ও পূর্বাঞ্চলের লোকদের জন্য ‘ইয়ালামলাম পাহাড়’-কে ‘মিকাত’ নির্ধারণ করা হয়েছে। যারা মিকাতের সীমানার মাঝে বসবাস করে তারা নিজ-নিজ গৃহ থেকেই ইহরাম বাঁধবে।

হজ্জ ও উমরাহ্

৮ যিলহজ্জ হতে ১৩ যিলহজ্জ সময়ের মাঝে অনুষ্ঠিত শরীয়ত নির্ধারিত কর্মকে হজ্জ বলে। বছরের অন্যান্য দিনে ইহরামের সাথে ‘তোয়াফ’ ও ‘সায়ি’ করাকে ‘উমরাহ্’ বলে। ফরয নামাযের সাথে যেরূপ সুন্নত ও নফল নামায পড়ার রীতি আছে, তদ্বপ হজ্জের আগে ও পরে সুন্নত এবং নফল উমরাহ্ করা হয়। হজ্জে ভুল-ক্রটির জন্য ফিদিয়া, সদকা, কুরবানী ও রোয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। (বিস্তারিত অবগতির জন্য সূরা বাকারার ২৪ নং বর্কু ও সূরা মায়েদার ১৩ রক্তু দ্রষ্টব্য)।

কা'বা শরীফ ও হজ্জের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

কোন-কোন বর্ণনা অনুযায়ী কা'বা শরীফের প্রথম বা মূল প্রতিষ্ঠাতা হলেন হ্যরত আদম (আ.)। (তফসীর ইবনে কাসীর)। পবিত্র কুরআনের মতে, এটিই পৃথিবীর সর্বপ্রথম ইবাদতগ্রহ। বলা হয়েছে: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِتَذَكَّرَ مِبْرَكًا وَهُدًى لِلْمُلْمِينَ﴾ “ইন্ন আউয়ালা বাইতিউ উয়িয়া লিন্নাসি লাল্লায়ী বিবাক্তা মুরারাকাওঁ ওয়া হুদ্বাল্লিল আলামিন” – অর্থাৎ, “নিশ্চয় সর্বপ্রথম মানব জাতির জন্য যে ঘর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল তা হল বাক্তাতে, তা সমগ্র বিশ্বের জন্য আশিসপূর্ণ ও হেদায়েতের কারণ।” (সূরা আলে ইমরান: ৯৭)। যবুর কিতাবেও এর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। (Psalms 84: 4-6)। উল্লেখ্য, বাক্তা সেই উপত্যকার প্রাচীন নাম যেখানে বর্তমান মক্কা নগরী অবস্থিত। আজ হতে থায় চার হাজার বছর পূর্বে খোদাপ্রেমিক ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ্ তালার নির্দেশে আপন প্রিয়তমা স্ত্রী হ্যরত হাজেরা এবং স্নেহের পুত্র হ্যরত ইসমাইল (আ.)-কে বর্তমান মক্কা শহর যেখানে অবস্থিত সেখানে রেখে যান। সে যুগে উক্ত স্থান সম্পূর্ণ জনমানবহীন ছিল। জীবনধারণের কোন উপকরণ সেখানে ছিল না। হ্যরত ইবরাহীম (আ.) সামান্য কিছু খাদ্য এবং পানীয়ের ব্যবস্থা করতো আল্লাহ্ ওপর ভরসা করে স্থীয় স্ত্রী-পুত্রকে রেখে নিজ এলাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। এদিকে কয়েক দিনে যখন খাদ্য ও পানীয় নিঃশেষ হয়ে গেল তখন ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর পুত্র ইসমাইলকে নির্ধাত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য অসহায় জননী হাজেরা পানির সন্ধানে সাফা ও মারওয়া পাহাড়দেয়ের মাঝে ইতস্তত ছুটোছুটি করতে থাকেন। সব চেষ্টা যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো, তখন আল্লাহ্ তালা মরণভূমির তলদেশ হতে এক সুস্থানু পানীয় জলের ফোয়ারা নির্গত করেন। প্রাচীন গ্রন্থেও এর বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। (আদিপুস্তক, ২১:২৯)।

এ ফোয়ারা পরবর্তীকালে ‘যময়ম কৃপ’ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পরবর্তীকালে এ কৃপকে কেন্দ্র করে জনবসতি গড়ে উঠে এবং পবিত্র মক্কা নগরীর ভিত্তি স্থাপিত হয়। আল্লাহ্

নির্দেশে হ্যরত ইবরাহীম (আ.) পুনরায় শ্রী-পুত্রের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য মক্কায় আগমন করেন। আল্লাহ তাঁকে স্বপ্নযোগে একমাত্র প্রিয় পুত্রকে কুরবানী করার নির্দেশ প্রদান করেন। তৎকালীন যুগে সমাজে নরবলির প্রচলন থাকায় হ্যরত ইবরাহীম (আ.) স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী পুত্র ইসমাইলকে জবাই করতে উদ্যত হন, কিন্তু আল্লাহ তাঁলা প্রত্যাদেশ বাণী দিয়ে ইসমাইলের পরিবর্তে পশু কুরবানী করার আদেশ দিয়ে ইসমাইলকে আল্লাহর বাণী প্রচারের জন্য উৎসর্গ করার হৃকুম প্রদান করেন। এজন্যই হ্যরত ইবরাহীম (আ.) ও হ্যরত ইসমাইল (আ.)-এর পুণ্য-সূত্রির স্মরণে প্রতি বছর পশু কুরবানীর প্রচলন হয়েছে। হ্যরত আদম (আ.) কর্তৃক নির্মিত ইবাদতগৃহটি তখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। তাই আল্লাহ সেই গৃহকে পুনর্নির্মাণের জন্য হ্যরত ইবরাহীম (আ.)-কে নির্দেশ প্রদান করেন। হ্যরত ইবরাহীম (আ.) পুত্র হ্যরত ইসমাইল (আ.)-এর সহযোগে কা'বা গৃহকে নতুন করে গড়ে তোলেন। নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে আল্লাহ তাঁলা হজ্জের ঘোষণা করার আদেশ প্রদান করেন। আল্লাহ তাঁলা বলেন, “ওয়া আয়্যিন ফিল্লাসি বিল হাজ্জ”- অর্থাৎ, “হে ইবরাহীম! তুমি সকল মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা কর।” (সূরা হাজ্জ : ২৮)।

ছাদবিহীন কা'বা গৃহটি ৯ হাত উঁচু, ২৩ হাত দীর্ঘ এবং ২২ হাত প্রস্থবিশিষ্ট ছিল। পরবর্তীকালে কা'বা গৃহের আরও বহুবার সংস্কার করা হয়। মহানবী হ্যরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়াত লাভের পূর্বে কোরাইশারা যখন কা'বাগৃহের সংস্কার করে তখন পাথরের অভাবে মূল গৃহটিকে বাধ্য হয়ে কিছুটা ছোট করতে হয়। সেই পরিত্যক্ত অংশের নাম ‘হাতিম’। তোয়াফের হিসাব রক্ষার সুবিধার্থে গৃহের এক কোণে কালো রঙের একটি পাথর স্থাপন করা হয়। এ পাথরই ‘হাজরে আস্তওয়াদ’ নামে পরিচিত। বাইবেলেও এ পাথরের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়, যথা- “তা পরীক্ষাসিদ্ধ প্রস্তর, বহুমূল্যবান কোণের প্রস্তর, অতি দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত।” (যিশাইয়, ১৮:১৬)।

পবিত্র কা'বা, হজ্জ এবং হ্যরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা পবিত্র কুরআনের সূরা মায়েদার ১৩ তম রূক্কু, সূরা বাকারার ১৫, ২৪ ও ২৫ তম রূক্কু, সূরা হাজ্জের ৪৮ তম রূক্কু, সূরা আসু সাফ্ফাতের ৪৮ তম রূক্কু, সূরা ইবরাহীমের ৬৭ তম রূক্কু, সূরা আনকাবুতের ৭ম রূক্কুতে বর্ণিত হয়েছে। তৎসঙ্গে বাইবেলের আদিপুস্তকের ২, ১২, ১৬, ১৭, ১৮ অধ্যায় এবং যিশাইয়ের ৪৫: ১৩-১৪ পদেও বর্ণিত হয়েছে।

হজ্জের উদ্দেশ্য ও শিক্ষা

হ্যরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) তাঁর বিখ্যাত “তফসীরে কবীর”-এ সূরা হজ্জের যে দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন নিম্নে এর অংশ-বিশেষের ভাবার্থ প্রদান করা হলো:
“আল্লাহ তাঁলা বলেছেন, আমি ইবরাহীমকে এ-ও বলে দিয়েছিলাম, এ আদেশ শুধু

তোমার জন্যই নয়, বরং সমস্ত মানবজাতির জন্য। মানুষ দূর-দূরাত্ত হতে আগমন করবে আর এভাবে সারা দুনিয়ায় একটি মাত্র ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথকে সুগম করবে। লোকেরা কুরবানী করার পর গোসল করে নিজেদের দেহের মলিনতা দূর করার সাথে-সাথে তাদের অঙ্গরকে পরিষ্কার করবে এবং তারা আল্লাহর সাথে যে ওয়াদা করেছিল তা পূর্ণ করবে আর সেই সাথে এ পুরাতন গৃহের তোয়াফ করবে। এতে যেন কেউ এ কথা না বুঝেন, এ প্রাণহীন বস্তুকে খোদার তুল্য সম্মান প্রদান করা হয়েছে। তোয়াফ একটি প্রাচীন পদ্ধতি- যা কুরবানীর প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হতো। কোন লোক অসুস্থ হলে তার চারদিকে তোয়াফ করা হতো। এর উদ্দেশ্য ছিল রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পরিবর্তে তোয়াফকারী নিজের জীবন কুরবানী করতে চায়। আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যুগে-যুগে এমন সব লোকের উদ্ভব হবে যারা এ গৃহের সম্মান এবং আল্লাহ তাঁ'লার ইবাদতকে কায়েম রাখার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করবে। অন্যথায় বাহ্যিকভাবে এ তোয়াফের কোন মূল্য নেই।

সূরা হজের বর্ণিত আয়াতে আল্লাহ তাঁ'লা ইসলামের অন্যতম প্রধান ইবাদত হজের উল্লেখ করে বলেছেন, প্রতি বছর লক্ষ-লক্ষ লোক বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন জাতি, অসংখ্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এবং নানা ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও মক্কায় একত্র হয়ে এ সত্যেরই সাক্ষ্য প্রদান করে থাকে যে, তাদের মাঝে বর্ণ, গোত্র ও ভাষার শত-শত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ইসলামের তৌহীদমন্ত্র তাদেরকে একই সূত্রে গেঁথে দিয়েছে। সমবেত মুসলিমরা তাদের কর্ম দিয়ে এটিও প্রমাণ করে, এ কাঁ'বা গৃহের হেফায়তের জন্য তারা সদা প্রস্তুত এবং কোন শক্তিই কাঁ'বার বিনাশ ও মুসলমানদের একতাকে নষ্ট করতে সক্ষম নয়। সমবেত মুসলিম জনতা পৃথিবীর প্রত্যেক প্রান্তে ইসলাম প্রচার লাভ করেছে দেখেই আনন্দিত হয় না, বরং এক অনাবাদ ও অনুর্বর অঞ্চল হতে একদিন যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়েছিল- সেই ধ্বনির ডাকে সাড়া দিয়ে লক্ষ-লক্ষ লোকের একত্রিত হবার দৃশ্য দেখেও নিজেদের ঈমানকে তাজা করে।

যেখানে রসূল করিম (সা.)-এর জন্য ও কর্মভূমি ছিল, যেখানে একসময় ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বাক্য উচ্চারণ করার অনুমতি ছিল না, আজ সেখানে লক্ষ কঠে ‘আল্লাহ আকবর, আল্লাহ আকবর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহ আকবর, আল্লাহ আকবর ওয়াল্লাহল্লাহল্লাহল্লাহ হামদ’ এবং ‘লাবায়িকা আল্লাহহ্মা লাবায়িক, লাবায়িকা লা শারীকা লাকা লাবায়িক’ বজ্জিনিনাদে ধ্বনিত হচ্ছে। প্রতি বছর অগণিত লোক সমবেত হয়ে জীবন্ত ধর্ম ইসলাম এবং রসূল করিম (সা.)-এর সত্যতা প্রমাণ করছে। হজের প্রকৃত আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য হলো, সব ধরনের সম্পর্ককে ছিন্ন ও চূর্ণ করে একমাত্র আল্লাহ তাঁ'লার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করা। তাই এ উদ্দেশ্যকে বাস্তবে সার্থক করে তোলার জন্য সামর্থ্যবান লোকদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন পার্থিব সব কিছুকে পরিত্যাগ করে মক্কা মুকাব্রমায় উপস্থিত হয় এবং এভাবে জন্মভূমি, প্রিয় পরিবার-পরিজন ও

সহায়-সম্পদকে কুরবানী করার শিক্ষা গ্রহণ করে। পার্থিব বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহ'র ইচ্ছায় নিজেকে সমর্পিত করাই হজের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাই যদি কেউ স্বপ্নে হজ করতে দেখে তা হলে এর তা'বির (ব্যাখ্যা) হলো, উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়া। আর মানবজন্মের একমাত্র উদ্দেশ্যই হল আল্লাহ'র ইবাদত করা। তাই হজ মানবজন্মের উদ্দেশ্যকে সফলতা দান করতে সাহায্য করে। হজ সম্পন্ন করতে গিয়ে হজের আনুষ্ঠানিকতা পালনের মধ্য দিয়ে প্রত্যেক হাজী প্রায় চার হাজার বছর পূর্বের হয়রত ইবরাহীম (আ.), হয়রত ইসমাইল (আ.) ও হয়রত হাজেরার অতুলনীয় ঐশ্বী প্রেম, ত্যাগ ও তিতিক্ষার অপূর্ব দৃশ্যকে স্বচক্ষে দর্শন করে নিজেদেরকে অদ্বিতীয় গড়ে তোলার প্রেরণা লাভ করে। আল্লাহ'র রাস্তায় নিঃশেষে সবকিছু দান করলে এতে ক্ষয় হয় না, জয় ও অমরত্ব লাভ করা যায়— হজ এ শিক্ষাকে জ্ঞানত ও জীবন্ত করে তুলে ধরে।

হজের আরও একটি প্রধান শিক্ষা হলো, মুসলমানদের অন্তরে কেন্দ্রের প্রতি আনুগত্য ও ভালোবাসা সৃষ্টি করা। ইসলামের মূল কেন্দ্রে একত্র হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হতে আগত মু'মিন ভাইয়েরা একে অপরের সমস্যাকে উপলক্ষ করার এবং তার সাথে-সাথে একে অপরের সৌন্দর্যকে দর্শন করে নিজেদের জীবনকে উৎকৃষ্ট আদর্শে রূপায়িত করে বিশ্ব শান্তির পথকে সুগম করার সুযোগ লাভ করে থাকে।

আল্লাহ'র তা'লার প্রতীকসূচী

যেসব বস্তু বা স্থানের সাথে হজ পালনকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে সেগুলোকে কুরআন করিমে 'শা'আয়িরআল্লাহ'- অর্থাৎ, 'আল্লাহ'র নিদর্শন' বা প্রতীকরূপে আখ্যা দেয়া হয়েছে।
(সূরা বাকারা: ১৫৯, সূরা মায়েদা: ৩, সূরা হাজ্জ: ২৩)।

বস্তুতপক্ষে এগুলোকে আল্লাহ'র তা'লা কতগুলো অন্তর্নিহিত বিষয়ের প্রতীকরূপে ব্যবহার করেছেন যার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

(ক) কা'বা বা বায়তুল্লাহ (আল্লাহ'র ঘর) উপাসনার সুপ্রাচীন এবং সর্বপ্রথম গৃহ। এ গৃহের চারিদিকে হজ যাত্রীরা দোয়া পড়তে-পড়তে তোয়াফ বা প্রদক্ষিণ করেন। ঘোষণা করেন আল্লাহ'র একত্র ও মহত্বের কথা। সমস্ত মানবজাতির একত্রের শিক্ষাও এ তোয়াফের মাঝে নিহিত আছে।

(খ) সাফা ও মারওয়ার মাঝে দৌড়ানোর মাধ্যমে হাজীরা স্মরণ করেন হয়রত ইসমাইল (আ.) এবং হয়রত হাজেরার করুণ অবস্থার কথা। তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন কীভাবে আল্লাহ'র তা'লা জনমানবহীন অঞ্চলে নির্বাসিত, নিঃসহায় বাস্তাকে সাহায্য করেছিলেন।

(গ) 'মীনা' শব্দটি 'উমরীয়া' শব্দ হতে এসেছে। এর অর্থ হল, কোন উদ্দেশ্য বা কোন অভিপ্রায়। মীনাতে যাওয়ার উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ'র সাথে সাক্ষাৎ লাভের ইচ্ছা পোষণ করা। মীনা হতে মুজদালিফায় গমন করতে হয়।

(ঘ) ‘মুজদালিফা’ শব্দটির অর্থ হলো নৈকট্য। এর দ্বারা হাজী হস্তযোগ করেন, যে উদ্দেশ্যে তিনি এসেছেন তা নিকটতর বা আসন্ন। মুজদালিফার আরেকটি নাম হলো, ‘মাশ’আরং হারাম’ বা পবিত্র প্রতীক। এটা ইঙ্গিত করছে, আল্লাহর সাথে মিলিত হবার এক পরম লগ্ন উপস্থিত হয়েছে। মুজদালিফার পর আরাফাতে যেতে হয়।

(ঙ) ‘আরাফাত’ কথাটির মূল অর্থ চিনতে পারা বা জানতে পারা। আরাফাতের অবস্থান হজ্জযাত্রীকে হাশরের ময়দানের সেই অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যখন সে নিশ্চিতভাবে খোদাকে জানতে পারে এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে।

(চ) বিশ্বাসীর এ মহামিলনের জন্য যে স্থানকে আল্লাহ তা'লা নির্বাচিত করেছেন, তা কোন শস্য- শ্যামল, সুশোভিত স্থান নয়, বরং তা কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী এক অনুর্বর, শুক্ষ ভূমি। (সুরা কাহাফ: ৩৮)। সেখানে রয়েছে শুধু বিস্তৃত বালুকারাশি, কক্ষ এবং ভঙ্গুর শিলাময় ভূমি। এরপ একটি স্থান এজন্য নির্বাচিত করা হয়েছে যেন এতে আমরা বুঝতে পারি, এ স্থানে সাধারণ কোন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আকর্ষণ নেই। সেখানে যদি কেউ যায় তবে তার যাত্রার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে খোদা, একমাত্র খোদারই নৈকট্য লাভ। এজন্য আল্লাহ তা'লা বলেছেন, জেনে রেখো, তোমাদেরকে এ স্থানে একত্র করা হয়েছে তাঁর সাথে মিলিত হবার জন্য (কোন পার্থিব উদ্দেশ্যে নয়)। (সুরা বাকারা : ২০৪)

(ছ) ‘ইহরাম’ দ্বারা কিয়ামতের দ্রুত্যের কথা মনে করানো হয়। মৃত ব্যক্তির ন্যায় হজ্জযাত্রী সেলাইবিহান দু'টি চাদর দিয়ে নিজ দেহ আবৃত করেন। এ অবস্থা আরাফাতে অবস্থানকালে হজ্জযাত্রীদের কিয়ামত দিবসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যেন মৃত অবস্থা হতে শুভ পরিচ্ছদে আবৃত হয়ে মানবমঙ্গলী তাদের রবের (প্রভু-প্রতিপালকের) সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে।

(জ) মীনাতে অবস্থানকালে তিনটি স্তম্ভে (জামারাতুল উলা বা দুনিয়া, উষ্টা এবং আকাবা) তিন বার প্রস্তর নিক্ষেপের মাধ্যমে হজ্জযাত্রী মানব জীবনের তিনটি স্তর সম্বন্ধে স্মরণ করে। এগুলো হলো— (১) পার্থিব বা দুনিয়ার জীবন যা ‘জামারাতুদ দুনিয়া’ বা নিকটস্থ স্তম্ভ দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে, (২) কবরের স্তর বা মধ্যবর্তী স্তম্ভ (ইহজীবন এবং পরজীবনের মাঝে বিদ্যমান) যা ‘জামারাতুল উষ্টা’ বা মধ্যবর্তী স্তম্ভ বলে অভিহিত এবং (৩) পরকালের জীবন (যা আকাবা বলে পরিচিত) যা ‘জামারাত আল-আকাবা’ দিয়ে চিহ্নিত হয়েছে। এ সব স্তম্ভে প্রস্তর নিক্ষেপ শয়তানকে প্রস্তরাঘাত করার প্রতীক মনে করা হয়। ফলে মানুষের মন হতে সব কুপ্রয়োচনা এবং কুচিঞ্চল বিতাড়িত হয়। কেননা আল্লাহর উপস্থিতি শয়তানকে বিতাড়িত করে।

(ঘ) পশু কুরবানীর মাধ্যমে হজ্জযাত্রীগণ স্মরণ করেন হ্যারত ইবরাহীম (আ.) এবং হ্যারত ইসমাইল (আ.)-এর কুরবানীর কথা, তাঁদের অতুলনীয় ত্যাগ এবং তিতিক্ষার কথা। রূপকভাবে এর মাঝে এ শিক্ষা নিহিত রয়েছে, মানুষ যেন শুধু নিজেকে কুরবানী করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত না রাখে, উপরন্তু তাকে তার ধন-সম্পদ এমন কি

সন্তান-সন্ততিকেও আল্লাহর পথে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

(এও) কা'বার চতুর্দিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করা, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাতবার দৌড়ানো ইত্যাদির মাঝে ‘সাত’ সংখ্যাটি গুরুত্বপূর্ণ। আরবী ভাষায় ‘সাত’ পূর্ণতা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (আল আকরাব, আল মাওয়ারিদ প্রভৃতি আরবি অভিধান দ্রষ্টব্য)। বিশেষ করে হজের সময় এবং জীবনের অন্যান্য বিষয়েও হজ্যাত্রীকে ‘পূর্ণতার’ দিকে দৃষ্টি দিতে হবে— অর্থাৎ,, কোন প্রকার অসমাপ্ত বা অপূর্ণ কাজে সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না।

সংক্ষেপে বলা যায়, হজের বিভিন্ন নিয়ম-কানুনের মাঝে যেসব জিনিস ব্যবহার করা হয় বা যেসব কাজ করা হয় সেগুলো প্রতীকরণে ব্যবহৃত হয়েছে। এ প্রতীকগুলোতে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।” [তফসীরে কবীর, ১ম খন্ড, সূরা বাকারার ২০৪ নং আয়াত। প্রণেতা: হ্যরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ সানী (রা)]।

পরিশিষ্ট

সূরা বাকারার ২০৪ নং আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে হজের তত্ত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে নিম্নোক্ত সারমর্ম ‘তফসীরে কবীরে’ বর্ণিত হয়েছে, “হজ একটি মহান আধ্যাত্মিক বিধান। কুরআনের শিক্ষা অনুসারে মানব জাতির জন্য সর্বপ্রথম উপাসনালয় বা ইবাদত গৃহ হলো কা'বা। (সূরা আলে ইমরান : ৯৭)। হ্যরত আদম (আ.) এটি নির্মাণ করেছিলেন এবং হ্যরত ইবরাহীম (আ.) এ কা'বা পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। কুরআন করীম একে ‘সুপ্রাচীন গৃহ’ বলে অভিহিত করেছে। (সূরা হাজ: ৩০ ও ৩৪ নং আয়াত)। ইহুদী শাস্ত্রের এক বর্ণনায় আছে, “আব্রাহাম সেই উপাসনালয় পুনর্নির্মাণ করেছিলেন— যা আদম কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। এরপর তা নূহের মহাপ্লাবনে বিধ্বস্ত হয়েছিল এবং নূহ কর্তৃক পুনর্নির্মিত হয়েছিল এবং পরে ভাঙ্গের যুগে (Age of Divisions) বিধ্বস্ত হয়েছিল।

[The Targums of Onkelos and Jona: Han Ben Uzziel. Translated by: T.W. Ethebridge, Page : 226]

এ বর্ণনার সাথে একমাত্র কা'বারই সামঞ্জস্য রয়েছে। কারণ এত প্রাচীনকালের একুশ আর কোন উপাসনালয় নেই। এটি আল্লাহর একান্ত অভিপ্রায় যে, এ কেন্দ্রস্থলে বিশেষ বিভিন্ন স্থানের মানুষ একত্রিত হয়ে মানবজাতির একত্র এবং বিশ্বনিয়স্তা খোদা তাঁলার সাথে সকল মানুষের নিগৃঢ় সম্পর্কের বিষয়ে অবহিত হবে। বিভিন্ন জাতিতে বিরাজমান কৃত্রিম পার্থক্যগুলোকে ভুলে মানবতাবোধের ঐক্য-বন্ধনে আকৃষ্ট হবার জন্য হজের এ

অনুষ্ঠান তথা মহামিলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থান ও বিভিন্ন জাতির লোক হজের উদ্দেশ্যে একত্র হয়ে একে অন্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে এবং কল্যাণমূলক বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করতে পারে। এ সুযোগকে হজ্জযাত্রীর জন্য আরও বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যে শুধু মক্কার চার দেয়ালের মাঝেই তাকে থাকতে বলা হয়নি, অধিকস্তুতি মীনা, মুজদালিফা, আরাফাত এবং পুনরায় মীনায় অবস্থান করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

[তফসীরে কবীর, ১ম খন্ড, সূরা বাকারার ২০৪ নং আয়াত। প্রগেতো: হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ সানী (রা)]।

হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.)-এর দোয়া

হযরত সুফী আহমদ জান লুধিয়ানীর মাধ্যমে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর পক্ষ হতে বায়তুল্লাহ শরীফে এ দোয়া পাঠ করানো হয়। দোয়াটির বঙ্গানুবাদ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো—

“হে করণাময় আল্লাহ! তোমার অধম, অযোগ্য ও গুনাহগার দাস গোলাম আহমদ, যে তোমারই দেশ ভারতে বাস করে। তার এ বিনীত নিবেদন, হে রাহমানুর রাহীম! তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও এবং আমার ক্ষটি-বিচুতি এবং পাপ ক্ষমা করো, কেননা তুমি গাফুরুর রাহীম। আমায় দিয়ে এমন কাজ সম্পূর্ণ করাও যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। আমার আর আমার নফসের (নফসে আম্মারার) মাঝে পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব সৃষ্টি করো। আমার জীবন, আমার মরণ এবং আমার যাবতীয় শক্তি তোমার রাস্তায় নিয়োজিত করো। তোমার প্রেমের মাঝে আমাকে জীবিত রাখো এবং তাতেই মৃত্যু দান করো। তোমার প্রিয় লোকদের মধ্যে হতে আমাকে উত্থিত করো। হে আরহামুর রাহেমীন! যে কাজের প্রচারের জন্য তুমি আমাকে অদিষ্ট করেছ এবং যে সেবার জন্য তুমি আমার অন্তরে প্রেরণা সৃষ্টি করেছ, একে তোমারই অনুগ্রহে পূর্ণতা দান করো। এ অধমের হাতে বিরক্তবাদী এবং ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞ লোকদের হজ্জত পূর্ণ করো। এ অধম এবং তার প্রিয় ও একান্ত বাধ্য অনুসারীদের ক্ষমা করো এবং তাদেরকে অনুগ্রহের ছায়াতলে আশ্রয় দাও এবং তাদেরকে সাহায্য দান করো। আমার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবাগণের উপর অশেষ দুর্লভ, সালাম ও কল্যাণ অবতীর্ণ করো। আমীন, সুস্মা আমীন।”

(দৈনিক আল্ল ফযল: ১১ অক্টোবর ১৯৮২ ইং)।

পঞ্চম পরিচেদ

যাকাত

যাকাতের অর্থ হল মাল বা সম্পদের বৃদ্ধি হওয়া এবং সম্পদকে পরিত্র করা। এটি ইসলামের তৃতীয় রোকন বা স্তুতি। এটি এরূপ সদকা বা দান— যা ধনী ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়ে গরীব এবং অভাবীকে দেয়া হয়। আল্লাহ তাঁরা কুরআন করীমে বলেছেন-

وَمَا أَتَيْتُمْ مِّنْ زَكْوَةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُصْعَفُونَ^①

(ওয়ামা আতায়তুম মিন যাকাতিন্ তুরীদুনা ওয়াজ্হাল্লাহি ফাউলাইকা হুমুল মুয়ায়ফুন)
অর্থ: “আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যাকাত হিসেবে যা দাও সেক্ষেত্রে এরাই সেইসব লোক, যারা (যাকাতের মাধ্যমে নিজেদের ধন-সম্পদ) বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে।” (সূরা রাম : ৪০)

যাকাত শব্দের অর্থ

যাকাত শব্দের নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার অর্থ হ্যাঃ

- ক) কোন জিনিসের বৃদ্ধি পাওয়া এবং আশিসপূর্ণ হওয়া।
- খ) খারাপ অবস্থা হতে উত্তম অবস্থায় উন্নীত হওয়া।
- গ) স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা।
- ঘ) ‘তাহারাত’ লাভ করা বা পরিত্র হওয়া।
- ঙ) প্রশংসার যোগ্য হওয়া।
- চ) উচ্চ পর্যায়ের বস্ত।
- ছ) সম্পদের যাকাত দেয়া যাতে সেই সম্পদ পরিত্র হ্যাঃ।
- জ) কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সদকাকে যাকাত বলা হ্যাঃ, কেননা এটি দেয়ার ফলে মাল বরকতপূর্ণ হ্যাঃ, বৃদ্ধি পায় এবং ক্ষয়-ক্ষতি ও বিপদ হতে মুক্ত হ্যাঃ।
(তফসীরে কবীর, সূরা বাকারার ৪৪ নং আয়াতের তফসীর দ্রষ্টব্য)।
- হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, “ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে গরীবদের দেয়ার নাম যাকাত। এতে উত্তম পর্যায়ের সহানুভূতির শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এভাবে মুসলমানরা সামাজিক বিপদাবলী মোকাবেলা করতে সক্ষম হতে পারে।”
- এটি আদায় করা ধনীর উপর ফরয। ফরয না হলেও মানবীয় সহানুভূতির অনুপ্রেরণায় গরীবদের সাহায্য করা উচিত। কিন্তু আজকাল আমি দেখি, প্রতিবেশী যদি অভুত থেকে মৃত্যুমুখী হ্যাঃ, তবুও অঙ্কেপ করা হ্যাঃ না। অথচ অধিকাংশ লোক নিজ আরাম-আয়েশের

দিকে খেয়াল রাখে। খোদা তাঁলা আমার হস্তয়ে যে কথাটি উদ্বেক করেছেন আমি তা বর্ণনা না করে থাকতে পারি না। মানুষের মাঝে সহানুভূতি একটি উচ্চাদের শক্তি বা গুণ। আল্লাহ্ তাঁলা বলেন,

لَنْ تَأْلُو الْبِرَّ حَتَّىٰ تَفِقُّدَ مَمَّا تَحْبُّونَ^۱

(লান্ তানালুল বিরো হাত্তা তুনফিকু মিস্মা তুহিবুন)

অর্থ: “তোমরা কখনও প্রকৃত পুণ্য অর্জন করতে পারবে না— যে পর্যন্ত তোমরা যা ভালোবাস তা থেকে খরচ না কর।” (সুরা আলে ইমরান : ৯৩)।

“অনেক লোক আছে যারা বাসী এবং নষ্ট রুটি ও তরকারি— যা কোন কাজে আসে না, সেগুলো গরীবকে দেয় এবং মনে করে আমরা পুণ্যের কাজ করে ফেলেছি। এরপ ধারণা আল্লাহ্ কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।” (মাজমুয়া ফাতওয়া আহমদীয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬০)।

যাকাতের নির্দেশ

কুরআন করীমে বহু জায়গায় যাকাতের স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো, সব মানুষের ধন-সম্পদ কোন না কোন লোকের সাহায্য নিয়েই উপার্জিত হয়। এ উপার্জনে অনেক সময় অন্যের হক বা অধিকার শামিল হয়ে থাকে। মজুরী হিসেবে অন্যদের হক মিটিয়ে দেয়ার পরও ধনীর সম্পদে অন্যদের কিছু অধিকার বাকী থেকে যায়। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হলো, পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ সকল মানুষের জন্য, কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য নয়। আল্লাহ্ তাঁলা বলেছেন,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

(হয়াল্লায়ী খালাক্কা লাকুম মা ফীল আরয় জামী'আন)

অর্থ: “তিনিই [আল্লাহ্ যিনি] পৃথিবীতে যা-ই আছে সবই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।” (সুরা বাকারাঃ ৩০)।

সুতরাং শ্রমিক যখন সম্পদ সৃষ্টি করে তখন মজুরী পাওয়ার পরও সেই সম্পদে শুধু তাদেরই নয়, অন্যান্য মানুষেরও কিছু না কিছু অধিকার থাকে। এ অধিকার পূর্ণ করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অভাবী লোকদের মাঝে তা বিতরণের জন্য যাকাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোন-কোন যাকাত এ জন্য দিতে হয় যে, এগুলো সার্কুলেশন বা আবর্তনে না থাকার ফলে সমাজ পূর্ণ উপকারিতা হতে বাস্তিত হয়। তাছাড়া যাকাতের নির্দেশ এ জন্য দেয়া হয়েছে, অনেক সময় কোন-কোন লোক গরীবদের প্রতি নানা কারণে দৃষ্টি দিতে পারে না বা দেয় না। সেজন্য যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের বাঁচার ন্যূনতম অধিকারকে বিধিবদ্ধভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং “বায়তুল মাল” (খিলাফতের অধীন

কোষাগার) হতে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও করা হয়ে থাকে। কারণ, গরীব লোকদেরও আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে রক্ষা করার জন্যই শরীয়ত ধনীর কাছ থেকে যাকাত, সদকা প্রভৃতির আকারে তাদের অধিকার আদায় করার ব্যবস্থা করেছে। অবশ্য যাকাত গরীবদের উপর কোনো অনুগ্রহ নয়, বরং এটি দানকারীর নিজস্ব মঙ্গলের জন্য এবং তার মাল পরিশুল্দ ও পবিত্র করার জন্য দেয়া অত্যাবশ্যক। এজন্য কুরআন করীমে বারবার এসেছে-

يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوْةَ

(ইউকিমুনাস্ সালাতা ওয়া ইউতুনায় যাকাতা)

অর্থ: “তারা নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়।”

আল্লাহ তাঁলা আরও বলেছেন, “মু’মিন পুরুষ ও মু’মিন নারীরা পরম্পরের বন্ধু। তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং মন্দ কাজে বাধা দেয় এবং তারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। এরাই এমন যাদের ওপর আল্লাহ অবশ্যই দয়া করবেন। নিচয় আল্লাহ মহাপ্রাক্তমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। মু’মিন পুরুষ ও মু’মিন নারীদের আল্লাহ প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন এমন বাগানসমূহের— যাদের পাদদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে, সেখানে তারা চিরকাল বাস করবে।” (সূরা তাওবা: ৭১-৭২)।

আল্লাহর পথে খরচ করলে ধন-সম্পদহাস পায় না, বরং বৃদ্ধি পায়। কারণ আল্লাহ তাঁলা রিয়ক বা উপজীবিকা (Provisions) বাড়িয়ে দেন এবং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী অন্যদের কমিয়ে দেন। তাই আল্লাহ তাঁলা বলেছেন,

فَلْ إِنَّ رَبِّيْ بِيْسَطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقِرِّلَهُ وَمَا آنفَقَتْمُ

مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ④

(কুল ইন্না রাবী ইয়াবসুত্র রিয়কা লিমাইয়াশাউ মিন ই’বাদিহ ওয়া ইয়াকদির লাভ ওয়ামা আনফাকতুম মিন শায়য়িন ফাহয়া ইউখালিফুহ ওয়া হয়া খায়রুর রায়কীন)

অর্থ: “তুমি বল, ‘নিচয়ই আমার প্রতিপালক স্বীয় বান্দাদের মধ্য হতে যার জন্য চান রিয়ক (এর ক্ষেত্রে) সম্প্রসারিত করে দেন এবং যার জন্য চান সংকীর্ণ করে দেন। এবং তোমরা যা কিছু খরচ করবে তিনি অবশ্যই এর প্রতিদান দিবেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই সর্বোত্তম রিয়ক দানকারী।’” (সূরা সাবা : 80)।

আল্লাহ তাঁলা আরও বলেছেন-

**مَئَلَ الْأَذْيَنَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَيِّلِ اللَّهِ كَمَلَ حَبَّةً أَبْتَثَ سَبْعَ سَابِلَ فِي كُلِّ سُبْلَةٍ
مِائَةَ حَبَّةً وَاللَّهُ يَصْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ طَوَّلَهُ وَاسْعَ عَلَيْهِ** ⑤

(মাসালুল্লাহীনা ইউনফিকুন আমওয়ালাহুম ফী সাবীলিল্লাহি কামাসালি হারবাতিন্ আম্বাতাত্ সাব'আ সানাবিলা ফী কুল্লি সুমরুলাতিম মিআতু হারবাতিন, ওয়াল্লাহু ইউরায়িফু লিমাইয়েশাউ ওয়াল্লাহু ওয়াসিউন আলীম)

অর্থ: “যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করে, তাদের দ্রষ্টান্ত এক শস্যবীজের দ্রষ্টান্তের ন্যায়, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেকটি শীষে একশ’ শস্যবীজ থাকে। এবং আল্লাহ’ যার জন্য চান (এর চেয়েও) বৃদ্ধি করে দেন। নিশ্চয় আল্লাহ প্রার্থ্য দানকারী, সর্বজ্ঞ।” (সুরা বাকারা : ২৬২)।

এছাড়া আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করলে মানুষ কুরবানীর মাধ্যমে এমন একটা আনন্দ অনুভব করে যাতে তার আত্মা সতেজ হয়, ঈমান বাড়ে এবং মজবুত হয়। (সুরা বাকারা : ২৬২)।

যাকাত প্রদানের বরকত সমধৈ সহীহ বুখারী এবং অন্যান্য হাদীসে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। হাদীসে এসেছে, “যখনই কেউ হয়রত রসূল করিম (সা.)-এর কাছে যাকাত নিয়ে উপস্থিত হতেন তখনই তিনি তার নাম ধরে এ প্রার্থনা করতেন, “হে আল্লাহ! এ ব্যক্তি এবং তার বংশধরের ওপর তোমার নেয়ামত নাফিল কর।” সেই ব্যক্তির জন্য কর অপূর্ব এ নেয়ামত যে আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা রসূল করিম (সা.)-এর এ দোয়ায় নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করে।

যাকাত কার ওপর ফরয

প্রত্যেক সুস্থ, বুদ্ধিসম্পন্ন, প্রাণ্ডবয়স্ক ধনসম্পদের অধিকারী লোক, যার কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা, রূপা, টাকা অথবা ব্যবসার পুঁজি এবং সামগ্রী, গৃহপালিত পশু পুরো ১ বছর জমা রয়েছে তার জন্য যাকাত দেয়া ফরয। যাকাত হালালভাবে উপার্জিত সম্পদের উপর দেয়া আবশ্যক এবং প্রতি বছর দিতে হয়। খণ্ণী ব্যক্তির জন্য যাকাত ফরয নয়।

যাকাতের উপকারিতা

যাকাত এজন্য দিতে হয়, যেন আল্লাহর সাথে প্রকৃত ভালোবাসা এবং সত্যিকার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। যাকাতে কৃপণতার অভ্যাস দূর হয় এবং জাতির গরীবদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব হয়। যাকাত ধন-সম্পত্তির প্রতি ভালোবাসা ও আসক্তি হতে রক্ষা করে এবং ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেয়ার শক্তি দান করে। আল্লাহ’ তাঁলা বিত্তশালী ব্যক্তিদের সম্পর্কে রসূল করিম (সা.)-কে নির্দেশ দিয়েছেন:

حُدُّمٌ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تَطْهِرُهُمْ وَتُزَكِّيْهُمْ بِهَا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ

(খুব মিন আমওয়ালিহিম্ সাদাকাতান তুতাহহিরুহুম ওয়া তুয়াক্তিহিম ওয়া সাল্লি

আলায়হিম ইন্না সালাতাকা সাকানুল লাহুম)

অর্থ: “তাদের ধন-সম্পদ হতে তুমি সদকা (যাকাত) গ্রহণ করো, যেন এ দিয়ে তুমি তাদেরকে পবিত্র করতে পার এবং তাদেরকে পরিশুল্ক করতে পার ও তাদের জন্য দোয়া কর। নিচয় তোমার দোয়া তাদের জন্য প্রশাস্তির কারণ হবে।” (সূরা তওবা : ১০৩)। সুতরাং যাকাত দেয়ার ফলে একদিকে নিজের মাঝে এক পবিত্র পরিবর্তন সাধিত হবে, স্থীয় ধন-সম্পদ পবিত্র হবে, অন্যদিকে রসূল (সা.)-এর দোয়ারও অংশীদার হবে। কত সৌভাগ্যবান সে ব্যক্তি যে হ্যুম্র (সা.)-এর দোয়ার অংশীদার হয়!

যাকাত দিলে ধন-সম্পদ কমে না

কোন-কোন দুর্বল ঈমানদার ব্যক্তি মনে করেন, যাকাত দিলে ধন-সম্পদ কমে যাওয়ার ভয় থাকে। কিন্তু আল্লাহই সব উপজীবিকা বা রিয়কের মালিক। আল্লাহ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন:

أَلَّيْسِ إِنَّمَا تُعَذِّبُ الْفَقَرَوْ يَأْمُرُكُمْ بِالْمُحْسَنَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ يَعْدِلُ كُمْ مَعْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا
وَاللَّهُ أَوْسَعُ عَلَيْهِ^۱

(আশৃশায়ত্তানু ইয়াইদুরমুল ফাকুরা ওয়া ইয়ামুরকুম বিল্ফাহশায় ওয়াল্লাহু ইয়ায়িদুরকুম মাগফিরাতাম্ মিন্হু ওয়া ফায়লান্ ওয়াল্লাহু ওয়াসি'উন আলীম)

অর্থ: “শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং সে তোমাদেরকে অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ নিজ পক্ষ হতে তোমাদেরকে ক্ষমা এবং আশিসের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। বস্তুত আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী (ও) সর্বজ্ঞ।” (সূরা বাকারা : ২৬৯)।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'লা শয়তানী প্ররোচনা হতে মানুষকে সতর্ক করেছেন। শয়তানী প্ররোচনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষ যখন আল্লাহর পথে খরচ করার জন্য দারিদ্রের ভয় করে, তখন দারিদ্র এবং অশ্লীলতা (সমাজের গরীবদের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি না দেয়ার জন্য) প্রবলভাবে সমাজ দেহকে জর্জিরিত করে ফেলে। তখন ধনী-দারিদ্র সবাই পক্ষে জীবন ধারণ করা অসহনীয় হয়ে পড়ে। দারিদ্র এবং সামাজিক কদাচার সকলকেই প্রভাবিত করে। এ অবস্থা সৃষ্টি হবার পূর্বেই সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য আল্লাহর পথে খরচ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

যাকাতের শর্ত বা যাকাত কখন দিতে হবে

যার কাছে পুরো এক বছর নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ টাকা থাকে অথবা ব্যবসায় টাকা নিয়োজিত থাকে, তাকে এর উপর চল্লিশ ভাগের একভাগ (১/৮০) যাকাত দিতে হবে।

পুরো এক বছর সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা সেই রূপার মূল্যের পরিমাণ বা সেই মূল্যের বেশি স্বর্ণ থাকলে এর (মূল্যের) চাল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে। এভাবে সাড়ে বায়ান্ন তোলা বা এর বেশি রূপা থাকলে এর পরিমাণের চাল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে। যেসব অলংকার মাঝে-মাঝে ব্যবহার করা হয় আর তা যদি উল্লেখিত নিসাব বা নির্দিষ্ট পরিমাণ অনুযায়ী থেকে থাকে তাহলে এর ওপরও উল্লেখিত হিসেবে যাকাত দিতে হবে। উল্লেখ্য, সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের পরিমাণের চেয়ে কম মূল্যের ব্যবহার্য গহনার ওপর যাকাত দিতে হবে না।

চাল্লিশটি বকরী থাকলে একটি বকরী, পাঁচটি উটের জন্য একটি বকরী, ত্রিশটি গাভী বা মহিষের জন্য একটি বাছুর যাকাত হিসেবে দিতে হবে। যে জমিতে কৃষ্ণ অথবা খাল হতে পানি সেচ করতে হয় না এর উৎপন্ন দ্রব্যের দশভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে। উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যাপারে যাকাত তখনই দিতে হবে যদি উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ আনুমানিক ২১ মণ হয়। যাকাত প্রতি বছর আদায় করার মেয়াদ সেই সময় হতে নির্ধারণ করতে হবে যে সময় হতে তার কাছে অর্থ-সম্পদ অথবা অলংকার মজুদ থাকে। কেউ নিজের টাকা অন্যকে খণ্ডন্ত দিলে সেই টাকার ওপর যাকাত দিতে হবে না। কিন্তু উক্ত টাকা ফেরত পাওয়ার পর যাকাত দিতে হবে।

অলংকার ও গহনার যাকাত সম্পর্কে হয়রত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, “ যে গহনা সব সময় ব্যবহার করা হয় এর যাকাত দিতে হবে না। এরূপ গহনা যা গচ্ছিত থাকে, কিন্তু কখনও-কখনও পরিধান করা হয় এবং কখনও-কখনও গরীব স্ত্রীলোকদের ব্যবহার করতে দেয়া হয় এর সম্পর্কে কারও কারও ফতোয়া হলো, এগুলোর যাকাত দিতে হবে না। যে গহনা মাঝে মাঝে পরিধান করা হয়, কিন্তু অন্যদের ব্যবহার করতে দেয়া হয় না এর যাকাত দেয়াই উত্তম। কেননা, এ শুধু নিজের জন্যই ব্যবহৃত হয়। এভাবে আমার গৃহে আমল করা হয় এবং প্রত্যেক বছরের শেষে যাকাত দেয়া হয়। যে গহনা টাকার ন্যায় সঞ্চিত রাখা হয়, এর উপর যাকাত দেয়া সম্পর্কে কোন মতবিরোধ নেই।” (মাজমুয়া ফাতাওয়া আহমদীয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৮)।

বিভিন্ন সম্পদের ওপর প্রদত্ত যাকাতের হিসাব

বিভিন্ন দ্রব্যের ওপর যাকাতের পরিমাণ (নিসাব) আলাদা-আলাদা হিসাব করতে হবে— অর্থাৎ, সর্বের উপর প্রদত্ত যাকাতের হিসেবের সময় শুধু স্বর্ণের পরিমাণের কথাই ভাবতে হবে। অনুরূপভাবে ছাগল এবং গাভীর উপর প্রদত্ত যাকাতের হিসাবের জন্য আলাদা আলাদাভাবে যাকাতের হিসাব করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কোন ব্যক্তির নিকট যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা থাকে এবং তিন তোলা স্বর্ণ থাকে এবং এর মূল্য সাড়ে বায়ান্ন

তোলা রূপার মূল্য অপেক্ষা কম হয় তাহলে শুধু রূপার উপর (রূপার মূল্যের চান্দিশ ভাগের একভাগ) যাকাত দিতে হবে, তিন তোলা স্বর্ণের ওপর যাকাত দিতে হবে না। আবার কারো কাছে যদি পাঁচটি উট এবং পাঁচটি গাভী থাকে শুধু উটের জন্যই যাকাত হবে। মোটকথা, যাকাতের বিষয়গুলো পৃথকভাবে নিম্নতর পরিমাণ বা সংখ্যা (হিসাব) অতিক্রম করলে যাকাত দিতে হবে।

নিম্নে ছকের সাহায্যে বিভিন্ন সম্পদের ওপর প্রদত্ত যাকাতের হিসাব তুলে ধরা হল।

মাল বা সম্পদ	এক বছরকাল সংরক্ষিত নিম্নতর পরিমাণ (নিসাব) হিসেবে মাল যার জন্য যাকাত দিতে হবে।	যাকাতের পরিমাণ
১। রূপা	সাড়ে বায়ান তোলা বা এর বেশি (পরিমাণ) থাকলে।	চান্দিশ ভাগের একভাগ (১/৪০) বা সমপরিমাণ অর্থ
২। সোনা	সাড়ে বায়ান তোলা রূপার দামের সমান সোনা থাকলে বা এর বেশি (পরিমাণ) থাকলে।	ঢ
৩। সোনার গহনা	সাড়ে বায়ান তোলা রূপার দামের সমান (নিয়মিত ব্যবহার্য গহনা ব্যতীত) সোনা থাকলে বা এর বেশি পরিমাণ থাকলে।	ঢ
৪। রূপার গহনা	সাড়ে বায়ান তোলা রূপার দামের সমান (নিয়মিত ব্যবহার্য গহনা ব্যতীত) রূপা থাকলে বা এর বেশি থাকলে।	ঢ
৫। নগদ টাকা	সাড়ে বায়ান তোলা রূপার দামের টাকা (নেট ও মুদ্রা) থাকলে বা এর বেশি (পরিমাণ) থাকলে।	ঢ
৬। কারবারে, ব্যবসায় নিয়োজিত মূলধন	কোন বছরের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত যত টাকা ব্যবসায় লাগানো হয় তখন হতে বছরের শেষ পর্যন্ত মোট বার্ষিক মূলধনের হিসাব বের করে যাকাত দিতে হবে। * (উদাহরণ দ্রষ্টব্য)	ঢ

৭। জমির উৎপন্ন দ্রব্য	<p>ক) যে জমিতে ফসল উৎপাদনের জন্য পানি সেচ করা হয়, এর ২১ মণ্ড ৫ সের শস্যের উপর বা তদুর্দশ পরিমাণের উপর।</p> <p>খ) যে জমিতে ফসল উৎপাদনের জন্য পানি সেচ করা হয় না, এর ২১ মণ্ড ৫ সের শস্যের উপর বা তদুর্দশ পরিমাণের উপর।</p>	<p>বিশ্ব ভাগের এক ভাগ</p> <p>দশ ভাগের এক ভাগ</p>
মাল বা সম্পদ	<p>এক বছরকাল সংরক্ষিত নিম্নতর পরিমাণ (নিসাব) হিসেবে মাল-যার জন্য যাকাত দিতে হবে।</p>	<p>যাকাতের পরিমাণ</p>
	<p>গ) কৃষকের কাছে যখন কোন জমি ইজারা থাকে তখন তাকে এর উৎপাদিত শস্যের যাকাত (ক) বা (খ) শর্ত অনুসারে (যে শর্ত প্রযোজ্য) দিতে হয়।</p> <p>ঘ) যখন কোন জমি বর্গা থাকে তখন তার উৎপাদিত শস্যের যাকাত জমির মালিক এবং বর্গাদার সব উৎপাদনের উপর মিলিতভাবে (ক) বা (খ) শর্তানুসারে দিবে (যাকাত দেয়ার পর ফসল বন্টন করবে)</p>	<p>১/২০ বা ১/১০ ভাগ</p> <p>১/২০ বা ১/১০ ভাগ</p>
৮। গৃহপালিত পশু	<p>গৃহপালিত পশু ৪০টি বকরীর জন্য একটি বকরী, ৫টি উটের জন্য একটি বকরী, ৩০টি গাভী বা মহিষের জন্য ১টি বাহুর যাকাত দিতে হবে।</p>	

* উদাহরণ: যদি কোন ব্যক্তি তার ব্যবসায় প্রথম মাসে ২৫০.০০ টাকা, দুই মাস পর ২০.০০ টাকা এবং চার মাস পরে ৫০০.০০ টাকা বিনিয়োগ করে তাহলে বৎসরান্তে তাকে নিম্নলিখিত হিসেব অনুযায়ী গড় ৬০০.০০ টাকার ওপর চালিশ ভাগের একভাগ-অর্থাৎ, ১৫.০০ টাকা যাকাত দিতে হবে।

$$250.00 \times 12\text{মাস} = 3000.00 \text{ টাকা}$$

$$20.00 \times 10\text{মাস} = 200.00 \text{ টাকা}$$

$৫০০.০০ \times ০৮\text{মাস} = ৪০০০.০০$ টাকা

মেট = ৭২০০.০০ টাকা

মূলধন বা পুঁজির গড় = $৭২০০/১২ = ৬০০$ টাকা।

যাকাতের পরিমাণ = $৬০০.০০ \times (১/৮০) = ১৫.০০$ টাকা

অতএব ৬০০.০০ টাকার প্রদত্ত যাকাতের পরিমাণ = ১৫.০০ টাকা

যাদের মাঝে যাকাত বিতরণ করা যায়

কুরআন করীমে এ ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। তা হলো:

“সদকা কেবল অভাবী, অসহায়, এবং (সদকার কাজে নিয়োজিত) কর্মচারীদের প্রাপ্য। আর (এ সদকার অর্থ তাদেরও প্রাপ্য) যাদের অন্তরকে ধর্মের প্রতি অনুরাগী করা প্রয়োজন। আর দাসমুক্তি ও খণ্ডগ্রস্তদের (খণ্ডমুক্তির জন্য) এবং আল্লাহর পথে সাধারণ ব্যয় নির্বাহের ও মুসাফিরদের জন্যও (এ সদকার অর্থ খরচ করা যাবে)। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিধান। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাবান।” (সূরা তত্ত্বা : ৬০)।

অতএব কুরআন করীমের শিক্ষানুযায়ী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের মাঝে যাকাত বিতরণ করতে হবে:

- ১) ফকীর তথা এমন লোক— যারা দারিদ্র অথবা অসুস্থতার কারণে আর্থিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছে।
 - ২) মিসকীন তথা এমন লোক যাদের কাজ করার সামর্থ্য আছে, কিন্তু কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় উপায় বা উপকরণ নেই।
 - ৩) যেসব ব্যক্তি যাকাত সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত অথবা যাকাতের হিসাব রাখে অথবা অন্য কোনভাবে যাকাত আদায়ের কাজে নিয়োজিত থাকে।
 - ৪) এমন নও-মুসলিম যারা গৃহ হতে বিতাড়িত এবং যাদের অর্থাত্ব রয়েছে।
 - ৫) যুদ্ধবন্দী, দাস অথবা অন্যলোক— যাদেরকে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্তিলাভের সুযোগ দেয়া হয়।
 - ৬) যেসব ব্যক্তি খণ্ড পরিশোধ করতে অক্ষম অথবা এমন ব্যক্তি যার ব্যবসায়-বাণিজ্য অস্বাভাবিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
 - ৭) কোন মহান কাজের জন্য।
 - ৮) যে লোক সফরে অর্থাত্বে আটকা পড়ে গিয়েছে অথবা যারা জ্ঞান লাভের জন্য সফর করছে অথবা যারা সামাজিক কল্যাণ সাধনের জন্য সফর করছে।
- বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য এবং এমন লোক— যার কাছে এক দিনেরও আহার নেই তাকে

অবশ্যই যাকাত দিতে হবে। ইমাম বা খলীফার তত্ত্বাবধানে যাকাত সংগ্রহ এবং বিতরণ করতে হবে। কেউ ব্যক্তিগতভাবে যাকাত বিতরণ করতে পারবে না। তবে যাকে সে দান করতে চায় তার দরখাস্ত খলীফার কাছে প্রেরণ করা যাবে।

যাকাত সম্পর্কিত অন্যান্য নিয়মাবলী

- নাবালক বা পাগলের সম্পদের যাকাতের জন্য অভিভাবক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- বছরের প্রথমে কোন সম্পদের নিসাব (ন্যূনতম পরিমাণ) পূর্ণ না হয়ে যদি শেষের দিকে পূর্ণ হয় তবে শেষের মালের ওপর যাকাত দিতে হবে।
- বছরের মাঝে কোন সময়ে মাল সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে গেলে এবং দ্বিতীয়বার পুনরায় সেই মাল তৈরি হলে বা হস্তগত হলে যখন হতে দ্বিতীয়বার মাল এসেছে, তখন থেকেই বছর ধরা হবে।
- বছরের মাঝে কোন সময়ে মাল চুরি বা লুক্ষিত বা দখলচৃত হলে এবং কোন কারণে সেই মাল পুনরায় ফেরত পাওয়া গেলে বছরের শেষে তারও যাকাত দিতে হবে।
- কোন ব্যক্তি বছরের মাঝে কোন মাল অন্য ব্যক্তির সাথে বিনিময় করলে উভয় ব্যক্তির যাকাতের তারিখ মালের বিনিময়ের দিন হতে শুরু হবে।
- চান্দু মাসের হিসেবে বছর গণনা করতে হবে। সেই মাস হতে বছর শুরু হয়ে যায় যখন হতে কোন নিসাব পরিমাণ মাল অধিকারে আসে এবং ১২ চান্দু মাস অতিবাহিত হয়।

যেসব ক্ষেত্রে যাকাত দিতে হবে না

- ১) খণ্ডস্বরূপ প্রদত্ত অর্থ বা সম্পদ।
- ২) অন্যের কাছ থেকে যে অর্থ এখনও পাওয়া যায়নি (যেমন: কোন দোকানদার তার ক্ষেত্রার কাছে বাকীতে মাল বিক্রয় করলে)
- ৩) বন্ধক রাখা জিনিস।
- ৪) সরকারের নিকট আমানত হিসেবে প্রদত্ত টাকা।
- ৫) বন্ধকের বিনিময়ে দেয়া টাকা।
- ৬) কারখানা বা ব্যবসায় প্রদত্ত জামানত।
- ৭) প্রতিদেন্ট ফাল্ডে জমাকৃত অর্থ।
- ৮) অপহৃত বা হারানো মাল বা টাকা।
- ৯) যে বাড়িতে বসবাস করা হয় তা যদি কোটি টাকারও অধিক হয় তার ওপর যাকাত নেই। তবে বাড়ি যদি ভাড়া দিয়ে থাকে তাহলে আয়কৃত অর্থের ওপর যাকাত দিতে হবে।
- ১০) যে অলংকার দৈনন্দিন পরিধান করা হয় এর উপর যাকাত দিতে হবে না, তা যত বেশি পরিমাণই হোক না কেন।

ঝণী ব্যক্তির ওপর যাকাত ফরয নয় কিন্তু খণ যদি অল্প হয় এবং তার কাছে এমন সব মাল থাকে যার ওপর যাকাত দেয়া জরুরী, তাহলে তাকে নিসাব অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে। অনেকে মনে করেন, কোন মালের ওপর যাকাত দেয়ার সময় উপস্থিত হলে আগামী বছরের খরচ পত্রের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সা বা মাল বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অংশের ওপর যাকাত দিলেই চলে- এ ধারণা মোটেই ঠিক নয়। সব সম্পদ বা মালের ওপর যাকাত দিতে হবে। যে মাল যাকাত বা সদকা হিসেবে কাউকে দেয়া হয় তা পুনরায় কিনে ফেরত নেয়া উচিত নয়।

যে দেশে সরকার অধিকাংশ যাকাতযোগ্য লোকদের আয় এবং সম্পদের ওপর ট্যাক্স আদায় করে, সেখানে যদিও ‘যাকাত’ শব্দ ব্যবহার করা হয় না, তবুও তাদের মাঝে অধিকাংশ ট্যাক্সই যাকাতের স্থলাভিষিক্ত। যেমন-জমির খাজনা, আয়কর ইত্যাদি। সুতরাং যে মালের ওপর সরকার ট্যাক্স আদায় করে সেগুলোর ওপর যাকাত দিতে হবে না। কিন্তু যে মালের ওপর ট্যাক্স দিতে হয় না, অথবা যেসব মালের ওপর সরকারী ট্যাক্স যাকাতের নির্ধারিত হার হতে কম, সে অবস্থায় যাকাতের সর্বমোট অংক হতে ট্যাক্স বাবদ প্রদত্ত টাকা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট টাকা যাকাতস্বরূপ আদায় করা উচিত।

যাকাতের তত্ত্বকথা

কুরআন করীমে অর্থ ব্যয়ের কয়েক প্রকারের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ-

- ১) যাকাত: এটা ফরয বা আবশ্যিক প্রদত্ত।
 - ২) সদকা: এটা নফল। এর পরিমাণ মানুষের অভ্যন্তরীণ তাকওয়ার ভিত্তিতে নির্ণয় করার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। দু' প্রকার ব্যক্তি সদকা পাওয়ার যোগ্য : (ক) যারা নিজেদের প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করে সাহায্য চায় এবং (খ) যারা নিজেদের প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করে না অথবা যারা প্রকাশ করতে অক্ষম।
 - ৩) সেসব খরচ যা জাতি বা ধর্মের সমষ্টিগত প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ করা হয়।
 - ৪) শোকরানা
 - ৫) ফিদিয়া
 - ৬) কাফ্ফারা
 - ৭) সহযোগিতামূলক খরচ-যা নাগরিক জীবনের প্রয়োজনের জন্য জরুরী সাব্যস্ত করা হয়েছে।
 - ৮) হাক্কুল খিদমত বা পারিশ্রমিক।
 - ৯) আদায়ে ইহসান বা উপকারের বিনিময়।
 - ১০) তোহফা বা উপহার।
- এ দশ প্রকার খরচের কথা কুরআন শরীফ হতে সাব্যস্ত হয়। কেউ এ খরচগুলোর

(যেখানেই এর সুযোগ ঘটে) কোন একটিকে বাদ দিলে নিম্নোক্ত আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী সে আমল হতে বন্ধিত হয়।

وَمَمَّا رَزَقْنَاهُ يُنْفِقُونَ

(ওয়া মিমা রায়াক্নাহম ইউন্ফিকুন)

অর্থ: “আর আমরা তাদেরকে যে রিয়ক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে।”

এর ফলে তাকওয়ায় দুর্বলতা সৃষ্টি হয়। দুনিয়াতে অনেক লোক এ শ্রেণীবিভাগকে বিবেচনা না করার ফলে উত্তম পুণ্য বা সওয়াব হতে বন্ধিত থাকে। (তফসীরে কবীর, সূরা বাকারার ৪ নং আয়াতের তফসীর দ্রষ্টব্য)।

দু' প্রকারের যাকাত

কোন-কোন মালের ওপর প্রদেয় যাকাত সরকারের কাছে জমা দিতে হবে এবং কোন-কোন মালের যাকাত গরীবদের মাঝে বণ্টন করতে হবে এর বিবরণ হচ্ছে- ১) জমির ফসলের যাকাত, ব্যবসায় বা কারবারে নিয়োজিত টাকার যাকাত, খনিজ দ্রব্যের ওপর প্রদেয় যাকাত (খুমুস) এবং গৃহপালিত পশুর ওপর প্রদেয় যাকাত-এই চার প্রকার যাকাত রাষ্ট্রের কোষাগারে জমা দিতে হবে যাতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ অসহায়, দুঃস্থ ও মিসকীনদের প্রতিপালন এবং রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য খরচ করতে পারে।

২) যেসব মাল বা সম্পদ রাষ্ট্রের পক্ষ হতে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। যেমন: গহনা ও অলংকার এবং মজুদকৃত অর্থ- এ বিষয়গুলোর যাকাত দেয়া ব্যক্তি-বিশেষের নিজস্ব দায়িত্ব। এসব বিষয়ের যাকাত ইমাম বা খলীফার তত্ত্বাবধানে সংগৃহীত এবং বণ্টন হতে হবে। কাউকে যাকাতের অর্থ দেয়ার যোগ্য মনে করলে তার দরখাস্ত ইমামের সমীক্ষে দেয়া যেতে পারে। খিলাফতের নেয়ামের মাধ্যমে যাকাত দেয়ার ব্যবস্থার মাধ্যমে যাকাত গ্রহীতাদের আত্মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বকে অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। যাকাতদাতার সরাসরি বিতরণে এটা সম্ভব হতো না। দানের হাত ওপরে থাকে আর গ্রহণের হাত নিচে। ফলে দাতার সামনে গ্রহীতা স্বাভাবিকভাবে সবসময় মাথা নীচু করে চলবে। বিশেষ করে ভবিষ্যতে আবার পাওয়ার আশায়। এতে তার ব্যক্তিত্ব ও আত্মর্যাদা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু নেয়ামের মাধ্যমে যাকাত বণ্টনে এ ক্রটি ঘটে না। কারণ গ্রহীতা এটা আল্লাহ তাঁলার ব্যবস্থায় অধিকার হিসেবে লাভ করেন।

চাঁদা ও যাকাত

জামাতী চাঁদা ও যাকাত সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়। যাকাত নির্দিষ্ট পরিমাণ হলেই বিত্তশালীর উপর তা দেয়া আবশ্যক। জামাতী চাঁদা জামাতের ব্যয় নির্বাহ ও প্রয়োজনীয় কাজে খরচ

হয়। যদি জামাতী সিলসিলা বা সংগঠনের প্রয়োজন হয় তাহলে চাঁদা নিবে অথবা নিবে না। তাই দু'টি বিষয়কে কখনও এক মনে করা উচিত নয়।

কোন মুসলমানের জন্য মাল (ধন-সম্পদ) কুরবানী শুধু যাকাতের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং আল্লাহ তাঁলা আরও অনেক অধিকার পূরণ করতে তাকে নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রেক্ষিতে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেছেন, “তৃতীয় বিষয় হলো (যাকাত ও সদকার পর) জামাতের চাঁদা— যা ধর্মের জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয়। এ জিহাদ তলোয়ারের জিহাদ হোক বা কলম ও কিতাবের মাধ্যমেই হোক, সেটাও প্রয়োজনীয়। কেননা যাকাত এবং সদকা গর্বীবদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে। এ দিয়ে বই-পুস্তক ছাপানো সম্ভব নয় বা মুবালিগদেরও দেয়া যায় না।” (মালায়কাতুল্লাহ, পৃ. ৬২)।

আজকাল তলোয়ারের বা অস্ত্রের জিহাদ নেই। সুতরাং ইসলাম প্রচারের জন্য অথবা জামাতের নেয়ামের মজবুতির জন্য এবং এ ধরনের অন্যান্য খরচাদির জন্য যে টাকা সংগৃহীত হয় তা-ই চাঁদার অন্তর্ভুক্ত।

جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ

(জাহিদু বিআমওয়ালিকুম ওয়া আন্ফুসিকুম)

অর্থ: “তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের প্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর।” (তওবা : ৪১)।

এ আয়াতের প্রথম অংশের ওপর আমল করা যায় চাঁদা দিয়ে, আর দ্বিতীয় অংশের ওপর আমল করা যায় কোন-কোন সময় নিজের কাজ স্থগিত রেখে কিছু সময় তবলীগের জন্য দিয়ে অথবা ধর্মের উন্নতির জন্য তাঁলীম ও তরবিয়তের কাজে অংশ নিয়ে।

সুরা বাকারার চতুর্থ আয়াতও এ কথার সমর্থন করে। অর্থাৎ, ইসলাম প্রচারের জন্য অর্থ, সম্পদ, সময় এবং ভানের দ্বারা সেবা করতে হবে। হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, “লায়েমী (অবশ্য-দেয়) চাঁদা এবং হিস্যায়ে আমদ্ (ওসীয়তকারীদের আয়ের অংশ-বিশেষ) যাকাত হতে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। বক্ষত যাকাত একটি আলাদা ফরয কাজ। সব রকম চাঁদা দিলেও যাকাত দেয়া অবশ্য-কর্তব্য। যাকাতের নিয়ন্ত করে চাঁদা দিলেও যাকাত আলাদাভাবে দিতে হবে।” (মাসায়েলে যাকাত, পৃ. ১০)।

যাকাত আদায় না করার পরিণাম

যাকাত ফরয হওয়ার পরও যেসব ব্যক্তি যাকাত আদায় করে না তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাঁলা কুরআন করীমে বলেছেন:

وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الدَّهَبَ وَالْفَضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بَعْدَ اِبْرِهِمَ ﴿١٠﴾
يَوْمَ يُحْكَمُ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَكُنُوا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ
لَا نَسِيكُمْ فَدُولُقَوْمًا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

(ওয়াল্লাহায়ীনা ইয়াক্নিযুনায় যাহাবা ওয়াল্ ফিয়াতা ওয়ালা ইয়ুনফিকুনাহা ফী সাবীলিল্লাহ, ফাবাশ্শিরভূম বি'আয়াবিন 'আলীম। ইয়াওমা ইউহ্মা আলায়হা ফী নারি জাহানামা ফাতুকওয়া বিহা জিবাভূম ওয়া জুনুবভূম ওয়া যুহুরভূম হায়া মা কানায়তুম লিআনফুসিকুম ফায়ুক মা কুন্তুম তাকনিয়ুন)

অর্থ: “এবং যারা সোনা ও রূপা মজুদ করে এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। যেদিন এগুলোকে (এসব সোনা-রূপাকে) জাহানামের আগুনে উত্পন্ন করা হবে এবং এগুলো দিয়ে তাদের কপালে, তাদের পাৰ্শ্বদেশে, এবং তাদের পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে। (তখন তাদেরকে বলা হবে) এটি সেই সম্পদ- যা তোমরা নিজেদের জন্য মজুদ করতে। সুতোৱাং তোমরা যা মজুদ করতে (এখন) এর স্বাদ গ্রহণ কর।” (সুরা তাওবা : ৩৪-৩৫)।

হ্যরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত: হ্যরত রসূল করিম (সা.) বলেছেন, “যে ধনী ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ হতে যাকাত আদায় করে না, তার ধন-সম্পদকে জাহানামের আগুনে উত্পন্ন করা হবে এবং উত্পন্ন শলাকা দ্বারা তাদের কপালে এবং মুখ-মন্ডলে দাগ দেয়া হবে এবং এ শাস্তির মেয়াদ পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে।”

হ্যরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে আরও বর্ণিত হয়েছে, “হ্যরত রসূল করিম (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা’লা ধন-সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু সে এর যাকাত দেয় না, কিয়ামতের দিন তার সেই ধন-সম্পদ এক ভয়ংকর সাপের আকারে দৃষ্ট- হবে, উক্ত সাপ কিয়ামতের দিন তার গলায় জড়িয়ে থাকবে এবং চোয়াল দংশন করতে-করতে বলবে- আমি তোমার সেই ধন-সম্পদ যার যাকাত তুমি দাওনি’। (বুখারী ও মিশকাত)।

যাকাত ও সুদের তুলনা

যাকাতের মাধ্যমে ইসলাম গরীবদের অবস্থা ভাল করার নির্দেশ দিয়েছে এবং সেই সাথে তাদের আত্মর্যাদা ও সম্মানকে রক্ষা করেছে। কিন্তু সুদ ব্যবস্থা শুধু যে গরীবদের আর্থিক অবস্থাকে অবহেলা করেছে তা-ই নয়, আসলে এ ব্যবস্থার ফলে গরীবরা আরও গরীব হয় এবং ধনীর ধন আরও বৃদ্ধি পায়। মানব সমাজে ধনী-দরিদ্রের মাঝে যে বিরাট বৈষম্য রয়েছে এর ফলে সমাজের বৃহত্তম অংশ দারিদ্রের কবলে নিষ্পেষিত এবং মুষ্টিমেয় ধনী শ্রেণী অপরিমিত সম্পদের প্রাচুর্যে নিমগ্ন রয়েছে, এ সবের মূলে রয়েছে সুদব্যবস্থা।

সেজন্য কুরআন করিমে যাকাতের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং সুদ গ্রহণ করতে নিমেধ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাঁলা বলেছেন:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَالٍ يَرْبُوا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكْوَةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ ^(১)

(ওয়ামা আতায়তুম মির রিবাল্ লি ইয়ারবুওয়া ফী আমওয়ালিন্নাসি ফালা ইয়ারবু ইন্দাল্লাহি। ওয়ামা আতায়তুম মিন যাকাতিন্ তুরীদুনা ওয়াজহাল্লাহি ফাউলায়িকা হুমুল মুখযিফুন)

অর্থ: “এবং তোমরা যা (যে অর্থ) সুদের ওপর দিয়ে থাক তা লোকের ধনসম্পদের সাথে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এটা আল্লাহ্ সমাজে বৃদ্ধি পায় না। আর তোমরা আল্লাহ্ সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে যাকাত দাও, জেনে রাখ, এই সব লোকই (নিজেদের ধন-সম্পদ) বহুগুণে বৃদ্ধি করছে।” (সূরা রূম : ৪০)।

মূলধন বা পুঁজি বিনিয়োগ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল খণ্ডহণ এবং খণ্ডান। ইসলাম খণ্ডান সম্পর্কিত আদান-প্রদানের ব্যাপারে সুদভিত্তিক অর্থ-ব্যবস্থাকে আদৌ সমর্থন করে না। কুরআন করিমে সুবা বাকারায় বলা হয়েছে:

الَّذِيْكَ يَأْكُونُ الرِّبُّو لَا يَقُوْمُونَ لِأَلَا كَمَا يَقُوْمُ الرَّبِّيْلُ الَّذِيْنِ يَسْجَبُطُهُ السَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِإِنْهُمْ قَالُوْ
إِنَّمَا يُبَيِّغُ مِثْلُ الرِّبُّو ۖ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحْرَمَ الرِّبُّو ۖ

(আল্লায়ীনা ইয়া-কুলুনার রিবা লা ইয়াকুমুনা ইল্লা কামা ইয়াকুমুল্লায়ী- ইয়াতাখাবাতুহশ শায়তানু মিনাল মাস্সি; যালিকা বিআল্লাহুম ক্লানু ইল্লামাল বাইয়ু মিসলুর রিবা, ওয়া আহাল্লাহল বায়া’ ওয়া হারারামার রিবা)

অর্থ: “বারা সুদ খায় তারা সেভাবে দাঁড়ায় যেভাবে সেই ব্যক্তি দাঁড়ায় যাকে শয়তান সংস্পর্শে এনে জ্ঞান-বুদ্ধিহারা করে ফেলে। এর কারণ হলো, তারা বলে, ব্যবসায়-বাণিজ্য সুদেরই মতো। অথচ আল্লাহ্ ব্যবসায়-বাণিজ্যকে বৈধ করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন।” (সূরা বাকারা : ২৭৬)।

পবিত্র কুরআন সব ধরনের সুদ নিষিদ্ধ করেছে। আধুনিককালে ব্যবসায়-বাণিজ্য সুদের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে পড়েছে। সুদ ছাড়া কোন অর্থনৈতিক প্রগতির কথা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হতে পারে। কিন্তু অর্থব্যবস্থা পরিবর্তন করে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা যেতে পারে যার ফলে সুদহীন ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব। ইসলামের প্রাথমিক যুগে সুদহীন অর্থব্যবস্থা থাকা সঙ্গেও উল্লেখিত ব্যবসায়-বাণিজ্য অপ্রতিহতভাবেই চলেছিল। উপরোক্ষে অতি আয়াতে বলা হয়েছে, শয়তান যাকে উন্নত করে তুলেছে সে ছাড়া কেউই সুদ গ্রহণ করে উন্নতি লাভ করতে

পারে না। এ কথার অর্থ হলো, কোন বদ্ধ-পাগল যেমন তার কর্মের পরিণাম ভেবে দেখে না, তেমনিভাবে সুদের ওপরে ঝণ্ডাতাগণ সুদের মারাত্মক পরিণতির কথা ভেবে দেখে না। সুদখোর মহাজনেরা শুধু তাদের নিজেদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখে, সমাজ তথা দেশ এবং পৃথিবীর পরিণামের কথা ভাবতে পারে না। সুদের নেশায় কোন-কোন সময় তাদের মানবোচিত গুণাবলী, যেমন- দয়া, মায়া, পরোপকারিতা, সহমর্মিতা প্রভৃতি বিনষ্ট হয়ে যায়।

সুদভিত্তিক অর্থ-ব্যবস্থার ফলে কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্র সাধ্যাতীত খণ্ড গ্রহণ করে থাকে। এর ফলে এক সুদূরপ্রসারী দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়। সুদখোর মহাজন বা ব্যবসায়ীরা এত সহজে অর্থ উপার্জন করতে পারায় তারা এ ব্যবসার মাঝে আকর্ষ নিমজ্জিত থাকে। সুদ-ব্যবস্থা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে চলেছে, যার ফলে জাতিতে-জাতিতে পরম্পরারে সহজেই স্বার্থের সংঘর্ষ দেখা দিতে পারে। যখন যুদ্ধ বাধে তখন বিবদমান জাতিগুলোকে বিদেশ হতে অতিরিক্ত সুদের ভিত্তিতে খণ্ড গ্রহণ করতে হয় এবং সুদের ভিত্তিতে দেশ হতেও বহু অর্থ সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। দেশ এবং বিদেশ হতে এভাবে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে সহজেই মারণান্ত্র তৈরী অথবা আমদানী করা ব্যাপকতা লাভ করে। ব্যাংকগুলো সুদের অফুরন্ত প্রস্তবণস্বরূপ। এগুলো ছোট-বড় যুদ্ধ ও মহাযুদ্ধের সমরোপকরণ সংগ্রহে সাহায্য করে এবং জাতি-বিদ্যে সৃষ্টি করে মানবতার সর্বনাশ করে এবং বিশ্বকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য, অচিরেই পবিত্র কুরআন, হাদীস ও হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পৃথিবী উলট-পালট হয়ে যাবে এবং জগতে মহা ধ্বংস সংঘটিত হবে। তখন “নেয়ামে ওসীয়্যাত” (ওসীয়্যাত ব্যবস্থা) কায়েম হবে ও যাকাতের ব্যবস্থা পৃথিবীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং জগতে শাস্ত্ররাজ্য কায়েম হবে।

যারা সুদের ওপর টাকা ধার করে তাদের আত্মর্যাদা, বিবেচনাবোধ এবং সতর্কতাবোধ প্রবলভাবে হ্রাস পায়। কুরআন করিমে সেজন্য এ অবস্থাকে উন্মুক্তা বা পাগলামী বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। উল্লেখিত আয়তে সুদ-পদ্ধতির সমর্থকদের সাধারণ যুক্তির কথাও আল্লাহ তা'লা উল্লেখ করেছেন। সেসব লোক প্রায়ই বলে, লাভের জন্য যেভাবে মানুষ বিভিন্ন দ্রব্যের মাধ্যমে ব্যবসায় করে, একইভাবে অর্থের ব্যবসায় যে মুনাফা পাওয়া যায় তাকেই সুদ বলে। কিন্তু সুদ-ব্যবসার ফলে যেসব অকল্যাণকর পরিণাম দেখা দেয়, অন্য ব্যবসার ফলে সেরূপ ঘটে না।

হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.) সুদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, “শরীয়তে সুদের সংজ্ঞা হলো, কোন ব্যক্তি যদি নিজের লাভের জন্য অন্যকে ঝণ্ডব্রহ্মপ টাকা দেয় এবং লাভ নির্দিষ্ট করে নেয়, তাহলে তা সুদ হবে। ... কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি টাকা নেয় এবং অঙ্গীকার না করে, বরং নিজের পক্ষ হতে অতিরিক্ত কিছু টাকা দিয়ে দেয়, তাহলে এটা সুদ বলে গণ্য হবে না। নবীরা যখনই খণ্ড গ্রহণ করতেন তখন অবশ্যই অতিরিক্ত

টাকাসহ খণ্ড ফেরৎ দিতেন।” (ফিকাহ আহমদীয়া, ২য় খন্ড)। হযরত নবী করিম (সা.) বলেছেন, “যে খণ্ড কোন মুনাফা টানে তা সুন্দ।” (জামেউস সগীর)।

পৃথিবীতে আজ যারা সবচেয়ে বেশি ধনী বলে পরিচিত তাদের প্রায় প্রত্যেকেই সুন্দ পদ্ধতির সুচতুর প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত মূলধনের পরিমাণ বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। ফলে সামান্য টাকা দিয়ে ব্যবসায় শুরু করে তারা ব্যাংকের বিশ্বাসভাজন হয় এবং পরে প্রচুর টাকা ধার নিয়ে ব্যবসায় শুরু করে এবং অন্যদিকে উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়ে দিয়ে প্রচুর মুনাফা লাভের পথ সৃষ্টি করে। বহুক্ষেত্রে বড় ব্যবসায়ীরা সাধারণ ষষ্ঠি মূলধন নিয়োগকারী ব্যবসায়ীদেরকে প্রতিযোগিতায় সহজেই হারিয়ে দিয়ে একচেটিয়া ব্যবসায় (Monopoly) প্রতিষ্ঠিত করে। সুন্দভিত্তিক এ খণ্ড-প্রথার দক্ষ পরিচালনার সাহায্য ছাড়া শিল্প কিংবা ব্যবসায় কেউ আকাশচুম্বী উন্নতি লাভ করেছে এমন দ্রষ্টান্ত অল্পই আছে।

সুন্দহীন ইসলামী অর্থনীতি

সুন্দ-পদ্ধতি যদি না থাকতো, তাহলে প্রত্যেকেই তার মূলধন কো-অপারেটিভ বা সমবায়ভিত্তিক ব্যবসায় বা শিল্পকাজে নিয়োগ করতো, ফলে ব্যবসায় ও শিল্পের মূলধনে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যাও যেমন বাড়তো, তেমনি ব্যবসায়ের আয় বহু লোকের মাঝে ভাগ হয়ে যেত। দশজন লোকের প্রত্যেকে যদি দশ হাজার টাকা কোন ব্যবসায় নিয়োগ করে, তবে এক লক্ষ টাকা দিয়ে যে ব্যবসায় করা যাবে তার লভ্যাংশে দশজনের সমান অধিকার থাকবে। অথচ সেই এক লক্ষ টাকার মালিক যদি একজন ব্যবসায়ী হয়, তবে গোটা লাভ একমাত্র তারাই হাতে যাবে। উভয়ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের পরিমাণ সমান থাকবে, শুধু মুনাফা কোন ব্যক্তিবিশেষ বা পরিবারের একক হাতে না গিয়ে একাধিক হাতে পড়বে।

এখানে একথা বলা আবশ্যিক, ইসলাম সুন্দহীন খণ্ড প্রথাকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেনি। বরং খণ্ডগ্রহীতাকে বলা হয়েছে, সে যেন খণ্ড গ্রহণের সময় অন্যকে দিয়ে তা নিখিয়ে নেয় এবং শর্তগুলো নির্ধারণ করে দেয়। (সূরা বাকারা : ২৮৩)। আবার বলা হয়েছে, খণ্ডগ্রহীতা যদি কষ্টকর অবস্থায় থাকে, তাহলে খণ্ডদাতা যেন তাকে (যতদিন তার সুন্দিন না আসে) কিছু সময় অবকাশ দেয়। আর যদি খণ্ডদাতা তাকে অক্ষমতার জন্য মাফ করে দেয়— অর্থাৎ, খণ্ডের টাকা গ্রহণ না করে, তা আরও উত্তম বলে আল্লাহর দ্রষ্টিতে বিবেচিত হবে। (সূরা বাকারা : ২৮১)।

যাকাত ব্যবস্থা ও অর্থ পরিচালনা (Money Circulation)

যাকাতের উদ্দেশ্য শুধু গরীব-দুঃখীর প্রতি বিশেষ ত্রাণের ব্যবস্থা করা অথবা আর্থিক দিক দিয়ে যারা পেছনে পড়ে আছে সমাজের সে অংশের উন্নয়ন করাই নয়, বরং এর দ্বারা

অর্থ-সম্পদ এবং পণ্ডৰ্ব্য মজুদ করে রাখার অভ্যাস দূর হয়। ফলে টাকা-পয়সা এবং অন্যান্য পণ্ডৰ্ব্য সবসময় এক হাত হতে অন্য হাতে পরিচালিত হতে পারে। এভাবে অতি সহজেই আর্থিক বিষয়সমূহের পারস্পরিক সমন্বয় (Economic Adjustment) সাধিত হতে পারে। অর্থ-সম্পদ সবসময় সার্কুলেশনে সচল থাকার ফলে সহজেই বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের কর্মসংস্থান হবে। উপরন্ত যাকাতের টাকা দিয়ে সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর মৌলিক চাহিদাগুলোও পূরণ হবে। তাই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوٰةِ فَعِلُوٰنٌ
৩

(ওয়াল্লায়ীনা হৃষি লিয় যাকাতি ফায়িনুন)

অর্থ: “এবং যারা (মু’মিনরা) যাকাত প্রদানে তৎপর (তারা সফল হয়)।” অর্থাৎ, মু’মিনরা যাকাত প্রদানে কোন গতিমিসি করে না। (সূরা মু’মিনুন : ৫)।

মোটকথা ব্যক্তিগত, সামাজিক তথা সার্বিক কল্যাণের জন্য যাকাত ব্যবস্থা সত্যিই অতুলনীয়। সূরা লোকমানের প্রথম রূপ্ততে সেজন্য বলা হয়েছে, “যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং পারলোকিক জীবনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, তারাই তাদের প্রভুর পক্ষ হতে আগত হেদায়েতের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তারাই (সব ক্ষেত্রে) কৃতকার্য হবে।” (সূরা লোকমান : ৫-৬)।

ইসলামী অর্থনীতির মূলকথা

প্রসঙ্গত: ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কয়েকটি মূল বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে:

- ১) ইসলাম অসঙ্গতভাবে অর্থোপার্জনের প্রচেষ্টাকে ধর্মীয় এবং নৈতিক বিধানের মাধ্যমে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে।
- ২) অর্থনীতির মূল বিষয় ‘অভাববোধ’ (Want) সম্বন্ধে ইসলাম একটি নতুন মূল্যবোধের সৃষ্টি করেছে। এ মূল্যবোধে পুঁজিপতিদের চরম স্বার্থান্বতা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা নেই অথবা কমিউনিজমের অনুপ্রেরণাহীন ও ব্যক্তিস্বাধীনতাহীন জীবনযাত্রার কঠোরতাও নেই। ইসলাম ধনী-গরীব সব মানুষের স্বাধীনতা এবং মৌলিক প্রয়োজনের কথা স্বীকার করেছে এবং এদের মাঝে এক অপূর্ব সমন্বয়ের মাধ্যমে বাস্তব কর্মসংস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে।
- ৩) ইসলাম Consumption বা ভোগের পরিমাণ এবং প্রকারকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতে আদেশ দিয়েছে।
- ৪) এসব বিষয় সত্ত্বেও যাকাত, সদকা, দান-খয়রাত, উত্তরাধিকার ইত্যাদি ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলামে একটি নিখুঁত ধন-বন্টন-নীতি অনুসৃত হয়েছে। আন্তরিকতার সাথে এ নীতিগুলো অনুসৃত হলে ধনী শ্রেণীর হাতে অবৈধ ও অবাঞ্ছিত পরিমাণে ধন-সম্পত্তি সংগ্রহীত হতে পারবে না।

- ৫) ইসলামী নীতি অনুসারে সব দরিদ্রের মৌলিক খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থানের অভাব পূরণের জন্য বিশেষ দায়িত্ব থাকবে রাষ্ট্রের ওপর ।
- ৬) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংযমপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতির অনুসরণ করতে হবে এবং যথাসম্ভব যুদ্ধের সম্ভাবনা হতে দেশকে রক্ষা করতে হবে ।
- ৭) বিশ্বব্যাপী খিলাফতের অধীনে পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক উভয়ক্ষেত্রে সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে নিয়ামে ওসীয়ত ও তাহরীকে জাদীদের আদর্শ অনুসরণ করতে হবে ।
- ৮) সকল প্রকার ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড, জ্বালাও-পোড়াও এবং দুর্বাতিক্ষুদ্র বিষয়াদি পরিহার করার জন্য ব্যক্তিগত এবং সামাজিক সকল পর্যায়ে আন্তরিকতার সাথে প্রচেষ্টা করতে হবে । ন্যায় ও কল্যাণভিত্তিক বিচার-ব্যবস্থা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হবে । এই সকল বিষয় অর্থনৈতিক উন্নতির পূর্বশর্ত ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দোয়া

দোয়া সংক্রান্ত জরুরী কিছু কথা

আল্লাহ কুরআনুল আয়ীমে বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ তাল্লাহ তাঁর বান্দাকে তাঁর কাছে দোয়া করার জন্যে বিশেষভাবে তাগিদ প্রদান করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, “উদ্উনী আস্তাজীব লাকুম”- অর্থাৎ, আমার কাছে দোয়া কর আমি তোমাদের দোয়া করুল করব। (সূরা আল মু’মিন : ৬১)। বরং তিনি উদাসীনদের আরও একটু কঠোরভাবে বলেছেন, “কুল মা ই’বাউবিকুম রাবি লাওলা দুআউকুম”- অর্থাৎ, তুমি বলে দাও, তোমরা যদি দোয়া না কর তবে আমার প্রভু তোমাদের কি পরওয়া করেন? (সূরা আল ফুরকান : ৭৮)।

হাদীস পাঠেও আমরা জানতে পারি, মহানবী (সা.) দোয়ার প্রতি বিশেষ জোর দিয়েছেন। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর জিনিসের জন্যও তিনি আল্লাহ তাল্লাহ তাঁর দোয়াপ্রার্থী হতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, “তোমাদের প্রত্যেক অভাব অভিযোগের জন্য আল্লাহ তাল্লাহ তাল্লাহ কাছে প্রার্থনা কর। এমনকি জুতার ফিতার জন্যও।” (তিরমিয়ী)।

হাদীসে আরও বলা হয়েছে, “নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু জীবিত ও দয়ালু। কোন বান্দা তাঁর কাছে হাত তুললে তিনি তা খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।” (তিরমিয়ী, আবু দাউদ)।

বর্তমান যামানার ইমাম হ্যরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহ্মুদী (আ.) দোয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন, “দোয়ার মধ্যে আল্লাহ তাল্লাহ তাঁর অত্যাধিক শক্তি রেখেছেন। খোদা তাল্লাহ ইলহামের মাধ্যমে বারবার আমাকে জানিয়েছেন, যা কিছু হবে দোয়া দ্বারাই হবে। আমাদের হাতিয়ার তো দোয়াই। দোয়া ছাড়া আর কোন অস্ত্র আমাদেরকে দেয়া হয়নি।” একটি কথা অবশ্যই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, দোয়া করা আমাদের কাজ আর দোয়া করুল করা খোদা তাল্লাহ তাঁর কাজ। খোদা তাল্লাহ আমাদের অধীনে নন বরং আমরাই তাঁর অধীনে। তিনি আমাদের প্রভু এবং মালিক। কোন হাকিম বা বাদশাহ যদি প্রজার প্রার্থনা মঞ্জুর না করেন তবে প্রজার কিছি-বা করার থাকে। তাই কোন দোয়া করুল না হলে আমাদের হতাশ হবার কিছু নেই। আল্লাহ তাল্লাহ তাঁর রহমান এবং রহীম। তিনি আলেমুল গায়েবও বটে। তিনি জানেন, আমরা যে জন্যে দোয়া করেছি তা করুল করা হলে আমাদের মঙ্গল হবে, না অঙ্গল। আমাদের খোদা ত্রিকালদশী। আমাদের ভাল-মন্দ তাঁরই নখদর্পণে। তিনি আমাদের স্রষ্টা। আমাদের ভাল-মন্দের খবর তাঁর চেয়ে বেশি আর কে জানে? তাই কোন দোয়া করুল না

হলে আমাদের নিরাশ হওয়া উচিত নয়। দোয়া করে যাওয়াই শ্রেয়। কথিত আছে, এক বুয়ুর্গের শিষ্য দোয়ার সময় তাঁর কাছে উপস্থিত ছিল। পরপর তিন দিন ইলহাম মারফত সেই বুয়ুর্গকে জানান হলো, “তোমার দোয়া কবুল হবে না”। এতে শিষ্যের মনে বুয়ুর্গ সম্বন্ধে সন্দেহ সৃষ্টি হলো এবং সে তাকে দোয়া কবুল না হওয়ার কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে বসলো। এতে বুয়ুর্গ মনে কোন প্রকার কষ্ট না নিয়ে শাস্তিভাবে বললেন, “ছত্রিশ বছর ধরে আমি দোয়া করছি আর এভাবে ইলহাম হচ্ছে। দোয়া করা আমার কাজ আর দোয়া কবুল করা খোদা তাঁলার কাজ। এ ব্যাপারে আমি তো আর বাড়াবাড়ি করতে পারি না।” এ সময়েই পুনঃইলহাম হলো, “তোমার ছত্রিশ বছরের দোয়া সব আজ কবুল করা হলো।” (সুবহানআল্লাহ্)। কী মহান ধৈর্য! প্রার্থনাকারীকে ধৈর্য ও স্বৈর্যের সাথে ক্রমাগত দোয়া করে যেতেই হবে। তবে এটা সত্য, তার দোয়া বিফলে যাবে না। একদিন না একদিন তার দোয়া কবুল হবেই। কেননা, দোয়া কবুল করার জন্য আল্লাহ্ তাঁলা প্রতিশ্রুতিবন্ধ। ‘মুজীব’ তথা দোয়া কবুলকারী খোদা কোন না কোন আঙ্গিকে তাঁর বান্দার দোয়া কবুল করে থাকেন। দোয়া যখন করা হয়, তখন তা কবুল না হলে আকাশে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে এবং রহমান খোদা প্রয়োজনানুসারে বান্দার অজ্ঞাতসারে সেই দোয়ার ফল তাকে দিয়ে থাকেন। নিয়তি বা তকদীরের লিখনের প্রতি প্রার্থনাকারীকে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে।

তকদীর দু'প্রকার। যথা: ১। তকদীরে মুয়াল্লেক (টেলমান তকদীর) ২। তকদীরে মুব্রাম (অট্টল তকদীর)। দোয়া সদকা এবং খ্যরাত ইত্যাদিতে তকদীরে মুয়াল্লাকের পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু কোন অবস্থায় কোন তকদীর কার্যকরী তা বান্দার বোধগম্য নয়। তবুও আল্লাহ্ তাঁলা বান্দার দোয়াকে নিষ্ফল করেন না। কোন না কোনভাবে তা প্রৱণ করেন। এটাই বুয়ুর্গানে দ্বিনের অভিজ্ঞতালক্ষ অভিমত।

প্রত্যেক কাজের এক একটা মৌসুম হয়ে থাকে। সময়মত কাজ করলেই সুফল লাভ হয়। অসময়ে কাজ করলে সুফল লাভ তো হয়ই না বরং তাতে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এরূপভাবে দোয়ারও একটি মৌসুম বা সময় আছে।

নামায়ের মধ্যেই দোয়া অধিক কবুল হওয়ার মোক্ষম সময়, বিশেষ করে যখন আমরা সিজদায় রত থাকি। মহানবী (সা.) বলেছেন, “যখন কোন বান্দা সিজদায় থাকে, তখন সে আল্লাহ্ তাঁলার অতি নিকটে থাকে। সুতরাং তখন বেশি করে দোয়া কর।” (মুসলিম)। এ ছাড়া দোয়া কবুল হয় জুয়ু'আর দিনে, সুবহে সাদিকের পূর্বে, রম্যান মাসে, লায়লাতুল কদরে, আরাফাতের দিনে, ইফতার করার সময়ে, আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে, বৃষ্টিপাতারে সময়ে, অসুস্থ অবস্থায়, সফরকালীন সময়ে, জিহাদের ময়দানে এবং যুগ্ম ও অত্যাচার বরদাশ্তকালীন ধৈর্য ধারণ ইত্যাদি সময়ে।

দোয়ার কবুলিয়তের জন্য বিশ্বিল পস্তা অবলম্বন করা যেতে পারে। হ্যরত খলীফাতুল মসাই সানী মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর পবিত্র বক্তব্যের আলোকে কয়েকটি পস্তা নিম্নে

বর্ণিত হলো:

- ১) আল্লাহ্ তাঁ'লাকে সর্বদা হায়ির-নায়ির খেয়াল করা এবং তাঁ'র সব হৃকুম-আহকাম মোতাবেক নিজের জীবনকে পরিচালিত করা ।
- ২) আল্লাহ্ তাঁ'লা দোয়া কবুল করবেন আর করার ক্ষমতা রাখেন, এ বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাস নিয়ে দোয়া করতে হবে । আল্লাহুর রহমত হতে নিরাশ হবার অবকাশ নেই ।
- ৩) দোয়ার কবুলিয়তের আশায় বিপদগ্রস্ত বান্দার দুঃখ-কষ্ট মোচনে সচেষ্ট থাকা উচিত ।
- ৪) দোয়ার শুরুতে মহানবী (সা.)-এর ওপর অধিক সংখ্যায় দুরদ পাঠ করলে দোয়া কবুল হওয়ার আশা করা যায় । কেননা, সব কল্যাণ এবং আশিস আমরা তাঁ'র বদৌলতেই পেয়ে থাকি ।
- ৫) দোয়ার প্রথম ভাগে আল্লাহ্ তাঁ'লার প্রশংসা এবং পবিত্রতা বেশি-বেশি করে ঘোষণা করা উচিত । আল্লাহ্ তাঁ'লার মহিমা কীর্তনে আত্মা পবিত্র, নির্মল ও জ্যোতির্ময় হয় ।
- ৬) দোয়া করার পূর্বে নিজ শরীর, কাপড়-চোপড় এবং পরিবেশের পবিত্রতার প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । কেননা, পবিত্রতম আল্লাহ্ তাঁ'লা পবিত্রতাকেই বেশি পছন্দ করেন ।
- ৭) দোয়ার জন্যে এক নীরব নিষ্ঠক কোলাহলমুক্ত পরিবেশকে বেছে নেয়া দরকার । এতে দোয়ায় পূর্ণ একাগ্রতা সৃষ্টি হয় ।
- ৮) দোয়ার পূর্বে নিজের দুর্বলতা, অক্ষমতা আর নিঃস্ব অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করা দরকার । খুব চিন্তা করা দরকার যেন তার ওপর শিশুসুলভ অসহায়ত্বের অবস্থার সৃষ্টি হয়, যেরূপ সে মায়ের সাহায্য ছাড়া এক মুহূর্তও চলতে পারে না ।
- ৯) দোয়া করার পূর্বে আল্লাহ্ তাঁ'লার অ্যাচিত-অসীম দানসমূহের বিষয়ে চিন্তা করা উচিত যাতে আল্লাহ্ তাঁ'লার ওপর গভীর আহ্বা জন্যে যে তিনি দোয়া কবুল করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন । না চাইতেই যিনি অনেক দিয়েছেন, চাইলে তিনি কি না দিতে পারেন?
- ১০) আল্লাহ্ তাঁ'লার নেয়ামতসমূহের চিন্তা করার সাথে সাথে তাঁ'র অভিসম্পত্তের বিষয়াবলী সম্বন্ধেও চিন্তা করা দরকার- যাতে প্রার্থনাকারীর কাছে তাঁ'র নিঃসহায় অবস্থা আরও প্রকটভাবে ধরা দেয় ।
- ১১) দোয়া করার প্রারম্ভে প্রার্থনাকারীকে সব দিক হতে অলসতামুক্ত হতে হবে । কেননা, শারীরিক-মানসিক, অলসতাপূর্ণ আত্মার অধিকারী ব্যক্তির দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ ।
- ১২) কোন বিশেষ ব্যাপারে দোয়া শুরু করার পূর্বে সহজে কবুলিয়তযোগ্য সাধারণ বিষয়াবলীর জন্যে দোয়া করা প্রয়োজন । এতে বিশেষ দোয়ার ব্যাপারে অধিক আন্তরিকতা ও একাগ্রতার সৃষ্টি হয় আর কবুলকৃত দোয়ার জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে ত্রৈশিসম্পন্ন অর্জন করত তা কাজে লাগানো যায় ।
- ১৩) দোয়ার জন্য আশিসমন্তিত স্থান নির্বাচন করা প্রয়োজন । কেননা, দোয়ার কবুলিয়তের সাথে উপযুক্ত স্থানের সম্পর্ক অনন্বীক্ষ্য ।

১৪) বিশেষ-বিশেষ বিষয়ে দোয়া করার সাথে আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ-বিশেষ তাগিদ অনুসারে আল্লাহ্ তা'লার সেই গুণবাচক নামকে নিরূপণ করে তাঁকে সেই নামে ডাকা উচিত। তা হলে শীঘ্ৰ-শীঘ্ৰই দোয়া করুল হবে।

১৫) আল্লাহ্ তা'লার “আল্লাহ্” নাম সব গুণবাচক নামের সমষ্টি- অর্থাৎ, সব গুণবাচক নামের সমন্বয় ‘আল্লাহ্’ নামের মাঝে ঘটেছে। তাই শুধু আল্লাহ্ নাম ডাকলেও যেকোন ব্যাপারে দোয়া করুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পরিশেষে হ্যরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কথায় “গয়ের মুমকিন কো ইয়ে মুমকিন মে বদল দেতি হ্যায়, এ্যায় মেরে ফালসফি ও! যোরে দোয়া দেখো তো”— অর্থাৎ, অসম্ভবকে এটি (দোয়া) সম্ভব করে দেখায়, হে আমার দাশনিকবৃন্দ। দোয়ার শক্তি দেখ না!

আরবি শব্দ বড়ই গাঞ্জীর্যপূর্ণ ও তাৎপর্যবহুল। বাংলা ভাষায় সবসময় এর প্রতিশব্দ মেলা ভার। ভাই-বোনদের প্রতি লক্ষ্য রেখে যতদূর সম্ভব সরল ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বর্তমান সংস্করণের বৈশিষ্ট্য হল, হাফেয় মুযাফফর আহমদ সাহেবের ‘আদঙ্গিয়াতুল কুরআন’ পুস্তক থেকে দোয়ার পটভূমি সহ আরও কিছু-কিছু অংশের অনুবাদ নেয়া হয়েছে। তাছাড়া প্রত্যেকটি দোয়ার সর্টিক বাংলা উচ্চারণ দেয়ারও চেষ্টা করা হয়েছে।

কুরআন মজীদের দোয়া

(১) সূরা আল ফাতিহা -১

(মঙ্গী সূরা, বিসমিল্লাহ-সহ এতে ৭ আয়াত এবং ১ রংকু আছে)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম)

১। আল্লাহর নামে, যিনি পরম করণাময়, অ্যাচিত-অসীম দাতা, বারবার কৃপাকারী ।

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(আল্হামদু লিল্লাহির রাবিল আলামিন)

২। সব প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক ।

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(আর রাহমানির রাহীম)

৩। পরম করণাময়, অ্যাচিত-অসীম দানকারী, বারবার কৃপাকারী ।

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

(মালিকি ইয়াওমিদ্দীন)

৪। বিচার দিবসের মালিক বা কর্তা ।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

(ইয়াকানা'বুদু ওয়া ইয়াকা নাসতা'স্টন)

৫। আমরা তোমারই ইবাদত (উপাসনা) করি এবং তোমারই কাছে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি ।

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

(ইহদিনাস সিরাত্তাল মুসতাফীম)

৬। তুমি আমাদেরকে সরল-সুদৃঢ় পথে চালাও ।

صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَثْتَ عَلَيْهِمْ هُنَّ غَيْرُ الْمَعْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

(সিরাতুল্লায়ীনা আন'আমতা আলায়হিম গায়ারিল মাগদুবি 'আলায়হিম ওয়ালাদদাল্লীন) ৭। তাদের পথে যাদেরকে তুমি প্রৱক্ষক দিয়েছ, যারা (তোমার) ক্রোধগ্রস্ত হয়নি এবং যারা পথভ্রষ্টও হয়নি। আমীন (তা-ই হোক)।

- সূরাতুল ফাতিহাকে রসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম শ্রেষ্ঠ দোয়া হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। (মুস্তাদরাক হাকিম)।
- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে ওহীর মাধ্যমে এ সংবাদ দেয়া হয়েছে, একটি পরিপূর্ণ দোয়া যা ইতোপূর্বে কোন নবীকে দান করা হয়নি তাহলো সূরা আল ফাতিহা ও সূরা আল্ বাকারার শেষ আয়াত। যে-ই এসব দোয়ার মাধ্যমে খোদা তাঁলার কাছে চাইবে তার দোয়া গ্রহণ করা হবে। (সহীহ মুসলিম)।
- হাদীসে কুন্দসীতে আছে, আল্লাহ তাঁলা বলেন, আমি নামাযকে আমার ও বান্দার মধ্যে বস্টন করে দিয়েছি। আমার বান্দার অবশ্যই সেসব লাভ হবে যা এ দোয়াতে তার জন্য চাওয়া হয়েছে। (সহীহ মুসলিম)।

সূরা আল্ ফাতিহা পরিপূর্ণ দোয়া

সৈয়দনা হয়রত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন :

“খোদা তা’লা আল্ ফাতিহার মধ্যে দোয়ার এমন উভম পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন যার চেয়ে উভম পদ্ধতি আর সৃষ্টি হতে পারে না। দোয়ার মধ্যে আত্মিক আবেগ সৃষ্টি হওয়ার জন্যে যা দরকার এর সব বিষয় এর মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। বিস্তারিত বিবরণ হল, দোয়ার করুণিয়তের জন্য এটা আবশ্যক, এর মধ্যে যেন একটি আবেগ থাকে। কেননা, যে দোয়ার মধ্যে আবেগ থাকে না তা কেবল মৌখিক বিড়বিড়ানি, সত্যিকারের দোয়া নয়। কিন্তু এটাও বলা আবশ্যক, দোয়ার মধ্যে আবেগ সৃষ্টি হওয়া প্রত্যেক মানুষের নিয়ন্ত্রণে নয় বরং মানুষের জন্যে অত্যধিক প্রয়োজনীয় বিষয় তার ধ্যান-ধারণায় বিদ্যমান থাকা দরকার। আর এ কথা প্রত্যেক বিবেকবানের নিকট দীক্ষিমান যে, আত্মিক আবেগ সৃষ্টির জন্য কেবল দু’টি বিষয়ই আছে:

এক-অদ্বীয় খোদাকে পরিপূর্ণ, সর্বশক্তিমান সব গুণের আধার মনে করে তাঁর রহমত ও দয়াকে আজীবন নিজের অস্তিত্ব ও জীবন ধারণের জন্য আবশ্যক জ্ঞান করা। আর তাঁকেই সব কল্যাণের উৎস মনে করা। দ্বিতীয়ত, নিজের অস্তিত্ব ও নিজের সমশ্রেণীগুলোকে অধম, কপর্দকহীন এবং খোদা তাঁলার সাহায্যের মুখাপেক্ষী মনে করা... প্রার্থনা করার সময়ে প্রার্থনাকারীর এ দু’টি উপকরণ সম্বন্ধে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার।” (বারাহীনে আহমদীয়া : পৃ. ৫৫৩-৫৪, টীকা দ্রষ্টব্য)।

(২) হ্যরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া

[হ্যরত ইবরাহীম (আ.) বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের সময় মক্কা শহরের পূর্ণ নিরাপত্তা, এর অধিবাসীদের রিয়ক লাভের ও সন্তান-সন্ততির শিরক ও মুর্তিপূজা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে দোয়া করেছিলেন তা সবই গ্রহণ করা হয়] (তফসীর দূররে মনসুর, ৪৩ খণ্ড, পৃ. ৮৬, তফসীর কুরতুবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৭)।

رَبِّ اجْعُلْ هَذَا أَبْدَأًا إِمَّاً وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الْحَمَرَتِ مِنْ أَمْنٍ مِنْهُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

(রাবিজ-আল হায়া বালাদান আমিনাও ওয়ারযুক্ত আহলাহ মিনাস সামারাতি মান আমানা মিনহম বিল্লাহি ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি)

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! এ (মক্কাকে) এক নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ শহর করে দাও। আর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখবে তাদেরকে ফল-ফলাদির রিয়ক (জীবনোপকরণ) দান করো।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(রাব্বানা তাক্বাবাল মিন্না-ইন্নাকা আনতাস্ সামী-উল ‘আলীম)

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ থেকে (এ সেবা) গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমই সর্বশ্রেতা, সর্বজ্ঞ।

**رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذِرَيْتَنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَا سِكَنَّا وَبِئْبَعَ عَلَيْنَا
إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ**

(রাব্বানা ওয়াজ আলনা মুসলিমায়নি লাকা ওয়া মিন যুরিয়াতিনা উমাতাম্ম মুসলিমাতাল্লাকা-ওয়া আরিনা মানসিকানা ওয়া তুব-আলায়না-ইন্নাকা আনতাত্ তাওওয়াবুর রাহীম)

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের উভয়কে তোমার প্রতি আত্মসমর্পণকারী বানাও এবং আমাদের বংশধরদের মাঝেও তোমার প্রতি আত্মসমর্পণকারী একটি উম্মত (সৃষ্টি কর)। আর আমাদেরকে আমাদের ইবাদত (ও কুরবানীর) নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দান কর এবং আমাদের তওবা করুল করে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, কারণ তুমই সদয় তওবা গ্রহণকারী, বারবার কৃপাকারী।

**رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّهُمْ إِنِّي لَكَ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُرَزِّكِيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ**

(রাব্বানা ওয়াব-আস ফীহিম রাসূলাম মিনহম ইয়াতলু আলায়হিম আয়াতিকা ওয়া

ইউ'আল্লিমু হুমুল কিতাবা ওয়াল হিকমাতা ওয়া ইউযাকীহিম-ইন্নাকা আনতাল আয়ীযুল হাকীম)

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি তাদের মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে এক মহান রসূল আবির্ভূত কর, যে তাদের নিকট তোমার আয়াতসমূহ পড়ে শুনাবে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত (প্রজ্ঞ) শিক্ষা দিবে এবং তাদের পবিত্র করবে। নিচ্য তুমি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। (সূরা বাকারা : ১২৭-১৩০)।

৩) বিপদের সময় মুমিনদের দোয়া

[খোদার ধৈর্যশীল মুমিন বান্দাদের ওপর যখন কোন বিপদ পড়ে বা দুঃখ-কষ্ট আসে তখন তারা এ দোয়া করে থাকে, যার দরজন তাদের ওপর তাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অনুগ্রহরাজি ও কল্যাণরাজি অবর্তীর্ণ হয়ে থাকে। আর এরাই পথপ্রাণ। (সূরা বাকারা : ১৫৬-১৫৭)।

হ্যরত ইমাম হোসেন বিন আলী (রা.)-এর বর্ণনা, “মুমিন দুঃখকষ্টের সময় ‘ইন্নালিল্লাহ’ পড়লে আল্লাহ তাঁলা এর প্রতিদান হিসেবে সেভাবেই এর প্রতিফল দিয়ে থাকেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ)।

এই জন্যে দুঃখ-কষ্ট দূরীকরণের প্রতিকারও এ দোয়ার প্রসাদে লাভ হয়।

দোয়াটি হল:

إِنَّ اللَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجُعُونَ^①

(ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়াহি রাজিউন)

নিচ্য আমরা আল্লাহরই আর নিচ্য তাঁর দিকে আমরা ফিরে যাব। (সূরা বাকারা : ১৫৭)।

(৪) উভয় জগতের কল্যাণ লাভের দোয়া

[হ্যরত আনাস বিন মালেক (রা.)-কে কেউ একজন বললেন, আপনি আমার জন্যে দোয়া করুন। হ্যরত আনাস (রা.) এ দোয়া করলেন। সে আরও দোয়া করতে বললে, তিনি বলেন, তুমি আর কী চাও? তোমার জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ চাইলাম। (তফসীর কুরতুবী, ২য় খন্ড, পৃ. ৪৪৩)।]

رَبَّنَا أَتَّبَعْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قَاتَعْدَابَ الظَّالِمِ

(রাববানা আতিনা ফিদুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াক্সিন আয়াবান্নার)

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালেও এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর। আর আমাদেরকে আগন্তের আয়াব থেকে রক্ষা কর। (সূরা বাকারা : ২০২)।

টিকা : হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) বলেছেন, স্বপ্নে একবার হযরত নবী করিম (সা.) তাঁকে অধিক সংখ্যায় উপরোক্ত দোয়া পাঠ করার জন্যে তাকিদ দিয়েছেন। (মিরকাতুল ইয়াকীন, পৃ. ১৮৮)।

(৫) অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সাহায্য লাভের দোয়া

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَيْنَنَا صَبْرًا وَ تَبِّعْ أَقْدَامَنَا وَ انصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفَّارِينَ ۝

(রাববানা আফরিগ আলায়না সাব্রাওঁ ওয়া সার্বিত আকুন্দামানা ওয়ানসুরনা আলাল কুওমিল কাফিরীন)

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের ওপর অসাধারণ ধৈর্য বর্ষণ কর ও আমাদের পদক্ষেপ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখ আর কাফির (অস্তীকারকারী) লোকদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর। (সুরা বাকারা : ২৫১)।

(৬) ক্ষমা লাভের দোয়া

سَمِعْنَا وَأَطْعَنْنَا فَغُفرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝

(সামি'না ওয়া আত্তা'না গুফরানাকা রাববানা ওয়া ইলায়কাল মাসীর)

আমরা (আল্লাহ তা'লার আদেশ) শুনলাম ও মানলাম, হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমরা তোমারই কাছে ক্ষমা চাই আর তোমারই দিক (সবার) ফিরে যেতে হবে। (সুরা বাকারা : ২৮৬)।

(৭) ঐশ্বী পাকড়াও থেকে সুরক্ষা এবং ঐশ্বী সাহায্য লাভের দোয়া

رَبَّنَا لَا تَوَاحِدْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَلْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَيْنَنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الدِّيْنِ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفْ عَنَّا وَاغْفِرْنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَنَا فَاصْرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفَّارِينَ ۝

(রাববান লা তুআখিয়না ইননাসীনা আও আখত্তা'না- রাববানা ওয়ালা তাহিমিল 'আলায়না ইস্রান কামা হামালতাহ 'আলাল্লায়ীনা মিন কুরলিনা- রাববানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা মা-লা ত্তাক্তাতা লানা বিহি-ওয়া'ফু 'আগ্না- ওয়াগফিলানা-ওয়ারহামনা-আন্তা মাওলানা-ফান্সুরনা 'আলাল কুওমিল কাফিরীন)

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করো না যদি আমরা ভুলে যাই অথবা ক্রটি-বিচ্যুতি করি। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের ওপর এমন বোঝা চাপিও না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। তুমি আমাদেরকে মার্জনা কর, তুমি

আমাদেরকে ক্ষমা কর, আর তুমি আমাদের প্রতি কঢ়া কর, (কারণ) তুমিই আমাদের অভিভাবক। অতএব অস্থীকারকারী লোকদের বিরুদ্ধে তুমি আমাদের সাহায্য কর। (সূরা বাকারা : ২৮৭)।

[এ দু'টি দোয়া সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত। হ্যরত আবু মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, “সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত রাতের বেলায় ঘুমোবার সময় পাঠ করা খুবই কল্যাণজনক। তদুপরি এগুলো আরশের সেই ভান্ডার— যা নবী করিম (সা.) ছাড়া কাউকে দেয়া হ্যানি। (তফসীরে তাবারী, তয় খন্দ, পৃ. ৪৩৪)।

সূরা বাকারার শেষ দু'টি দোয়ার আয়াত সম্বন্ধে রসূল করিম (সা.) বলেছেন, এ দু'টি মুখ্যত কর ও পরিবারের সবাইকে মুখ্যত করাও। কেননা, এগুলো নামায, কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়াতে ব্যবহার করা হয়। (হ্যরত ইমাম সুযুতি (রহ.) প্রণীত আদ্দুরৱ্বল মনসুর, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৮)।

(৮) সঠিক পথ লাভের পর পথভ্রষ্ট না হওয়ার দোয়া

[হ্যরত উম্মে সালামাহ (রা.) বর্ণনা করেন, “রসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সময় এ দোয়া করতেন, হে হৃদয় পরিবর্তনকারী খোদা! আমার হৃদয়কে তোমার ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। তিনি (রা.) বলেন, আমি বলাম, হে আল্লাহর রসূল! হৃদয় আবার পরিবর্তন হয় নাকি? হ্যুন্ন (সা.) এ কুরআনী দোয়া পড়ে শুনান আর বলেন, প্রত্যেক মানুষের পদশ্বলনের সম্ভাবনা রয়েছে। এ জন্যে বেশি-বেশি এ দোয়া করা আবশ্যিক। (হ্যরত ইমাম সুযুতি (রহ.) প্রণীত আদ্দুরৱ্বল মনসুর, ২য় খণ্ড, পৃ. ০৮)।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْهَدْيَتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ

(রাবৰানা লা তুযিগ্ কুলুবানা বা'দা ইয় হাদায়তানা ওয়া হাব লানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান-ইন্নাকা আনতাল ওয়াহহাব)

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে সঠিক পথ দানের পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না। আর তোমার সন্ধিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর। নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা। (সূরা আলে ইমরান : ৯)।

(৯) ঈমানের স্বীকারোত্তি, পাপ ও ত্রৈশী শান্তি থেকে রক্ষার দোয়া

[নবী করিম (সা.) বলেছেন, যখন আল্লাহ্ তা'লা কোন জাতিকে শান্তি দিতে চান তখন তাদের মধ্যকার তাহাজুদগুয়ার ও ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে তাদের কারণে সেই জাতির শান্তি টলিয়ে দেন। (তফসীর কুরতুবী, ৪৮ খন্দ, পৃ. ৩৯)।]

رَبَّنَا إِنَّا أَمْتَأْ فَاغْفِرْنَا ذُنُوبَنَا وَقَاتَعْدَابَ النَّارِ

(রাবণা ইন্নানা আমান্না ফাগলির লানা যুনুবানা ওয়াকুনা ‘আয়াবান্নার) হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা ঈমান এনেছি। অতএব তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর এবং আগন্তের শান্তি থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর। (সূরা আলে ইমরান : ১৭)।

(১০) ঐশ্বী মাহাত্ম্য কীর্তন ও উন্নতি লাভের দোয়া

[নবী করিম (সা.) হযরত মুআয় (রা.)-কে ঝণ থেকে মুক্তি লাভের জন্যে এ দু'টো আয়াত পড়তে বলেছেন। দুঃখ-কষ্টে পীড়িত যে মুসলমান এ আয়াত পাঠ করে আল্লাহু তালা তাঁর ঝণ ও দুঃখকষ্ট দূর করে দিবেন। মুক্তিল বলেন, রসূল করিম (সা.) পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের ওপর যখন বিজয় লাভ করেন তখন তাঁকে এ দোয়া শিখান হয়। (তফসীর কুরতুবী, ৪৮ খণ্ড, পৃ. ৫৪)।]

اللَّهُمَّ مِلِكُ الْمُلُكِ تُوْقِي الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعَزِّزُ مِنْ تَشَاءُ وَتُنْذِلُ مِنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

(আলালুম্মা মালিকাল মুলকি তু'তিল মুলকা মান তাশাউ ওয়া তানবিঁ'উল মুলকা মিম্মান তাশাউ ওয়া তু'ইয়েয় মান তাশাউ ওয়া তুযিলু মান তাশাউ বিইয়াদিকাল খায়র-ইন্নাকা ‘আলা কুল্লি শায়ইন কুদীর)

হে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ! যাকে চাও তাকেই তুমি ক্ষমতা দান কর আর যার নিকট থেকে চাও ক্ষমতা কেড়ে নাও। আর যাকে চাও সম্মান দান কর এবং যাকে চাও লাঞ্ছিত কর। সব কল্যাণ তোমারই হাতে। নিশ্চয় তুমি প্রত্যেক বিষয়ে (যা তুমি চাও) সর্বশক্তিমান।

تَوَلِّ يَوْمَ الْهَارِ وَتَوَلِّ لَيْلَةَ الْهَارِ فِي أَيْلَى وَتَحْرِجْ الْحَسَدَ مِنْ الْمِسْتَ وَتَحْرِجْ الْحَسَدَ مِنْ الْحَسَدِ وَتَرْزِقْ مِنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حَسَابٍ ﴿

(তুলিজুল লায়লা ফিল্লাহারি ওয়া তুলিজুল্লাহরা ফিল্লায়ল-ওয়া তুখরিজুল হাইয়া মিনাল মায়িতি ওয়া তুখরিজুল মায়িতা মিনাল হায়ি-ওয়া তারযুকু মান তাশাউ বিগায়ারি হিসাব)

তুমি রাতকে দিনে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতে প্রবেশ করাও। আর তুমি মৃত থেকে জীবিতকে বের কর এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের কর। আর যাকে চাও তুমি বেহিসাব রিয়ক (জীবনে পকরণ) দান কর। (সূরা আলে ইমরান : ২৭-২৮)।

(১১) সন্তান উৎসর্গ করার মানত ও নয়র মানার দোয়া

[হ্যরত মরিয়মের মা হান্না তাঁর নিজের ভাবী সন্তানকে জন্মের পূর্বে উৎসর্গ করার জন্যে এ দোয়া করেছিলেন। এ দোয়া করুল হয়েছিল। আর মরিয়মের মত মহান পুণ্যবতী কল্যাণকাংকে দেয়া হয়েছিল।]

رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مَحَرَّرًا قَقَبَلْ مِنْيٌ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑩

(রাবিব ইয়া নায়ারতু লাকা মা ফী বাত্তনী মুহারুরান ফাতাকাবাল মিন্নী ইয়াকা আনতাসু সামী'উল 'আলীম)।

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক। আমার গর্ভে যা আছে তা আমি (সংসার) মুক্ত করে তোমার (ধর্মের সেবার) জন্যে উৎসর্গ করলাম। সুতরাং তুমি আমার নিকট থেকে এটা গ্রহণ কর। নিশ্চয় তুমই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সুরা আলে ইমরান : ৩৬)।

(১২) রসূলের স্বীকারোক্তি ও ঐশ্বী নৈকট্য লাভের দোয়া

[হ্যরত মসীহ নাসেরী (আ.)-এর হাওয়ারীরা চারদিক থেকে মসীহকে অস্থীকার করা হচ্ছে দেখে সাহায্যের ধ্বনি উচ্চারণ করেন-মসীহর ওপর ঈমান আনুন আর দোয়া করুণ।]

رَبَّنَا أَمْتَابِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَأَكْبَبْنَا مَعَ الشَّهِيدِينَ ⑪

(রাববানা আমান্না বিমা আনযালতা ওয়াত্তাবান্নার রাসূলা ফাকতুবনা মাআশ্শ শাহিদীন) হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি যা অবতীর্ণ করেছ আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি আর এ রসূলের অনুসরণ করেছি। সুতরাং তুমি আমাদেরকে সাক্ষীগণের অস্তর্ভুক্ত হিসেবে লিখে রাখ। (সুরা আলে ইমরান : ৫৪)।

(১৩) ধৈর্য ও স্বৈর্যের জন্যে দোয়া

[নবীদের ওপর ঈমান আনয়নকারী সেসব আল্লাহওয়ালা লোকদের আল্লাহ তাল্লা প্রশংসা করেন- যারা নিজেদের নবীদের সাথে থেকে শক্তির সাথে যুদ্ধ করেছে, মোটেও দুর্বলতা দেখায়নি। কুরআন শরীফে তাদের এ দোয়ার উল্লেখ এসেছে। যার ফলে আল্লাহ তাঁদেরকে ইহ ও পরকালের প্রতিদান দিয়েছেন।]

رَبَّنَا أَغْفِرْنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيَّ أَمْرِنَا وَأَوْتِيَّتْ أَقْدَامَنَا وَأَصْرَنَا عَلَى النَّقْوَمِ الْكُفَّارِينَ ⑫

(রাববানাগ্ ফিরলানা যুনুবানা ওয়া ইসরাফানা ফী আমরিনা ওয়া সাবিত আকুন্দামানা ওয়ানসুরনা আলাল কুওমিল কাফিরীন)

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক। আমাদেরকে আমাদের পাপ ও আমাদের কাজের মধ্যকার

বাড়াবাড়ি ক্ষমা কর। আর আমাদের পদক্ষেপকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত কর (আমাদেরকে বিশ্বাসে অটল-অনড় রাখ)। আর অস্বীকারকারী জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। (সূরা আলে ইমরান : ১৪৮)।

(১৪) আল্লাহ তাঁলা যথেষ্ট হওয়ার দোয়া

[হ্যরত ইবরাহীম (আ.)- কে যখন আগুনে ফেলা হলো তখন তিনি এ দোয়া করেছিলেন-
বুখারী, কিতাবুত্ত তফসীর]

حُسْبَنُ اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ

(হাসবুন্নাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল)

আল্লাহ আমাদের জন্যে যথেষ্ট। আর তিনি কত উত্তম কার্যান্বাহক! (সূরা আলে ইমরান : ১৭৮)।

(১৫) দোয়খের শান্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া

رَبَّنَا مَا حَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَاعَدَابَ النَّارِ

(রাবরানা মা খালাকৃতা হায়া বাত্তিলান- সুবহানাকা ফাক্রিনা আয়াবান্নার)

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি এ (বিশ্বজগতকে) বৃথা সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র।
সুতরাং তুমি আমাদেরকে আগুনের শান্তি থেকে রক্ষা কর।

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُذْخِلُ النَّارَ فَقُدْ أَخْرِيَّةُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

(রাবরানা ইন্নাকা মান তুদখিলিন্নারা ফাকুদ আখযাইতাহ- ওয়ামা লিয়্যালিমীনা মিন
আনসার)

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি যাকে আগুনে প্রবেশ করিয়েছ, অবশ্যই তাকে তুমি
লাষ্টিত করেছ। প্রকৃতপক্ষে অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা আলে ইমরান : ১৯২-১৯৩)।

(১৬) সত্য গ্রহণের স্বীকারোক্তি ও উত্তম পরিণতি লাভের দোয়া

[হ্যরত আয়েশা (রা.) বলেন, যখন এ দোয়া সম্বলিত আয়াতগুলো অবর্তীর্ণ হলো তখন
হ্যুর (সা.) কাঁদতে-কাঁদতে নামায শুরু করেন। হ্যরত বেলাল (রা.) আঁ-হ্যরত
(সা.)-কে নামাযের খবর দিতে এসে তাঁর এ রকম কান্নার কারণ জানতে চাইলেন। তিনি
(সা.) বললেন, আজ রাতে আমার ওপর এ আয়াত অবর্তীর্ণ হয় আর বলা হয়, খুব
হতভাগ্য সেই লোক, যে এ আয়াত পড়ে অথচ এ সম্বন্ধে চিন্তা করে না। (তফসীর
কুরতুবী, ৪ৰ্থ খন্দ, পৃ. ৩১)।]

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يَنْادِي لِلْأَيْمَانِ أَنْ أَمْتُوا بِرِّبِّكُمْ فَإِمَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرْنَا
ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْنَا عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ^{١٥} رَبَّنَا وَاتَّنَا مَا وَعَدْنَا عَلَى رُسُلِكَ
وَلَا مُخْرِنَا يَوْمَ الْقِيَمةِ^{١٦} إِنَّكَ لَا تُحِلُّ الْمِيعَادَ

(রাববানা ইন্নানা সামি'না মুনাদিয়াইয়ুনাদী লিলউমানি আন আমিনু বিরাবিকুম ফা আমান্না, রাববানা ফাগফিরলানা যুনুবানা ওয়া কাফ্ফির ‘আন্না সায়িয়আতিনা ওয়া তাওয়াফফানা মা'আল আব্রার- রাববানা ওয়া আতিনা মা ওয়া'আতানা ‘আলা রাসূলিকা ওয়ালা তুখ্যিনা ইয়াওমাহ- ইন্নাকা লা তুখলিফুল মী'আদ)

হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা এক আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে (এই বলে) আহ্বান জানাতে শুনেছি-‘তোমারা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন।’ অতএব আমরা ঈমান এনেছি। অতএব হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দাও। আর আমাদের দোষ-ক্রটি আমাদের কাছ থেকে দূরীভূত কর এবং আমাদেরকে পুণ্যবাণদের অস্তর্ভুক্ত করে মৃত্যু দাও।

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি তোমার রসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, তা তুমি আমাদেরকে দাও এবং কিয়ামতের দিনে তুমি আমাদেরকে লাঞ্ছিত করো না। নিশ্চয় তুমি তোমার প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না। (সূরা আলে ইমরান : ১৯৪-১৯৫)।

(১৭) অত্যাচারী জনপদবাসী থেকে রক্ষার দোয়া

[হয়রত আব্দুল্লাহ বিন আববাস (রা.)-এর মা প্রাথমিক যুগে ঈমান এনেছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, রসূল করিম (সা.)-এর মক্কা থেকে হিজরত করে যাওয়ার পরে আমি ও আমার মা মক্কার সেসব অসহায় শিশু ও নারীদের অস্তর্ভুক্ত ছিলাম যাদের কথা কুরআন শরীফে উল্লেখ এসেছে। এরা হিজরতের জন্যে খোদার কাছে দোয়া করতেন। (বুখারী, কিতাবুত তফসীর)।]

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقُرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا^{١٧} وَاجْعَلْنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًا^{١٨} وَاجْعَلْنَا
مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا^{١٩}

(রাববানা আখরিজনা মিন হায়হিল ক্঵ারইয়াতিয় যালিমি আহলুহা-ওয়াজ ‘আল্লানা মিল্লাদুন্কা ওয়ালিয়াও ওয়াজআল লানা মিল্লাদুন্কা নাসীরা)

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে এ শহর থেকে বের করে নাও, এর অধিবাসীরা বড়ই অত্যাচারী। আর তুমি নিজের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে কোন অভিভাবক নিযুক্ত কর এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে কোন সাহায্যকারী নিযুক্ত কর। (সূরা নিসা : ৭৬)।

(১৮) নিজের অক্ষমতা ও অস্বীকারকারীদের বিষয়ে দায়িত্বমুক্ত হওয়ার দোয়া

[হ্যরত মূসা (আ.) তাঁর জাতিকে পবিত্র ভূমির বিজয়ের সংবাদ দিয়ে এতে প্রবেশ করার আদেশ দেন। তখন তারা এটা অস্বীকার করে। তখন হ্যরত মূসা (আ.) এ দোয়া করেন। এর ফলে ৪০ বছরের জন্যে সেই পবিত্র ভূমি মূসা (আ.)-এর জাতির নিকট নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়।]

رَبِّنَا لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَأُفْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَسِيقِينَ^{১৫}

(রাবিব ইন্নী লা আমলিকু ইন্না নাফসী ওয়া আখি ফাফরঞ্চ বায়নানা ওয়া বায়নাল কুাওমিল ফাসিফুন)

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমি আমার নিজের ও আমার ভাই ছাড়া কারও ওপর কোন কর্তৃত রাখি না। সুতরাং তুমি আমাদের ও দুর্শর্মপরায়ণ লোকদের মাঝে পার্থক্য করে দাও। (সূরা মায়েদা : ২৬)।

(১৯) ঈমানের স্বীকৃতি ও যোগ্যতা লাভের দোয়া

[কুরআন শরীফে এ দোয়া সেসব নিষ্ঠাবান ও পবিত্র দলের প্রতি আরোপিত হয়— যারা অন্য ধর্মের, বিশেষ করে খ্রিস্টানদের মাঝ থেকে সত্যকে চিনতে পেরে ঈমান আনে আর এ দোয়া করে।]

رَبَّنَا أَمَّا فَأَكْتُبْنَا مَعَ الشَّهِيدِينَ^{১৬} وَمَا أَنَا لَدُوْمَنْ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ
وَنَطَّمْعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْصَّالِحِينَ^{১৭}

(রাববানা আমান্না ফাকতুবনা মা'আশ্ শাহিদীন- ওয়ামা লানা লা নু'মিনু বিল্লাহি ওয়ামা জা-আনা মিনাল হাকি- ওয়া নাত্মা'উ আইয়ুদখিলানা রাববুনা মা'আল কুাওমিস্ সালিহীন)

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং তুমি আমাদেরকে সাক্ষীগণের অন্তর্ভুক্ত কর। আর আমাদের এমন কী কারণ রয়েছে যে, আমরা আল্লাহ'র ওপর এবং যে সত্য আমাদের নিকট এসেছে এতে ঈমান আনব না? অথচ আমরা আন্তরিকভাবে আকাঙ্ক্ষা করি, আমাদের প্রভু-প্রতিপালক আমাদেরকে পুণ্যবান জাতির অন্তর্ভুক্ত করবেন। (সূরা মায়েদা : ৮৪-৮৫)।

(২০) রিয়্ক বৃদ্ধি ও ঈদের আনন্দ লাভের দোয়া

[হ্যরত ঈসা (আ.)-এর হাওয়ারীদের চাপে তিনি খোদার কাছে দোয়া করলে আকাশ থেকে খাবার খাঞ্চা অবতীর্ণ হয় আর রিয়্কে প্রবৃদ্ধি লাভ ঘটে। হ্যরত মসীহ (আ.)-এর দোয়ার জবাবে আল্লাহ্ তাঁলা বলেন, খাবার খাঞ্চা দিলাম কিন্তু এর অকৃতজ্ঞতা করলে কঠিন শাস্তি দেব।]

اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزُلْ عَلَيْنَا مَاءً بِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيْدًا لَاَوَّلَنَا وَآخِرَنَا وَإِيَّهُ مُنْكَرٌ
وَأَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرُّزْقِينَ
১৫

(আল্লাহভ্রম্মা রাববানা আনফিল ‘আলায়না মাইদাতাম মিনাস্ সামাই তাকুনু লানা ‘ঈদান্নি আওয়ালিনা ওয়া আখিরিনা ওয়া আয়াতাম মিন্কা ওয়ার্যুকুনা ওয়া আন্তা খায়রুর রায়িকীন)

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্! তুমি আকাশ থেকে আমাদের জন্যে খাবার ভরতি খাঞ্চা অবতীর্ণ কর যেন তা আমাদের প্রথম অংশের জন্য আর আমাদের শেষ অংশের জন্যে ঈদের কারণ হয় এবং (যেন তা) তোমার পক্ষ থেকে একটি নির্দর্শন হয়। (হে প্রভু!) তুমি আমাদেরকে রিয়িক দান কর। প্রকৃতপক্ষে তুমই উন্নত রিয়িকদাতা। (সূরা মায়েদা : ১১৫)।

(২১) পথঅর্পণ জাতির জন্যে ক্ষমার দোয়া

[হ্যরত আবু যার (রা.) বর্ণনা করেন, “রসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একবার সম্পূর্ণ নামাযে এ দোয়া করেন। আমি আবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার তো সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ। আপনি কেন কেবল একটি আয়াতই পড়ছেন? রসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি আমার উম্মতের জন্যে দোয়া করছিলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী জবাব পেলেন? তিনি (সা.) বললেন, সে জবাব সম্বন্ধে যদি বলি তাহলে অধিকাংশ লোক নামায ছেড়ে দেবে।” (হ্যরত ইমাম সুযুতী প্রণীত আদ দুররূল মনসূর, ৩য় খন্ড, পৃ. ৭৫)। হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.)-ও তাঁর অনুসারীদের জন্য এ দোয়া করেছিলেন।]

إِنْ تُعْذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَدُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَرِيرُ الْحَكِيمُ
১৬

(ইনতু’আয়িবহুম ফা ইন্নাহম ‘ইবাদুকা-ওয়াইন তাগফিরলাহুম ফা ইন্নাকা আনতাল আয়ীযুল হাকীম)

অর্থ: (হে আল্লাহ্) তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দিতে চাও তাহলে তারা তোমারই বান্দা। আর তুমি যদি তাদেরকে ক্ষমা করতে চাও তাহলে নিশ্চয় তুমি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। (সূরা মায়েদা : ১১৯)।

(২২) পাপ থেকে মুক্তির দোয়া

[হ্যরত আদম (আ.) ঐশ্বী আদেশ ভুলে গিয়ে ‘নিষিদ্ধ গাছের স্বাদ নেন- যার সম্পর্কে তাঁকে নিষেধ করা হয়েছিল। তাই আল্লাহু তালা তাঁকে এ দোয়া শিখান। এর ফলে তিনি আল্লাহু তালার ক্ষমা লাভ করেন। (আদ দুররংল মনসূর, ওয় খড় পৃ. ৭৫)।]

رَبَّنَا طَلَمْنَا آفَسَنَا وَإِنْ لَمْ تَعْفِرْلَكَ وَتَرْحَسَنَكَ كُونَنَ مِنْ الْخَرِيْنَ ①

(রাববানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনানা মিনাল খাসিরীন)

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রাণের ওপর অত্যাচার করেছি। আর তুমি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না কর ও আমাদের প্রতি কৃপা না কর তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (সূরা আ'রাফ : ২৪)।

(২৩) অত্যাচারী জাতির অস্তর্ভুক্ত বা সহযোগী না হওয়ার দোয়া

[পরিপূর্ণ মু'মিন যখন জান্নাতের পরে জাহানামের দৃশ্য দেখবে তখন এ দোয়া করবে]

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الظَّالِمِيْنَ ②

(রাববানা লা তাজ' আলনা মা'আল কুওমিয় যালিমীন)

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অত্যাচারী জাতির অস্তর্ভুক্ত করো না। (সূরা আ'রাফ : ৪৮)।

(২৪) সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করণের দোয়া

[হ্যরত আব্দুল্লাহ বিন আবাস (রা.) বর্ণনা করেন, “হ্যরত শুআইব (আ.) জাতির হেদায়াতের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে দোয়া করার সিদ্ধান্ত নেন। এর ফলে তাঁর জাতি ভূমিকাম্পের কবলে পতিত হয়ে ধ্বংসাণ্ট হয়। (তফসীর কুরতুবী, ৭ম খড়, পৃ. ২৫১)।]

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمَنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَتَحِيْنَ ③

(রাববানাফ্তাহ বায়নানা ওয়া বায়না কুওমিনা বিল হাকি ওয়া আন্তা খায়রংল ফাতিহীন)

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের ও আমাদের জাতির মাঝে যথাযথভাবে মীমাংসা করে দাও। কেননা, তুমই উত্তম মীমাংসাকারী। (সূরা আ'রাফ : ৯০)।

(২৫) ধৈর্য ও উত্তম পরিগাম লাভের দোয়া

[হ্যরত মূসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী যাদুকররা এ দোয়া করেছিলেন যখন ফেরাউন তাদেরকে দুঃখকষ্ট দিয়েছিল।]

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوْفِيقًا مُسْلِمِينَ

(রাব্বানা আফরিগ্ আলায়না সাব্রাওঁ ওয়া তাওয়াফ্ফানা মুসলিমীন)
হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের প্রতি ধৈর্য অবতীর্ণ কর আর আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দাও। (সূরা আরাফ : ১২৭)।

(২৬) আল্লাহর দরবারে ফিরে যাওয়া ও পূর্ণ ঈমান প্রকাশের দোয়া

[হ্যরত মূসা (আ.) আল্লাহর জ্যোতির্বিকাশ সহ্য করতে না পেরে অচেতন হয়ে যান। চেতনা লাভ করে তিনি এ দোয়া করেন।]

سُبْحَكَ تَبَّتْ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ

(সুবহানাকা তুর্বতু ইলায়কা ওয়া আনা আওওয়ালুল মু'মিনীন)
তুমি (সব ছ্রটি থেকে) পবিত্র। আমি তোমার দিকে ফিরে আসছি। আর আমি মু'মিনদের মাঝে প্রথম। (সূরা আরাফ : ১৪৪)।

(২৭) কৃপা ও ক্ষমতাপ্রাপ্তির দোয়া [বনী ইসরাইলের তওবার দোয়া]

لَبِّرْ لَهُ يَرْكَعْنَا رَبَّنَا وَيَعْفِرْ لَنَكَوْنَنَّ مِنَ الْخَسِيرِينَ

(লা-ইল্লাম ইয়ারহামনা রাবুনা ওয়া ইয়াগফির লানা লানাকুনানা মিনাল খাসিরীন)
আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের ওপর যদি কৃপা না করেন এবং আমাদের ক্ষমা না করেন তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো। (সূরা আরাফ : ১৫০)।

(২৮) নিজের জন্য ও নিজ ভাইয়ের জন্য পরম কৃপাময়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা [হ্যরত মূসা (আ.)-এর দোয়া]

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلَا حُجْ وَأَدْخِنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ

(রাবিগফিরলী ওয়ালিআখী ওয়া আদখিলনা ফী রাহমাতিকা ওয়া আন্তা আরহামুর রাহিমীন)
রাবিগফিরলী ওয়ালিআখী ওয়া আদখিলনা ফী রাহমাতিকা ওয়া আন্তা আরহামুর

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা কর। আর আমাদের উভয়কে তোমার কৃপার মাঝে প্রবিষ্ট কর। কেননা, তুমিই কৃপাময়দের মাঝে সর্বোত্তম। (সূরা আরাফ : ১৫২)।

(২৯) করণ্ণা ও ক্ষমা বর্ষণের দোয়া [হ্যরত মুসা (আ.)-এর দোয়া]

أَنْتَ وَلِيْنَا فَاغْفِرْنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ حَيْرُ الْغَفِّرِيْنَ

(আন্তা ওয়ালীয়ুন্যা ফাগফির লানা ওয়ারহামনা ওয়া আন্তা খায়রল গাফিরীন) তুমি আমাদের অভিভাবক, সুতরাং তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের ওপর কৃপা বর্ষণ কর। কেননা, তুমি ক্ষমাকারীদের মাঝে সর্বোত্তম। (সূরা আরাফ : ১৫৬)।

(৩০) ইহকাল ও পরকালের জন্য দোয়া [নিজের জাতির জন্যে হ্যরত মুসা (আ.)-এর দোয়া]

وَاَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا مُهْدُنَا اِلَيْكَ

(ওয়াকতুব্লানা ফী হায়হিদুন্যা হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি ইন্না হৃদনা ইলায়কা) আর তুমি আমাদের জন্য এ দুনিয়াতে কল্যাণ নির্ধারিত কর এবং পরকালেও। নিশ্চয় আমরা তোমার দিকে (অনুতাপের সাথে) ফিরে এসেছি। (সূরা আরাফ : ১৫৭)।

(৩১) পূর্ণ ভরসা ও ঐশী সন্তুষ্টির জন্য দোয়া

[হ্যরত আবু দারদা (রা.) বর্ণনা করেন, “যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা ৭ বার এ দোয়া পড়বে আল্লাহ তাঁলা দুনিয়া ও আধিরাতের তার সব দুঃখকষ্ট দূর করে দিবেন”]

حَسِّيَ اللَّهُ تَعَالَى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

(হাসবিয়াল্লাহু-লা ইলাহা ইল্লাহ-আলায়হি তাওয়াকালতু ওয়া হৃয়া রাবুল আরশিল আয়ীম)

আল্লাহই আমার জন্যে যথেষ্ট। তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তাঁর প্রতিই আমি ভরসা করি। আর মহান আরশের অধিগতি তিনিই। (সূরা তওবা : ১২৯)।

(৩২) শক্তির অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া [হ্যরত মুসা (আ.) তাঁর ওপর ঈমান আনয়নকারী যুবকদের এ দোয়া শিখান]

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّلِيمِينَ ۝ وَبِحَنَّا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكُفَّارِ

(রাববানা লা তাজ'আলনা ফিতনাতাল্লিল কৃত্তমিয় যালিমীন-ওয়া নাজজিনা বিরাহমাতিকা মিনাল কৃত্তমিল কাফিরীন)

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি অত্যাচারী জাতির জন্যে আমাদেরকে পরীক্ষার কারণ বানিও না; বরং তুমি নিজ কৃপায় আমাদেরকে অস্তীকারকারী জাতির (অত্যাচারী) হাত থেকে উদ্ধার কর। (সূরা ইউনুস : ৮৬-৮৭)।

(৩৩) অত্যাচারীদের ধর্ষনের জন্যে দোয়া

[হযরত মূসা (আ.)-এর এ দোয়া সম্মক্ষে আল্লাহ তাল্লা বলেন, মূসা (আ.)-কে তাঁর দোয়ার কবুলিয়তের সংবাদ দেয়া হয়েছিল। দৃঢ় পদক্ষেপের জন্যও তাকে মুখ্যদের অনুসরণ না করতে আদেশ দেয়া হয়েছিল ।।]

رَبَّنَا إِنَّكَ أَتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَآمُوا لَّا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَّا رَبَّنَا لِيُصْلُوْعَ اعْنَ سَيِّلِكَ
رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ آمَوَالِهِمْ وَأَشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ
④

(রাববানা ইন্নাকা আত্মাতা ফির'আউনা ওয়া মালাআহ যীনাতাওঁ ওয়া আমওয়ালান ফিল হায়াতিদুন্যা-রাববানা লি ইউযিলু আন সাবীলিকা-রাববানাত্তমিস্ আলা আমওয়ালিহিম ওয়াশদুদ আলা কুলুবিহিম ফালা ইউমিনু হাত্তা ইয়ারাউল আয়াবাল আগীম)

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি ফেরাউন ও তার (জাতির) প্রধানগণকে এ পার্থিব জীবনের চাকচিক্য ও ধন-সম্পদ দিয়েছ, (ফলে) হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তারা (লোকদেরকে) তোমার পথ থেকে ভ্রষ্ট করেছে। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তাদের ধন-সম্পদ বিনষ্ট কর আর তাদের অস্তরকে কঠিন করে দাও যাতে তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি না দেখা পর্যন্ত ঈমান না আনে। (সূরা ইউনুস : ৮৯)।

(৩৪) নৌকায় চড়ার দোয়া

[হযরত নূহ (আ.) প্লাবনের সময় নৌকায় চড়তে গিয়ে ঐশ্বী আদেশের মাধ্যমে এ দোয়া পড়েন। আর তাঁর নৌকা জুনী পাহাড়ের শীর্ষে নোঙ্গর করে। নবী করিম (সা.) বলেছেন, এ দোয়া আমার উম্মতকে নিমজ্জিত হওয়ার হাত থেকে নিরাপদ করবে। (তফসীর কুরতুবী, ৯ম খন্ড, পৃ. ৩৭)।

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُرْسِهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ
⑤

(বিসমিল্লাহি মাজরিহা ওয়া মুরসিহা-ইন্না রাবিল লা গাফুরুর রাহীম) আল্লাহর নামেই এর গতি ও স্থিতি। নিশ্চয়ই আমার প্রভু-প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, বারবার কৃপাকারী। (সূরা হুদ : ৪২)।

(৩৫) অনর্থক প্রশ্নাবলী থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া

[নৃহ (আ.)-এর প্রাবনের সময় যখন হ্যরত নৃহ (আ.)-এর পুত্র ধবংস হচ্ছিল তখন তিনি কাফির পুত্রের রক্ষার জন্য এ দোয়া করেন। এর ফলে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে ভর্তুক ছিল না বলে সাব্যস্ত হয়। এমতাবস্থায় হ্যরত নৃহ (আ.) এ আকুতিপূর্ণ দোয়া করেন। এর ওপর আল্লাহ্ তা'লার নিরাপত্তা ও কল্যাণমণ্ডিত পথ-নির্দেশ শুনানো হয়।]

رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَعْفِرْنِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَسِيرِينَ^④

(রাবিব ইন্নী আ'উয়ুবিকা আন আসআলাকা মা লায়সা লী বিহী ইলম- ওয়া ইন্না তাগফিরলী ওয়া তারহামনী আকুম মিনাল খাসিরীন)

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমি তোমার কাছে এমন কিছু চাওয়া থেকে তোমার আশ্রয় চাই যে বিষয়ের (ভালমন্দ সম্বন্ধে) আমার কোন জ্ঞান নেই। আর তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না কর এবং আমার প্রতি করণা না কর তাহলে নিশ্চয় আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (সূরা হূদ : ৪৮)।

(৩৬) মন্দের মোকাবেলায় শক্তি লাভ করার দোয়া

[মিশরের কর্মকর্তার স্ত্রী এবং অন্যান্য মহিলারা যখন হ্যরত ইউসুফ (আ.)-কে মন্দ কাজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যে চেষ্টা করছিল তখন হ্যরত ইউসুফ (আ.) এ আকুতিপূর্ণ দোয়া করেন। এ প্রসঙ্গে কুরআন শরীফে এসেছে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর দোয়া করুল করেন আর সেই মহিলাদের অপচেষ্টা থেকে হ্যরত ইউসুফ (আ.)-কে নিরাপদে রাখেন।]

رَبِّ السَّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا شَرِفٌ عَنِّي كَيْدُهُنَّ أَصْبَرَ لِيَهُنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ^⑤

(রাবিস সিজ্নু আহারু ইলায়া মিস্মা ইয়াদ'উনানী ইলায়হি-ওয়া ইন্না তাসরিফ'আন্নী কায়দাহন্না আসবু ইলায়হিন্না ওয়া আকুম মিনাল জাহিলীন)

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তারা আমাকে যে বিষয়ের দিকে ডাকছে এর তুলনায় আমার জন্যে জেলখানা অধিক পছন্দনীয়। আর তাদের চক্রান্তকে যদি তুমি আমার কাছ থেকে না দূর কর তাহলে আমি তাদের প্রতি ঝুঁকে যাব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (সূরা ইউসুফ : ৩৪)।

(৩৭) শাসন ক্ষমতা ও জ্ঞান লাভের পর কৃতজ্ঞতা স্বীকার

[হয়রত ইউসুফ (আ.)-এর কারাগার জীবনের পরে যখন আল্লাহ্ তাঁলা তাঁকে শাসন ক্ষমতা দিলেন এবং তাঁর ভাই ও পিতা-মাতাকে পেয়ে তিনি তাদের সেবায় উপস্থিত হলেন যখন তিনি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এ দোয়া করেন।]

رَبِّ قَدْ أَتَيْنَاهُ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلِمْنَا مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَأَطْرَفَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْتَ وَلِيٌّ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوْفِيقٌ مُسِّلِمًا وَالْحَقِيقُ بِالصَّلَاحِينِ ﴿١﴾

(রাবিব কান্দ আত্যাতানী মিনাল মুলকি ওয়া আল্লামাতানী মিন তাঁভিলিল আহাদীস-ফাত্তিরাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরায়ি-আনতা ওয়ালিয়ি ফিদুন্যা ওয়াল আখিরাহ-তাওয়াফ্ফানী মুসলিমমাওঁ ওয়া আলহিকনী বিস্সালিহীন)

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে অবশ্যই শাসনক্ষমতার কিছু দান করেছ আর আমাকে স্বপ্নের কিছু ব্যাখ্যাও শিখিয়েছ। হে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা! তুমই আমার ইহকাল ও পরকালের অভিভাবক। তুমি আমাকে পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দিও এবং পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করো। (সূরা ইউসুফ : ১০২)।

(৩৮) রিয়কের প্রাচুর্য ও পুণ্যবান সন্তান-সন্ততির জন্যে দোয়া

[হয়রত ইবনে জারজ বলতেন, “ইব্রাহিমী উম্মত যেন সর্বদা ইবাদতে কায়েম থাকে। আল্লামা শা’বী বলতেন, হয়রত নূহ ও ইবরাহীম (আ.) সাধারণ মু’মিন পুরুষ ও মু’মিন নারীদের ক্ষমার জন্যে দোয়া করেন। এতে আমার যে আনন্দ লাগে তা সারা বিশ্বের ধন-সম্পদ লাভেও হতো না। (হয়রত ইমাম সুয়তী (রহ.) প্রণীত তফসীর আদ্দ দুররূল মনসুর, ৪৮ খন্দ, পৃ.৪৬)।]

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَدَأَ إِمَّا وَاجْبَنْ وَبَخِّ أَنْ تَعْبَدَ الْأَصْنَامَ

(রাবিবজ’আল হায়ল বালাদা আমিনাও ওয়াজনুবনী ওয়া বানিয়া আননা’বুদাল আসনাম) হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! এ শহরকে (মকাকে) তুমি শান্তিধাম করো আর আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে প্রতিমার উপাসনা থেকে দূরে রেখো।

رَبِّ إِنَّمَّا أَصْلَلْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبَعَّنْ فَإِنَّهُ مَيِّيٌّ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفْوُرَ رَجِিঁ

(রাবিব ইন্নাল্লাহ আয়লালনা কাসীরাম মিনাল্লাস-ফামান তাবিঁআনী ফাইন্নাহ মিন্নী ওয়া মান আসানী ফাইন্নাকা গাফুরুল রাহীম)

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় তারা বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করে সে নিশ্চয় আমারই সাথী। আর যে আমার অবাধ্যতা করে সেক্ষেত্রে নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, বারবার কৃপাকারী।

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادِعِيْرِ ذُرْعٍ عَنْبَيْتِكَ الْمُحَرَّمٌ رَبَّا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ
فَاجْعَلْ أَفْيَدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوَى إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُمْ مِنَ الشَّمَرِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

(রাব্বানা ইন্নী আসকান তু মিন যুরারিয়তি বিওয়াদিন গায়রি ধী ঘার' ইন ইন্দা বায়তিকাল মুহারুম-রাব্বানা লিইউকীমুস্ সালাতা ফাজ'আল আফইদাতাম মিনান্নাসি তাহভী ইলায়হিম ওয়ারযুক্তহুম মিনাস সামারাতি লা'আল্লাহুম ইয়াশকুরুন)

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমি আমার সন্তানদের কয়েকজনকে তোমার সম্মানিত গৃহের নিকট এক অনুর্বর উপত্যকায় বসতি স্থাপন করালাম। হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তারা যেন নামায প্রতিষ্ঠিত করে। সুতরাং তুমি লোকদের হাদয়কে এমন করে দাও যেন তারা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাদেরকে ফল-ফলাদির খাদ্য-সামগ্রী দান কর যেন তারা তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا تُخْفِيْ وَمَا تُعْلِنُْ وَمَا يَحْكُمُ عَلَىِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ

(রাব্বানা ইন্নাকা তা'লামু মা নুখ্ফী ওয়া মা নু'লিন-ওয়ামা ইয়াখ্ফা আলাল্লাহি মিন শায়ইন ফিল আরায় ওয়ালা ফিস্ সামায়ি)

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমরা যা গোপন করি ও আমরা যা প্রকাশ করি নিশ্চয় তুমি সবই অবগত। আর আল্লাহুর নিকট থেকে কোন কিছু পৃথিবীতে ও আকাশসমূহে গোপন থাকতে পারে না।

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَىِ الْكِبِيرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ

(আলহামদুলিল্লাহিল্লায়ী ওয়াহবালী আলাল কিবারি ইসমাইলুল্লা ওয়া ইসহাকু-ইন্না রাব্বি লাসামী'উদ্দুআ)

সব প্রশংসা একমাত্র সেই আল্লাহর যিনি আমাকে (আমার) বার্ধক্যে ইসমাইল ও ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয়ই আমার প্রভু-প্রতিপালক সদা দোয়া শুনে থাকেন।

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيمَ الصَّلَاةَ وَمَنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ

(রাবিজ'আলনী মুকুমাস্ সালাতি ওয়া মিন যুরারিয়তি-রাব্বানা ওয়া তাকুবাল দু'আ) হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমাকে ও আমার বংশধরকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী করো। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমার দোয়া করুল করো।

رَبَّ اغْفِرْ لُّ وَلَوَالدَّى وَلِمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُولُ الْحِسَابُ ④

(রাববানাগ ফিরলী ওয়ালি ওয়ালিদাইয়া ওয়া লিল মুমিনীনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসাব) হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! যে দিন হিসাব-নিকাশ অনুষ্ঠিত হবে সেদিন আমাকে ও আমার পিতামাতাকে এবং মুমিনগণকে ক্ষমা করো। (সূরা ইব্রাহীম : ৩৬-৪২)।

(৩৯) পিতা-মাতার জন্যে দোয়া

[নবী করিম (সা.) তাঁর নিজের ও উম্মতের জন্যে পিতামাতার উদ্দেশ্যে এ দোয়া নির্ধারণ করেছেন। ছয়ুর (সা.) বলতেন, সন্তান পিতামাতার অনুগ্রহের মূল্য দিতে পারে না-যতক্ষণ না পিতাকে গোলামী থেকে মুক্তি না করায়। (তফসীর কুরতুবী, ২০তম খন্ড, পৃ. ২৪৪)।

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتُ صَغِيرِيَا ⑤

(রাববির হামহূমা কামা রাববায়ানী সাগীরা)

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি তাদের উভয়ের প্রতি সেভাবে করুণা কর যেভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছিলেন। (সূরা বনী ইসরাইল : ২৫)

(৪০) নতুন স্থানে প্রবেশ ও বের হওয়ার দোয়া

[হ্যরত আব্দুল্লাহ বিন আবাস (রা.) বর্ণনা করেন, “মদীনায় হিজরত করার কাছাকাছি সময় এ দোয়া সম্বলিত আয়াত অবর্তীর্ণ হয়। (মুতাফাকুন আলায়হি)। প্রত্যেক কাজের শুভ উদ্বোধন ও শুভ পরিসমাপ্তির ব্যাপারে এ দোয়া কার্যকরী।]

رَبِّ أَذْلِفْ مُدْخَلٌ صَدِيقٌ وَأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجٌ صَدِيقٌ وَاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَنًا نَصِيرًا ⑥

(রাববি আদখিলনী মুদখালা সিদ্ধীওঁ ওয়া আখরিজনী মুখরাজা সিদ্ধীওঁ-ওয়াজ-আল্নী মিল্লাদুন্কা সুলত্তানাহাসীরা)

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে উভয়ভাবে প্রবেশ করাও এবং আমাকে উভয়ভাবে বের করো। তোমার সন্তুষ্যান থেকে আমার জন্যে পরম সাহায্যকারী ক্ষমতা দান কর। (সূরা বনী ইসরাইল : ৮১)।

(৪১) আল্লাহর বাণী শুনে ঐশী প্রতিশ্রূতির ওপর ঈমান আনয়ন

[জ্ঞানী মুমিনদেরকে যখন আল্লাহর কালাম পড়ে শুনানো হয় তখন তারা আল্লাহর দরবারে সিজদায় পড়ে এ দোয়া করতে থাকে]

سَبِّحْنَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمْفُوْلًا

(সুবহানা রাবিনা ইন কানা ওয়া'দু রাবিনা লামাফ'উলা)

আমাদের প্রভু-প্রতিপালক পরিব্রত। নিচয় আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের প্রতিশ্রূতি অবশ্যই পূর্ণ হবে। (সূরা বনী ইসরাইল : ১০৯)।

(৪২) সফলতা লাভের দোয়া

[হ্যরত ইসা (আ.)-এর মান্যকারী আসহাবে কাহফ- অর্থাৎ, গুহার অধিবাসী বলে কথিত যুবসম্প্রদায়ের দোয়া। তারা তৌহীদের হেফায়তের জন্য পর্বত গুহায় লুকিয়ে ছিলেন]

رَبَّنَا أَتَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهِيَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

(রাবিনা আতিনা মিল্লাদুন্কা রাহমাতাও ওয়া হায়ি'লানা মিন আমরিনা রাশাদা)
হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে তোমার পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ দান কর আর আমাদেরকে আমাদের কাজকর্ম সম্পাদনে সঠিক পথের ব্যবস্থা করে দাও। (সূরা কাহফ : ১১)।

(৪৩) পুণ্যবান সন্তান লাভের দোয়া

[হ্যরত যাকারিয়া (আ.) শেষ বয়সে পুণ্যবান সন্তান লাভের জন্যে এ দোয়া করেন।]

رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظُمُ مِنِّي وَاشْتَغَلَ الرَّأْسُ شَيْئًا وَلَمْ أَكُنْ بِدِعَائِكَ رَبِّ شَقِيقًا

(রাবিব ইন্নী ওয়াহানাল 'আয়মু মিন্নী ওয়াশ্তা'আলার রাঁসু শায়বাওঁ ওয়া লাম আকুম বিদুআ'ইকা রাবিব শাক্রিয়া)

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! নিচয় আমার অবস্থা এরূপ যে, আমার অস্থিগুলো দুর্বল হয়ে গিয়েছে এবং বার্ধক্যের দরুণ আমার মাথার চুল উজ্জ্বল-শুভ হয়ে গেছে। কিন্তু হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তোমার কাছে দোয়া করে আমি কখনও ব্যর্থ হইনি।

وَإِنِّي خَفْتُ الْمَوَالَيَّ مِنْ وَرَاءِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةً فَهَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيْ

(ওয়া ইন্নী খিফতুল মাওয়ালিয়া মিঁও ওয়ারাই ওয়া কানাতিমরায়াতী আক্রিয়ান ফাহাবলী

মিল্লাদুন্কা ওয়ালিয়্যা)

আর নিশ্চয় আমি আমার (মৃত্যুর) পরে আমার আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে ভয় করি এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্য। সুতরাং তুমি তোমার পক্ষ থেকে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দান কর।

رَبِّ رَضِيَّاً وَيَرِثُ مِنْ أَلِيْعَقْوَبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّاً

(ইয়ারিসুনী ওয়া ইয়ারিসু মিন আলি ইয়া'কুবা ওয়াজ'আলহু রাবির রায়িয়্যা)

যে আমার উত্তরাধিকারী হবে ও ইয়াকুবের বৎশধরগণেরও সব কল্যাণের উত্তরাধিকারী হবে। আর হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তাকে তুমি (তোমার) সদা সন্তোষভাজন বানিও। (সূরা মরিয়ম : ৫-৭)।

(৪৪) তবলীগে সফলতার জন্যে দোয়া

[হ্যরত মুসা (আ.)-কে যখন ফেরাউনের দরবারে গিয়ে শ্রেষ্ঠ ফরমান পৌছানোর আদেশ দেয়া হলো তখন তিনি এ দোয়া করেন। হ্যরত আসমা বিনতে উমায়েস বর্ণনা করেন, “আমি রসূল করিম (সা.)-কে সামরীর পাহাড়ের পাদদেশে এ দোয়া করতে শুনেছি। তিনি (সা.) খোদার কাছে এ আবেদন করছিলেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সেই দোয়া করছি যা আমার ভাই মুসা করেছিলেন। (হ্যরত ইমাম সুযুতী (রহ.) প্রণীত তফসীর আদ্দ দুররূল মনসূর, ৪ৰ্থ খন্দ, পৃ. ২৯৫)।]

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ وَاحْلُلْ عَقْدَةَ مِنْ لِسَانِيْ

(রাবিরশ্রাহলী সাদরী-ওয়া ইয়াসসিরলী আমরী-ওয়াহলুল উকুদাতাম মিল লিসানি ইয়াফকাহু ক্লাওলী)

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমার জন্য আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দাও। আর আমার দায়িত্বকে আমার জন্য সহজ করে দাও এবং আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও যেন তারা আমার কথা সহজে বুঝতে পারে। (সূরা ত্বা-হা : ২৬-২৯)।

(৪৫) জ্ঞান বৃদ্ধির দোয়া

[নিজ সিদ্ধান্তগুলোতে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি দেয়ার জন্যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে এ দোয়া শিখানো হয়েছে।]

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

(রাবির যিদ্বী ইলমান)

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও। (সূরা ত্বা-হা : ১১৫)।

(৪৬) রোগ থেকে মুক্তি লাভের দোয়া

[হ্যরত আইউব (আ.)-এ দোয়ার মাধ্যমে রোগ থেকে মুক্তি লাভ করেন।]

أَلِّيْ مَسْنَى الصُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ

(আলী মাস্সানিয়ায় শুরু ওয়া আনতা আরহামুর রাহিমীন)

(হে আল্লাহ) ভয়ানক যন্ত্রণা আমাকে জর্জরিত করেছে। আর তুমি কৃপাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কৃপাকারী। (সূরা আমিয়া : ৮৪)।

(৪৭) ইসমে আয়ম (মহান নাম)

[হ্যরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেন, “নবী করিম (সা.) বলেছেন, হ্যরত ইউনুস (আ.) মাছের পেটে যে দোয়া করেছিলেন কোন মুসলমান যদি এ দোয়া করে তখন তা কবুল হবে। (তফসীরে কুরতুবী, ১১তম খন্ড, পৃ. ৩৩৪)।]

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

(লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায যালিমিন)

তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। নিশ্চয় আমি (নিজের প্রাণের ওপর) অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। (সূরা আমিয়া : ৮৮)।

[টিকা: আঁ-হ্যরত (সা.) হ্যরত ইউনুস (আ.)-এর এ দোয়াকে ইসমে আয়ম আখ্যায়িত করেছেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁ'লার কাছে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয়।]

(৪৮) একাকীত্ব থেকে মুক্তি ও উন্নতি

প্রজন্ম লাভের জন্যে দোয়া

[আল্লাহ তাঁ'লা বলেন, যাকারিয়া যখন এ দোয়া করল তখন আমরা তা কবুল করি এবং তার স্ত্রীকে সুস্থ করে ইয়াহিয়াকে দান করি।]

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرَدًا وَأَنْتَ حَيْرُ الْوَرَثِينَ

(রাবির লা তায়ারনী ফারদাওঁ ওয়া আন্তা খায়রুল ওয়ারিসীন)

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে একা ছেড়ে দিও না। আর তুমই উন্নতরাধিকারীগণের মধ্যে সর্বোত্তম। (সূরা আমিয়া : ৯০)।

(৪৯) সহায়তা ও সঠিক মীমাংসা লাভের দোয়া

[হ্যরত কাতাদাহ্ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-কে যখন যুদ্ধে যেতে হতো তখন তিনি বিশেষভাবে এ দোয়া করতেন। (তফসীর আদ্দ দুররুল মনসূর, ৪ৰ্থ খণ্ড, পৃ. ৩৪২।]

رَبِّ الْحُكْمِ بِالْعُقْدِ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَنُ عَلَى مَا تَصْفُونَ ﴿١﴾

(রাবিহকুম বিল হাকি-ওয়া রাবুনার রাহ্মানুল মুসত্তাঁ আনু আলা মা তাসিফুন)
হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি সত্য-সঠিক মীমাংসা কর। আর পরম করণাময় অ্যাচিত-অসীম দানকারী হলেন আমাদের প্রভু-প্রতিপালক, তোমাদের (মিথ্যা) বর্ণনার বিরুদ্ধে যাঁর সাহায্য চাওয়া হয়। (সূরা আমিয়া : ১১৩)

(৫০) সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের ওপর বিজয় লাভ করার দোয়া

[হ্যরত নূহ (আ.)-এর এ দোয়ার ফলে আল্লাহ তা'লা তাঁকে নৌকার মাধ্যমে প্লাবন থেকে উদ্ধার করেন।]

رَبِّ الْأَصْرَنِيْ بِمَا كَذَّبُوكُمْ ﴿٢﴾

(রাবিন্সুরনী বিমা কায়্যাবুন)

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে সাহায্য কর, কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করেছে। (সূরা মু’মিনুন : ২৭)।

(৫১) কল্যাণ অবতরণের দোয়া

[হ্যরত নূহ (আ.)-কে আল্লাহ তা'লা এ নির্দেশ দিলেন, যখন নৌকায় চড়ে বসবে তখন প্রথমে পড়, “আল্লাহমদুলিল্লাহিল্লায়ী নাজ্জায়না মিনাল ক্ষাওমিয় যালিমীন” – অর্থাৎ, সব প্রশংসা সেই সন্তার যিনি আমাদেরকে অত্যাচারী জাতি থেকে উদ্ধার করেছেন– পরে এ দোয়া পড়। হ্যরত আলী (রা.) মসজিদে প্রবেশ করার সময়েও এ দোয়া সম্বলিত আয়াত পড়তেন। (তফসীর কুরতুবী, ১২তম খণ্ড, পৃ. ১২০)।]

رَبِّ أَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُبِيرًا وَأَنْتَ حَيْرُ الْمُزَرِّلِينَ ﴿٣﴾

(রাবির আনযিল্নী মুনযালাম মুবারাকাওঁ ওয়া আন্তা খায়রুল মুনযিলীন)

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে এমন অবস্থায় অবতরণ করাও যেন আমার ওপর প্রচুর কল্যাণ বর্ষিত হতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তুমই হচ্ছো অবতরণকারীগণের মাঝে সর্বোত্তম। (সূরা মু’মিনুন : ৩০)।

(৫২) যালিমের শাস্তি থেকে সুরক্ষার দোয়া

[নবী করিম (সা.)-কে বিজয়ের ওয়াদা দেয়ার সাথে-সাথে এ দোয়াও শিখানো হয়েছে যেন তাঁর (সা.) জাতির সাথে মার্জনার আচরণ করা হয়।]

رَبِّ إِنَّمَا تُرِيكَ مَا يُوَعْدُونَ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ১০

(রাবিব ইম্বা তুরিয়ানী মা ইউ'আদুন- রাবিব ফালা তাজ-আলনী ফিল ক্লাওমিয় যালিমীন) হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি (আমার জীবন্দশায়) আমাকে যদি তা দেখিয়ে দিতে যার প্রতিশ্রূতি তাদেরকে দেয়া হচ্ছে, হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তখন তুমি আমাকে অত্যাচারী জাতির অস্তর্ভুক্ত করো না। (সূরা মু'মিনুন : ৯৪-৯৫)।

(৫৩) শয়তানের কু-প্ররোচনা থেকে দূরে থাকার দোয়া

[হ্যরত আমর বিন সাঈদ (রা.) বর্ণনা করেন, “নবী করিম (সা.) ঘুমাবার সময় পড়ার জন্য কিছু দোয়া আমাদের শিখিয়েছিলেন। শয়তানী প্ররোচনা থেকে সুরক্ষা পাওয়ার জন্য এ দোয়া পড়তে হয়। (হ্যরত ইমাম সুফুতী (রহ.) প্রশিত আদ দুররূল মনসুর, ৫ম খন্ড, পৃ. ১৪)।]

رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ الشَّيْطَانِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَخْصُرُ وَ ১১

(রাবিব আ'উয়ুবিকা মিন হামাযাতিশ্শ শায়াত্তীন-ওয়া আ'উয়ুবিকা রাবিব আইয়াহ্যুরুন) হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমি শয়তানের সব কু-প্ররোচনা থেকে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি।

আর হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমার কাছে তাদের উপস্থিত হওয়া থেকেও তোমার আশ্রয় চাচ্ছি। (সূরা মু'মেনুন : ৯৮-৯৯)।

(৫৪) মিথ্যাবাদীদের মিথ্যারোপের মোকাবেলায় মু'মিনদের ক্ষমা প্রার্থনার দোয়া

[কফির ও আল্লাহ তাঁলার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীরা যখন কিয়ামতের দিনে অপরাধ স্বীকার করবে তখন আল্লাহ তাঁলা বলবেন, দূর হয়ে যাও! আর আমার সাথে কোন কথা বলবে না। কেননা, তোমরা আমার সেই মু'মিন বান্দাদেরকে হাসি-ঠাউর লক্ষ্যস্থলে পরিণত করেছিলে যারা এ দোয়া পড়তো। তাদের ধৈর্যের কারণে আজ আমি তাদেরকে অনেক প্রতিদান দিব।]

رَبَّنَا إِمَّا فَاغْفِرْ لَكَ وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرُّحْمَنِ

(রাব্বানা আমান্না ফাগফির্লানা ওয়ারহামনা ওয়া আন্তা খায়রুর রাহিমীন) হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর আর আমাদের প্রতি কৃপা কর। প্রকৃতপক্ষে কৃপাকারীদের মাঝে তুমি সর্বোত্তম। (সূরা আল মুমিনুন : ১১০)।

(৫৫) ক্ষমা ও করণ্ণা লাভের জন্য দোয়া

[হ্যরত আবু বকর (রা.) নামায পড়ার জন্য আঁ-হ্যরত (সা.)-এর কাছে কোন দোয়া শিক্ষা দেয়ার জন্য আবেদন করেন। তখন হ্যুর (সা.) এ দোয়া শিখান। এতে বিশেষভাবে খোদার কৃপা ও ক্ষমা চাওয়া হয়েছে। আর সেই দোয়া এটাই। (তফসীর আদৃ দুররংল মনসূর, ৫ম খন্ড, পৃ. ১৮)।]

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحُمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرُّحْمَنِ

(রাবিগফির ওয়ারহাম ওয়া আন্তা খায়রুর রাহিমীন)

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! ক্ষমা কর ও কৃপা কর। প্রকৃতপক্ষে তুমি কৃপাকারীদের মাঝে সর্বোত্তম। (সূরা আল মু'মিনুন : ১১৯)।

(৫৬) দোয়খের শান্তি থেকে সুরক্ষার দোয়া

[ইবাদুর রহমান তথা আল্লাহর বান্দাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'লা বলেন, এরা রহমান খোদার বান্দা যারা রাতে নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের সকাশে দাঁড়িয়ে ইবাদতে রাত কাটায় এবং ঐশ্বী ত্রোধ থেকে সুরক্ষা পাওয়ার জন্যে দোয়া করে।।]

رَبَّنَا صِرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا

(রাব্বানা আসরিফ আন্না আযাবা জাহান্নামা-ইন্না আযাবাহা কানা গারামা)

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের ওপর থেকে দোয়খের আযাব (শান্তি) অপসারিত করো। নিশ্চয় সেটির আযাব সর্বনাশ। (সূরা ফুরকান : ৬৬)।

(৫৭) পবিত্র জীবন সঙ্গী ও সন্তান-সন্ততি লাভ ও তাদের সংশোধনের জন্যে দোয়া

[কুরআন শরীফে আল্লাহর বান্দাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ এসেছে, তারা সর্বদা এ দোয়া করে থাকে।।]

رَبَّنَا هُبْلَكَنْ أَرْوَاجَنَ وَذْرِيْتَنَا قَرَّةَ أَعْيَنَ وَاجْعَلْنَا لِمُمْتَقِينَ إِمَامًا^⑤

(রাবিনা হাবলানা মিন আযওয়াজিনা ওয়া যুরিয়্যাতিনা কুর্রাতা আইউনিঁও ওয়াজ'আলনা লিল মুত্তাকীনা ইমামা)

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্তির মাধ্যমে চক্ষুর শিংশুতা দান কর। এবং আমাদেরকে মুত্তাকীগণের (খোদা-ভীরুগণের) ইমাম (নেতা) বানাও। (সূরা ফুরকান : ৭৫)।

(৫৮) পুণ্যবানদের মাঝে অন্তর্ভুক্তি, সত্য কথা বলা ও পিতার জন্য দোয়া

[নবী করিম (সা.) বলতেন, মানুষ ওয়ু করে আল্লাহর নাম নিয়ে ইবরাহীম (আ.)-এর এ দোয়া করলে আল্লাহ তাঁলা তাকে জাল্লাতের খাদ্য ও পানীয় দান করবেন, তার রোগকে পাপের প্রায়শিত্ত বানিয়ে দেবেন আর তাকে সৌভাগ্যের জীবন ও শহীদের মৃত্যু দান করবেন। সমুদ্রের ঢেউরের সমান পাপ হলেও মাফ করে দেবেন। তাকে মীমাংসার শক্তি ও সাহস দিবেন। আর দুনিয়াতে তার স্মরণ অবশিষ্ট রাখা হবে। (হ্যরত ইমাম সুযুতী (রহ.) প্রণীত তফসীর আদ দুররুল মনসূর, ৪৮ খন্ড, পৃ. ৮৯)।]

رَبِّ هَبْلَكَنْ حُكْمًا وَالْحَقْفُ بِالصَّلَحِينَ^٦ وَاجْعَلْ لِلسَّانِ صَدِيقًا فِي الْأَخْرِيْنَ^٧
وَاجْعَلْ مِنْ وَرَثَةً جَنَّةَ النَّعِيْمِ^٨ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهَ كَانَ مِنَ الصَّالِيْنَ^٩ وَلَا تُخْزِنِ يَوْمَ يُبَعَّثُونَ^{١٠}
(রাবি হাবলী হুকমাওঁ ওয়া আলহিকুনি বিস্সালিহীন- ওয়াজ'আল লী লিসানা সিদ্দাকীন ফিল আখিরীন- ওয়াজ'আলনী মিওঁ ওরাসাতি জাল্লাতিল্লাস্তম- ওয়াগফিরলি আবী ইল্লাহ কানা মিনায়য়াল্লীন- ওয়ালা তুখ্যিনী ইয়াওমা ইউব'আসুন)

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে হিকমত (প্রজ্ঞা) দান কর ও পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত কর। আর পরবর্তীদের মাঝে আমার জন্যে প্রকৃত (স্থায়ী) খ্যাতি প্রতিষ্ঠা কর। আর তুমি আমাকে কল্যাণপূর্ণ জাল্লাতের উত্তরাধিকারীগণের অন্তর্ভুক্ত কর। আমার পিতাকে ক্ষমা কর। কারণ সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত। আর যেদিন পুনরায় (জীবিত করে) উঠানো হবে সেদিন তুমি আমাকে অপমানিত করো না। (সূরা শোআরা : ৮৪-৮৮)।

(৫৯) সত্যের বিজয়ের জন্য দোয়া

[হ্যরত নূহ (আ.) জাতির বিরোধিতায় ক্লান্ত হয়ে সিদ্ধান্তকারী নির্দর্শন চান। এতে তিনি নিজের ও তাঁর জামাতের মুক্তির দোয়া করেন। আল্লাহ তাঁলা বলেন, আমরা এ দোয়া কবুল করেছি এবং তার জাতিকে প্লাবন দিয়ে ডুবিয়ে দিয়েছি আর তাকে ও তার অনুসারীদের নৌকায় উদ্ধার করেছি।]

رَبِّ إِنَّ قُوَّمِيْ كَذَّبُونَ ﴿١﴾ فَأَفْتَخِ بَيْنِيْ وَبَيْهُمْ فَتَحًا وَنَجْنُوْ وَمَنْ مَعِيْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

(রাবির ইঙ্গু কুওমী কায়্যাবুন-ফাফতাহ বায়নী ওয়া বায়নাহুম ফাতহাও ওয়া নাজজিনী ওয়ামাম মা'ইয়া মিনাল মু'মিনীন)

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমার জাতি আমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করেছে। সুতোং তুমি আমার ও তাদের মাঝে সুস্পষ্ট মীমাংসা কর। আর আমাকে ও আমার সাথী মু'মিনদের (শক্র অনিষ্ট থেকে) উদ্ধার কর। (সূরা শোআরা : ১১৮-১১৯)।

(৬০) বিরুদ্ধবাদীদের দুষ্কর্ম থেকে রক্ষার দোয়া

[হ্যরত লৃত (আ.)-এর জাতি নসীহতের উত্তরে যখন তাঁকে এ বলে ধরক দিল, হে লৃত! তুমি যদি বিরত না হও তাহলে তোমাকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে, তখন তিনি এ দেয়া করেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'লা বলেন, আমরা এ দেয়া করুল করে লৃত ও তার পরিবারকে (তাঁর স্ত্রী ছাড়া) মুক্তি দেই। আর সেই জাতিকে ধ্বংস করে দিই।]

رَبِّ نَجِّنِيْ وَاهْلِ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢﴾

(রাবির নাজজিনী ওয়া আহলী মিম্মা ইয়া'মালুন)

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে ও আমার পরিবার-পরিজনকে সে-সব কার্যকলাপ থেকে রক্ষা কর- যা তারা করছে। (সূরা শোআরা : ১৭০)

(৬১) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ও সৌভাগ্য লাভের দোয়া

[হ্যরত সুলায়মান (আ.)-এর সেনাবাহিনী যখন 'নামল' উপত্যকায় পৌছেন তখন সে জাতি ভয়ে তাদের ঘরে চুকে যায়। এ ঘটনা দেখে হ্যরত সুলায়মান (আ.) স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ দেয়া করেন।]

رَبِّ أَوْزَعْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ بِعَمَلِكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالدَّى وَأَنْ أَعْمَلَ

صَالِحًا تَرْضَهُ وَأَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ ﴿٣﴾

(রাবির আওয়ি'নী আন আশকুরা নিমাতাকাল্লাতী আন'আমতা আলাইয়া ওয়া আলা ওয়ালিদাইয়া ওয়া আন আ'মালা সালিহান তারযাহ ওয়া আদখিলনী বিরাহ্মাতিকা ফী ইবাদিকাস্ সালিহীন)

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে সৌভাগ্য দাও যাতে আমি তোমার সেই কল্যাণের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার মাতা-পিতাকে দিয়েছ। আর আমি এমন পুণ্য কাজ করতে পারি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। (হে প্রভু-প্রতিপালক!) আর তুমি তোমার নিজ অনুগ্রহে আমাকে তোমার পুণ্যবান দাসগণের অন্তর্ভুক্ত কর। (সূরা নামল : ২০)।

(৬২) আল্লাহর মনোনীত বান্দাগণের প্রতি শান্তির দোয়া

[আল্লাহর মনোনীত বান্দাগণের জন্যে আঁ-হ্যরত সাল্লাল্লাহু আলায়াহি ওয়া সাল্লামকে এ দোয়া শিখানো হয়েছে]

الْحَمْدُ لِلّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

(আল্লামদুলিল্লাহি ওয়া সালামুন আলা ‘ইবাদিল্লায়ীনাস্ত্রাফা)

সব প্রশংসা আল্লাহর আর সদা শান্তি বর্ষিত হয় তাঁর সেসব বান্দাদের ওপর যাদেরকে তিনি মনোনীত করেন। (সূরা নামল : ৬০)।

(৬৩) অন্যায় ক্ষীকার এবং ক্ষমার জন্য আবেগ

[হ্যরত মুসা (আ.) অনিচ্ছাসত্ত্বেও এক ফেরাউনীর হাত থেকে এক বনী ইসরাইলকে বাঁচাতে গিয়ে এক ঘূর্ষি মারেন। এতে সে মারা যায়। পরে তিনি এ দোয়া করেন। আর আল্লাহ তাঁকে মাফ করে দেন।]

رَبِّ إِنِّي ظَمِيتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي

(রাবিব ইন্নী যালামতু নাফ্সী ফাগফিরলী)

হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমি আমার আত্মার ওপর অত্যাচার করেছি। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা কর। (সূরা কাসাস : ১৭)

(৬৪) হ্যরত মুসা (আ.)-এর দোয়া

[হ্যরত মুসা (আ.)-এর অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক ব্যক্তি তাঁর হাতে মারা যায়। এর ওপর তিনি ক্ষমার জন্যে দোয়া করেন। আল্লাহ তাঁলা ক্ষমার সংবাদ দেন। এরপরে হ্যরত মুসা (আ.) এ দোয়া করেন।]

رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ طَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ^④

(রাবিব বিমা আন'আমতা আলাইয়া ফালান্ আকুনা যাহীরাল লিল মুজরিমীন)
হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! যেহেতু তুমি আমাকে অনুগ্রহ করেছ তাই আমিও
অপরাধীদের কাউকে ভবিষ্যতে সাহায্য করব না। (সূরা কাসাস : ১৮)।

(৬৫) অত্যাচারী জাতি থেকে রক্ষার দোয়া

[হ্যরত মূসা (আ.)-এর দোয়া]

رَبِّ نَحْنُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِيمِينَ^⑤

(রাবিব নাজিনী মিনাল কুওমিয় যালিমীন)
হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে অত্যাচারী জাতি থেকে উদ্বার কর। (সূরা
কাসাস : ২২)।

(৬৬) কল্যাণ ভিক্ষার বিনীত দোয়া

[হ্যরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবাস বর্ণনা করেন, এ দোয়ার সময় হ্যরত মূসা (আ.)-এর
অবস্থা অভাবে এমন হয়েছিল যে, খেজুরের টুকরারও মুখাপেক্ষী ছিলেন। (হ্যরত ইমাম
সুযুতি (রহ.) প্রশীত তফসীর আদ দুররূল মনসূর)। পরে খোদা কেবল তাঁর থাকা-
থাওয়ার ব্যবস্থাই করলেন না বরং ঘরবাড়ি ও বিয়ে-শাদীর ব্যবস্থা করে দেন।]

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ حَيْرٍ فَقِيرٌ^⑥

(রাবিব ইন্নী লিমা আনযাল্তা ইলায়া মিন খায়রীন ফাকীর)
হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি যে কোন কল্যাণই আমাকে ভূষিত কর, আমি অবশ্যই
এর ভিক্ষারী। (সূরা কাসাস : ২৫)।

(৬৭) শক্রের ওপর বিজয় লাভের দোয়া

[হ্যরত লৃত (আ.) নিজের জাতিকে যখন কুকর্ম থেকে ফিরে যাবার জন্য তাগিদ
করছিলেন তারা উত্তরে বলল, তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে আয়াব নিয়ে এস।
এর প্রেক্ষিতে হ্যরত লৃত (আ.) এ দোয়া করেন।]

رَبِّ اسْرُفْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ^⑦

(রাবিবনসূরনী আলাল কুওমিল মুফসিদীন)
হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে এ বিপর্য সৃষ্টিকারী জাতির বিরুদ্ধে সাহায্য
কর। (সূরা আনকাবুত : ৩১)।

(৬৮) শিথিলতা দূর করণার্থে সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করার দোয়া

[হ্যরত আব্দুল্লাহ বিন আবুস রা.) বর্ণনা করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তি সকালে এ আয়াত পাঠ করলে আল্লাহ তা'লা সে দিন তার শিথিলতা দূর করে দেন এবং সন্ধ্যায় এ দোয়া করলে রাতের শিথিলতা দূর করে দেন। (আবু দাউদ) ।

فَبِسْحَنِ اللَّهِ حَمْدٌ لِمَسْوُنَ وَحْيٌ تُصْبِحُونَ ⑩

(ফা সুবহানাল্লাহি হীনা তুমসুনা ওয়াহীনা তুসবিছুন)

আর তোমরা যখন সন্ধ্যায় প্রবেশ কর এবং তোরে প্রবেশ কর তখন তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحْيٌ تُظْهَرُونَ ⑪

(ওয়া লাহুল হাম্দু ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরয়ি ওয়া ‘আশিয়্যাওঁ ওয়া হীনা তুয়াহিজুন) আর আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে সব প্রশংসা তাঁরই, আর রাতেও এবং তোমরা যখন দুপুরে প্রবেশ কর তখনও (প্রশংসা তাঁরই)।

**يُرْجِعُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُرْجِعُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحِيِّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ
تُخْرِجُونَ** ⑫

(ইউখরিজুল হাইয়া মিনাল মায়িতি ওয়া ইউখরিজুল মায়িতা মিনাল হায়ি ওয়া ইউহিল আরয়া বা'দ মাওতিহা-ওয়া কাযালিকা তুখরাজুন)

তিনি জীবিতকে মৃত হতে বের করেন এবং মৃতকে জীবিত হতে বের করেন। আর পৃথিবীকে এর মৃত্যুর পর জীবিত করেন। আর এভাবেই তোমাদেরকে (জীবিত করে) বের করা হবে। (সূরা রূম : ১৮-২০)।

(৬৯) পুণ্যবান সন্তান লাভের জন্য দোয়া

[হ্যরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া। তাঁর মিশনকে জারী রাখার জন্যে তিনি পুণ্যবান সন্তান লাভের জন্য দোয়া করেন। ফলে তিনি সন্তান লাভের শুভ সংবাদ লাভ করেন।]

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّابِرِينَ ⑬

(রাবির হাব্লী মিনাস সালিহীন)

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে পুণ্যবান সন্তান দান কর। (সূরা সাফ্ফাত: ১০১)

(৭০) সৎকর্মের মূল্যায়নের জন্য দোয়া

[আঁ-হ্যরত সাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তিই নামায়ের পরে বা মজলিস থেকে উঠতে গিয়ে এ আয়াত পড়ে আল্লাহ তা'লা কিয়ামতের দিন তার আমলের ওজন ও মূল্যায়ন করতে গিয়ে ঝুলি ভরে দান করবেন। (হ্যরত ইমাম সুযুতি {রহ.} প্রণীত তফসীর আদ্দ দুররূল মনসূর, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ২৯৯)]

سَبِّحْنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصْفُونَ ﴿٦﴾ وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨﴾

(সুবহানা রাবিকা রাবিল ইয্যাতি আম্মা ইয়াসিফুন-ওয়া সালামুন আলাল মুরসালীন-ওয়াল্হামদুল্লাহী রাবিল আলামিন)

তারা যা বর্ণনা করছে সম্মান ও শক্তির অধিকারী তোমার প্রভু-প্রতিপালক এ থেকে পবিত্র।

আর সব রসূলদের ওপর সদা শান্তি বর্ষিত হোক। আর সব প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহরই। (সূরা সাফ্ফাত : ১৮১-১৮৩)।

(৭১) হ্যরত সুলায়মান (আ.)-এর একটি দোয়া

[হ্যরত সুলায়মান (আ.)-এর এ দোয়া কবুল হয়েছে। আর বিরাট-বিরাট বিদ্রোহী বাহিনী তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। হ্যরত সালমাহ বিন আলকা (রা.) বলেন, “নবী করিম (সা.) যখন কোন দোয়া করতেন তখন এতে আল্লাহ তা'লার ‘ওয়াহহাব’ সিফতের উল্লেখ করতেন ও বিশেষভাবে এ কথা বলতেন, ‘সুবহানা রাবিয়াল ওয়াহহাব’- অর্থাৎ, পবিত্র আমার প্রভু-প্রতিপালক পরম দাতা। (হ্যরত ইমাম সুযুতি (রহ.) প্রণীত তফসীর আদ্দ দুররূল মনসূর, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ২১৩)।]

رَبِّ اغْفِرْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي ۝ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ ﴿١﴾

(রাবিগফিরলী ওয়াহাব্লী মুলকাল লা ইয়াম্বাগী লিআহাদিম মিম বাংদি-ইন্নাকা আনতাল ওয়াহহাব)

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর। আর আমাকে এমন একটি সম্রাজ্য দান কর যেন আমার পরে অযোগ্য কেউ এর মালিক না হয়। নিশ্চয় তুমিই পরম দাতা। (সূরা সাদ : ৩৬)।

(৭২) আল্লাহর দরবারে মীমাংসা প্রার্থনা

[হ্যরত সাইদ বিন হাসনা এ দোয়া প্রসঙ্গে বলতেন, আমি এমন একটি আয়াত সমন্বে জানি— যা পড়ে খোদার কাছে যা চাওয়া যায় তা-ই দেয়া হয়। রসূল করিম (সা.) এ দোয়া দ্বারা তাহজ্জুদ আরম্ভ করতেন। আর এর আগে পড়তেন ‘আল্লাহমা রাক্তি জিবরীলা ওয়া মিকালা ওয়া ইসরাফিলা’— অর্থাৎ, আল্লাহ আমার এবং জিব্রাইল, মিকাইল ও ইসরাফিলের প্রভু-প্রতিপালক। (তফসীর কুরতুবী, ১৫ খন্দ, পৃ. ২৬৫)।

اللَّهُمَّ قَاتِرَ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ عِلْمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَعْتَلُونَ^④

(আল্লাহমা ফাতিরাস্ম সামাওয়াতি ওয়াল আরয়ি আলিমাল গায়বি ওয়াশ্শ শাহাদাতি আন্তা তাহকুম বায়না ইবাদিকা ফী মা কানু ফীহি ইয়াখতালিফুন) হে আল্লাহ! আকাশসমূহ ও পৃথিবীর আদি স্তো, দৃশ্য ও অদ্রশ্যের জ্ঞাতা, তুমই তোমার বান্দাদের মাঝে সেসব বিষয়ে মীমাংসা করবে যে সমন্বে তারা মতভেদ করছে। (সূরা যুমার : ৪৭)।

(৭৩) দোষখের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া এবং জালাতী হওয়ার জন্যে দোয়া এবং মুমিনদের পক্ষে আরশের ফিরিশ্তাদের আকুতিপূর্ণ দোয়া

[রসূল করিম (সা.)-এর সাহাবারা (রা.) বর্ণনা করেন, “আমরা একত্র হয়ে আল্লাহ তা’লার মাহাত্ম্য সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। রসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তখন আমাদের মাঝে এলেন আর বললেন, আমিও তোমাদেরকে আল্লাহ তা’লার মাহাত্ম্যের একটি কথা বলছি। এরপরে তিনি আরশের বহনকারী ফিরিশ্তাদের সমন্বে বললেন, এরা খোদা তা’লার মহান সৃষ্টি। (হ্যরত ইমাম সুযুতি (রহ.) প্রণীত তফসীর আদৃ দুররংল মনসূর, ৫ খন্দ, পৃ. ৩৪৭)।

رَبَّا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سِيِّلَكَ وَقِيمُ عَذَابِ الْجَحِيمِ^⑤

(রাববানা ওয়াসিঁতা কুল্লা শায়ইর রাহমাতাওঁ ওয়া ইলমান ফাগফির লিল্লায়ীনা তাবু ওয়াত্তাবাঁউ সাবিলাকা ওয়াকিহিম আয়াবাল জাহীম)

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি প্রত্যেক বস্তুকে নিজ করণা ও জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টন করে রেখেছ। সুতরাং যারা তওবা করে এবং তোমার পথ অনুসরণ করে তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর ও দোষখের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।

رَبَّنَا وَأَذْجَلْهُمْ جَنَّتٍ عَدِينٍ أَتَيْتُ وَعَدْتُهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَبَاءِهِمْ
وَأَرْوَاجِهِمْ وَذُرْرِيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(রাববানা ওয়া আদখিলহুম জান্নাতি আদনিনিল্লাতি ওয়া'আদতাহুম ওয়া মান সালাহা মিন আবায়িহিম ওয়া আযওয়াজিহিম ওয়া যুরায়িয়াতিহিম- ইন্নাকা আনতাল আযীযুল হাকীম) হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি তাদেরকে চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবিষ্ট কর, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দান করেছ। আর তাদের পূর্বপুরুষ, তাদের সহধর্মীণী, তাদের সন্তান-সন্ততিগণের মাঝে যারা পুণ্যবান তাদেরকেও (জান্নাতে প্রবিষ্ট কর)। নিশ্চয় তুমিই মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَقِيمُ السَّيَّاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيَّاتِ يَوْمٌ فَقَدْ رَحْمَةً وَذِلِّكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

(ওয়াকিহিমুস সাইয়িয়াতি ওয়া মান তাফ্রিস সাইয়িয়াতি ইয়াওমায়িয়িন ফাকুদ রাহিম-তাহ- ওয়া যালিকা হৃয়াল ফাওযুল আযীম)

আর তুমি তাদেরকে সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষা কর। প্রকৃতপক্ষে তুমি সেদিনের অনিষ্টসমূহ থেকে যাকে রক্ষা করবে তার প্রতি অবশ্যই কৃপা করবে। আর এটাই তো প্রকৃতপক্ষে মহা সফলতা। (সূরা আল মু'মিন : ৮-১০)।

(৭৪) প্রত্যেক কাজকে আল্লাহর ওপর সোপর্দ করার স্বীকৃতি

[হ্যরত মুসা (আ.)-এর সময়ের এক মু'মিন ব্যক্তির দেয়া]

وَأَفْوَضْ أَمْرِيَ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِصَيْرٌ بِالْعِبَادِ

(ওয়া উফাওভিয়ু আমিরি ইলাল্লাহ-ইলাল্লাহা বাসীরুম বিল 'ইবাদ)

আর আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর নিকট সোপর্দ করছি। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে উত্তমভাবে দেখছেন। (সূরা মু'মিন : ৪৫)।

পৃথিবীকে এর মৃত্যুর পর জীবিত করেন। আর এভাবেই তোমাদেরকে (জীবিত করে) বের করা হবে। (সূরা রূম : ১৮-২০)।

(৭৫) যান-বাহনে চড়ার দোয়া

[নবী করিম (সা.) যানবাহনে চড়ার সময় এ দোয়া পড়তেন। (মুসনাদ আহমদ বিন হামল, আবু দাউদ)]

سُبْحَنَ اللَّهِ سَهْرَلَنَا هَذَا وَمَا كَيْلَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١﴾ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

(সুবহানাল্লাহী সাখ্খারা লানা হায়া ওয়ামা কুন্না লাহু মুকুরিনীন-ওয়া ইন্না ইলা রাবিনা লামুনকুলিবুন)

তিনি পবিত্র যিনি একে আমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন, অথচ আমরা একে আয়তাধীন করতে সক্ষম ছিলাম না।

আর নিশ্চয়ই আমরা আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পানে ফিরে যাব। (সূরা যুখরুফ : ১৪-১৫)।

(৭৬) ঐশ্বী কল্যাণ লাভে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

[এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে, এ দোয়া প্রার্থনাকারীদের মাঝে প্রথম ছিলেন হ্যরত আবু বকর (রা.)। তাঁর দোয়া এভাবে কবুল হয়েছে যে, তাঁর পিতামাতা, ভাই ও সব সন্তান ইসলাম কবুল করেছিলেন। (হ্যরত ইমাম সুয়তি (রহ.) প্রণীত তফসীর আদ্ দুররহল মনসূর, ৫ম খন্ড, পৃ. ৪১)।]

**رَبِّ أَوْزَعْنِيَ أَنْ أَشْكَرَ نِعْمَتَكَ أَتَيْتَنِيْ نِعْمَةً عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَالدَّىٰ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضِهَ
وَأَصْلَحْ لِي فِي دُرْرَىٰ هُنْيَ بَتَّ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ**

(রাবিব আওয়িনী আন্ম আশকুরা নিমাতাকাল্লাতী আন্মামতা আলায়া ওয়া ‘আলা ওয়ালিদাইয়া ওয়া আন আ’মালা সালিহান তারায়হ ওয়া আসলিহ লী ফী যুরায়িয়াতি ইন্নী তুব্তু ইলায়কা ওয়া ইন্নী মিনাল মুসলিমীন)

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে সৌভাগ্য দান কর, যাতে আমি তোমার সেই কল্যাণের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি— যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দিয়েছ। আর আমি যেন এমন পৃষ্ঠাকাজ করতে পারি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। আর আমার জন্য আমার বংশধরগণকে সংশোধন কর। নিশ্চয় আমি তোমার সমীপে বিনত হয়েছি এবং নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা আহ্কাফ : ১৬)।

(৭৭) ঐশ্বী সাহায্যের দোয়া

[হ্যরত নূহ (আ.)-এর জাতি যখন তাঁকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তারা সীমালংঘন করে তাঁর কর্তৃর বিরোধিতা করতে শুরু করেছিল তখন তিনি এ দোয়া করেন।]

آنِي مَغْلُوبٌ فَانْتَصَرْ ⑩

(আন্নী মাগলুরুন ফানতাসির)

(হে আমার প্রভু-প্রতিপালক!) নিশ্চয় আমি পরাভূত। অতএব তুমি (আমার পক্ষ থেকে) প্রতিশোধ নাও। (সূরা কুমার : ১১)।

(৭৮) বিদ্যে থেকে রক্ষা পাওয়া ও পুণ্যবানদের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টির দোয়া

[এক সাহাবী রসূল করিম (সা.)-এর সাথে নামায পড়লেন। হ্যুর (সা.) বললেন, এ ব্যক্তি জান্নাতী। হ্যরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-এর মনে প্রশ্ন জাগল, কী করে সে জান্নাতী হলো? তাই তিনি গিয়ে সেই লোকের বাড়িতে মেহমান হলেন। সেই লোক তাঁকে খুব আদর যত্ন করলেন। ইবনে উমর (রা.) বললেন, আমি রাতে তাহাজুদ পড়েছি অথচ সে ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। সকালে আমি নফল রোয়া রেখেছি, কিন্তু সে রাখেন। আমি তাকে জিজেসই করে ফেললাম, তাহলে তুমি এমন কি কাজ করেছ যাতে তোমার জান্নাতের সৌভাগ্য হয়েছে? সেই লোকটি বললেন, তুমি রসূল করিম (সা.)-কে গিয়ে জিজেস করলেই তো পার। ইবনে উমর (রা.) রসূল করিম (সা.)-কে গিয়ে জিজেস করলে তখন তিনি (সা.) বললেন, লোকটিকে আমার কথা বলে জিজেস কর। তখন সেই লোকটি বললেন, প্রথম কথাতো হল, আমার কাছে এ দুনিয়া কোন মূল্য রাখে না। কী পেলাম আর কী গেল এর কোন পরওয়া নেই। দ্বিতীয়ত আমার মনে কারও প্রতি হিংসা-বিদ্যে নেই। হ্যরত ইবনে উমর (রা.) বললেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লা আমার ওপর আপনাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। এ দোয়াই আল্লাহহ মু'মিনকে শিখিয়েছেন। (হ্যরত ইমাম সুয়তি (রহ.) প্রণীত আদৃ দুররূল মনসূর, ৫ম খন্ড, পৃ. ১৯৯)।]

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلَا حَوَانِنَا إِلَّا يَمْكُرْ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا
لِلَّذِينَ أَمْنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ⑪

(রাবরানাগফিরলানা ওয়ালি ইখওয়ানিনাল্লায়ীনা সাবাকুনা বিল ঈমানি ওয়ালা তাজ'আল ফী কুলুবিনা গিল্লাল লিল্লায়ীনা আমানু রাবরানা ইল্লাকা রাউফুর রাহীম) হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদিগকে ও আমাদের সেসব ভাইকে ক্ষমা কর যারা ঈমানে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়েছে। আর যারা ঈমান এনেছে আমাদের অন্তরে তাদের প্রতি কোন বিদ্যে সৃষ্টি করো না। হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি অতি স্নেহশীল, বারবার কৃপাকারী। (সূরা হাশ্র : ১১)।

(৭৯) সবকিছু নিজের প্রভুর সমীপে উপস্থাপন করার ইবাহীমি দোয়া

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوْكِيدًا وَإِلَيْكَ آتَيْنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيرُ ① رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلّذِينَ كَفَرُوا
وَاغْفِرْلَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ②

(রাববানা আ'লায়কা তাওয়াক্কালনা ওয়া ইলায়কা আনাবনা ওয়া ইলায়কাল মাসীর-
রাববানা লা তাজ'আলনা ফিতনাতাল লিল্লায়ীনা কাফার ওয়াগফির লানা রাববানা ইল্লাকা
আনতাল আয়ীয়ল হাকীম)

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তোমার ওপর আমরা ভরসা করেছি ও তোমারই সমীপে
আমরা ঝুঁকেছি এবং তোমার দিকে আমাদের শেষ প্রত্যাবর্তন হবে।

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! যারা অঙ্গীকার করেছে তুমি আমাদেরকে তাদের জন্য
পরীক্ষার কারণ করো না এবং তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর; হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক!
নিশ্চয় তুমই মহাপ্রাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। (সূরা মুমতাহানা : ৫-৬)।

(৮০) ঐশী কল্যাণের পূর্ণতা লাভের জন্যে দোয়া

[আল্লাহ তাঁ'লা মু'মিনকে তওবাতুন নসূহুর শিক্ষা দেন। এর ফলে আল্লাহ তাঁ'লা তাদের
পাপ দূর করেন ও তাঁর সন্তুষ্টির জান্মাতে স্থান দেন। এসব মু'মিনদের সামনে ও পেছনে
নূর থাকবে আর তারা এজন্য দোয়া করবে।]

رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْلَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ①

(রাববানা আতমিম্ লানা নূরানা ওয়াগফির লানা-ইল্লাকা আ'লা কুল্লি শায়ইন কুদাইর)

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের জন্য আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণ কর আর
আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি সব কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। (সূরা তাহ্রীম : ৯)।

(৮১) ঐশী নৈকট্য লাভের আকাঙ্ক্ষা ও অত্যাচারীদের কবল থেকে উদ্বারের দোয়া

[এটি ফেরাউনের স্তীর দোয়া। ঈমান আনার পরে যখন ফেরাউন তাঁর ওপর
যুলুম-নির্যাতন চালায় তখন তিনি তা থেকে রক্ষার জন্যে এ দোয়া করেন]

رَبِّ ابْنِي لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَحْنُ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلَهُ وَنَحْنُ مِنْ أَقْوَمِ الظَّالِمِينَ ①

[রাবিবনি জী ই'ন্দাকা বায়তান ফিল জান্নাতি ওয়া নাজিনী মিন ফিরআউনা ওয়া
'আমালিহী ওয়া নাজিনী মিনাল কুাওমিয় যালিমীন]

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমার জন্য তোমার সন্নিধানে জান্মাতে একটি গৃহ

নির্মাণ কর এবং ফেরাউন ও তার কার্যকলাপ থেকে আমাকে উদ্ধার কর আর আমাকে এ অত্যাচারী জাতি থেকে মুক্তি দাও। (সূরা তাহ্রীম : ১২)।

(৮২) অস্ত্রীকারকারী ও মিথ্যা আখ্যায়িতকারীদের বিরুদ্ধে দোয়া

[হ্যরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, হ্যরত নৃহ (আ.) নিজের জাতির বিরুদ্ধে সে সময় এ দোয়া করেন যখন তাঁর নিকট এ ওহী অবর্তীর্ণ হয়—

“এখন তোমার জাতি থেকে আর কেউ ঈমান আনবে না।” (তফসীর আদৃ দুররংল মনসূর, ৫ম খন্ড, পৃ. ২৭০)।

رَبِّ لَا تَذْرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكُفَّارِ إِنَّهُمْ يُصْلُوْا عِبَادَكَ
وَلَا يَلْدُوْا إِلَّا فَاجْرَأَكَفَّارًا

(রাবিল লা তায়ার আলাল আরয়ি মিনাল কাফিরীনা দাইয়্যারা। ইন্নাকা ইন তায়ারহুম ইউযিল্লু ইবাদাকা ওয়া লা ইয়ালিদু ইল্লা ফাজিরান কাফ্ফারা)

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি ভূপৃষ্ঠে অস্ত্রীকারকারীদের কারও গৃহকে (গৃহবাসীকে) ছেড়ে দিও না।

কেননা, তুমি যদি তাদেরকে ছেড়ে দাও তাহলে তারা আমার বান্দাদের প্রষ্ট করবে এবং কেবল পাপাচারী ও অতি অকৃতজ্ঞদের জন্য দেবে। (সূরা নৃহ : ২৭-২৮)*।

[* টীকা: নবীরা বড়ই দয়ালু হন। তাঁরা সাধারণত বদদোয়া করেন না। এখানে কোন গৃহকে ছেড়ে দিও না, অর্থ গৃহের কোন অবিশ্বাসী ও অস্ত্রীকারকারী যেন ঈমান আনা হতে বাস্তিত না থাকে]

(৮৩) পিতা-মাতা ও মুমিনদের ক্ষমা করার দোয়া

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيْ مُؤْمَنًا وَلِمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِتِ
وَلَا تَزِدِ الظَّلِيمِيْنَ إِلَّا تَبَارَأً

(রাবিগফিরলী ওয়ালি ওয়ালিদাইয়্যা ওয়া লিমান দাখলা বাইতিয়া মুমিনাওঁ ওয়া লিল মুমিনীনা ওয়াল মুমিনাতি-ওয়া লা তাযিদিয় যালিমীনা ইল্লা তাবারা)

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে আর যে ব্যক্তি বিশ্বাসী হয়ে আমার গৃহে (শিক্ষায়) প্রবেশ করে তাকে এবং বিশ্বাসী পুরুষ ও সব মুমিন নারীদের ক্ষমা কর এবং তুমি কেবল যালেমদের জন্য ধ্বংসই বাড়িয়ে দিও। (সূরা নৃহ : ২৯)।

সূরা ইখলাস ও আশ্রয় চাওয়ার দুটি পরিপূর্ণ দোয়া

[হ্যরত আবুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন, “রসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কুরআনের শেষ তিটি সূরা রাতে শোবার সময় যে পড়ে শোবে তার জন্যে আশ্রয় চাওয়ার এর চেয়ে অধিক আর কিছু নেই” (সুনানে নিসাঙ্গ)।

হ্যরত আয়েশা (রা.) আরও বর্ণনা করেন, সৈয়দিনা আঁ-হ্যরত (সা.) যখন রাতে বিছানায় ঘুমাতে যেতেন তখন হাত দুটো একত্র করে সূরা ইখলাস ও আশ্রয় চাওয়ার (সূরা ফালাকু ও সূরা নাস) দুটি দোয়া পাঠ করতেন আর হাতে ফুঁক দিতেন এবং মাথা থেকে নিয়ে পা পর্যন্ত সারা শরীর মুছে ফেলতেন। (বুখারী ও মুসলিম)। তিনি (সা.) তিনবার এ রকম করতেন। এভাবে নবী (সা.)-এর হাদীসে এ-ও আছে, উক্ত তিনটি সূরা সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করলে যাবতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে এবং দুঃখকষ্ট থেকেও নিরাপদ থাকবে।]

সূরা আল ইখলাস

(এটি মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহসহ এ সূরায় ৫ আয়াত এবং ১ রক্তু আছে)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿٢﴾ إِلَهُ الْصَّمْدُ ﴿٣﴾ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُواً أَحَدٌ ﴿٤﴾

(বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। কুল হ্যাল্লাহ আহাদ। আল্লাহস্স সামাদ। লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ। ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহ কুফুওয়ান আহাদ)

অর্থ: “(১) আল্লাহর নামে, যিনি পরম করণাময়, অ্যাচিত-অসীম দানকারী, বারবার কৃপাকারী। (২) তুমি বল, ‘তিনিই আল্লাহ এক-অধিতীয়। (৩) আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ সর্বনির্ভরস্তুল। (৪) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। (৫) আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই’।”

সূরা আল ফালাক

(এটি মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহসহ এ সূরায় ৬ আয়াত এবং ১ রক্তু আছে)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿٢﴾ مِنْ شَرِّ مَا حَكَىٰ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٤﴾ وَ
مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٥﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٦﴾

(বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। কুল আউয়ু বিরাবিল ফালাক। মিন শার্রি মা খালাক।

ওয়া মিন শার্রি গাসিকিন ইয়া ওয়াকাব। ওয়া মিন শাররিন् নাফ্ফাসাতি ফিলউকাদ।
ওয়া মিন শার্রি হাসিদিন ইয়া হাসাদ)

অর্থ: “আল্লাহর নামে যিনি পরম করণাময়, অ্যাচিত-অসীম দানকারী, বারবার কৃপাকারী। (২) তুমি বল, ‘আমি আশ্রয় চাই এক সৃষ্টিকে বিদীর্ণ করে আরেক সৃষ্টির উন্নেষকারী প্রভূর কাছে। (৩) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন এর অনিষ্ট থেকে, (৪) এবং অন্ধকার বিস্তারকারীর অনিষ্ট থেকে যখন তা ছেয়ে যায় (৫) এবং সম্পর্ক-বন্ধনে (বিচেদ সৃষ্টির জন্য) ফুৎকারকারিণীদের অনিষ্ট থেকে, (৬) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে’।”

সূরা আনু নাস

(এটি মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহসহ এ সূরায় ৭ আয়াত এবং ১ রূপ্তু আছে)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿٢﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٣﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٤﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ

الْخَنَّاسِ ﴿٥﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٦﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٧﴾

(বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। কুল আউয়ু বিরাবিন্নাস। মালিকিন্নাস। ইলাহিন্নাস।
মিন শাররিল ওয়াস ওয়াসিল খান্নাসি। আল্লায়ি ইউওয়াসবিসু ফী সুদুরিন্নাস। মিনাল
জিন্নাতি ওয়ান্নাস)

অর্থ: “(১) আল্লাহর নামে, যিনি পরম করণাময়, অ্যাচিত-অসীম দানকারী, বারবার কৃপাকারী, (২) তুমি বল, ‘আমি মানুষের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে আশ্রয় চাই, (৩) যিনি মানুষের অধিপতি, (৪) মানুষের উপাস্য, (৫) কুপ্রোচনা সৃষ্টিকারীর অনিষ্ট থেকে, যে কুপ্রোচনা দিয়ে সটকে পড়ে, (৬) যে মানুষের অন্তরে কুপ্রোচনা দেয়, (৭) সে জিনের
(উঁচু শ্রেণীর মানুষের) অন্তর্ভুক্তই হোক আর সাধারণ মানুষের অন্তর্ভুক্তই হোক’।”

আদিয়াতুর রসূল (সা.) [হ্যরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর দোয়া]

ঘুম থেকে উঠার পর দোয়া

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا مَاتَنَا وَإِلَيْهِ الشُّورُ -

(আলহামদু লিল্লাহিল্লায়ি আহইয়ানা বাঁদা মা আমাতানা ওয়া ইলায়হিন নুশুর)। [সহীহ বুখারী]
অর্থ: সব প্রশংসা তাঁরই যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবন দান করেছেন এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

শৌচাগারে যাবার দোয়া

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْثَ وَالْخَبَاثَ -

(আল্লাহভ্য ইন্নি আ'উযুবিকা মিনাল খুবসি ওয়াল খাবায়িসি)। [বুখারী ও মুসলিম]
অর্থ: হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি সব ধরনের শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক অপবিত্রতা থেকে তোমার আশ্রয় যাচনা করছি।

শৌচাগার হতে বের হওয়ার দোয়া

بِسْمِ اللَّهِ غَفَرَانَكَ -

(বিসমিল্লাহি গুফরানাকা)। [আবু দাউদ]

অর্থ: আল্লাহর নামে! (হে আল্লাহ! আমি) তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

(ا) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي -

(আলহামদু লিল্লাহিল্লায়ি আয়হাবা আন্নিল আয়া ওয়া আ'ফানি)। [আবু দাউদ]

অর্থ: সব প্রশংসা তাঁরই যিনি আমার কষ্ট দূর করে দিয়েছেন এবং আমাকে সুস্থিতা দান করেছেন।

ঘর হতে বের হওয়ার দোয়া

**بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضْلَلَ
أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ -**

(বিসমিল্লাহি তাওয়াককালতু আলাল্লাহি ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি।
আল্লাহহ্মা ইন্নি আ'উয়বিকা আন আযিল্লা আও উয়াল্লা আও আযিলিমা আও উয়লামা আও
আজহালা আও ইউজহালা আলাইয়া)। [আরু দাউদ ও তিরমিথি]

অর্থ: আল্লাহ তালার নাম নিয়ে (বের হচ্ছি)। আমি আল্লাহ তালার ওপর ভরসা করছি
আসলে আল্লাহ তালার দেয়া তৌফিক ছাড়া পাপ হতে বাঁচার এবং পুণ্য কাজ সম্পাদন
করার শক্তি নেই। হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন আমি পথভ্রষ্ট না
হই অথবা আমাকে পথভ্রষ্ট করা না হয়, আমি অত্যাচার না করি অথবা আমার ওপর
অত্যাচার করা না হয় এবং আমি মৃত্যু না করি অথবা আমার ওপর মৃত্যু না করা হয়।

ঘরে প্রবেশ করার দোয়া

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجَنَّا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا -

(আল্লাহহ্মা ইন্নি আসআলুকা খায়রাল মাওলিজি ওয়া খায়রাল মাখরাজি বিসমিল্লাহি ওয়া
লাজনা ওয়া আলাল্লাহি রাবুনা তাওয়াককালনা)। [আরু দাউদ]

অর্থ: হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট ঘরে প্রবেশকালীন এবং ঘর হতে
নির্গমনকালীন মঙ্গল কামনা করছি। আল্লাহ তালার নাম নিয়ে আমরা (গৃহে) প্রবেশ
করছি এবং আমরা আমাদের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহর ওপর ভরসা করছি।

খাবার শুরু করার দোয়া

-بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ-

(বিসমিল্লাহি ওয়া আলা বারাকাতিল্লাহ)। [আল মুসতাদেরেক আলা সহীহ হাইন]

অর্থ: আল্লাহর নাম নিয়ে এবং আল্লাহর কাছে বরকত কামনা করে (খাচ্ছি)।

খাবার শেষের দোয়া

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

(আলহামদু লিল্লাহিল্লায়ি আতু'আমানা ওয়া সাকানা ওয়া জা'আলানা মিনাল
মুসলিমীন)। [আরু দাউদ ও মিশকাত]

অর্থ: সব প্রশংসা আল্লাহ তালার- যিনি আমাদেরকে খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং
আমাদের মুসলমান বানিয়েছেন।

দাওয়াত খাবার পর দোয়া

اللَّهُمَّ بارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

(আল্লাহুম্মা বারিক লাভম ফিমা রাযাকতাভম ওয়া আগফির লাভম ওয়ার হামহম)। [সহীহ মুসলিম]
অর্থ: হে আল্লাহ! তাদেরকে তুমি যে রিয়ক দান করেছ তাতে বরকত দান কর এবং
তাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং তাদের প্রতি কৃপা কর।

নতুন কাপড় পরিধান করার দোয়া

**اَللَّهُمَّ كَمَا كَسَوْتَنِيهِ اَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ
وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ**

(আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু কামা কাসাওতানিহি। আসআলুকা খায়রাল ওয়া খায়রা মা সুনিন'আল
লাহ ওয়া আউয়ুবিকা মিন শাররিহী ওয়া শাররি মা সুনিনা লাহ)। [তিরমিয়ি ও আবু দাউদ]
অর্থ: হে আল্লাহ! সব প্রশংসা তোমারই যেভাবে তুমি এটি আমাকে পরিধান করিয়েছ।
আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি এর মঙ্গলের নিমিত্তে এবং তার জন্যও যার জন্য এটি তৈরী
করা হয়েছে এবং আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার কাছে, এটির অঙ্গল হতে যার জন্য এটি
তৈরী করা হয়েছে।

ভোরবেলা মসজিদে যাবার দোয়া

**اَللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي لِسَانِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا
وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ حَلْفِي نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ امَامِي نُورًا
وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ تَحْتِي نُورًا اَللَّهُمَّ اغْطِنِي نُورًا**

(আল্লাহুম্মাজাল ফি কালবি নুরাওঁ ওয়াজাজাল ফি লিসানি নুরাওঁ ওয়াজাজাল ফি সামরি
নুরাওঁ ওয়াজাজাল ফি বাসারি নুরাওঁ ওয়াজাজাল মিন খালফি নুরাওঁ ওয়াজাজাল মিন
আমামি নুরাওঁ ওয়াজাজাল মিন ফাওকি নুরাওঁ ওয়াজাজাল মিন তাহতি নুরা। আল্লাহুম্মা
আ'অতিনি নুরা)। [বুখারী ও মুসলিম]

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার অন্তর জ্যোতিতে ভরে দাও। আমার জিহ্বায় আলো দান কর।
এবং আমার কানে জ্যোতি দান কর, এবং আমার চক্ষুদ্বয়ে আলো দান কর। আমার
সামনেও আলো দান কর আমার পিছনেও আলো দান কর, আমার ওপরে আলো দান কর

এবং আমার নিচে আলো দান কর। হে আল্লাহ! আমাকে নূর দান কর।

রোগীর জন্য দোয়া

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبِّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ
شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقْمًا -

(আয়হিবিল বাসা রাববান নাসি। ওয়াশফি আনতাশ শাফি। লা শেফাআ ইল্লা শেফাউকা শিফাআন লা ইউগাদিরু সাকামা)। [সহীহ বুখারী]

অর্থ: হে মানুষের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি এ রোগকে দূর করে দাও এবং আরোগ্য দান কর। তুমিই তো আরোগ্যদাতা। তোমার কাছে ছাড়া (অন্য কারও কাছে) কোন আরোগ্য নেই। তুমি এ রকম আরোগ্য দান কর যেন রোগের অগুপ্রিমাণও না থাকে।

কবর ঘিয়ারতের দোয়া

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّ شَاءَ اللَّهُ
بِكُمْ لَا حُقُونَ نَسَأُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ -
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقَبُورِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ سَلْفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثْرِ -

(১) (আস্সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাদ দিয়ারি মিনাল মুমিনিনা ওয়াল মুসলিমিনা ওয়া ইল্লা ইন শা-আল্লাহ বিকুম্ভাল্লাহু হিকুনা। নাসআলুল্লাহু লানা ওয়া লাকুমুল আফিয়াহ)। মুসলিম
(২) (আস্সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুরি। ইয়াগফিরুল্লাহা লানা ওয়ালাকুম আনতুম সালফুনা ওয়া নাহনু বিল আসরি)। [সুনানে তিরমিয়]

অর্থ: (১) তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এ অঞ্চলের মুমিনগণ ও মুসলমানগণ! আল্লাহ চাইলে আমারও অচিরেই তোমাদের সাথে মিলিত হব। আমরা আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্যে এবং আমাদের জন্যে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

(২) হে কবরের অধিবাসীবৃন্দ! তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ! আমাদেরকে ও তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তোমরা আগে-আগে যাও, আমরা তোমাদের অনুসরণ করছি।

বিয়ে-শাদীতে মোবারকবাদ

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمِيعَ بَنِكُمَا فِي الْخَيْرِ -

(বারাকাল্লাহু লাকা, বারাকাল্লাহু লাকা, ওয়া বারাকা আলাইকুমা ওয়া জামা'আ বায়নাকুমা ফিল খায়রি)। [আবু দাউদ]

অর্থ: তোমাদেরকে আল্লাহ তা'লা বরকত দান করুন। তোমাদেরকে আল্লাহ বরকত দান করুন এবং তোমাদের উভয়ের ওপর বরকত হোক! নেক কাজে তোমাদের উভয়ের মাঝে এক্য সৃষ্টি হোক!

নব বধূর জন্য দোয়া

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ -

(আল্লাহল্লাহ ইন্নি আসআলুকা মিন খায়রিহা ওয়া খায়রি মা জাবালতাহা আলায়হি। ওয়া আউয়ুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা জাবালতাহা আলায়হি)। [ইবনে মাজা]

অর্থ: হে আমার আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তার মাঝে নিহিত সেই মঙ্গল কামনা করি যে মঙ্গলের মাঝে তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ এবং তোমার আশ্রয় চাচ্ছ তার মাঝে নিহিত সেই অঙ্গল হতে যে অঙ্গলের মাঝে তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ।

স্বামী-স্ত্রী মিলনের সময় দোয়া

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جِبِيلُ الشَّيْطَانِ وَجِبِيلُ الشَّيْطَانِ مَا رَزَقْتَنَا -

(বিসমিল্লাহি আল্লাহল্লাহ জান্নিবনাশ শায়তানা ওয়া জান্নিবিশ শায়তানা মা রাযাকতানা)।
[বুখারী ও মুসলিম]

অর্থ: আল্লাহ তা'লার নামে। হে আল্লাহ! শয়তান হতে আমাদেরকে দূরে রাখ এবং এ জিনিস হতে শয়তানকে দূরে রাখ যা তুমি আমাদেরকে দান করতে যাচ্ছো।

আশা পূরণের দোয়া

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَمِّضُ الصِّلْحَةُ -

(আলহামদু লিল্লাহিল্লায়ি বিনিমাতিহি তাতিম্মুস সালিহাতু)। [ইবনে মাজা]

অর্থ: সব প্রশংসা আল্লাহ তা'লার যার অনুগ্রহে সব উত্তম কার্য সম্পন্ন হয়।

বিপদগ্রস্ত লোককে দেখে দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الرَّبِّ الْعَظِيمِ مَا ابْتَلَكُ بِهِ وَفَضَّلْنَا عَلٰى كَثِيرٍ مِّنْ خَلْقٍ تَفْضِيلًا ۝

(আলহামদু লিল্লাহিল্লাহি আ'ফানি মিশ্রা ইবতালাকা বিহি ওয়া ফায়্যালানি আলা কাসিরিম মিশ্রান খালাকা তাফখিলা)। [তিরমিয়ি]

অর্থ: সব প্রশংসা আল্লাহ তাঁলার যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন সেই বিপদ হতে যাতে তুমি ক্লিষ্ট হয়েছ। আর তিনি তাঁর সৃষ্টির মাঝে অনেকের চেয়ে আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

নিয়তির বিধানের ওপর সন্তুষ্ট থাকার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اعُزُّزْنَا عَلٰى كُلِّ حَالٍ وَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ حَالٍ اَهْلِ التَّارِ-

(আলহামদু লিল্লাহি আ'লা কুল্লি হালিন ওয়া আউয়ু বিল্লাহি মিন হালি আহলিন নার)। [তিরমিয়ি]
অর্থ: সব অবস্থায় সব প্রশংসা আল্লাহ তাঁলার এবং আগনের অধিবাসীদের অবস্থা হতে আমি আল্লাহ তাঁলার আশ্রয় ভিক্ষা করছি।

অপচন্দনীয় কাজ দেখে দোয়া

اَللّٰهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا اَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ-

(আল্লাহভূম্মা লা ইয়াতি বিল হাসানাতি ইল্লা আনতা ওয়া লা ইয়াদফাতুস সাইয়্যাতি ইল্লা আনতা ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওলা ওয়া লা হাওলাতা ইল্লা বিল্লাহি)। [আবু দাউদ]

অর্থ: হে আমার আল্লাহ! তুমি ছাড়া কেউ সুখ আনয়ন করতে পারে না এবং তুমি ছাড়া কেউ দুঃখ দূর করতে পারে না। (পাপ হতে মুক্তি লাভের) সামর্থ্য এবং (পুণ্য কর্ম করার) শক্তি কেবল আল্লাহরই (আয়তে রয়েছে)।

সফলতার উপকরণ সৃষ্টি হওয়ার দোয়া

رَبَّنَا اِنَّا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهِيَ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا - رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي -

(রাবিনা আতিনা মিল্লাদুন্কা রাহমাতাও ওয়া হায়ি লানা মিন আমরিনা রাশাদা। রাবিনশ রাহলি সাদিরি ওয়া ইয়াসসিরলি আমরি)। [সূরা আল কাহফ, ১৮:১১ ও সূরা তাহা, ২০:২৬-২৭]
অর্থ: হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তোমার পক্ষ হতে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর

এবং আমাদের কাজে আমাদের জন্য সফলতার পথ বের করে দাও। হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমার বক্ষ খুলে দাও এবং আমার কাজকে আমার জন্যে সহজসাধ্য করে দাও।

ক্রোধ এবং আবেগের প্রভাব হতে রক্ষার দোয়া

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَبَّىٰ وَأَذِّهِبْ غَيْظَ قَلْبِي وَاجْرِنِي مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ

(আল্লাহুম্মাগ ফিরলি যামবি ওয়া আয়হিব গাইয়া কালবি ওয়া আজিরনি মিনাশ শায়তানির রাজিম)। [আমালুল ইয়াউমে ওয়াল লাইলাতে লে ইবনে সানাহ]

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার পাপকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার অস্তর হতে ক্রোধকে দূর করে দাও এবং বিতাড়িত শয়তান হতে আমাকে আশ্রয় দান কর।

সফরে যাবার দোয়া

যখন যানবাহনে আরোহণ করা হয় তখন তিন বার ‘আল্লাহ আকবর’- অর্থাৎ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, বলা দরকার।

سُبْحَنَ الدِّيْنِ سَخْرَلَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْتَقِبُونَ

اللَّهُمَّ إِنِّي نَسْعَلُك فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبَرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَالْعَمَلِ مَاتَرْضَى-

اَللَّهُمَّ هُوَنْ عَلَيْنَا سَفَرُنَا هَذَا وَاطْوُلْنَا بُعْدَهُنَّ

(সুবহানাল্লায়ি সাখখারা লানা হায়া ওয়া কুন্না লাহু মুকরিনীনা ওয়া ইন্না ইলা রাকিনা লামুনকালিবুন। আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফি সাফারিনা হায়াল বিরো ওয়াত তাকওয়া ওয়া মিনাল আমালি মা তারয়া। আল্লাহুম্মা হাওয়িয়ন আলায়না সাফারিনা হায়া ওয়া আতওয়ে লানা বু'দাহু আল্লাহুম্মা)। [মুসলিম]

অর্থ: তিনি পরিত্র যিনি একে আমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন অথচ আমরা একে আয়তাধীন করতে সক্ষম ছিলাম না। আর নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পানে ফিরে যাব। হে আল্লাহ! আমরা এ সফরে তোমার কাছে পুণ্য, খোদাতীতি এবং এমন কাজ করার (সামর্থ্য) প্রার্থনা করছি- যা তুমি পছন্দ কর। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আমাদের এ সফরকে সহজ করে দাও এবং দূরত্ব দূর করে দাও। হে আল্লাহ! এ সফরে তুমই বন্ধু এবং আমাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে আমাদের প্রতিনিধি।

শক্র জাতি হতে সুরক্ষার দোয়া

اللَّهُمَّ إِنَا نَجْعَلُكَ فِي نُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ -

(আল্লাহর্মা ইন্না নাজ'আলুকা ফি নুহারিহিম ওয়া নাউয়ুবিকা মিন শুরুরিহিম)। [আবু দাউদ]
অর্থ: হে আল্লাহ! আমরা (তাদের- অর্থাৎ, শক্রদের মোকাবেলায়) নিশ্চয় তোমাকে
তাদের অঙ্গে (ঢাল স্বরূপ) রাখছি এবং তোমার কাছে তাদের সব অনিষ্ট হতে আশ্রয়
চাচ্ছি।

বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে দোয়া

أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَأَخْرَ عَمَلَكَ زَوَّدَكَ اللَّهُ الْقُوَى

(আসতাওদিয়ুল্লাহা দিনাকা ওয়া আমানাতাকা ওয়া আখিরা আ'মালিকা
যাওয়্যাদাকাল্লাহুত্ত তাকুওয়া)। [তিরমিয়]

অর্থ: আমি তোমার ধর্ম, নিরাপত্তা এবং শেষ পরিণতির জন্য তোমাকে আল্লাহ তা'লার
কাছে সমর্পন করছি। আল্লাহ তা'লা তোমাকে তাকওয়ার পথে পরিচালিত করছেন।

উঁচু স্থানে আরোহণ করার দোয়া

اللَّهُمَّ لَكَ الشَّرْفُ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ -

(আল্লাহর্মা লাকাশ শারফু আ'লা কুলি শারফিন ওয়া লাকাল হামদু আ'লা কুলি
হালিন)। [মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল]

অর্থ: হে আল্লাহ! সব মর্যাদার ওপর তোমার জন্যই সমস্ত মর্যাদা এবং সর্বাবস্থায়
তোমারই প্রশংসা।

উঁচু স্থান হতে নিচু স্থানে অবতরণকালীন দোয়া

إِبْوَنَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ -

(আয়িবুনা তায়িবুনা আ'বিদুনা লি রাবিনা হামিদুন)। [তিরানী]

অর্থ: (১) আমরা আমাদের প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, তাঁরই
প্রশংসাকারী।

মজলিস হতে উঠার দোয়া

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اسْتَغْفِرُكَ وَاتُّوبُ إِلَيْكَ -

(সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহ ইল্লা আনতা আসতাগ-ফিরকা ওয়া আতুরু ইলায়কা)। [সুনানে আবু দাউদ]

অর্থ: হে আমার আল্লাহ! তুমি পবিত্র এবং প্রশংসাসহ বিদ্যমান। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তোমার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হচ্ছি।

নতুন চাঁদ দেখে দোয়া

اللَّهُمَّ اهْلِهِ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ رَبِّكَ اللَّهُ -

(আল্লাহুম্মা আহল্লাহ আলায়না বিল আমানি ওয়াল সৈমানি ওয়াস্ সালামাতি ওয়াল ইসলামি রাবি ওয়া রাবুকাল্লাহ)। [তিরমিয়ি]

অর্থ: হে আমার আল্লাহ! আমাদেরকে নিরাপত্তা, সৈমান, শান্তি এবং ইসলামের চাঁদ দেখাও। (হে চাঁদ) তোমার এবং আমার প্রভু আল্লাহ তালাই।

লাইলাতুল কদরের দোয়া

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي -

(আল্লাহুম্মা ইল্লাকা 'আফুরুন তুহিরুল আফওয়া ফা'ফু আন্নি)। [তিরমিয়ি]

অর্থ: হে আমার আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল। ক্ষমা করাকে তুমি ভালোবাস। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

বজ্রপাতের সময় যে দোয়া পড়তে হয়

اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضِّبِكَ وَلَا تَهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْذِكَ -

(আল্লাহুম্মা লা তাকতুলনা বিগায়াবিকা ওয়ালা তুহলিকনা বিআ'য়াবিকা ওয়া আফিনা কাবলা যালিকা)। [মুসনাদে আহমদ তিরমিয়ি]

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তোমার ত্রোধ দ্বারা হত্যা করো না। আর তোমার আয়াব দিয়ে ধ্বংস করো না বরং এর পূর্বে তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর।

শয়তানী প্রভাব হতে সুরক্ষার দোয়া

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَصْبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عَبَادِهِ وَمِنْ هُمَّزَاتِ الشَّيَاطِينِ
أَن يَحْضُرُونِ -

(আউয়ু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন গায়াবিহি ওয়া ইকাবিহি ওয়া শাররি ইবাদিহি
ওয়া মিন হামাযাতিশ শায়াতিনি আহি ইয়াহ্যুরুন)। [সুনানে আবু দাউদ]

অর্থ: আমি আল্লাহ তাঁলার পরিপূর্ণ বাকেয়ের মাধ্যমে তাঁর ক্রোধ ও আযাব হতে, তাঁর
বান্দার শক্তি হতে এবং শয়তানদের প্রোচনা হতে সুরক্ষার জন্যে আল্লাহ তাঁলার
আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন তারা আমার কাছেই না আসতে পারে।

অসুবিধাসমূহ দূর করণার্থে দোয়া

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهَدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْفَضَاءِ وَشَمَائِةِ الْأَعْدَاءِ -

(আল্লাহভূমা ইন্নি আউয়ুবিকা মিন জাহদিল বালায়ি ওয়া দারকিশ শিকায়ি ওয়া সুয়িল
কায়ায়ি ওয়া শামাতাতিল আ'দায়ি)। [বুখারী]

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করছি, বিপদ আপদের দুর্বিষহ অসুবিধা
হতে, দুর্ভাগ্যের করাল গ্রাস হতে, ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত হতে এবং শক্র আনন্দ হতে।

আদিয়াতুল মসীহ মাওউদ (আ.)

[হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর দোয়া]

(হ্যরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.)-এর নিম্নলিখিত ইলহামী দোয়াসমূহ এজন্য পেশ
করা হচ্ছে, কেননা আল্লাহ তাঁলা তাঁর নবীগণকে এবং বিশেষ বান্দাদের ইলহাম
মারফত যেসব দোয়া শিক্ষা দিয়ে থাকেন তা অবশ্যই এবং নিশ্চয় করুণিয়তের মর্যাদা
রাখে। আমাদের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাইকে এ দোয়াগুলো মুখস্থ করা ও স্মরণ রাখা
উচিত।)

হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ওপর ইলহাম মারফত দোয়া করার তাগিদ।
আল্লাহ তাঁলা হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে সম্মোধন করে বলেছেন:

إِنِّي أَنَا اللَّهُ فَاعْبُدُونِي وَلَا تَنْسِنِي وَاجْتَهِدْ أَنْ تَصِلَّنِي وَاسْأَلْ رَبِّكَ وَكُنْ سَوْلًا -

(ইন্নি আনাল্লাহু ফা'বুদুনি ওয়ালা তানসানি ওয়াজতাহিদ আন তাসিলানি ওয়াসআল রাবুকা ওয়া কুন সাউলান।)

অর্থ: (আল্লাহ বলছেন) আমিই আল্লাহ, আমার ইবাদত কর, আমাকে ভুলো না এবং সেই বিষয়ের জন্য চেষ্টা কর, যেন তুমি আমার সাথে মিলিত হতে পার এবং নেকট্য লাভ করতে পার। এটির পদ্ধতি হল, তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে দোয়া কর এবং পুনঃপুন কর। (তায়কেরা, পৃ. ৪০২)।

ادْعُونِي اسْتَجِبْ لِكُمْ
^{١٩٨٩}

(উদউনি আসতাজিব লাকুম)

অর্থ: আমার কাছে দোয়া কর, আমি তোমার দোয়া কবুল করবো। (তায়কেরা, পৃ. ২১৮)

أَجِيبُ دُعَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

(উজিরু দাওয়াতাদ্বারি ইয়া দাআনি)

অর্থ: আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করে থাকি যখন সে আমাকে ডাকতে থাকে। (তায়কেরা, পৃ. ৮৩)।

إِنَّهُ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

(ইন্নাহু সামিউদ দোয়া)

অর্থ: নিশ্চয় তিনি শ্রবণ করে থাকেন। (তায়কেরা, পৃ. ১০০)।

فُلْ مَا يَعْبَدُكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ

(কুল মা ইয়া'বাউবিকুম রাবিব লাও লা দুআ'উকুম)

অর্থ: তাদেরকে বলে দাও, আমার প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের কি পরওয়া করেন যদি তোমরা দোয়া না কর। (তায়কেরা, পৃ. ১৯)।

قَدْ جَرَتْ عَادَةُ اللَّهِ أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ الْأَمْوَاتُ إِلَّا الدُّعَاءُ

(কাদ জারাত আদাতুল্লাহি আল্লাহু লা ইয়ানফায়ুল আমওয়াতা ইল্লাদ দু'আ)

অর্থ: আল্লাহ তাঁলার চিরাচরিত রীতি এটিই, দোয়া ছাড়া মৃতদের আর কোন মঙ্গল পেঁচানো যায় না। (তায়কেরা, পৃ. ৪২৮)।

أَفَمَنْ يُجِبُ الْمُضَطَّرَ إِذَا دَعَاهُ قُلْ اللَّهُمَّ ذَرْهُمْ فِي حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ -

(আফামাই ইউজিরুল মুয়তাররা ইয়া দাআহু কুলিল্লাহু সুম্মা যারহুম ফি খাওয়িহিম ইয়ালআ'বুন)

অর্থ: যখন কোন উদ্দিশ্য ব্যক্তি তাঁকে ডাকে তখন আর কে আছে, যে তার ডাক শ্রবণ করে? তুমি বলে দাও, সেই সত্তা একমাত্র আল্লাহ তালাই। লোকেরা সেই কথা না শুনলে তুমি তাদেরকে ছেড়ে দাও যেন তারা অনর্থক কথাবার্তায় লিপ্ত থাকে। (তায়কেরা, পৃ. ৭৬৭)

دست تو دعائے تو ترجمہ زخدا۔

(দাস্তে তু- দোয়ায়ে তু- তারাহহুম যে খোদা।)

অর্থ: তোমার হাত উঠানোর জন্য এবং তোমার দোয়ার ফলে খোদা তালার রহমতের বারিধারা বর্ষিত হয়। (তায়কেরা, পৃ. ৫৬৯)।

تودر منزل ماچوب بار بار آئی۔ خدا ابر حمت بباریدیا نے۔

(তু দার মানযিল মা চু বার বার আই- খোদা আবরে রাহমাত বা বারিদ ইয়ানে)

অর্থ: হে আমার বান্দা। যেহেতু তুমি বারবার আমার দরগাহে ধর্না দাও, এজন্য তুমি নিজে প্রত্যক্ষ কর, তোমার প্রতি রহমতের বারিধারা বর্ষিত হলো কিনা? (তায়কেরা, পৃ. ৬৫৬)।

আল্লাহ তালার রহমত হতে নিরাশ হয়ো না
[হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি ইলহামী দোয়া]

لَا تَأْيِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ۔

(লা তাইয়াসু মির রাওহিল্লাহ।)

অর্থ: খোদা তালার রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। (তায়কেরা, পৃ. ৫২৭)।

وَلَا تَيَسِّرْ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ۔ أَلَا إِنَّ رَوْحَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔

(লা তাইয়াস মির রাওহিল্লাহ। আলা ইন্না রাওহাল্লাহি কারিব)

অর্থ: আল্লাহ তালার রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। জেনে নাও! আল্লাহ তালার রহমত অতি নিকটবর্তী। (তায়কেরা, পৃ. ৫০)।

أَقْنَطْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ الَّذِي يَرْبِّيْكُمْ فِي الْأَرْحَامِ۔

(আতাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহিল্লায় ইউরাবিকুম ফিল আরহাম।)

অর্থ: তুমি কি সেই খোদার রহমত হতে নিরাশ হয়ে পড়েছ, যে খোদা তোমাদের মাতৃগর্ভে প্রতিপালন করে থাকেন। (তায়কেরা, পৃ. ৬৫৭)।

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

(সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আফিম। আল্লাহুক্রম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁ
ওয়া আলি মুহাম্মাদ।)

অর্থ: আল্লাহ তাঁলা নিজ প্রশংসাসহ পবিত্র। মহান আল্লাহ পবিত্র। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ
(সা.) এবং তাঁর বংশধরগণের ওপর আশিস বর্ষণ কর। (তায়কেরা, পৃ. ৩২)।

رَبِّ اذْهَبْ عَنِّيَ الرِّجْسَ وَطَهُورِيَ تَطْهِيرًا -

(রাবিল আয়হিব আম্বির রিজসা ওয়া তাহহিরনি তাতহিরা।)

অর্থ: হে আমার প্রভু! আমার কাছ থেকে অপবিত্রিতাকে দূরে রাখ এবং আমাকে ততটুকু
পবিত্র কর যতটুকু পবিত্র করা যায়। (তায়কেরা, পৃ. ২৯)।

رَبِّ اجْعَلِيْ مُبَارَكًا حَيْثُ مَا كُنْتُ

(রাবিজআলানি মুবারাকান হায়সু মা কুনতু)

অর্থ: হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে এভাবে কল্যাণমণ্ডিত কর যেখানেই আমি বসবাস
করি কল্যাণ যেন আমার সাথী হয়। (তায়কেরা, পৃ. ১৩২)।

ঞশী সাহায্যের দোয়া

رَبِّ انِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ

(রাবিল ইন্নি মাগলুবুন ফানতাসির)

অর্থ: হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমি অসহায়, তুমি (আমার শক্র হতে) প্রতিশোধ গ্রহণ
কর। (তায়কেরা, পৃ. ৭১৪)।

رَبِّ انِّي مَظْلُومٌ فَانْتَصِرْ

(রাবিল ইন্নি মাযলুমুন ফানতাসির)

অর্থ: হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমি অত্যাচারিত, তুমি প্রতিশোধ গ্রহণ কর। (তায়কেরা,
পৃ. ৪৮৩)।

رَبِّ انِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَسَقِّهِمْ تَسْحِيقًا

(রাবিল ইন্নি মাগলুবুন ফানতাসির ফাসাহ্যিকহুম তাসহিকা)

অর্থ: হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমি অসহায়। তুমি (আমার শক্র হতে) প্রতিশোধ গ্রহণ

কর এবং সম্পূর্ণরূপে তাদের চূর্ণ-বিচূর্ণ কর। (তায়কেরা, পৃ. ৬৫৫)।

يَا اللَّهُ فَتْحٌ
৬৮/১৩

(ইয়া আল্লাহু ফাত্খন)

অর্থ: হে আল্লাহ! বিজয় দান কর। (তায়কেরা, পৃ. ৮৪০)।

الْمَسْكِنِ مِنْ رَبِّكَ هُوَ أَوْرَثِي نَصْرٌ وَتَبَيْدَا سَكَنٌ شَامٌ هُوَ

(এলাহি মেরে সিলসিলে কো তারাকি হো অওর তেরি নুসরাত অওর তাইদ উসকে শামিলে হাল হো)

অর্থ: হে খোদা! আমার সিলসিলাকে উন্নতি দান কর। তোমার সাহায্য এবং সহযোগীতা যেন সর্বদা এর সাথে থাকে। (তায়কেরা, পৃ. ৫০৭)।

رَبِّ اجْعَلْنِي غَالِبًا عَلَىٰ عَيْرِي

(রাবিবজআলনি গালিবান আলা গাইরি)

অর্থ: হে আমার প্রভু! আমাকে অন্যদের ওপর বিজয় দান কর। (তায়কেরা, পৃ. ৭১৩)

رَبِّ لَا تَذْرِعْنِي أَلْأَرْضَ مِنَ الْكَافِرِينَ دِيَارًا

(রাবিব লা তায়ার আলাল আরায় মিনাল কাফিরিনা দাইয়ারা।)

অর্থ: হে আমার প্রভু! ভূপৃষ্ঠে বসবাসকারী কাফিরদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তিকে ছেড়ে না। (তায়কেরা, পৃ. ৬৭৬)।

বায়তুত্দোয়ায় (দোয়ার গৃহ) পঠনীয় দোয়া

يَا رَبِّ فَاسْمِعْ دُعَائِيْ وَمَرْقِ اعْدَائِكَ وَاعْدَائِيْ وَانْجِزْ وَعْدَكَ وَانْصُرْ
عَبْدَكَ وَارْنَا اِيَّامَكَ وَشَهْرَ لَنَا حَسَامَكَ وَلَا تَذَرْ مِنَ الْكَافِرِينَ شَرِيرًا -

(ইয়া রাবিব ফাসমা' দু'আয়ি ওয়া মায়থিক আ'দায়িকা ওয়া আ'দায়ি ওয়া আনজিয় ওয়াদাকা ওয়ানসুর আ'বদাকা ওয়া আরিনা আইয়্যমাকা ওয়া শাহ্হির লানা হসামাকা ওয়ালা তায়ার মিনাল কাফিরিনা শারিরা)

অর্থ: হে আমার প্রভু! আমার দোয়া শ্রবণ কর। তোমার শক্তি ও আমার শক্তিকে খন্দ-বিখন্দ কর আর তোমার প্রতিক্রিতি পূর্ণ কর। আর তোমার বান্দাকে সাহায্য কর। আমাকে তোমার (আয়াবের) দিবস প্রত্যক্ষ করাও এবং তোমার তরবারীকে আমাদের জন্য প্রবল করে দেখাও এবং দুষ্ট কাফিরদের কাউকেও ছেড়ে দিও না। (তায়কেরা, পৃ. ৫১২)।

সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য করণার্থে দোয়া

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحِقِّ وَأَنْ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ -

(রাববানাফতাহ্ বাইনানা ওয়া বাইনা কাওমিনা বিল হাকি ওয়া আনতা খায়রুল ফাতিহিন)

অর্থ: হে আমার প্রভু! আমাদের এবং আমাদের জাতির মধ্যে মীমাংসা করে দাও এবং তুমি সব মীমাংসাকারীদের মাঝে উত্তম। (তায়কেরা, পৃ. ৪৭)।

رَبِّ فِرْقَيْنَ صَادِقٍ وَكَاذِبٍ أَنْ تَرِي كُلَّ مُصْلِحٍ وَصَادِقٍ -

(রাববি ফাররিক বায়না সাদিকিন ওয়া কায়বিন আনতা তারা কুল্লা মুসলিমিন ওয়া সাদিকিন)

অর্থ: হে আমার প্রভু! সত্যবাদী এবং মিথ্যবাদীদের মাঝে পার্থক্য করে দেখাও। তুমি প্রত্যেক সংশোধনকারী এবং সত্যবাদীকে ভালুকপে জান। (তায়কেরা, পৃ. ৬১৩)।

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَا وَبِيْهِمْ -

(রাববানাফতাহ্ বাইনানা ওয়া বাইনালুহম)

অর্থ: হে আমার প্রভু! আমাদের এবং তাদের (আমাদের শত্রুদের) মধ্যে মীমাংসা করে দাও। (তায়কেরা, পৃ. ৬৯৬)।

يَا حَفِظْ يَا عَزِيزُ يَا رَفِيقُ

(ইয়া হাফিয়ু ইয়া অযিয়ু ইয়া রাফিকু)

অর্থ: হে নিরাপত্তা দানকারী! হে পরাক্রমশালী! হে বন্দু! (তায়কেরা, পৃ. ৪৯৩)।

শক্তির অনিষ্ট হতে নিরাপদে থাকার দোয়া

رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظِنِي وَانْصُرْنِي وَارْحَمْنِي -

(রাববি কুল্ল শাইয়িন খাদিমুকা রাববি ফাহফায়নি ওয়ারহামনি)

অর্থ: হে আমার প্রভু! সব কিছুই তোমার সেবক। হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে নিরাপদে রাখ, তুমি আমাকে সাহায্য কর এবং তুমি আমার প্রতি কৃপা কর। (তায়কেরা, পৃ. ৪৫৮)।

رَبِّ احْفَظِنِي فِيْنَ الْقَوْمِ يَخْلُدُونِي سُخْرَةً -

(রাবিহ্ফায়নি ফাইল্লাল কাওমা ইয়ান্তাখিয়ুনানি সুখরাতান)

অর্থ: হে আমার প্রভু! আমাকে নিরাপদে রাখ। কেননা, জাতি আমাকে হাসি তামাশার পাত্র বানিয়ে নিয়েছে। (তায়কেরা, পৃ. ৬৭৮)।

رَبِّ لَا تُضِيعْ عَمَرِي وَعُمَرَهَا وَاحْفَظْنِي مِنْ كُلِّ أَفْٰفٍ تُرْسِلُ إِلَيَّ -

(রাবিব লা তুয়ায়ি' উমরি ওয়া উমুরাহা ওয়াহফায়নি মিন কুল্লি আফাতিন তুরসালু ইলায়া)

অর্থ: হে আমার প্রভু! আমার এবং তার বয়সকে নিরর্থক করে দিও না এবং সব ধরনের বিপদ— যা আমার প্রতি প্রেরিত হয় তা হতে নিরাপদে রাখ। (তায়কেরা, পৃ. ৬০৩)।

ক্ষমা এবং দয়ার জন্য দোয়া

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كَنَا خَاطِئِينَ -

(রাবিবানাগ ফিরলানা যুনুবানা ইন্না কুল্লা খাতিইন)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! আমাদের পাপ ক্ষমা করে দাও। কেননা, আমরা অন্যায় করেছি। (তায়কেরা, পৃ. ৬৩৯)।

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ مِنَ السَّمَاءِ

(রাবিবগফির ওয়ারহাম মিনাস সামায়।)

অর্থ: হে আমার প্রভু! আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আকাশ থেকে কৃপা বর্ণ কর। (তায়কেরা, পৃ. ৪৭।)

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا إِنَّا كَنَا خَاطِئِينَ -

(রাবিবানাগফির লানা ইন্না কুল্লা খাতিইন)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। কেননা, আমরা অন্যায় করেছি। (তায়কেরা, পৃ. ২০২)।

رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِيِّ الْمَوْتَىٰ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ مِنَ السَّمَاءِ

(রাবিব আরিনি কাইফা তুহয়িল মাওতা। রাবিবগফির ওয়ারহাম মিনাস সামায়।)

অর্থ: হে আমার প্রভু! তুমি মৃতকে কীভাবে জীবিত কর তা আমাকে দেখাও। হে আমার প্রভু! আকাশ হতে তুমি ক্ষমা এবং কৃপা অবতীর্ণ কর। (তায়কেরা, পৃ. ২৮)।

يَا اللَّهُ رَحْمَمْ كَر-

(ইয়া আল্লাহ! রহম কার)

অর্থ: হে আল্লাহ! দয়া কর। (তায়কেরা, পৃ. ৭০৮)।

رَبِّ ارْحَمْنِيْ إِنَّ فَضْلَكَ وَرَحْمَتَكَ يُنْجِيْ مِنَ الْعَذَابِ

(রাবিরহামনি ইন্না ফাযলাকা ওয়া রাহমাতাকা ইউনজি মিনাল আয়ার)

অর্থ: হে আমার প্রভু! আমার প্রতি দয়া কর। নিচয় তোমার অনুগ্রহ এবং কৃপা আয়ার হতে মুক্তি দেয়। (তায়কেরা, পৃ. ৭৩১)।

ক্ষমা ও মুক্তির জন্য দোয়া

رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَادْفَعْ بِالْأَيَّانَا وَكُرُوبَنَا وَيَجَّ مِنْ كُلِّ هِمْ قُلُوبَنَا وَكَفْلَ خَطَبَنَا وَكُنْ
مَعَنَا حَيْثِمَا كَنَّا يَا مَحْبُوبَنَا وَاسْتَرْعَوْ رَعَاتَنَا وَأَمِنْ رَوْعَاتَنَا تَوْكِلْنَا عَلَيْكَ وَفَوَّضْنَا
الْأَمْرَ إِلَيْكَ أَنْتَ مَوْلَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ - أَمِنْ بِارْبَعِ الْعَلَمِينَ -

(রাবৰানাগফির লানা যুনুবানা ওয়াদফা' বালায়ানা ওয়া কুরবানা ওয়া নাজি মিন কুল্লি
হাস্মি কুলুবিনা ওয়া কাফ্ফিল খুতুবানা ওয়া কুম মা'আনা হাইসুমা কুন্না ইয়া মাহবুবানা-
ওয়াসতুর 'আওরাতিনা ওয়া আমিন রাওআ'তিনা- ইন্না তাওয়াক্কালনা আলাইকা ওয়া
ফাওওয়ায়নাল আমরা ইলাইকা- আনতা মাওলানা ফিদুনিয়া ওয়াল আখিরাতি ওয়া
আনতা আরহামুর রাহিমিন- আমিন ইয়া রাবৰাল আলামিন।

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! আমাদের পাপ ক্ষমা করে দাও। আমাদের বিপদ-আপদ এবং
কষ্ট দূর করে দাও। আর আমাদের হৃদয়কে সব চিন্তা হতে মুক্তি দান কর। আমাদের
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের জন্যে প্রতিভূত হও। আর আমরা যেখানেই থাকি তুমি আমাদের
সাথী হও। হে আমাদের প্রেমাস্পদ! আমাদের নগ্নতাকে ঢেকে দাও এবং আমাদেরকে
আমাদের আশংকাসমূহ হতে নিরাপদে রাখ। তোমার ওপরই আমরা ভরসা করেছি।
দুনিয়া এবং আখিরাতে যাবতীয় বিষয়াবলীকে তোমার প্রতিই আমরা সমর্পিত করছি।
তুমই আমাদের অভিভাবক। তুমই সর্বোত্তম করণাময়। হে সারা জগতের
প্রভু-প্রতিপালক! কবুল কর। (তোহফা গুলড়াবিয়া, পৃ. ৯১)।

নামাযের সিজদার দোয়া

يَا مَنْ هُوَ أَحَبُّ مِنْ كُلِّ مَحْبُوبٍ إِغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَىِ وَادْخِلْنِيِّ فِي عَبَادَكَ الْمُخْلِصِينَ -

(ইয়া মান হয়া আহাৰু মিন কুলি মাহবুবিন ইগফিরলি ওয়াতুব আলাইয়া ওয়া আদখিলনি ফি ইবাদিকাল মুখলিসিন।)

অর্থ: হে! যিনি সব প্রেমাঙ্গদ হতে অধিক ভালোবাসা পাবার যোগ্য! আমাকে ক্ষমা কর। আমার প্রতি কৃপা বর্ষণ কর এবং আমাকে তোমার ন্যায়নিষ্ঠ বান্দাগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নাও।

(ফের্নেয়ারি ১৮৮৮ সনে চৌধুরী রঞ্জন আলী সাহেবের কাছে লিখিত পত্র হতে উক্তৃত)।

পূর্ণ রোগ মুক্তির জন্য দোয়া

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ الشَّافِيِّ بِسْمِ اللَّهِ الْغَفُورِ الرَّحِيمِ -

بِسْمِ اللَّهِ الْبَرِّ الْكَرِيمِ - يَا حَفِظْ يَا عَزِيزْ يَا رَفِيقْ يَا وَلِيْ أَشْفَفْي -

(বিসমিল্লাহিল কাফি। বিসমিল্লাহিশ শাফি। বিসমিল্লাহিল গাফুরুর রাহিম। বিসমিল্লাহিল বারবিল কারিম। ইয়া হাফিয়ু ইয়া আযিয়ু ইয়া রাফিকু ইয়া ওয়ালিয়ু ইশফিনি।)

অর্থ: আমি সেই আল্লাহ তা'লার নামে সাহায্য চাচ্ছি, যিনি যথেষ্ট। আমি সেই আল্লাহর নামে সাহায্য চাচ্ছি, যিনি ক্ষমাশীল এবং কর্মের প্রতিফলনদাতা। আমি সেই আল্লাহর সাহায্য চাচ্ছি, যিনি মহানুভব এবং অনুগ্রহশীল। হে নিরাপত্তা দাতা! হে পরাক্রমশালী! হে বন্দু! হে অভিভাবক! আমাকে আরোগ্য দান কর। (তায়কেরা, পৃ. ৫২৪)।

رَبِّ اشْفِ زَوْجِي هَذِهِ وَاجْعَلْ لَهَا بَرَكَاتٍ فِي السَّمَاءِ وَبَرَكَاتٍ فِي الْأَرْضِ -

(রাবিরশফি যাওজাতি হায়িহি ওয়াজআল লাহা বারাকাতিন ফিস্সামায়ি ওয়া বারাকাতিন ফিল আরামি।)

অর্থ: হে আমার প্রভু! আমার এ স্ত্রীকে আরোগ্য দান কর এবং তাকে ঐশ্বী এবং পার্থিব কল্যাণ দান কর। (তায়কেরা, পৃ. ৫৯০)।

رَبِّ زَدِ فِي عُمُرِي وَفِي عُمُرِ زَوْجِي زِيَادَةً خَارِقَ الْعَادَةِ -

(রাবিব যিদ ফি উমুরি ওয়া ফি উমুরি যাওজি যিয়াদাতান খারিকাল আদাতি।)

অর্থ: হে আমার প্রভু! আমার বয়সে এবং আমার সঙ্গীগির বয়সে অলৌকিকভাবে আধিক্য দান কর। (তায়কেরা, পৃ. ৪১৯)।

رَبِّ اصْحَّ زَوْجَيِ هَذِهِ

(রাবির আসিহ্হা যাওজাতি হায়িহি)

অর্থ: হে আমার প্রভু! আমার স্ত্রীকে ব্যাধি হতে রক্ষা কর এবং আরোগ্য করে দাও।
(তায়কেরা, পৃ. ৩৪০)।

إِشْفَنِيْ مِنْ لَدْنِكَ وَارْحَمْنِيْ

(ইশফিনি মিল্লাদুনকা ওয়ারহামনি।)

অর্থ: (হে আমার আল্লাহ) আমাকে তোমার সন্নিধান থেকে আরোগ্য দান কর এবং আমার
প্রতি করণা কর। (তায়কেরা, পৃ. ৬০৩)।

বিষন্নতা দূর হওয়ার দোয়া

رَبِّ نَجِّنِيْ مِنْ غَمِّ

(রাবির নজিজনি মিন গাম্মি)

অর্থ: হে আমার প্রভু! আমাকে বিষন্নতা হতে মুক্তি দাও। (তায়কেরা, পৃ. ১০৫)।

يَا حَسْنِي يَا فَيْرُومِ بِرْ حَمَّتِكَ اسْتَغْفِيْثُ إِنَّ رَبِّيْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضِ

(ইয়া হাইয়্য ইয়া কাইয়্যমু বিরাহমাতিকা আসতাগিসু ইন্না রাবির রাববুস সামাওয়াতি
ওয়াল আরয)

অর্থ: হে চিরঙ্গীবী ও চিরস্থায়ী (খোদা তালা) আমি তোমার কৃপার সাহায্য প্রার্থনা করি।
নিশ্চয় তুমি আমার প্রভু, যিনি আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীর প্রভু! (তায়কেরা, পৃ. ৩৪৩)।

رَبِّ إِنِّي أَخْتَرُكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

(রাবির ইন্নি আখতারতুকা আলা কুলি শাইয়িন।)

অর্থ: হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমি তোমাকে সব কিছুর মোকাবেলায় বেছে নিয়েছি।
(তায়কেরা, পৃ. ৪০২)।

رَبِّ أَخْرِجْنِيْ مِنَ الدَّارِ

(রাবির আখরিজনি মিনান্নার)

অর্থ: হে আমার প্রভু! আমাকে আঙ্গন হতে বের করে দাও। (তায়কেরা, পৃ. ৭০২)।

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِ الْحَزْنِ وَاتَّانَى مَا لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ -

(আলহামদু লিল্লাহিল্লায়ি আয়হাবা আল্লিল হায়ানা ওয়া আতনি মা লাম ইউতা আহাদুম মিনাল আলামিন)

অর্থ: সব প্রশংসা সেই আল্লাহু তা'লার, যিনি আমার সব বিষণ্নতা দূর করেছেন এবং আমাকে সেই জিনিস দান করেছেন, যা এ জগতে অন্য কাউকেও দান করেনি।
(তায়কেরা, পৃ. ৭১৭)।

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَخْرَجَنِي مِنَ النَّارِ

(আলহামদু লিল্লাহিল্লায়ি আখরাজানি মিনান্নার)।

অর্থ: সব প্রশংসা সেই আল্লাহুর যিনি আমাকে আঙ্গন হতে বের করেছেন।
(তায়কেরা, পৃ. ৭২০)।

ঈমান আনার দোয়া

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يَنْادِي لِلْإِيمَانِ وَدَاعِيًّا إِلَى اللّٰهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا -

(রাববানা ইন্নানা সামি'না মুনাদিই যাই ইউনাদি লিলঈমানি ওয়া দাইয়ান ইলাল্লাহি ওয়া সিরাজাম মুনিরা)।

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমরা একজন আহ্বানকারীর আহ্বান শুনেছি যিনি ঈমানের দিকে আহ্বান করেছেন। তিনি আল্লাহুর দিকে ডাকছেন এবং তিনি এক উজ্জ্বল প্রদীপ। (তায়কেরা, পৃ. ৫৩)।

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يَنْادِي لِلْإِيمَانِ - رَبَّنَا امْنَأْ فَكَتَبْنَا مَعَ الشَّهِيدِينَ -

(রাববানা ইন্নানা সামি'না মুনাদিই যাই ইউনাদি লিল ঈমান-রাববানা আমানা ফাকতুবনা মাআশ শাহিদিন)।

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমরা একজন আহ্বানকারীর আহ্বান শুনেছি যিনি ঈমানের দিকে আহ্বান করেছেন। হে আমাদের প্রভু! আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং তুমি আমাদেরকে সাক্ষীগণের মাঝে গণ্য করে নাও। (তায়কেরা, পৃ. ২৪৬)।

মানুষের সংশোধনের জন্য দোয়া

رَبِّ اصْلِحْ امَّةً مُّهَمَّدٍ

(রাবিব আসলিহ উম্মাতা মুহাম্মদিন)

অর্থ: হে আমার প্রভু! উম্মতে মুহাম্মদীয়ার সংশোধন করে দাও। (তায়কেরা, পৃ. ৪৭)।

رَبِّ اصْلِحْ بَيْنِي وَبَيْنِ إِخْرَتِي

(রাবিব আসলিহ বাইনি ওয়া বাইনা ইখওয়াতি)

অর্থ: হে আমার প্রভু! আমার মধ্যে এবং আমার ভাইদের মাঝে সংশোধন এনে দাও। (তায়কেরা, পৃ. ৭১৩)।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَهْلَكْتُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ فَلَنْ تُعَذِّبْ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا -

(আল্লাহমা ইন আহলাকতা হায়হিল ইসাবাতা ফালান তুবাদা ফিল আরফি আবাদা)

অর্থ: হে আমাদের আল্লাহ! তুম এই জামাতকে যদি ধ্বন্স করে দাও, তবে এ পৃথিবীতে তোমার উপাসনা কখনও হবে না। (তায়কেরা, পৃ. ৪৫৫)।

জ্ঞান বৃদ্ধি হওয়ার দোয়া

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

(রাবিব যিদনি ইলমান)

অর্থ: হে আমার প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও। (তায়কেরা, পৃ. ৩৮৯)।

رَبِّ عِلْمَنِي مَا هُوَ خَيْرٌ عِنْدَكَ

(রাবিব আল্লামনি মাহুয়া খায়রুন ইন্দাকা)

অর্থ: হে আমার প্রভু! আমাকে সেসব বিষয় শিক্ষা দাও, যা তোমার কাছে উত্তম। (তায়কেরা, পৃ. ৬৫৩)।

رَبِّ ارْنِي أَنْوَارَكَ الْكُلِّيَّةَ

(রাবিব আরিনি আনওয়ারাকাল কুল্লিয়াতা)

অর্থ: হে আমার প্রভু! আমাকে সেসব জ্যোতি দেখাও- যা সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। (তায়কেরা, পৃ. ৬১৬)।

رَبِّ أَرْنِي حَقَائِقَ الْأَشْيَايْ

(রাবিব আরিনি হাকায়িকাল আশিয়া)

অর্থ: হে আমার প্রভু! আমাকে প্রত্যেক বস্তুর মূল তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান দাও।

(তায়কেরা, পৃ. ৭২১)।

اَزْل اَبْدِي خَدَا! مُجَّهْ زَنْدِي كَا شَرْبَتْ پَلَّا۔

(আয়ে আয়ল আবদি খোদা! মুবে যিন্দেগী কা শরবত পিলা)

অর্থ: হে আদি এবং অন্তের খোদা! আমাকে জীবন সূধা পান করাও।

(তায়কেরা, পৃ. ৭০৭)।

সন্তান-সন্ততির জন্য দোয়া

رَبِّ هَبْ لِي ذُرِيْةً طِبِيْةً

(রাবিব হাব লি ঘুর্রিয়াতান তাইয়েবাতান)

অর্থ: হে আমার প্রভু! আমাকে পবিত্র সন্তান-সন্ততি দান কর। (তায়কেরা, পৃ. ৭৩৮)।

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرَدًّا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔

(রাবিব লা তায়ারিনি ফারদাওঁ ওয়া আনতা খায়রুল ওয়ারিসিন)

অর্থ: হে আমার প্রভু! আমাকে একাকী ছেড়ে দিও না এবং তুমি উত্তরাধীকারীগণের মধ্যে উত্তম। (তায়কেরা, পৃ. ৪৭)।

নির্দর্শন দেখার দোয়া

رَبِّ اَرِنِي اِيَّاهٍ مِّنَ السَّمَاءِ

(রাবিব আরিনি আয়াতাম মিনাস সামায়ি)

অর্থ: হে আমার প্রভু! আমাকে আকাশ হতে একটি নির্দর্শন দেখাও।

(তায়কেরা, পৃ. ৫৯৪)।

رَبِّ اَرِنِي زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ

(রাবিব আরিনি যালযালাতা সা-আতি)

অর্থ: হে আমার প্রভু! আমাকে ভূমিকম্প দেখাও, যা প্রচণ্ডতায় কিয়ামতের নমুনাস্বরূপ হয়। (তায়কেরা, পৃ. ৬০০)।

খারাপ কথা হতে রক্ষা পাওয়ার দোয়া

رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيْيَ مَمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ -

(রাবিস সিজনু আহাবু ইলায়্যা মিমা ইয়াদউনানি ইলায়াহি)

অর্থ: হে আমার প্রভু! কারাগার আমার কাছে সেই কথার চেয়েও শ্রিয় যার দিকে লোক আমাকে আহ্বান করে। (তায়কেরা, পৃ. ১০৫)।

প্রতিদান চেয়ে দোয়া

رَبِّ احْرِزْ جَزَاءً أَوْفِي

(রাবির আজয়িহি জায়া-আন আওফা)

অর্থ: হে আমার প্রভু! তাকে পরিপূর্ণভাবে প্রতিদান দাও। (তায়কেরা, পৃ. ৫১৫)।

আগুনের ওপর বিজয়ী হবার দোয়া

رَبِّ سِلْطَنِي عَلَى النَّارِ

(রাবির সাল্লিতনি আলান নার)

অর্থ: হে আমার প্রভু! আগুনের ওপর আমাকে বিজয়ী করে দাও। (তায়কেরা, পৃ. ৫৯১)।

পুণ্যাত্মাগণের সাথে সাক্ষাৎ করার দোয়া

رَبِّ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقِيقِي بِالصِّلَحِينَ -

(রাবির তাওয়াফফানি মুসলিমাওঁ ওয়ালহিকনি বিস সালিহিন)

অর্থ: হে আমার প্রভু! ইসলামের ওপর আমাকে মৃত্যু দান কর এবং পুণ্যাত্মাগণের অন্তর্ভুক্ত করে দাও। (তায়কেরা, পৃ. ৬৬০)।

অসমান হতে সুরক্ষার দোয়া

رَبِّ لَا تُبْقِ لِي مِنَ الْمُخْرِبَاتِ ذِكْرًا -

(রাবির লা তুরিনি মিনাল মুখ্যিয়াতি যিকরান)

অর্থ: হে আমার প্রভু! অসমান হওয়ার কোন কথাই আমার জন্য বাকী রেখো না।
(তায়কেরা, পৃ. ৬৬৬)।

ভূমিকম্প এবং মৃত্যু না দেখার দোয়া

رَبِّ لَا تُرِنِي زَلْزَلَةً السَّاعَةِ - رَبِّ لَا تُرِنِي مَوْتَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ

(রাবির লা তুরিনি যালযালাতাস্ সাআতি)। রাবির লা তুরিনি মাওতা আহদিম মিনহম)

অর্থ: হে আমার প্রভু! আমাকে কিয়ামতের ভূমিকম্প দেখিও না। হে আমার প্রভু! তাদের
মধ্য হতে কারও মৃত্যু আমাকে দেখিও না। (তায়কেরা, পৃ. ৫৯৩)।

বিবিধ দোয়া

إِلِيٌّ إِلِيٌّ لَمَّا سَبَقْتَنِي

(ইলি ইলি লামা সাবাকতানি)

অর্থ: হে আমার আল্লাহ! হে আমার আল্লাহ! তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করলে? (হিব্র
ভাষায় দোয়া) (তায়কেরা, পৃ. ১০৫)।

إِلِيٌّ إِلِيٌّ لَمَّا سَبَقْتَنِي إِلِيٌّ أَوْسِ

(ইলি ইলি লামা সাবাকতানি ইলি আওস)

অর্থ: হে আমার আল্লাহ! হে আমার আল্লাহ! তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করলে। হে
আমার আল্লাহ! আমাকে পুরস্কৃত কর। (তায়কেরা, পৃ. ৯৪)।

رَبِّ أَخْرَ وَقْتَ هَذَا

(রাবির আখ্খির ওয়াকতা হায়া)

অর্থ: হে আমার আল্লাহ! (যে ভূমিকম্প সামনে দেখা যাচ্ছে তা) কিছু সময়ের জন্য পিছনে
সরিয়ে দাও। (তায়কেরা, পৃ. ৫৯৯)।

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي هَذِهِ الرُّوْبَا

(আল্লাহমা বারিক লি ফি হায়িহির রুবায়া)

অর্থ: হে আল্লাহ! এ স্থানকে আমার জন্য কল্যাণমণ্ডিত করে দাও। (তায়কেরা, পৃ. ৮৩৫)।

يَا اللَّهُ أَبْشِرْ كِيْ بْلَسِيْ بْجِيْ تَالْ دَے.

(ইয়া আল্লাহ! আব শেহের কি বালায়েঁ ভি টাল দে)

অর্থ: হে আল্লাহ! এখন শহরের দূরাবস্থাও দূরীভূত করে দাও। (তায়কেরা, পৃ. ৭০২)।

বৌনি মালুমাত

(ধর্মীয় জ্ঞান)

ইসলামের মৌলিক ধারণা ও প্রাথমিক কাল

- ★ আল্লাহ তাল্লা
- ★ ইসলাম
- ★ কুরআন মজীদ
- ★ বিশ্ব নবী হ্যরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)
- ★ এক নজরে মুস্তফা (সা.) চরিত
- ★ হাদীস
- ★ খোলাফায়ে রাশেদীন
- ★ আসহাবে রসূল (সা.) (রসূল (সা.)-এর সাহাবীগণ)
- ★ বুয়র্গানে ইসলাম (ইসলামের প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গ)
- ★ ইসলামের ইতিহাস
- ★ বিবিধ (১)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তা'লা

প্র. আল্লাহ তা'লার মৌলিক নাম কী? এর অর্থ কী?

উ. আল্লাহ তা'লার মৌলিক নাম ‘আল্লাহ’। এর অর্থ এর মাঝে সব সৌন্দর্য একীভূত হয়েছে এবং এ নাম যাবতীয় দোষমুক্ত। আল্লাহ তা'লার এই মৌলিক নাম কেবলমাত্র তাঁর জন্যই প্রযোজ্য।

প্র. আল্লাহ তা'লার প্রধান চারটি গুণবাচক নাম কী কী?

উ. রাব (প্রভু-প্রতিপালক), রাহমান (পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী), রাহীম (বার-বার দয়াকারী), মালিক (সর্বাধিপতি)।

প্র. কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'লার কতটি গুণবাচক নাম বর্ণিত হয়েছে? নামগুলো কী কী?

উ. আল্লাহ তা'লা যেমন অনন্ত-অসীম, তাঁর নাম এবং গুণবলীও অনন্ত-অসীম। কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'লার ১০৮ টি গুণবাচক নাম বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল- আল্ কুদুস (অতি পবিত্র), আস্ সালাম (পরম শান্তিময়), আল্ মু'মিন (পূর্ণ নিরাপত্তাদাতা), আল্ জাকুর (প্রবল প্রতিবিধায়ক), আল্ মুতাকাবির (অতিব গরীয়ান/উচ্চমর্যাদাবান), আল্ খালিক (একমাত্র সৃষ্টিকর্তা), আল্ বারী (আদি সুনিপুণ স্মষ্টি), আর রায়ক (সর্বোত্তম রিযিকদাতা), আল্ আলীম (সর্বজ্ঞ), আর রাফী (মর্যাদায় উন্নতি দানকারী), আস্ সামী (সর্বশ্রেষ্ঠ), আল্ বাসীর (সর্বদৰ্ষ্য), আল্ হাকীম (পরম প্রজ্ঞাময় বিচারক), আল্ আদীল (পূর্ণ ন্যায়বিচারক), আল্ লতীফ (সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম), আল্ খারীর (সর্ববিদিত), আল হাইয়ুন (চিরঙ্গীব-জীবনদাতা), আল্ কাইয়ুম (চিরস্থায়ী-স্থিতিদাতা), আল্ আলিয়ুন (অতি উচ্চ), আল্ আ'য়ীম (অতি মহান) ইত্যাদি।

প্র. আল্লাহ তা'লার অঙ্গিতের একটি প্রমাণ কুরআন মজীদ হতে পেশ করুন।

উ. আল্লাহ তা'লার রসূলগণ সবসময় পরিণামে সফলতা লাভ করবেন। যেমন : কুরআন মজীদে বলা হয়েছে-

كَسْبُ اللَّهِ لَا يَعْلَمُنَّ أَنَّا وَرُسُلُنَا

(কাতাবাল্লাহ লাআগ্লিবাল্লাহ আনা ওয়া রসূলী)

অর্থ: আল্লাহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন (আল্লাহ এটি সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন) “নিশ্চয় আমি এবং আমার রসূলগণই বিজয়ী হব।” (সূরা মুজাদিলা : ২২)।

প্র. আল্লাহ তা'লার কী কোন সদৃশ আছে?

উ. না, আল্লাহ তা'লার কোন সদৃশ নেই। কেননা তিনি বলেছেন-

لَيْسَ كَمِثْلُهُ شَيْءٌ

(লাইসা কামিসলিহি শাইয়্যন)

অর্থ: তাঁর মত আর কেউই নেই। (সূরা আশৃ শুরা : ১২)।

প্র. আল্লাহ তাঁলা কর্তৃক মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী?

উ. আল্লাহর ইবাদত করা। আল্লাহ তাঁলা এ সম্পর্কে বলেন-

وَمَا حَقُّتُ الْجِرَّّ وَالْإِنْسَنُ إِلَّا لِيَعْدُونَ^{৩৭}

(ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়া'বুদুনি)

অর্থ: আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যে। (সূরা আয়ারিয়াত : ৫৭)।

ইসলাম

প্র. ইসলাম মানে কী ?

উ. পরিপূর্ণ আনুগত্য এবং পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ।

প্র. ইসলাম কী ?

উ. খোদার জন্য ফানা বা বিলীন হয়ে যাওয়া, খোদার ইচ্ছায় নিজের ইচ্ছাকে বিলীন করে দেয়ার নামই ইসলাম।

প্র. ইসলামের স্তুতি কয়টি ও কী কী?

উ. পাঁচটি। যথা: ১) কলেমা, ২) নামায, ৩) রোয়া, ৪) হজ্জ, ৫) যাকাত

প্র. ঈমানের বিষয় কয়টি ও কী কী?

উ. ছয়টি। আল্লাহর ওপর, তাঁর ফিরিশতাগণের ওপর, তাঁর কিতাবসমূহের ওপর, তাঁর নবীগণের ওপর ও পরকালের ওপর ঈমান আনা এবং ভাল ও মন্দের নিয়তির ওপর পূর্ণ আঙ্গু জ্ঞাপন করা।

প্র. আল্লাহ তাঁলার একমাত্র মনোনীত ধর্ম কোনটি?

উ. ইসলাম। এ সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা হচ্ছে,

إِنَّ الدِّيْنَ بِعِنْدِ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

(ইন্নাদ দ্বিনা ইন্দাল্লাহিল ইসলাম)

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ তাঁলার নিকট ইসলামই মনোনীত ধর্ম। (সূরা আলে ইমরান : ২০)।

প্র. ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে ইসলামের মহান শিক্ষা কী?

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

(লা ইকরাহ ফিদ্বীন)

অর্থ: ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই। (সূরা বাকারা : ২৫৭)।

প্র. যে তোমাকে ‘আস্সালামু আলাইকুম’ বলে তার ব্যাপারে ইসলাম আমাদের কী শিক্ষা দেয়?

উ. **وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَفْقَى إِلَيْكُمُ اللَّهُ لَسْتَ مُؤْمِنًا**

(ওয়াল্লা তাকুলু লিমান আলকা ইলাইকুমুস সালামা লাসতা মু'মিনান)

অর্থ: যে তোমাদের সালাম দেয় তাকে ‘তুমি মুমিন নও’ একথা বলো না। (সূরা নিসা : ৯৫)।

প্র. মুসলমানদের প্রথম কিবলা কোনটি ছিল?

উ. বায়তুল মাকদাস (পবিত্র ঘর), যেরহ্যালেম, ফিলিস্তিন।

প্র. কয়েকজন প্রধান ফিরিশ্তার নাম লিখুন।

উ. জীবাংল, মীকাংল, ইশ্রাফীল এবং আযরাঙ্গল।

কুরআন মজীদ

প্র. কুরআন মজীদে কতটি সূরা, কতটি আয়াত, কতটি রূকু, কতটি শব্দ এবং কতটি মঞ্জিল আছে?

উ. ১১৪টি সূরা, ৬৩৪৮টি আয়াত, ৫৫৮টি রূকু, ৮৬৪৩০টি শব্দ এবং ৭টি মঞ্জিল আছে। (ধীনি মাল্যমাত, ম.খো.আ. পাকিস্তান, পৃ. ০৪)।

নোট: আয়াত এবং শব্দের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। কারণ কেউ-কেউ বিসমিল্লাহকে আয়াতের সাথে গণনা করে থাকেন আবার অন্য অনেকে আছেন যারা আয়াত গণনা করেন না। সর্বসম্মত মত হল, পবিত্র কুরআন অবিকল তা-ই রয়েছে যা আঁ-হ্যরত (সা.)-এর ওপর নাযিল হয়েছিল। আহমদীয়া মুসলিম জামাত সর্বান্তকরণে বিসমিল্লাহকে পবিত্র কুরআনের আয়াত হিসেবে গণনা করে থাকে। কেননা বিসমিল্লাহকে আয়াত না ধরলে সূরা ফাতিহায় ৭টি আয়াত পাওয়া যায় না। অতএব, বিসমিল্লাহসহ পবিত্র কুরআনের আয়াত সংখ্যা হল ৬৩৪৮টি।

প্র. কুরআন করীম একত্র ও বিন্যস্ত করা সম্পদে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

উ. নবী আকরাম (সা.) স্বয়ং আল্লাহ তা'লার ওহীর মাধ্যমে কুরআন করীম একত্র ও সুবিন্যস্ত করেছেন এবং এটিকে লিখে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। পরবর্তীতে হ্যরত আবু বকর (রা.) তাঁর খিলাফতের সময়ে হ্যরত যায়েদ বিন হারিস (রা.)-এর মাধ্যমে

(যিনি একজন কাতেবে ওহী ছিলেন) সেই লিখিত কুরআন করীমকে বাঁধিয়ে একটি গ্রন্থের আকারে হ্যরত হাফসা বিনতে উমর (রা.)-এর কাছে সংরক্ষণ করেন। শেষে হ্যরত উসমান (রা.) তাঁর খিলাফতের সময় উক্ত কুরআনের কতগুলো কপি তৈরি করিয়ে এক একটি কপি বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্রে প্রেরণ করেন। আজ আমাদের মাঝে ত্বরিত সেই কুরআনই বিদ্যমান আছে।

(দিবাচাহ তাফসীরুল কুরআন, লেখক : হ্যরত মুসলেহ মাওউদ (রা.), পৃ. ২৫৭)

প্র. পবিত্র কুরআন সর্বপ্রথম কখন, কোথায় অবতীর্ণ হয়?

উ. পবিত্র কুরআন ৬১০ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক হিজরি পূর্ব ১২ সনের রমযান মাসের শেষ দশ দিনের সোমবার লাইলাতুল কদরের রাত্রিতে হেরা পর্বতের গুহায় অবতীর্ণ হয়।

প্র. ওহী হ্বার পর হ্যরত খাদিজা (রা.) হ্যরত মুহাম্মদ (সা.)-কে কার কাছে নিয়ে যান?

উ. হ্যরত খাদিজা (রা.)-এর চাচাতো ভাই খ্রিস্টান পভিত হ্যরত ওরাকা বিন নাওফালের কাছে।

প্র. প্রথম ওহী অবতীর্ণ হ্বার পর কত দিন পর্যন্ত ওহী নাযিল বন্ধ ছিল? এ সময়কে কী নামে ডাকা হয়?

উ. ৪০ দিনের জন্য। এ সময়কে ‘ফাতরাত’ (দুই ওহীর মাঝখানের বিরতি)-এর সময় বলা হয়।

প্র. ফাতরাতের সময় অতিক্রান্ত হ্বার পর কোন সূরা সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়?

উ. ‘ইয়া আইয়ুহাল মুদ্দাস্সির’ হে পোষাকাবৃত ব্যক্তি। (সূরা আল মুদ্দাস্সির, ৭৪ নং সূরা)।

প্র. কুরআন করীমের হিফায়তের ব্যাপারে আল্লাহ তা’লা কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন?
উ.

إِنَّا نَحْنُ نَرْزَقُ الْدِّيْكَرَ وَإِنَّا لَهُ لَحِيقُطُونْ

(ইন্না নাহনু নায়ালনায় যিক্রা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিয়ুন)

অর্থ : নিশ্চয় আমরাই এ যিকর (কুরআন) নাযিল করেছি এবং নিশ্চয় আমরা এর হেফায়তকারী। (সূরা হিজর: ১০)।

প্র. কুরআন করীমের প্রথম দু’টি সূরা এবং শেষ দু’টি সূরার নাম কী?

উ. প্রথম দু’টি সূরার নাম হলো সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারা। শেষ দু’টি হল সূরা ফালাক ও সূরা নাস। শেষ দু’টি সূরাকে একত্রে ‘মুআওভেয়াতান’ (নিরাপত্তা দানকারী যুগল) বলা হয়। কেননা এ উভয় সূরাই ‘কুল আউবু’ দিয়ে শুরু হয়েছে। এই দুই সূরায় আখেরী যুগের ফেতনার হাত থেকে রক্ষা পাবার দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

প্র. কুরআন করীমের সর্বাপেক্ষা বড় এবং সর্বাপেক্ষা ছোট সূরা কী?

উ. সবচেয়ে বড় সূরা হল সূরা বাকারা এবং সবচেয়ে ছোট সূরা হল সূরা কাউসার।

প্র. বর্তমান বিন্যাস হিসেবে কুরআন করীমের সর্বপ্রথম আদেশ কী?

উ.

يَا يَهُوا النَّاسُ أَعْبُدُ وَأَرْبِكُمُ الَّذِي حَلَقُكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ

(ইয়াআয়হান্নাসু'বুদু রাক্বাকুমুল্লায়ী খালাক্বাকুম ওয়াল্লায়ীনা মিন ক্বাবলিকুম লা'আল্লাকুম তাভাকুন)

অর্থ : হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের সেই প্রভু-প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার। (সূরা বাকারাঃ ২২)

প্র. সূরা ফাতিহায় ক�ঢ়াটি দলের কথা উল্লেখ রয়েছে?

উ. তিনটি দলের কথা। যথা: ১) আনামতা আলাইহিম, (পুরস্কারপ্রাপ্ত), ২) মাগযুব (অভিশঙ্গ), ৩) যাল্লিন (পথভ্রষ্ট)।

প্র. সূরা বাকারার প্রথম ১৭ আয়াতে কত প্রকারের লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে?

উ. তিন প্রকার লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা: মুত্তাকী (খোদাভীরু), কাফির (অস্বীকারকারী) এবং মুনাফিক (কপট)।

প্র. কুরআন করীম কতদিনে নাখিল হয়েছে?

উ. প্রায় ২৩ বছরে।

প্র. কুরআন করীমে যেসব শরীয়তধারী নবীর উল্লেখ আছে তাঁদের নাম লিখুন।

উ. হ্যরত আদম (আ.), হ্যরত নূহ (আ.), হ্যরত মূসা (আ.) এবং হ্যরত মুহাম্মদ (সা.)।

প্র. নবীদের নামে নামকরণ হয়েছে এমন সব সুরার নাম লিখুন?

উ. সূরা ইউনুস, সূরা ইউসুফ, সূরা হৃদ, সূরা ইবরাহীম, সূরা মুহাম্মদ, সূরা নূহ, সূরা লুকমান।

প্র. কুরআন করীমে যেসব নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের নাম লিখুন?

উ. হ্যরত আদম (আ.), হ্যরত নূহ (আ.), হ্যরত ইবরাহীম (আ.), হ্যরত লূত (আ.), হ্যরত ইসমাঈল (আ.), হ্যরত ইসহাক (আ.), হ্যরত ইয়াকুব (আ.), হ্যরত ইউসুফ (আ.), হ্যরত হৃদ (আ.), হ্যরত সালেহ (আ.), হ্যরত শুয়াইব (আ.), হ্যরত মূসা (আ.), হ্যরত হারুন (আ.), হ্যরত দাউদ (আ.), হ্যরত সুলায়মান (আ.), হ্যরত ইলিয়াস (আ.), হ্যরত ইউনুস (আ.), হ্যরত যুলকিফল (আ.), হ্যরত আল-ইয়াসা (আ.), হ্যরত ইন্দ্ৰীস (আ.), হ্যরত আইটব (আ.), হ্যরত যাকারিয়া (আ.), হ্যরত টেসা (আ.), হ্যরত লুকমান (আ.), হ্যরত উয়ায়ির (আ.), হ্যরত যুলকারনাইন (আ.), হ্যরত মুহাম্মদ (সা.) এবং শেষ যুগে আগমনকারী উম্মতী নবী হ্যরত আহমদ (আ.)-

সহ সর্বমোট ২৮ জন।

প্র. কুরআন করীমে কোন সাহাবীর নাম উল্লেখ রয়েছে? সুরার নাম বলুন?

উ. যায়েদ বিন হারিস (সা.)-এর নাম। সূরা আহ্যাব : ৩৮ নং আয়াতে তাঁর নাম

এসেছে।

- প্র. কুরআন করীমের কোন সূরার প্রথমে ‘বিসমিল্লাহ’ নেই এবং কেন?
- উ. সূরা ‘তওবা’-র প্রথমে বিসমিল্লাহ নেই। কেননা এটি সূরা আনফালের অংশ-বিশেষ।
- প্র. কুরআন করীমের কোন সূরায় বিসমিল্লাহ দু’বার আছে?
- উ. সূরা নামলে (প্রথমে একবার এবং ৩১ নং আয়াতে আরেকবার)।
- প্র. কুরআন করীমে মহানবী (সা.)-এর নাম (মুহাম্মদ) কতবার উল্লেখ করা হয়েছে? উদাহরণ দিন।
- উ. চারবার। এগুলো হল- ১) সূরা আলে ইমরান : ১৪৫, ২) সূরা মুহাম্মদ : ০৩, ৩) সূরা আহ্যাব : ৪১, ৪) সূরা ফাতহ : ৩০

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالْدِيْنِ مَعَهُ أَشْدَادُ الْكُفَّارِ رَحْمَةٌ بَيْنَهُمْ

(মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ওয়াল্লাযিনা মা’আহু আশিদ্দাউ আলাল কুফ্ফারি রংহামাউ বায়নাহুম)

অর্থ: মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল। আর যারা তাঁর সাথে আছে তারা অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর (এবং) পরম্পরের প্রতি কোমল। (সূরা ফাতহ: ৩০)

প্র. নাযিল হবার দিক হতে পবিত্র কুরআনের সর্বশেষ সূরার নাম কী?

উ. সূরা আন নাসর। (১১০ নং সূরা)।

প্র. কুরআন মজীদে কোথায় মহানবী (সা.)-এর ‘খাতামান্নাবীঈন’ এবং ‘রাহমাতুল্লিল আলামীন’ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে?

উ. খাতামান্নাবীঈন: সূরা আহ্যাবের ৪১ নং আয়াত-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلِكُنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّنَ

(মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম্ মির্ রিজালিকুম ওয়ালাকির্ রাসূলাল্লাহি ওয়া খাতামান্নাবীঈন)

অর্থ: হযরত মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের পুরুষদের (বয়ঃপ্রাণ) কারো পিতা নন বরং তিনি আল্লাহর রসূল এবং খাতামান্নাবীঈন (নবীদের মোহর)।

রাহমাতুল্লিল আলামীন: সূরা আমিয়ার ১০৮ নং আয়াত-

وَمَا آرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

(ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতুল্লিল আলামীন)

অর্থ: আমরা তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য কেবল রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি।

প্র. ‘লায়লাতুল কদর’ বলতে কী বুঝেন?

উ. ‘লায়লাতুল কদর’ হলো সেই পবিত্র রাত যে রাতে কুরআন করীম নাযিল হওয়া আরম্ভ হয় এবং যার মাহাত্ম্য বর্ণনায় আল্লাহ তা’লা বলেছেন-

لِيَلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

(লায়লাতুল কাদ্রি খায়রুল মিন আলফি শাহরিন)

অর্থ: লাইলাতুল কদর হাজার মাস হতেও উত্তম।

মহানবী (সা.) রম্যানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতগুলোর মাঝে একে অন্বেষণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ রাতে খোদা তাঁলা তাঁর বান্দার অনেক কাছে চলে আসেন এবং তাদের দোয়াসমৃহকে কবুলিয়তের র্যাদা দান করেন। হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, “যে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে আল্লাহ তাঁলার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের আগমন হয় সে যুগকেও লায়লাতুল কদর বলা হয়।”

প্র. কুরআন করীমে যেসব ফলের কথা বর্ণিত আছে সেগুলোর নাম লিখুন।

উ. রুম্মান (ডালিম), ইনাব (আঙ্গুর), তীন (ডুমুর), তালহুন (কলা), যয়তুন (জলপাই), নাখলুন (খেজুর)।

প্র. কুরআন করীমে উল্লেখিত কিছু পঞ্চ নাম লিখুন।

উ. জামালুন (উট), গানামুন (বকরী), জাননুন (দুষ্প/ভেড়া), বাকারাতুন (গাভী), কালবুন (কুকুর), খিনজির (শূকর), খাইলুন (ঘোড়া), বিগালুন (খচর), হিমারুন (গাধা), ফিলুন (হাতি), কাসওয়ারাতুন (বাঘ), যে'বুন (নেকড়ে), ইজলুন (বাচ্চুর), নাজাতুন (মেষ/ভেড়ী), কিরাদাতুন (বানর)।

প্র. কুরআন করীমে বর্ণিত কতিপয় জাতির নাম লিখুন।

উ. হ্যরত নূহ (আ.)-এর জাতি [আর্মেনিয়ায় বসবাস করত], আদ জাতি [হ্যরত হুদ (আ.)-এর জাতি], সামুদ জাতি [হ্যরত সালেহ (আ.)-এর জাতি], আসহাবিল বাস, [সামুদ জাতির একটি শাখা], আসহাবিল আইকাহ [হ্যরত শুয়াইব (আ.)-এর জাতি], হ্যরত লৃত (আ.)-এর জাতি, ফেরাউনের জাতি [হ্যরত মুসা (আ.) এবং বনী ইসরাইলের ওপর যারা অত্যাচার করেছিল], আসহাবিল ফীল [ইয়েমেনের লোক যারা হংস্তী বাহিনী নিয়ে কাঁবা গৃহ ধ্বংস করতে এসেছিল]।

প্র. পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে সূরা ফাতেহার কী কী নাম পাওয়া যায়?

উ. সূরা ফাতেহার অনেক নাম রয়েছে। তবে অধিক প্রমাণসিদ্ধ হলো- ফাতেহাতুল কিতাব (ঐশী কিতাবের উদ্বোধনী সূরা), আস্ম সালাত (নামায), আল হাম্দ (প্রশংসা), উম্মুল কুরআন (কুরআন-জননী), আল কুরআনুল অয়ীম (মহান কুরআন), উম্মুল কিতাব (কিতাব-জননী), আস্ম সাব'উল মাসানী (সাতটি বার-বার আবৃত্ত আয়াত), আশ্ শিফা (আরোগ্য), আর রুকাইয়া (রক্ষাকৰ্বচ), আল কানয (ধনভান্ডার)।

প্র. পবিত্র কুরআনে কোন দু'টি সূরাকে ‘আয যাহরাওয়ান’ (দু'টি উজ্জল ফুল) বলা হয়?

উ. সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান-কে।

প্র. রসূল (সা.) কোন সূরাকে কুরআনের চূড়া বা শীর্ষ বলে আখ্যায়িত করেছেন?

উ. সূরা বাকারার-কে ।

প্র. পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে বড় আয়াত কোনটি?

উ. সূরা বাকারার ২৮৩ নং আয়াত ।

প্র. সূরা বাকারার সারাংশ কোন আয়াতকে বলা হয়?

উ. ১৩০ নং আয়াতকে । কেননা এ আয়াতে বর্ণিত বিষয়গুলো ধারাবহিকভাবে এ দীর্ঘ সূরাতে পর্যালোচনা করা হয়েছে । অর্থাৎ, প্রথমে নির্দেশনাবলী, এরপর শরীয়ত, তারপর শরীয়তের তৎপর্য এবং অবশেষে জাতীয় উন্নতির পছন্দ বর্ণনা করা হয়েছে ।

প্র. হ্যরত ইবরাহীম (আ.) ও হ্যরত ইসমাঈল (আ.) তাদের বংশে একজন মহান নবী তথা মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের জন্য যে দোয়া করেছিলেন তা কোথায় বর্ণিত আছে?

উ. সূরা বাকারার ১৩০ নং আয়াতে ।

প্র. সূরা আলে ইমরানের আর কী কি নাম রয়েছে?

উ. আয় যাহরা (একটি উজ্জল ফুল), আল আমান (শান্তি), আল কানয (সম্পদ), আল মুয়িনাহ (সাহায্যকারী), আল মুজাদলাহ (পরম্পর বিতর্ক), আল ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা), তৈয়বা (পবিত্র) ।

প্র. পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আশহুরুল হারাম (সমানিত মাস) কয়টি ও কী কী?

উ. সম্মানিত মাস হলো চারটি । এগুলো হলো- মুহররম, রজব, যিলকদ, যিলহজ্জ । এসব মাসে যুদ্ধবিঘ্ন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ।

প্র. পবিত্র কুরআনে বায়তুল আতিক (প্রাচীন গৃহ) বলতে কোন গৃহকে বুঝানো হয়েছে?

উ. কাবা শরীফ-কে ।

প্র. মক্কা উপত্যকার পুরাতন নাম কী? এর উল্লেখ কোথায় পাওয়া যায়?

উ. মক্কার পুরাতন নাম হলো ‘বাক্কা’ । সূরা আলে ইমরানের ১৯৭ নং আয়াতে এর উল্লেখ আছে ।

প্র. নাযিল হওয়ার দিক হতে কুরআন করীমের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ আয়াত দু'টি কী কী?

উ. কুরআন করীমের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত :

رَقْرَأٌ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ^۱

(ইকুরা বিস্মি রাবিকাল্লায়ী খালাফ)

অর্থ: পাঠ কর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন । (সূরা আলাক্স : ২)

কুরআন করীমের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত :

সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত সম্মধে বিভিন্ন বর্ণনা আছে; অধিকাংশের মতানুসারে নিম্নের আয়াতকে সর্বশেষ আয়াত বলা হয়-

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيَنًا^۲

(আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আত্মামতু আ'লায়কুম নিম্মাতি ওয়া
রায়ীতু লাকুমুল ইসলামা দীনা)

অর্থ: আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের
ওপর আমার নিয়ামতকে (অনুগ্রহকে) সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য
ধর্মরূপে মনোনীত করলাম। (সূরা মায়েদা: ৮)।

একটি বিখ্যাত বর্ণনায় নিম্নের আয়াতকে সর্বশেষ আয়াত বলা হয়েছে :

وَأَنْتُمْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيْ إِلَيْهِ

(ওয়াত্তাকু ইয়াওমান তুরজা'উনা ফীহি ইলাল্লাহ)

অর্থ: এবং তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে
নিয়ে যাওয়া হবে। (সূরা বাকারা : ২৮২)।

প্র. আখেরী যুগে নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার কথা কুরআন করিমের
কোথায় বর্ণিত আছে?

উ. সূরা নূরের ৫৬ নং আয়াতে।

প্র. কোন সূরা নাযিল হবার পর হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছিলেন, ‘এ সূরা আমার
অকালবার্ধক্য এনে দিয়েছে?’

উ. সূরা হৃদ।

প্র. পবিত্র কুরআনে রসূল (সা.)-কে বার-বার কী নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে?

উ. আল্লাহর নূর বা জ্যোতি। যেমন: সূরা নিসা: ১৭৫, সূরা মায়েদা: ১৭, সূরা নূর: ৩৬,
সূরা তাগারুন: ০৯, সূরা সাফুফ: ০৯।

প্র. কোন সূরা অবতীর্ণ হবার সময় ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) ফেরেশতা প্রহরী হিসেবে
কাজ করেছিল বলে উল্লেখ রয়েছে?

উ. সূরা কাহাফ।

প্র. রসূল (সা.) দাজালের ফেতনা থেকে রক্ষা পাবার জন্য কী পড়তে বলেছেন?

উ. সূরা কাহাফের প্রথম ১০ আয়াত এবং শেষ ১০ আয়াত সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করতে
বলেছেন।

প্র. খতমে নবুওয়তের আশিস ও কল্যাণ, ওফাতে মসীহ (আ.) এবং সাদাকাতে মসীহ
মাওউদ (আ.)-এর স্বপক্ষে কুরআন মজীদ হতে একটি করে উদ্ধৃতি দিন।

উ. ক) খতমে নবুওয়াতের আশিস ও কল্যাণ :

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالصَّدِيقِينَ
وَالشَّهِيدَاتِ وَالصَّلِيبِينَ

(ওয়ামাইয়ুতি'ইল্লাহা ওয়ারাসূলা ফাউলাইকা মাল্যায়ীনা আন্তাল্যাল্লাহ আল্যাহিম
মিনান্ন নাবীয়ীনা ওয়াস্সিরীকীনা ওয়াশু শুহাদায় ওয়াস্সালিহীন)

অর্থ: আর যে (সব ব্যক্তি) আল্লাহ্ ও এ রসূলের আনুগত্য করবে এরাই তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যাদের আল্লাহ্ পুরক্ষার দান করেছেন (এরা) নবী, সিদ্ধীক, শহীদ ও সালেহদের (অন্তর্ভুক্ত হবে)। (সূরা নিসা : ৭০)।

খ) ওফাতে মসীহ (আ.) :

কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্ তাঁলা হ্যরত ঈসা (আ.)-কে তাঁর অনুসারীদের পদস্থলন সম্বন্ধে জিজেস করবেন তখন হ্যরত ঈসা (আ.) নিজে বলবেন-

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ إِنَّمَا تَوَقَّيْنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ

(ওয়া কুনতু আল্লায়হিম শাহীদাম্ মা-দুমতু ফাইহিম ফালাম্মা তাওয়াফ্ফায়তানী কুনতা আনতার রাক্তিবা আল্লায়হিম)

অর্থ: এবং আমি যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম আমি তাদের ওপর সাক্ষী ছিলাম, এরপর যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে তখন তুমিই তাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক ছিলে। (সূরা মায়েদা : ১১৮)।

গ) সাদাকাতে হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.) : এ প্রসঙ্গে পরিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে-

فَقَدْ لِمْسَتْ فِيْكُمْ عُمَرًا مِنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ^{৩৩}

(ফাকুন্দ লাবিসতু ফাইকুম উমুরাম্ মিনকুবলিহী আফালা তাঁকিলুন)

অর্থ: নিশ্চয় আমি ইতোপূর্বে তোমাদের মাঝে এক সুদীর্ঘকাল জীবন যাপন করেছি, তবুও কী তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাবে না ? (সূরা ইউনূস : ১৭)।

তেমনি হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.)-ও তাঁর বিরঞ্জবাদীদের চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে কে আছ, যে আমার জীবনে দোষারোপ করতে পার”? (তায়কেরাতুশ শাহাদাতাইন, বাংলা অনুবাদ, পঃ.৭৭)।

প্র. জুমুআর নামায ও দুই ঈদের নামাযে হ্যুর (সা.) কোন দুঁটি সূরা পাঠ করতেন?

উ. সূরা আল্লা ও সূরা গাশিয়া।

প্র. কোন সূরাকে রসূল (সা.) সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা বলে অভিহিত করেছেন?

উ. সূরা ইখলাস-কে।

প্র. কোন সূরাকে পরিত্র কুরআনের হন্দয় আখ্যা দেয়া হয়েছে?

উ. সূরা ইয়াসীন-কে।

প্র. কুরআনে রসূল (সা.)-কে কী কী উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে?

উ. আল মুয়্যাম্বিল (চাদরাবৃত ব্যক্তি), আল মুদাসসির (পোষাকাবৃত ব্যক্তি), আবুল্লাহ (আল্লাহ'র বান্দা), আল ইনসান (পরিপূর্ণ মানব), ত্বা-হা (পরিত্র ও পথ প্রদর্শক)।

প্র. কুরআন শরীফে তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত বলতে কোন মসজিদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে?

উ. মসজিদে কুবা।

প্র. কুরআন মজীদে উম্মতে মোহাম্মাদীয়াকে কী কি উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে?

উ. খায়রা উম্মাতিন (সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত), সূরা আলে ইমরান: ১১১, এবং উম্মাতান ওসাতান (মধ্যমপন্থী উন্নত উম্মত), সূরা বাকারা : ১৪৫।

প্র. রসূল (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীগণকে পবিত্র কুরআনে মুমিনদের কী বলা হয়েছে?

উ. উম্মুল মু'মিনীন বা মু'মিনদের মাতা বলা হয়েছে। (সূরা আহ্মাব: ৭ নং আয়াত)।

প্র. পবিত্র কুরআনে কোন নবীর নাম ইসরাইল রাখা হয়েছে?

উ. হ্যরত ইয়াকুব (আ.)-এর নাম।

প্র. কুরআন শরীফে যুননুন (মাছওয়ালা) দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে?

উ. হ্যরত ইউনূস (আ.)-কে।

প্র. শেষ যুগে আগত হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর হাতেই বিশ্বব্যাপী ইসলাম বিজয় লাভ করবে বলে পবিত্র কুরআনের কোথায় ইংগিত করা হয়েছে?

উ. সকল মুফাসিরগণ এ বিষয়ে একমত, এ তবিয়দ্বাণী হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর যুগে পূর্ণ হবে। আয়াতটি হল-

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهَدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الْدِينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرَهُ الْمُسْرِكُونَ

(হ্যাল্লায় আরসালা রাসূলাহ বিল হৃদা ওয়া দ্বিনীল হাকি লিউয়হিরাহ আলাদ দ্বিনী কুল্লাহি ওয়ালাও কারিহাল মুশারিকুন)

অর্থ: তিনি তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন যেন তিনি তাকে সব ধর্মের ওপর বিজয় দান করেন। আর মুশারিকরা যত অপচন্দই করুক না কেন (তিনি তা দান করবেন)। (সূরা আস সাফ্ফ : ১০)।

প্র. রসূল (সা.) সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য আগমন করেছেন এ সম্পর্কে একটি আয়াত উপস্থাপন করুণ।

উ. **يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا**

(ইয়া আইয়্যহানাসু ইন্নি রাসূলুল্লাহি ইলায়কুম জামিয়ান)

অর্থ: হে মানুষ ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সবার জন্য আল্লাহর রসূল। (সূরা আরাফ : ১৫৯)।

প্র. কুরআন করীমের একজন প্রাচীন তফসীরকারকের নাম লিখুন।

উ. তফসীরে কবীরের প্রগেতা হ্যরত আল্লামা ইমাম ফখরুদ্দীন রায়ী (রাহে.)।

বিশ্ব নবী হ্যরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)

প্র. রসূলুল্লাহ (সা.) কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ. ৯ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ২০ এপ্রিল ৫৭১ খ্রিস্টাব্দের সোমবার বর্তমান সৌদি আরবের মক্কা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। (সীরাতে খাতামানাবীঈন, পঃ. ৯৩)।

প্র. হ্যরত রসূলে করিম (সা.)-এর নাম, কুনিয়াত (পারিবারিক নাম) এবং লকব (উপাধি) লিখুন।

উ. তাঁর পবিত্র নাম: মুহাম্মদ (সা.), কুনিয়াত: ‘আবুল কাসেম’ (কাসেমের পিতা) এবং লকব: ‘আল-আমীন’ (বিশ্বস্ত) এবং ‘আসুস সুদুক’ (অধিক সত্যবাদী)।

প্র. তাঁর (সা.) দাদা, পিতা এবং মাতার নাম কী?

উ. দাদা: হ্যরত আব্দুল মুত্তালিব, পিতা: হ্যরত আব্দুল্লাহ এবং মাতা: হ্যরত আমিনা বিনতে ওয়াহহাব।

প্র. তাঁর পিতা এবং মাতার কখন মৃত্যু হয়?

উ. তাঁর পিতা হ্যরত আব্দুল্লাহ তাঁর জন্মের ছয় মাস পূর্বে ইন্তেকাল করেন এবং মাতা তাঁর ছয় বছর বয়সের সময় ইন্তেকাল করেন।

প্র. তাঁর দুধ মাতার নাম কী?

উ. হ্যরত হালিমা সাদিয়া বিন্তে আবু যুরাইব (রা.)। তিনি হাওয়াজিন বংশের বনী সাদ গোত্রের একজন মহিলা ছিলেন।

প্র. মায়ের মৃত্যুর পর কে শিশু মুহাম্মদ (সা.)-কে দেখাশুনা করেন?

উ. পিতামহ হ্যরত আব্দুল মুত্তালিব। পরে তিনিও মারা গেলে শিশু মুহাম্মদ (সা.)-কে দেখাশুনা করেন তাঁর চাচা হ্যরত আবু তালিব।

প্র. মহানবী (সা.) কত বছরে, কার সাথে প্রথম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন?

উ. পঁচিশ বছর বয়সে হ্যরত খাদীজাতুল কুবরা বিন্তে খুওয়াইলিদ (রা.)-এর সাথে। তখন হ্যরত খাদীজা (রা.)-এর বয়স ছিল চাল্লিশ বছর। হ্যরত খাদীজা (রা.)-এর লকব বা উপাধি ছিল ‘তাহেরা’।

প্র. মহানবী (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীগণের নাম লিখুন।

উ. ১) হ্যরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.), ২) হ্যরত সওদা বিনতে জাম'আ (রা.) ৩) হ্যরত আয়েশা সিদ্দিকা বিন্তে আবু বকর (রা.), ৪) হ্যরত হাফসা বিনতে উমর (রা.), ৫) হ্যরত যয়না বিন্তে খুজায়মা (রা.), ৬) হ্যরত উম্মে সালমা হিন্দ বিন্তে উমাইয়া (রা.), ৭) হ্যরত যয়ন বিন্তে জুহাশ (রা.), ৮) হ্যরত জুয়ায়িরিয়া বিন্তে হারিস (রা.), ৯) হ্যরত সাফিয়া বিন্তে হৃষায়ি বিন আখতাব (রা.), ১০) হ্যরত উম্মে হাবিবা বিন্তে আবু সুফিয়ান (রা.), ১১) উম্মে ইব্রাহীম হ্যরত মারিয়া কিবতিয়াহ (রা.) এবং ১২) হ্যরত মায়মুনা বিন্তে হারিস (রা.)।

একসঙ্গে চারজনের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করা কেবলমাত্র তাঁর জন্য বৈধ করা হয়েছিল। এ বর্ণনা সূরা আহ্যাবের ৫১ নং আয়াতে রয়েছে। হ্যরত রসূল করিম (সা.)-এর প্রথম স্ত্রী হ্যরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.)-এর বিয়ের সময় বয়স ছিল ৪০ বছর এবং তাঁর (সা.) বাকী সমস্ত বিয়ে হ্যরত খাদীজা (রা.)-এর ইন্টেকালের পর হয়েছিল। হ্যরত আয়েশা (রা.) এবং হ্যরত মারিয়া কিবতিয়াহ্ (রা.) নবী করিম (সা.)-এর কুমারী স্ত্রী ছিলেন আর অন্যান্যরা কেউ ছিলেন বিধবা, আবার কেউ ছিলেন তালাকপ্রাপ্তা।

প্র. মহানবী (সা.)-এর সাহেবাদীগণের (কন্যা) নাম লিখুন।

১. হ্যরত যয়নাব (রা.), স্বামী : আবুল আস বিন রাবী (রা.) ২. হ্যরত রঞ্জাইয়া (রা.)
ও ৩. হ্যরত উম্মে কুলসুম (রা.). তাদের বিবাহ আবু লাহাবের দুই ছেলে উত্বা এবং
উত্বিবার সাথে হয়েছিল। কিন্তু রোখ্সতনার পূর্বেই বিবাহ ভেঙ্গে যায়। পরে তাদের
উভয়ের বিবাহ (একজনের মৃত্যু হলে অপর জনের সাথে) হ্যরত উসমান বিন আফ্ফান
(রা.)-এর সাথে সম্পন্ন হয়। হ্যরত উসমান (রা.)-কে এজন্য যুন-বুরাইন (দুই মূরের
অধিকারী) বলা হয়; ৪. হ্যরত ফাতেমাতুয় যোহরা (রা.), স্বামী : হ্যরত আলী বিন আবু
তালিব (রা.).

প্র. মহানবী (সা.)-এর সাহেবাদাগণের (পুত্র) নাম কী কী?

উ. ১. হ্যরত কাসেম (রা.), ২. হ্যরত তাহের (রা.) ৩. হ্যরত তাইয়েব (রা.) (তাঁর আরেক
নাম আবুল্লাহ ছিল) এবং ৪. হ্যরত ইবরাহীম (রা.). [সীরাত খাতামান্নাবেদেন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৯]

প্র. মহানবী (সা.) কত বছর বয়সে নবুওয়তের দাবি করেন?

উ. চাল্লিশ বছর বয়সে।

প্র. তাঁর উপর প্রথম ওই কোথায় নাযিল হয়?

উ. হেরো পর্বতের গুহায়।

প্র. পুরুষ, নারী, শিশু, দাস, বাদশাহ, খ্রিস্টান, ফারসি এবং রোমানদের মাঝে কে-কে
সর্বপ্রথম তাঁর উপর সৈমান আনয়ন করেন?

উ. পুরুষদের মাঝে হ্যরত আবু বকর (রা.), মহিলাদের মাঝে হ্যরত খাদীজা (রা.),
বালকদের মাঝে হ্যরত আলী (রা.), দাসদের মাঝে হ্যরত যায়েদ বিন হারিস (রা.),
বাদশাহগণের মাঝে হাব্শি বাদশাহ নাজাশী, খ্রিস্টানদের মাঝে ওরাকা বিন নাওফাল,
ফারসিদের মাঝে হ্যরত সালমান ফারসি (রা.) এবং রোমানদের মাঝে হ্যরত সোহায়েব
রুমী (রা.) সবার আগে ইসলাম গ্রহণ করেন।

প্র. রসূলে আকরাম (সা.)-এর মৃত্যুতে হ্যরত হাসসান বিন সাবেত (রা.) যে শোকগাঁথা
আবৃত্তি করেছিলেন তা লিখুন।

উ.

كُنْتَ السَّوَادِ لِنَاطِرٍ فَعِمِيْنَ عَلَى النَّاطِرِ
مَنْ شَاءَ بَعْدَكَ فَلِيْمَتْ كُنْتَ أَحَادِرْ

(କୁନ୍ତାସ୍ ସାଓୟାଦା ଲିନାଯିରୀ
ମାନ ଶା-ଆ ବା'ଦାକା ଫାଲଇହ୍ୟାମୁତ
ଫା-ଆ'ଘୀୟା ଆ'ଲାୟକାନ୍ ନାୟିରୁ
ଫା-ଆ'ଲାୟକା କୁନ୍ତ ଉହ୍ୟିର)

ଅର୍ଥ: ପଂକ୍ତିର କାବ୍ୟରୂପ:

নয়নের মণি ছিলে গো আমার তোমার বিহনে তাই
অঙ্ক হলো যে, দু'চোখ আমার আর কোনও আলো নাই
আমারতো কেন ভয় নেই আর আর কারও প্রয়ান্তের
আমার তো শুধু শংকা ছিল যে তোমারই বিরহের।

ପ୍ର. ମହାନବୀ (ସା.) ଯେ ସକଳ ରାଜା-ବାଦଶାହୁଙ୍କର ନାମେ ତବଳିଗି ପତ୍ର ପ୍ରେରଣ କରେଛିଲେଣ ତାଦେର ମଧ୍ୟ ଥିକେ କରେକଜନେର ନାମ ଲିଖନ ।

উ. ১) হিরাক্লিয়াস: কায়সার-এ-রোম (রোম সম্প্রট), ২) খসরং পারভেজ: কিসরা (পারস্য সম্প্রট), ৩) আসহামাহ নাজাশী: আবিসিনিয়ার বাদশাহ, ৪) মুকাউকিস: মিসরের বাদশাহ, ৫) মুনসির তাইমি: আমীর, বাহারাইন।

প্র. মহানবী (সা.)-এর একটি পংক্তি বলুন।

أَنَا أَئِي لَا كَذِبٌ أَنَا أَئِنْ عَبْدُ الْمُطَلَّبِ

(আনান নাবিয়ু লা কায়িব আনা ইবনু আবদিল মুতালিব)
 অর্থ: আমি নবী, মিথ্যাবাদী নই; আমি আব্দুল মুতালিবের পৌত্র।
 প্র. মক্কা থেকে হিজরতের পথে মহানবী (সা.) কোন গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন? তাঁর
 (সা.) স্বামী আব্দুল মুতালিব

ଏହି ପ୍ରକାଶକ ମାତ୍ରରେ ନାହିଁ ।

প্র. প্রতিকৃতির করণাতে ব্যবহৃত (মা.) এবং কোন নবীর মাথে সাদগু দেওয়া হয়েছে?

ଉ ହ୍ୟାରତ ମନ୍ଦୀର (ଆ)। (ମୋହମ୍ମଦାଖିଲ : ୧୬ ପଂ ଆୟାତ)

প্র বসন্ত (সা)-এর উটমীর নাম কী ছিল?

ଡ କାସଓଯା ।

প্র. রসূল (সা.) সর্বোত্তম শুণাবগীর ধারক-বাহক - এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'লার ঘোষণা কী?

۵. ﴿۱۷﴾ اَنَّكَ لَعَلِيٌّ حَلْقٌ عَظِيمٌ

(ইন্নাকা লা'-আলা খুলুকিন আয়িম)

অর্থ: নিশ্চয় তুমি মহান চারিত্রিক গুণাবলীর ওপর অধিষ্ঠিত। (সূরা

প্র. মহানবী (সা.)-এর চরিত্র সম্বন্ধে হ্যরত আয়েশা (রা.) কী বলেছেন?

८.

کان خلقہ القرآن (کانا خلقلوں کو راتاں)

অর্থ: তাঁর চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ কুরআন। (সহীহ বুখারী ও সুনানে আবু দাউদ)।

প্র. হ্যুর (সা.) কবে, কোথায় ইন্তেকাল করেন? তাঁর (সা.) রওয়া মোবারক কোথায় অবস্থিত?

উ. হ্যুর (সা.) ২৬ মে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ১১ হিজরির ১লা রবিউল আউয়াল ৬৩ বছর বয়সে মদীনায় হ্যরত আয়েশা (রা.)-এর গৃহে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে হ্যরত আয়েশা (রা.)-এর বাসগৃহেই সমাহিত করা হয়।

(তারিখে আহমদীয়াত, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৫২-৫৫৩ এবং দ্বিনী মাল্যমাত, ম.খো.আ. পাকিস্তান, পৃ. ১৬)।

প্র. রসূল (সা.) নবুওয়তের দাবির পর কত বছর জীবিত ছিলেন?

উ. প্রায় ২৩ বছর।

এক নজরে হ্যরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর চরিত

খ্রিস্টাব্দ হিজরি পূর্ব সন বিশেষ ঘটনাবলী

- | | | |
|-----|----|---|
| ৫৭০ | ৫৪ | <ul style="list-style-type: none"> ● ইয়েমেনের গর্ভনর আবরাহা আশরাম হস্তী বাহিনী নিয়ে কাঁবা ঘর ধ্বংসের জন্যে মক্কা আক্রমণ করতে এলে দলবলসহ আব্দুল্লাহ ক্রোধের কারণে গুটিবসন্ত ও প্লাবনের শিকার হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ● এ ঘটনার কয়েক মাস পূর্বে হ্যরত আব্দুল্লাহ বিয়ে হয়। ● হ্যরত আব্দুল্লাহ মদীনায় ইন্তেকাল করেন। |
| ৫৭১ | ৫১ | <ul style="list-style-type: none"> ● ৫৭১ (২০ এপ্রিল, সোমবার) ৫১ (৯ রবিউল আউয়াল) হ্যরত আব্দুল্লাহর ওরসে এবং হ্যরত আমিনার গর্ভে কুরাইশ বংশে আরবের মক্কা নগরে হ্যরত মুহাম্মদ (সা.) জন্মগ্রহণ করেন। ● জন্মের ২ সপ্তাহ পরে লালন-পালনের জন্য তাঁর দুধ মাতা বনু সাদ গোত্রের হালিমা সাদিয়ার কাছে তাঁকে দেয়া হয়। সেখানে তিনি ৫ বছর অবস্থান করেন। |
| ৫৭৬ | ৪৫ | <ul style="list-style-type: none"> ● হ্যরত আমিনা মদীনার পথে আবওয়া নামক স্থানে ইহলোক ত্যাগ করেন। এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। |
| ৫৭৮ | ৪৩ | <ul style="list-style-type: none"> ● দাদা হ্যরত আব্দুল মুতালিব আঁ-হ্যরত (সা.)-কে ছেড়ে দুনিয়া থেকে চলে যান। |
| ৫৮২ | ৪০ | <ul style="list-style-type: none"> ● ১২ বছর বয়সে চাচা হ্যরত আবু তালিবের সাথে বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়ায় গমন করেন। বসরায় ‘বাহিরা’ নামক খ্রিস্টাব্দ সাধুর সাথে পরিচয় হয়। |

- | | | |
|-----|----|--|
| ৫৯০ | ৩২ | ● হরব্ উল ফুজার' বা অন্যায় সমরে ব্যথিত হয়ে 'হিলফুল ফুয়ুল' |
| | | সমিতি গঠন করেন। |
| ৫৯৩ | ২৯ | ● হ্যরত খাদীজা (রা.)-এর ব্যবসার কাজে নিযুক্ত হন এবং সিরিয়া |
| | | গমন করে ব্যবসায় প্রচুর লাভবান হন। এ সময় তিনি 'আমীন' |
| | | উপাধিতে খ্যাত হন। |
| ৫৯৫ | ২৭ | ● হ্যরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.)-এর (৪০) সাথে আঁ-হ্যরত |
| | | (সা.) (২৫) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। হ্যরত আবু তালিব ৫০০ |
| | | দিরহাম মোহরানা ধার্য করে এ বিবাহ দেন। আঁ-হ্যরত (সা.)- |
| | | এর তিন পুত্র-কাসেম, তৈয়ব ও তাহের এবং চার কন্যা যয়নব, |
| | | রুক্মাইয়া, উম্মে কুলসুম এবং ফাতেমা- এ স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ |
| | | করেন। ছেলেরা অল্প বয়সেই মারা যান। |
| ৬০৫ | ১৭ | ● কা'বা ঘরের সংক্ষার আর কৃষ্ণপাথর (হাজরে আসওয়াদ) |
| | | স্থাপনের ঘটনা। ইতোপূর্বে তিনি মক্কায় 'আলু আমীন', 'আস্ম |
| | | সুদুক' বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এ সময় থেকেই তিনি |
| | | হেরো গুহায় গভীর ধ্যান ও আল্লাহর ইবাদতে রত থাকতেন। |
| ৬১০ | ১২ | ● রম্যান মাসের শেষ দশকের সোমবারে হেরো গুহায় ৪০ বছর |
| | | বয়সে প্রথম ওহী লাভ করেন। |
| | | ● হ্যরত খাদীজার চাচাত ভাই ওরাকা বিন নাওফাল আঁ-হ্যরত |
| | | (সা.)-কে 'বিশ্বনবী' বলে সনাত্ত করেন। |
| | | ● তৌহীদের প্রচার শুরু। হ্যরত খাদীজা ও হ্যরত আলী প্রথমে |
| | | ইসলাম গ্রহণ করেন। পরে হ্যরত আবু বকর, হ্যরত বেলাল, |
| | | হ্যরত যায়েদ বিন হারিস, হ্যরত উসমান, হ্যরত আবুর |
| | | রহমান বিন আওফ, হ্যরত সাদ বিন ওয়াক্বাস, হ্যরত যুবায়ের |
| | | ইবনে আওয়াম ও হ্যরত তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ (রা.) প্রমুখ |
| | | ইসলাম গ্রহণ করেন। |
| ৬১৫ | ৭ | ● রজব মাসে প্রথমে ১০টি এবং পরে ৮৩টি মুসলমান পরিবার |
| | | নাজাশীর রাজ্য আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। এ সময়ের |
| | | নাজাশীর ব্যক্তিগত নাম ছিল আসহামাহ। |
| ৬১৬ | ৬ | ● কুরাইশদের যুলুম-নির্যাতন চরম আকার ধারণ করে। |
| | | ● হ্যরত উমর ইবনুল খাত্বাব এবং হ্যরত হাময়া বিন আব্দুল |
| | | মুত্তালিব (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ। |
| ৬১৭ | ৫ | ● 'শিংবে আবু তালিব' বা আবু তালিবের উপত্যকায় হ্যরত রসূল |
| | | করিম (সা.) সহ মুসলমানদের কুরাইশরা অবরুদ্ধ করে রাখে। |

- এ অবরোধকালের সময়সীমা প্রায় আড়াই থেকে তিন বছর ছিল।
- হযরত আবু তালিব এবং হযরত খাদীজা (রা.) ইন্টেকাল করেন। মৃত্যুর সময় হযরত খাদীজা (রা.)-এর বয়স ছিল ৬৫ বছর।
- মহানবী (সা.) হযরত আয়েশা বিনতে আবু বকর (রা.) এবং হযরত সওদা বিনতে জাম'আ (রা.) প্রত্যেককে ৪০০ দিরহাম মোহরানা দিয়ে বিয়ে করেন।
- মহানবী (সা.) মক্কা থেকে ৭৫ মাইল দক্ষিণে তায়েফ গমন করেন। কিন্তু বহু যুগ্ম নির্যাতন ভোগ করে মক্কায় ফিরে আসেন। এটি নবুওয়াতের দশম বছর ছিল।
- আকাবার প্রথম বয়স্ত।
- পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়।
- রোম এবং পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষ এবং রোমের বিজয় লাভ। মহানবী (সা.) এ প্রসঙ্গে ভবিষ্যত্বাণী করেন।
- আকাবার দ্বিতীয় বয়াত অনুষ্ঠিত হয়। ৭৫ জন ইয়াসরেব বা মদীনাবাসী এতে অংশগ্রহণ করেন এবং মহানবী (সা.)-কে তাদের দেশে আশ্রয় দেয়ার অঙ্গীকার করেন (যিলহজ্জ মাস)।
- মহানবী (সা.) ইয়াসরেব তথা মদীনার পথে হিজরত করেন। পথিমধ্যে তিনি (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) মক্কা থেকে ৩ মাইল দক্ষিণে সওর নামক গুহায় আশ্রয় নেন। সেখানে তিনি দিন অবস্থান করেন। ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর সোমবার সেখান থেকে তিনি মদীনার পথে রওনা দেন।
- ২০ সেপ্টেম্বর মহানবী (সা.) মদীনার সন্নিকটে কুবা নামক স্থানে পৌঁছেন। পরবর্তীকালে স্মৃতিস্মরণ সেখানে ‘কুবা মসজিদ’ নির্মিত হয়।
- আযান এবং জুমু'আর নামাযের বিধান জারী হয়।
- মসজিদে নববীর প্রতিষ্ঠা হয়।
- নামাযরত অবস্থায় যেরণ্যালেমের বায়তুল মাকদাস থেকে মক্কার কা'বার দিকে কিবলা পরিবর্তন। তখন শাবান মাস ছিল।
- ৪ ষটি শর্ত সম্বলিত ‘মদীনা সনদ’ প্রণয়ন- যা পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান নামে আখ্যায়িত।
- রোয়া, স্টেডুল ফিতর, স্টেডুল আয়হা এবং হজ্জ এর বিধান জারী হয়।

- মার্চ মোতাবেক রম্যান মাসে মদীনার ৮০ মাইল পশ্চিমে ‘বদর’ নামক কুয়ার নিকটবর্তী প্রান্তরে মক্কার কুরাইশ এবং মুসলমানদের মাঝে ‘বদরের যুদ্ধ’ সংঘটিত হয়।
- শাওয়াল মাসে হ্যরত আয়েশা (রা.)-এর রোখসাতনা অনুষ্ঠিত হয়।
- রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস পরিত্র কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী (সুরা রূম) পুনরায় পারস্য বাহিনীকে পর্যন্ত করতে আরম্ভ করে।
- যিলহজ্জ মাসে হ্যরত আলী (রা.)-এর সাথে হ্যরত ফাতেমা (রা.)-এর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।
- ‘জান্নাতুল বাকী’ প্রতিষ্ঠা এবং এ করে হ্যরত উসমান বিন মায়উন (রা.)-কে সর্বপ্রথম দাফন করা হয়।
- শাবান মাসে হ্যরত রসূল করিম (সা.) হ্যরত উমরের কন্যা হ্যরত হাফসা (রা.)-কে বিয়ে করেন।
- রম্যান মাসে হ্যরত ইমাম হাসান (রা.) জন্মগ্রহণ করেন।
- মার্চ মোতাবেক শাওয়াল মাসে মদীনার ৫ মাইল পশ্চিমে উহুদ নামক উপত্যকায় মুসলমান এবং মক্কার কুরাইশদের মাঝে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
- ইহুদী গোত্র বনু কায়নুআকা-কে মদীনা থেকে নির্বাসন দেয়া হয়।
- মদের নিষেধাজ্ঞা ঘোষিত হয়।
- সফর মাসে কাফেররা ‘বির মাউনা’ নামক স্থানে ধোঁকা দিয়ে ৬৯ জন ‘হাফেয়ে কুরআন’-কে শহীদ করে দেয়।
- বরিটল আউয়াল মাসে ইহুদী গোত্র বনু নবীর-কে মদীনা থেকে নির্বাসন দেয়া হয়।
- ইসলামী উত্তরাধিকার আইন ঘোষণা করা হয়।
- আঁ-হ্যরত (সা.) হ্যরত য়যনাব বিনতে খোজায়মা (রা.)-কে বিয়ে করেন।
- শাবান মাসে হ্যরত ইমাম হোসেন (রা.) জন্মগ্রহণ করেন।
- শাওয়াল মাসে হ্যরত রসূল করিম (সা.) উম্মে সালমা হিন্দ বিনতে উমাইয়া (রা.)-কে বিয়ে করেন।
- জমাদিউস সানি মাসে চন্দ্ৰগ্রহণ হয় এবং হ্যুর (সা.) বা-জামাত ‘সালাতুল খুসুফ’-এর নামায আদায় করেন।

- মক্কায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয় এবং আঁ-হ্যরত (সা.) মক্কার গরীবদের সাহায্য প্রেরণ করেন। আবু সুফিয়ান আঁ-হ্যরত (সা.)-কে মক্কাবাসীদের জন্য দোয়ার অনুরোধ করেন। (বুখারী, কিতাবুল ইস্তিসকা)।
- শাবান মাসে আঁ-হ্যরত (সা.) হ্যরত যায়েদের তালাকপ্রাণ্তা স্তু এবং তাঁর (সা.) ফুফাত বোন হ্যরত যয়নাব বিনতে জুহশ (রা.)-কে ঐশী নির্দেশে বিয়ে করেন।
- পর্দার আদেশ জারী হয়।
- শা'বান মাসে বনু মুস্তালিক গোত্রের বিরংদ্বে হ্যুর (সা.) এক অভিযান পরিচালনা করেন।
- বনু মুস্তালিকা গোত্রের সর্দার হারেস বিন আবি যারার কন্যা জুয়ায়ারিয়া (রা.)-কে আঁ-হ্যরত (সা.) বিয়ে করেন।
- ৩১ মার্চ কুরাইশ, ইহুদী এবং বেদুইনদের ১০৬০০ সৈন্যের একটি সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে আবু সুফিয়ান মদীনা আক্রমণ করে।
- আঁ-হ্যরত (সা.) হ্যরত সালমান ফারসি (রা.)-এর পরামর্শ মোতাবেক ৬ দিন যাবৎ মদীনার চারদিকে পরিখা খনন করে তিন হাজার মুসলমান সৈন্য নিয়ে সেখানে থেকেই যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধ ‘জঙ্গে আহয়া’বা ‘পরিখার (খন্দক) যুদ্ধ’ নামে খ্যাত। শাওয়াল মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
- বিবাহ এবং তালাকের বিধান জারী হয়।
- ১৯ ফেব্রুয়ারি আঁ-হ্যরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ তার পুত্র সিরোস কর্তৃক নিহত হয়।
- মার্চ মাসে ‘বয়াতে রিয়ওয়ান’ এবং বিখ্যাত হুদায়বিয়ার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়, যাকে পবিত্র কুরআন ‘ফাতহুম মুরীন’ বা প্রকাশ্য বিজয় বলে আখ্যা দিয়েছে।
- হ্যুর আকরাম (সা.) বিভিন্ন রাজা-বাদশাহগণের কাছে ইসলামের দাওয়াত প্রেরণ করেন।
- আগস্ট (মহ্রুরম) মাসে খায়বারের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এ যুদ্ধে হ্যরত আলী (রা.)-এর বীরত্বের জন্য তাঁকে ‘আসাদুল্লাহ্’ বা আল্লাহর সিংহ উপাধি দেয়া হয়।
- হ্যুর (সা.) উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান (রা.)-কে বিয়ে করেন।

- | | | |
|-----|----|---|
| ৬২৯ | ৭ | <ul style="list-style-type: none"> ● আঁ-হ্যরত (সা.) ফেব্রুয়ারি মাসে ২,০০০ সাহাবী নিয়ে উমরাহ হজ পালনের জন্যে মক্কায় গমন করেন এবং ৩ দিন অবস্থান করে চলে আসেন। ● মু'তার যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। হ্যরত যায়েদ (রা.), হ্যরত আব্দুল্লাহ (রা.) এবং হ্যরত জাফর (রা.) শহীদ হন। হ্যরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) ‘সাইফুল্লাহ’ খেতাব পান। ● আঁ-হ্যরত (সা.) হ্যরত মারিয়া কিবতিয়া (রা.)-কে বিয়ে করেন। হ্যরত মায়মুনাহ বিনতে হারিস এবং হ্যরত সাফিয়া বিনতে হ্যায়ি বিন আখতাব (রা.)-কেও তিনি এ বছর বিয়ে করেন। |
| ৬৩০ | ৮ | <ul style="list-style-type: none"> ● ৬ জানুয়ারি মোতাবেক ১০ রম্যানে ১০,০০০ সাহাবী নিয়ে আঁ-হ্যরত (সা.) মক্কা অবরোধ করেন এবং পরিশেষে মক্কা বিজয় করেন। ● হ্যরত মারিয়া কিবতিয়া (রা.)-এর গর্ভে সাহেবযাদা ইবরাহীম জন্মগ্রহণ করেন এবং শৈশবেই তিনি মারা যান। আঁ-হ্যরত (সা.) তাঁর সম্পর্কে বলেন, ‘সে জীবিত থাকলে সত্যবাদী নবী হতো।’ ● ২৭ জানুয়ারি মোতাবেক ৬ শাওয়াল মক্কার তিন মাইল দূরে হৃন্দায়নের প্রান্তরে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ● মুসলমানগণ তায়েফ বিজয় করেন। |
| ৬৩১ | ৯ | <ul style="list-style-type: none"> ● নভেম্বর মাসে তাবুকের যুদ্ধ পরিচালনা করা হয়। এ যুদ্ধের আরেক নাম ‘গাযওয়াতুল উসরা’- অর্থাৎ, কঢ়ের যুদ্ধ। |
| ৬৩২ | ১০ | <ul style="list-style-type: none"> ● ফেব্রুয়ারি মোতাবেক যিলহজ মাসে আঁ-হ্যরত (সা.) ১,১৪,০০০ সাহাবী এবং পবিত্র সহধর্মীগণসহ বিদায় হজ পালন করেন। ● আঁ-হ্যরত (সা.) আরাফাতের মাঠে ঐতিহাসিক বিদায় হজের ভাষণ দেন। |
| ৬৩২ | ১১ | <ul style="list-style-type: none"> ● ১লা রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার মোতাবেক ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মে ৬৩ বছর বয়সে আঁ-হ্যরত (সা.) তাঁর প্রিয় প্রভুর কাছে গমন করেন। [ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজে'উন]। (আল্লাহল্লাহ সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিঁ ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ) |

নেট: মহানবী (সা.)-এর জন্ম ও মৃত্যু তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে। হ্যরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) তাঁর ‘সীরাতে খাতামান্নাবীঙ্গন’ পুস্তকে জন্ম তারিখ সম্বন্ধে লিখেছেন, মহানবী (সা.)-এর সঠিক জন্ম তারিখ হলো ২০ এপ্রিল ৫৭১ খ্রিস্টাব্দ। মিশরের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ মাহযুদ পাশা ফালাকী সাহেব বহু গবেষণা করে পুস্তক রচনা করে দেখিয়েছেন, হয়র (সা.)-এর জন্ম ৯ রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার মোতাবেক ২০ এপ্রিল ৫৭১ খ্রিস্টাব্দ। আল্লামা আকরাম খাঁ প্রমুখ পণ্ডিতবর্গও এটা সমর্থন করেছেন। ঐতিহাসিক তারিখগুলো সম্বন্ধে মতভেদ থাকার কারণে কারও কাছে উপরোক্ত তারিখগুলোতে অমিল দৃষ্টিগোচর হতে পারে, তবে এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য পরিবেশনের জন্যে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে।

হাদীস শরীফ

প্র. হাদীস কাকে বলে?

উ. হাদীস সেসব বাক্যবলীর নাম যা মহানবী (সা.)-এর পরিত্র কথা, কাজ এবং অনুমোদন বা সমর্থন অনুযায়ী বর্ণিত হয়েছে।

প্র. ‘সিহাহ সিভাহ’ সম্বন্ধে সংক্ষেপে বর্ণনা করন।

উ. ‘সিহাহ সিভাহ’ অর্থ ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীসের পুস্তক। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে মুহাদিসগণ (হাদীস বিশারদগণ) নিম্নোক্ত ছয়টি হাদীসের পুস্তককে অধিক প্রমাণিত ও বিশ্বাসযোগ্য এবং সর্বাধিক বিশুদ্ধ বলে নির্ধারিত করেছেন। মর্যাদাক্রম অনুযায়ী হাদীসের পুস্তকগুলো হলো:

১. সহীহ বুখারী: সংগ্রাহক: হ্যরত ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী (রহ.) [১৯৪-২৫৬ হিজরি]

২. সহীহ মুসলিম: সংগ্রাহক: হ্যরত ইমাম মুসলিম বিন হাজাজ (রহ.) [২০৯-২৬১ হিজরি]

(সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমকে একত্রে ‘সহীহায়ন’ বলা হয়। এদের উভয়ের সর্বসম্মত বর্ণনাকে ‘মুত্তাফাকুন আলায়হে’ বলা হয়।)

৩. জামে তিরামিয়া: সংগ্রাহক: হ্যরত ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরামিয়া (রহ.) [২০৪-২৭৯ হিজরি]।

৪. সুনানে আবু দাউদ: সংগ্রাহক: হ্যরত ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান বিন আশআস (রহ.) [২০২-২৭৫ হিজরি]।

৫. সুনানে নিসাও: সংগ্রাহক: হ্যরত ইমাম হাফেজ আহমদ বিন শোয়াইরুন্নিসাও (রহ.) [২১৫-৩০৬ হিজরি]।

৬. সুনানে ইবনে মাজাহ: সংগ্রাহক: হযরত ইমাম আবু আন্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ
ইবনে মাজাহ কায়দীনি (রহ.) [২০৯ - ২৭৫ হিজরি]।

প্র. কোন সাহাবী এবং কোন সাহাবীয়া সর্বাগেক্ষণ বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন?

উ. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এবং হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)।

প্র. হৃষুর (সা.)-এর এমন একটি হাদীস বলুন যেখানে প্রত্যেক শতাব্দীতে উন্মত্তে
মুহাম্মদীয়ায় মোজাদ্দেদ আগমনের ভবিষ্যত্বাণী রয়েছে?

উ. ان الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها.

(ইন্নাল্লাহা ইয়াব'আসু লিহায়িহিল উম্মাতি আ'লা রাসি কুল্লি মিআতি সানাতিন মান
ইউজাদ্দিদু লাহা দিনাহা)

অর্থ: নিচয় আল্লাহ তা'লা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এই উন্মত্তের জন্য এমন এক
মহাপুরুষকে আবির্ভূত করবেন যিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে পুনর্জীবিত করবেন।
(সুনানে আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, কিতাবুল মালাহিম, পৃ. ২৪১)।

প্র. মহানবী (সা.) হযরত ঈসা (আ.)-এর বয়স কত বলে নিরূপণ করেছেন?

উ. ১২০ বৎসর। এ সম্বন্ধে হাদীসটি হল -

ان عيسى ابن مریم عاش عشرين و مائة سنة

(ইন্না ঈসাব্না মারযামা আশা ইশরীনা ওয়া মিআতা সানাতিন)

অর্থ: নিচয় ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.) ১২০ বছর জীবিত ছিলেন। (কনযুল উম্মাল, ২য়
খন্ড, পৃ. ১৬০)।

প্র. হাদীস শরীফে মূসায়ী মসীহ হযরত ঈসা (আ.) এবং মুহাম্মদী মসীহ হযরত মির্যা
গোলাম আহমদ (আ.)-এর চেহারা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা উল্লেখ করুণ।

উ. মূসায়ী মসীহ (আ.)-এর গায়ের রং লোহিত বর্ণ, মাথার চুল কোঁকড়ানো ও প্রশস্ত
বক্ষ।

মুহাম্মদী মসীহ (আ.) সুদর্শন, তাঁর গায়ের রং গোধূম, মাথার চুল সোজা ও লক্ষ্মা।
(বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাব বাদাউল খালক, পৃ. ১৬৫ ও কুনযুল উম্মাল)।

প্র. যে হাদীসে মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.) একই ব্যক্তি হবেন বলে উল্লেখ রয়েছে তা
বলুন।

উ.

مهدی الا عیسی بن مریم ۴

(লাল মাহদীয় ইন্না ঈসাব্নু মারইয়াম)

অর্থ: মাহদী ঈসা ইবনে মরিয়ম ব্যতিরেকে অপর কেউ নন"- অর্থাৎ, মাহদী এবং ঈসা
একই সত্ত্ব। (সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফীতান, বাব শিদ্দাতুয়্যামান)।

প্র. হাদীস শরীফে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর কী কী কাজের উল্লেখ রয়েছে?

উ. ক্রুশ ধ্বংস করা (ইয়াক্সিরস্স সলীব), শূকর বধ করা (ইয়াকতুলুল খিন্যীর), যুদ্ধ রাহিত করা (ইয়ায়াউল হারব), ইসলামকে পুনর্জীবিত করা এবং ইসলামের প্রাধান্য বিস্তার করা (লিহউয়হিরাহু আলাদীনি কুল্লাহি), ইসলামী শরীয়ত কার্যে করা, বহি ও অভ্যন্তরীণ যাবতীয় বিরোধের ন্যায়বিচারক ও মীমাংসাকারী (হাকামান আদলান) হারানো ঈমানকে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা, অধিক পরিমাণে (আধ্যাত্মিক) ধনভাণ্ডার বিতরণ করা।

প্র. যে হাদীসে মহানবী (সা.) ইমাম মাহদী (আ.)-কে তাঁর সালাম পৌছাতে বলেছেন তা উল্লেখ করুন।

الا من ادركه فاليقرء عليه السلام

(আলি মান্ত আদরকাহু ফালইয়াকরা আলায়হিস্স সালাম)

অর্থ: স্মরণ রেখো, যে কেউ ইমাম মাহদী (আ.)-এর সাক্ষাৎ পাবে সে অবশ্যই তাকে আমার সালাম পৌছাবে। (তিবরানী আলি আওসাতি ওয়াস্স সগীর)।

প্র. হ্যরত মসাহুদ মাওউদ (আ.)-কে যে হাদীসে পারস্য বংশোদ্ধৃত বলে উল্লেখ করা হয়েছে তা বলুন।

উ. যখন সূরা জ্যু'আর 'ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম' আয়াত নাযিল হয়, তখন মহানবী (সা.) হ্যরত সালমান ফারসি (রা.)-এর কাঁধে হাত রেখে বলেন-

لوكان اليمان عند الثريا لنا له رجال اورجل من هولاء

(লাও কানালি ঈমানু ইনদাস্স সুরাইয়া লানা লাহু রিজালুন আও রাজুলুম মিন হা-উলায়ি)

অর্থ: ঈমান যদি সুরাইয়া নক্ষত্রে উঠে যায় তাহলে এর (পারস্য বংশের) এক বা একাধিক ব্যক্তি পুনরায় একে (ঈমান) তা থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনবেন। (বুখারী, তৃয় খণ্ড, কিতাবুত তফসীর)

প্র. উম্মুল মু'মিনীন হ্যরত আয়েশা (রা.) খাতামান্নাবীসৈনের তাৎপর্য বর্ণনায় কী বলেছেন?

قولوا انه خاتم الانبياء ولا تقولوا لا نى بعده

(কুলু ইন্নাহু খাতামুল আমবিয়ায়ি ওয়া লা তাকুলু লা নাবীয়ায় বা'দাহু)

অর্থ: "তোমরা বল, 'মহানবী (সা.) খাতামুল আমবিয়া' কিন্তু একথা বলো না, 'তাঁর (সা.)-এর পরে কোন নবী নেই'।" (দুররে মনসুর, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৪ এবং তাকমেলা মাজমাউল বিহার, ৪৮ খণ্ড, পৃ. ৮৫)।

প্র. দু'টি হাদীস উল্লেখ করুন যাতে প্রমাণিত হয় মহানবী (সা.)-এর পর নবী আসতে পারে।

উ. ১)

لوعاش لكان صدِّيقاً نِيَّا

(লাও আশা লাকানা সিদ্বিকান নাবিয়্যান)

অর্থ: “যদি সে [হ্যুর (সা.)-এর সন্তান সাহেবযাদা ইবরাহীম] জীবিত থাকত তবে সে সত্য নবী হতো।” (সুনানে ইবনে মাজা, ১ম খন্ড, কিতাবুল জানায়ে এবং তারিখ ইবনে আসাকির, ৩য় খন্ড, পৃ. ২৯৫)।

২) **أَبُو بَكْرٍ أَفْضَلُ هُذِّهِ الْأُمَّةِ إِلَّاَنْ يَحْكُونَ تَبَيْيَّنٌ**

(আবু বাকরিন আফযালু হায়হিল উম্মাতি ইল্লা আইয়াকুনা নাবিয়্যন)

অর্থ: “আবু বকর এ উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ—যদি ভবিষ্যতে কোন নবী হন তিনি ব্যতীত।” (কুন্যুল হাকায়েক ফি হাদিসি খায়রুল খালারিক, পৃ. ০৪ এবং জামেউস সগীর, ২য় খন্ড, পৃ. ১৩৭)।

প্র. সর্বথাটীন হাদীস গ্রন্থের নাম কী?

উ. হ্যরত হাম্মাম বিন মুনাব্বাহ (রহ.) কর্তৃক সংকলিত ‘সহীফা হাম্মাম বিন মুনাব্বাহ’। তিনি হ্যরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর একজন শিষ্য ছিলেন।

তথ্যসূত্র :

- ১) পবিত্র কুরআন মজৌদের সূরা পরিচিতি, বিষয়বস্তু, আয়াত, টাকা ও বিষয়সূচী দ্রষ্টব্য।
- ২) সীরাতে খাতামান্নাবীঙ্গন, প্রণেতা : হ্যরত সাহেবযাদা মির্যা বশির আহমদ, এম.এ (রা.)।
- ৩) দ্বিনি মালুমাত, মজলিস খোদামুল আহমদীয়া, পাকিস্তান।
- ৪) হাদীকাতুস সালেহীন।

খোলাফায়ে রাশেদীন

প্র. খোলাফায়ে রাশেদীন বলতে কী বুঝায়? কাদেরকে খোলাফায়ে রাশেদীন বলা হয়?

উ. হ্যরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর তিরোধানের পর যে চারজন সাহাবী হ্যুর (সা.)-এর প্রতিনিধিত্বে সমগ্র আরব রাষ্ট্র ও মুসলিম সমাজের সর্বাধিনায়কত্ব করে গেছেন তাঁরাই মুসলিম জাহানের ইতিহাসে ‘খোলাফায়ে রাশেদীন’ নামে পরিচিত। তাঁদের উপাধি ছিল আমীরুল মু’মিনীন বা মু’মিনদের নেতা। এ চারজন মহাসম্মানিত পুণ্যবান পুরুষ হলেন- ১) হ্যরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.), ২) হ্যরত উমর ফার়ক (রা.), ৩) হ্যরত উসমান গণী (রা.), ৪) হ্যরত আলী মুর্তজা (রা.)।

প্র. খোলাফায়ে রাশেদীন রেজওয়ানুল্লাহি আলাইহিমগণের খিলাফতকাল উল্লেখ করুন।

- উ. ১) হ্যরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.): ১১ হিজরি-১৩ হিজরি (৬৩২-৬৩৪ ইং)
- ২) হ্যরত উমর ফার়ক (রা.): ১৩ হিজরি-২৪ হিজরি (৬৩৪-৬৪৮ ইং)
- ৩) হ্যরত উসমান গণী (রা.): ২৪ হিজরি-৩৫ হিজরি (৬৪৮-৬৫৬ ইং)
- ৪) হ্যরত আলী মুর্তজা (রা.): ৩৫ হিজরি-৪০ হিজরি (৬৫৬-৬৬১ ইং)

প্র. শায়খাইন কাদের বলা হয়? রসূল (সা.)-এর সাথে তাঁদের কী সম্পর্ক ?

উ. হ্যরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এবং হ্যরত উমর ফারংক (রা.)-কে একত্রে শায়খাইন বলা হয়। তাঁরা উভয়েই রসূল (সা.)-এর শশুর এবং খলীফা ছিলেন।

হ্যরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)

প্র. হ্যরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা-মায়ের নাম কী?

উ. তিনি ৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের বনি তাইম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম উসমান (ডাক নাম কোহাফা) এবং মাতার নাম উম্মুল খায়ের সালমা।

প্র. হ্যরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর আসল নাম কী?

উ. হ্যরত আব্দুল্লাহ বিন আবি কোহাফা (রা.)। তাঁর আসল নাম ছিল ‘আতীক’।

প্র. হ্যরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) তাঁর কোন কন্যাকে হ্যুর (সা.)-এর সাথে বিবাহ দেন?

উ. হ্যরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)।

প্র. হ্যরত আবু বকর (রা.)-এর একান্ত প্রচেষ্টার ফলে মক্কার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিগর্গ ইসলাম করুন করেছিলেন, তাদের কয়েকজনের নাম বলুন।

উ. হ্যরত উসমান (রা.), হ্যরত তালহা (রা.), হ্যরত যুবায়ের (রা.), হ্যরত আব্দুর রহমান (রা.), হ্যরত সাঁদ (রা.)।

প্র. হ্যরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর জীবদ্ধায় কাকে তাঁর (সা.) পরিবর্তে ইমামতি করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন?

উ. হ্যরত আবু বকর (রা.)-কে।

প্র. হ্যরত আবু বকর (রা.) খিলাফতে আসীন হয়েই সর্বপ্রথম কী কাজ করেন?

উ. হ্যরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নির্দেশিত হ্যরত উসামা বিন যায়েদ (রা.)-এর নেতৃত্বে ৭০০ সৈন্যের মুসলিম সেনাবাহিনী সিরিয়া অভিযানে প্রেরণ করেন।

প্র. হ্যরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতের সময় কয়েকজন ব্যক্তি মিথ্যা নবুওয়তের দাবি করেছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বলুন।

উ. বনু হানিফা গোত্রের মুসায়লামা কায়াব, ইয়েমেনের আসাদ আনসি, বনী আসাদ গোত্রের তোলায়হা, ইয়ারবু গোত্রের সাজাহ নাসী এক প্রিস্টান নারী।

প্র. হ্যরত মুহাম্মদ (সা.) হ্যরত আবু বকর (রা.)-এর সমানে কী বলেছেন?

উ. “যদি আমি আমার উম্মতের মধ্যে কাউকে বন্ধুরপে গ্রহণ করতাম তবে তাকেই (আবু বকরকে) বন্ধুরপে গ্রহণ করতাম।” (বুখারী, কিতাবুল মানাকিব)

প্র. পরিত্র কুরআন মজীদে হযরত আবু বকর (রা.)-কে কী সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে?

উ. সানিয়াসনাইনি (দু' জনের দ্বিতীয়)। সূরা তওবা : ৪০ নং আয়াত।

উ. রসূল (সা.)-এর পর কোন সাহাবী সর্বাধিক কুরআনের তত্ত্বকথা বুবাতে পারতেন?

উ. হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)।

প্র. কোন সূরা অবতীর্ণ হলে কোন সাহাবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যু সন্ধিকটে বুবাতে পেরে কাঁদতে শুরু করেন?

উ. সূরা আন্ন নাসর অবতীর্ণ হলে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)।

প্র. হযরত মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করে তাঁর উদ্দেশ্যে কী বলেছেন?

উ.

أَبُو بَكْرٍ أَفْصَلُ هُنْدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَيِّدًا

(আবু বাকরিন আফখালু হায়হিল উম্মাতি ইল্লা আইয়াকুনা নাবিয়ুন)

অর্থঃ আবু বকর এ উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যদি ভবিষ্যতে কোন নবী হন তিনি ব্যতীত। (কুন্যুল হাকায়েক ফি হাদিসি খায়ারুল খালায়িক, পৃ. ০৪ এবং জামেউস সগীর, ২য় খন্ড, পৃ. ১৩৭)।

প্র. হযরত আবু বকর (রা.) কত বছর খিলাফতের গুরুদায়িত্ব পালন করেন এবং কখন মৃত্যুবরণ করেন?

উ. ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের মে মাস থেকে ৬৩৪ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত। তিনি ২৩ আগস্ট ৬৩৪ সন মোতাবেক ১৩ হিজরির ২২ জামাদিউস সালি মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন।

হযরত উমর ফারুক (রা.)

প্র. হযরত উমর ফারুক (রা.) কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? তাঁর পিতা-মাতার নাম কী?

উ. হযরত উমর ফারুক (রা.) ৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত কুরাইশ বংশের আদিয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খাতাব এবং মাতার নাম খানতামাহ।

প্র. হ্যুর (সা.) কোন দুই উমরের জন্য দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ! তুমি এ উভয়ের মধ্যে থেকে একজনকে ইসলাম কবুল করার সৌভাগ্য দান কর?"

উ. ১) উমর বিন খাতাব ২) উমর বিন হিশাম।

প্র. হযরত উমর (রা.) কখন ইসলাম কবুল করার সৌভাগ্য লাভ করেন? ইসলাম গ্রহণের পর হ্যুর (সা.) তাঁকে কোন উপাধি প্রদান করেন?

উ. নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছরে ৩৩ বছর বয়সে তিনি ইসলাম কবুল করেন। ইসলাম গ্রহণের পর হ্যুর (সা.) তাঁকে ‘ফারুক’-অর্থাৎ, সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী উপাধিতে ভূষিত করেন।

প্র. হ্যরত উমর (রা.)-এর ডাকনাম কী ছিল?

উ. আবু হাফসা।

প্র. হ্যরত উমর (রা.) তাঁর কোন কন্যাকে হ্যুর (সা.)-এর সাথে বিবাহ দেন?

উ. হ্যরত হাফসা বিনতে উমর (রা.)।

প্র. হ্যরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর কোন সাহাবী সম্পর্কে বলেছেন, “যদি শয়তান তাকে কোন রাস্তায় চলতে দেখে তাহলে শয়তান ভিন্ন রাস্তায় পথ চলতে শুরু করে?”

উ. হ্যরত উমর ফারক (রা.)।

প্র. হ্যরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে উল্লেখযোগ্য কোন-কোন সাম্রাজ্য ও রাজ্য বিজয় হয়েছিল?

উ. পারস্য সাম্রাজ্য বিজয়, রোম সাম্রাজ্য বিজয়, যেরূবালোম বিজয়, মিসর বিজয়।

প্র. মজলিসে শূরা সর্বপ্রথম কোন খলীফা প্রতিষ্ঠা করেন?

উ. হ্যরত উমর ফারক (রা.)।

প্র. কোন খলীফার সময়কালে মদীনার মসজিদে নবৰ্বী এবং কাবাগৃহের সংস্কার সাধন শুরু হয়?

উ. হ্যরত উমর ফারক (রা.)।

প্র. হিজরি কামরি সনের প্রবর্তন কে করেন? এর মাস কয়টি ও কী কী?

উ. হ্যরত উমর ফারক (রা.)। হিজরি কামরি সনের মাস হল ১২ টি। এগুলো হল-
মহররম, সফর, রবিউল আউয়াল, রবিউস সানি, জমাদিউল আউয়াল, জমাদিউস সানি,
রজব, শাবান, রময়ান, শাওয়াল, যিলকদ, যিলহজ্জ।

প্র. যেরূবালোম বিজয়ের সময় খ্রিস্টান ধর্মগুরুর নাম কী ছিল?

উ. খ্রিস্টান পাদ্রী সফ্রোনিয়াস।

প্র. হ্যরত উমর (রা.) তাঁর জীবদ্ধশায় তাঁর মৃত্যুর পর খলীফা নির্বাচনের জন্য যে কমিটি গঠন করে যান তাদের সংখ্যা কয়জন ছিল এবং নাম কী কী?

উ. হ্যরত উমর ফারক (রা.) তাঁর মৃত্যুর পর খলীফা নির্বাচনের জন্য একটি কমিটি গঠন করে যান। এর সদস্য সংখ্যা ছিল ৬ জন। তারা হলেন- ১) হ্যরত উসমান (রা.), ২) হ্যরত আলী (রা.), ৩) হ্যরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.), ৪) হ্যরত আব্দুর রহমান বিন আওফ (রা.), ৫) হ্যরত তালহা (রা.), ৬) হ্যরত সাদ বিন আবু ওয়াক্বাস (রা.)। হ্যরত উমর (রা.) আরও বলেন, এ ছয়জনের মধ্যে যিনি সর্বাধিক সমর্থন লাভ করবেন, তিনিই খলীফা হিসেবে যোগ্যতম বিবেচিত হবেন।

প্র. হ্যরত উমর (রা.) কখন মৃত্যুবরণ করেন?

উ. হ্যরত উমর ফারক (রা.) মদীনার মসজিদে নামায়রত অবস্থায় আবু লুলু ফিরোজ
নামক পার্শ্ব গোলাম কর্তৃক ২৬ যিলহজ্জ ২৩ হিজরি গুরুতরভাবে আহত হন এবং ১লা

মহরম ২৪ হিজরি শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত উসমান গণী (রা.)

প্র. হযরত উসমান গণী (রা.) কোন বৎশে জন্মগ্রহণ করেন? তাঁর পিতা-মাতার নাম কী?

উ. হযরত উসমান গণী (রা.) মকার বিখ্যাত কুরাইশ বৎশের উমাইয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হল আফফান এবং মাতার নাম আরওয়াহ।

প্র. হযরত উসমান (রা.)-এর ডাকনাম কী ছিল? তিনি আরবে কী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন?

উ. ডাক নাম ছিল আবু আমর এবং আবুল্ফ্লাহ। তিনি আরবে গণী (সম্পদশালী) নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

প্র. কাকে যুন-নূরাইন (দুই নূরের অধিকারী) বলা হয় এবং কেন?

উ. হযরত উসমান গণী (রা.)-কে। কেননা তিনি ত্ব্যুর (সা.)-এর পুত্র দুই কন্যা হযরত রংকাইয়া (রা.) এবং হযরত উম্মে কুলসুম (রা.)-কে (একজনের মৃত্যুর পরে অন্যজনকে) বিবাহ করেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁকে এত বেশি ভালোবাসতেন যে তিনি একবার বলেছিলেন, তাঁর (সা.) যদি আরও একটি কন্যা সন্তান থাকতো, তাকেও তিনি উসমানের (রা.) সাথে বিবাহ দিতেন।

প্র. মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে হযরত উসমান (রা.) মদীনার কোন কৃপ, কত হাজার দিরহাম দিয়ে ত্রয় করে মুসলমানদের জন্য হিবা (দান) করে দিয়েছিলেন?

উ. মদীনার একমাত্র সুপেয় পানিয় জলের কৃপ ‘বিরে রূমা’। তিনি (রা.) বিশ হাজার দিরহাম দিয়ে এ কৃপ ত্রয় করে মুসলমানদের ব্যবহারের জন্য দান করে দিয়েছিলেন।

প্র. হযরত উসমান (রা.) কার নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে কী কারণে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিলেন?

উ. রসূল (সা.)-এর নির্দেশেই তাঁর স্ত্রী হযরত রুকাইয়া (রা.)-এর অসুস্থতার কারণে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিলেন।

প্র. কোন খলীফার আমলে মুসলিম নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়?

উ. ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান গণী (রা.)-এর খিলাফতকালে।

প্র. কোন ব্যক্তির কুচক্রান্ত ও স্বার্থপর নীতির কারণে হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে অরাজকতা ও অসন্তোষের সূচনা হয়?

উ. খলীফা হযরত উসমান (রা.)-এর জামাতা ও চাচাতো ভাই ‘মারওয়ান’ এর।

প্র. হযরত উসমান (রা.) কখন, কীভাবে শাহাদাত বরণ করেন?

উ. দীর্ঘ ১২ বছর অত্যন্ত নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং সততার সাথে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও আবুল্ফ্লাহ বিন সাবার নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জুন মোতাবেক ১৮ যিলহজ্জ ৩৫ হিজরি সনে হযরত উসমান (রা.)-এর গৃহে প্রবেশ করে

কুরআন পাঠরত ৮২ বছরের বৃদ্ধ খলীফার ওপর কাপুরঘোচিত হামলা করে তাঁকে শহীদ করে দেয়।

প্র. হ্যরত উসমান (রা.)-এর কোন স্ত্রী তাঁকে বিদ্রোহীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে গিয়ে হাতের অঙ্গুলি হারান?

উ. হ্যরত নাইলা।

হ্যরত আলী মুর্তজা (রা.)

প্র. হ্যরত আলী (রা.) কবে কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন? তাঁর পিতা-মাতার নাম কী?

উ. হ্যরত আলী (রা.) ৬০০ খ্রিস্টাব্দে মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের হাশেমী গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হল হ্যরত আবু তালিব এবং মায়ের নাম ছিল হ্যরত ফাতেমা। তিনি হ্যুর (সা.)-এর আপন চাচাতো ভাই ছিলেন।

প্র. হিজরতের সময় কোন সাহাবী নিজ মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে শক্র পরিবেষ্টিত গৃহে আঁ-হ্যরত (সা.)-এর বিছানায় শায়িত ছিলেন?

উ. হ্যরত আলী মুর্তজা (রা.)।

প্র. হ্যরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর কোন কন্যাকে হ্যরত আলী (রা.)-এর সাথে বিবাহ দেন? তাদের কয়জন সন্তান-সন্ততি ছিল?

উ. হ্যরত ফাতেমাতুয় যোহরা (রা.)-কে। হ্যরত ফাতেমা (রা.)-এর গর্ভে হ্যরত হাসান (রা.), হ্যরত হোসেন (রা.) এবং মুহসীন নামে তিনটি ছেলে এবং যয়নব এবং উম্মে কুলসুম নামে দুটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। মুহসীন বাল্যকালে মারা যান। হ্যরত আলী (রা.) হ্যরত ফাতেমা (রা.)-এর জীবদ্ধশায় দ্বিতীয় কোন বিবাহ করেননি।

প্র. খায়বার যুদ্ধের অসামান্য বীরত্বের জন্য হ্যুর (সা.) হ্যরত আলী (রা.)-কে কৌ উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন?

উ. আসাদউল্লাহ (আল্লাহর সিংহ)।

প্র. হৃদায়বিয়া সন্ধির লেখক কে ছিলেন?

উ. হ্যরত আলী (রা.)।

প্র. কোন যুদ্ধাভিযানের সময় হ্যুর (সা.) হ্যরত আলী (রা.)-কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিয়ন্ত নিযুক্ত করেন? তখন হ্যুর (সা.) হ্যরত আলীকে উদ্দেশ্যে করে কী বলেছিলেন?

উ. তাবুকের যুদ্ধের সময়। হ্যুর (সা.) তখন বলেছিলেন-

يَا عَلِيٌّ أَمَا سُرْضِيَ أَنْ تَحْكُونَ مِنِّي كَهَارُونَ مِنْ مُؤْسِيَ غَيْرَ آنَّكَ لَدُستَ نِيَّةً -

(ইয়া আলিয় আমা তারয়া আন তাকুনা মিন্নি কাহারুনা মিম্ মূসা গায়রা আল্লাকা লাসতা নাবিয়্যান)

অর্থ: হে আলী! তুমি কী এতে সম্প্রস্ত নও যে, তুমি আমার নিকট সেক্রেট মর্যাদার অধিকারী যেরেপু মূসার নিকট হারংনের। তবে পার্থক্য হল, আমার পরে তুমি নবী হবে না। (তাবাকাতি কবির, ৫ম খন্ড, পৃ.১৫)।

প্র. হ্যুর (সা.)-এর নির্দেশে হ্যরত আলী (রা.) কখন, কোথায় ইসলাম প্রচারের জন্য গমন করেন?

উ. আঁ-হ্যরত (সা.)-এর নির্দেশে হিজরি দশম সালে ইয়েমেনে ইসলাম প্রচারের জন্য যান।

প্র. হ্যরত আলী (রা.)-এর অসামান্য বীরত্বের জন্য হ্যুর (সা.) তাঁকে কোন তরবারী প্রদান করেছিলেন?

উ. ‘জুলফিকার’ নামক তরবারী।

প্র. হ্যরত আলী (রা.)-এর খিলাফতকালে মুসলমানদের মাঝে কয়টি গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ও কী কী?

উ. তিনটি গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এগুলো হল- ১) জঙ্গে জামাল (উষ্ট্রের যুদ্ধ) ২) সিফিফিনের যুদ্ধ ৩) নাহরাওয়ানের যুদ্ধ।

প্র. ‘উষ্ট্রের যুদ্ধ’ নাম হ্বার কারণ কী?

উ. এ যুদ্ধে মুসলমানদের একটি পক্ষের সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব হ্যরত আয়েশা সিদিকা (রা.) উষ্ট্রের পিঠে অবস্থান করে দিয়েছিলেন বিধায় এ যুদ্ধ জঙ্গে জামাল বা উষ্ট্রের যুদ্ধ নামে ইতিহাসে খ্যাত।

প্র. হ্যরত আলী (রা.) মদীনা থেকে কোথায়, কী কারণে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন?

উ. কুফায়। আর এটি করার কারণ ছিল খিলাফতের পূর্বাঞ্চলে সুশাসন এবং বিশেষ করে বেদুইনদের পদান্ত করে সাম্রাজ্য শান্তি প্রতিষ্ঠা।

প্র. খারিজী কারা ছিল?

উ. হ্যরত আলী (রা.)-এর খিলাফতকালে যারা দুমার সালিশে অসম্প্রস্ত হয়ে হ্যরত আলী (রা.)-এর পক্ষ ত্যাগ করেছিল, তারাই ইসলামের ইতিহাসে খারিজী নামে পরিচিত। তারা ছিল ইসলামের গোঁড়াপঢ়ী ও চরমপঢ়ী সম্প্রদায়। প্রথম দুই খলীফাকে মানলেও যেহেতু তাদের মতে শেষ দু'জন খলীফা ইসলামের শক্তিদের সাথে মীমাংসা বা আলোচনা করতে চেষ্টা করেছিলেন, সেজন্য তারা এই শেষ দু'জন খলীফার চরম বিরোধিতা করে। এদের মতে, বংশ-গোত্র নির্বিশেষে সার্বজনীনতার ভিত্তিতে খলীফা নির্বাচিত হবে। কোন ব্যক্তি ইসলামের পাঁচটি স্তুতি পালনে ব্যর্থ হলে তারা তাকে কাফের হিসেবে গণ্য করে থাকে।

প্র. হ্যরত আলী (রা.) কবে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন?

উ. হ্যরত আলী (রা.) আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম খারিজীর বিষাক্ত ছুরির আঘাতে
গুরুতররূপে আহত হন এবং ২১ রময়ান ৪০ হিজরি মোতাবেক ৬৬১ খ্রিস্টাব্দের
জানুয়ারি মাসে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন।

তথ্যসূত্র :

- ১) সীরাতে খাতামান্নাবীঙ্গন, প্রণেতা : হ্যরত সাহেবযাদা মির্যা বশির আহমদ, এম.এ
(রা.)।
- ২) দীনি মাল্যমাত, মজলিস খোদামুল আহমদীয়া, পাকিস্তান।
- ৩) ইসলামের ইতিহাস, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।
- ৪) পকেট বুক, প্রণেতা : হ্যরত মাওলানা গোলাম ফরিদ খাদেম সাহেব।

আসহাবে রসূল (সা.) [রসূল (সা.)-এর সাহাবীগণ]

প্র. মদীনার প্রথম মুসলমান কে?

উ. নাজর গোত্রের প্রধান হয়রত আবু উসামা আসাদ বিন জুরাকাহ (রা.)।

প্র. সাহাবাদের (রা.) প্রথম ‘ইজ্ম’ (সর্ববাদীসম্মত মত) কখন ও কীভাবে সংঘটিত হয়েছিল?

উ. মহানবী (সা.)-এর প্রেম ও মহবতে বিভোর শোকাহত সাহাবীগণ তাঁর ওফাত লাভের বিষয়টি সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছিলেন না। হয়রত উমর (রা.) এতই শোকাভিভূত ও বেদনায় মুহুমান ছিলেন যে, মসজিদে নববীতে কোষমুক্ত তরবারী উত্তোলন করে তিনি ঘোষণা করলেন, যে কেউ বলবে, হয়রত মুহাম্মদ (সা.) মৃত্যুবরণ করেছেন, তার শিরশ্চেদ করা হবে। মসজিদে উপস্থিত অবশিষ্ট সাহাবীগণ নীরব হয়ে থাকলেন। এমতাবস্থায় হয়রত আবু বকর (রা.) মসজিদে প্রবেশ করে মিষ্রে দাঁড়িয়ে তেলওয়াত করলেন-

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

(ওয়ামা মুহাম্মাদুন্‌ ইল্লা রাসূলুন, কান্দ খালাত্ মিন् ক্লাবলিহির রসূল)

অর্থ: এবং মুহাম্মদ (সা.) কেবল একজন রসূল। তাঁর পূর্বেকার সব রসূল অবশ্যই গত হয়েছেন। (সুরা আলে ইমরান : ১৪৫)।

এ আয়াত তেলওয়াত করার পর সকল সাহাবা বিনা ব্যতিক্রমে মেনে নিয়েছিলেন, মহানবী (সা.) তাঁর পূর্ববর্তী সকল রসূলের ন্যায় মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাঁর পূর্ববর্তী সব রসূলও তাঁর ন্যায় গত হয়েছেন বা ওফাত লাভ করেছেন।

প্র. আশারাহ মুবাশ্বারাহ (বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ জন) কারা ছিলেন?

উ. মহানবী (সা.) তাঁর দশজন প্রিয় সাহাবীকে তাঁদের জীবন্দশায়ই বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন। তাঁরা হলেন-

- (১) হয়রত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)
- (২) হয়রত উমর বিন আল খাতাব (রা.)
- (৩) হয়রত উসমান বিন আফ্ফান (রা.)
- (৪) হয়রত আলী বিন আবু তালিব (রা.)
- (৫) হয়রত আব্দুর রহমান বিন আওফ (রা.)
- (৬) হয়রত আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ (রা.)
- (৭) হয়রত সাঈদ বিন যায়িদ (রা.)
- (৮) হয়রত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রা.)

(৯) হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.)

(১০) হযরত সান্দ বিন আবু ওয়াকাস (রা.)

প্র. কোন এক মুক্ত ক্রীতদাসের নাম বলুন যাকে হ্যুর (সা.) সেনাবাহিনীর উচ্চ পদে নিযুক্ত করেছিলেন?

উ. মু'তা-এর যুদ্ধে হযরত যায়েদ বিন হারিস (রা.)-কে। এ যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

প্র. হযরত রসূল করিম (সা.)-এর দরবারের বিখ্যাত কবির নাম লিখুন এবং তাঁর একটি পংক্তি লিখুন।

উ. হযরত হাসান বিন সাবেত (রা.)। তাঁর ভালোবাসাপূর্ণ একটি পংক্তি হল-

فَإِنَّ أَبِي وَالدَّهَةَ وَعِرْضَى لِعِرْضُ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَاءُ

(ফাইনা আবি ওয়া ওয়ালিদাহু ওয়া ই'রফি লিয়িরফি মুহাম্মাদিন মিনকুম বিকায়ু) অর্থ: হে রসূল (সা.)-এর শক্রগণ! নিশ্চয় আমার বাবা ও তাঁর বাবা আর আমার সমস্ত মান-সম্মান হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সম্মান-মর্যাদার খাতিরে তোমাদের সম্মুখে ঢালশৰপ।

প্র. একজন বিখ্যাত মুসলমান মহিলা সাহাবী কবির নাম বলুন।

উ. হযরত খানসা রায়িআল্লাহু আনহা।

প্র. ইসলামের প্রথম মুহায়ারিন কে?

উ. হযরত বেলাল (রা.)

প্র. মকার বাইরে প্রথম মোবাল্লেগ কে?

উ. হযরত মুসায়েব বিন উমায়ের (রা.)

প্র. সেসব বিশিষ্ট সাহাবীদের নাম লিখুন যাঁরা কাতেবে ওহী বা ওহী-ইলহাম লেখার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন?

উ. হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.), হযরত খালীফ বিন সাঈদ বিন আল্ আস (রা.), হযরত হানযালা বিন আর রবী আল আসদী (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা (রা.), হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.), হযরত আবাস বিন সাঈদ আল্ আস (রা.), হযরত মুআইকীর বিন আবী ফাতিমা (রা.), হযরত সারজিল বিন হাসনাহ (রা.) (এরপে প্রায় ৪০ জন ওহী লেখক ছিলেন)।

[ফতুল বারী, ৯ম খন্ড, পৃ. ১৯, অধ্যায়: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ওহী বিষয়]।

প্র. একজন কাতেবে ওহী (ওহী লিখক) মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলেন, তার নাম কী?

উ. আব্দুল্লাহ বিন সান্দ আবি সারাহ।

প্র. হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, “তোমরা চার ব্যক্তির নিকট কুরআন শিখ”-সে

চারজন ব্যক্তির নাম লিখুন।

উ. ১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), ২) হযরত আবু হৃষায়ফা (রা.)-এর মুক্ত ক্রীতদাস হযরত সালেম (রা.), ৩) হযরত উবাই বিন কাব (রা.), ৪) হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা.)।

প্র. 'সাইফুল্লাহ' (আল্লাহর তরবারী) কে?

উ. আঁ-হযরত (সা.) বীর মুসলিম সেনানী হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-কে 'সাইফুল্লাহ' উপাধি দিয়েছিলেন।

প্র. হযরত আবু হৃষায়রা (রা.)-এর আসল নাম কী? তাঁকে আবু হৃষায়রা বলা হয় কেন?

উ. হযরত আবু হৃষায়রা (রা.)-এর আসল নাম উয়ায়ের। তিনি একটি বিড়াল পুষ্টেন এবং বিড়ালটিকে খুব ভালোবাসতেন। এজন্য নবী করিম (সা.) তাঁকে আদর করে আবু হৃষায়রা (বিড়ালের পিতা) বলে ডাকতেন।

প্র. এমন এক মুক্ত ক্রীতদাসের নাম বলুন যিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ কুরাইশদের কাছে ছেড়ে দিয়ে হিজরত করে মদীনায় এসেছিলেন? তখন হ্যুর (সা.) তাঁকে কী বলেছিলেন?

উ. হযরত সোহায়েব রুমী (রা.)। হ্যুর (সা.) তাঁকে বলেন, "সোহায়েব তোমার এই বর্তমান সওদা তোমার পূর্বেকার সমস্ত সওদার চাইতে বেশি লাভজনক।"

প্র. হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দুই চাচা তাঁর উপর ঈমান এনেছিলেন যাদেরকে হ্যুর (সা.) খুবই ভালবাসতেন। তাদের নাম লিখুন?

উ. ১) হযরত হাময়া বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.) ২) হযরত আবুবাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.)।

প্র. আস্হাবে সুফ্ফা কারা?

উ. আঁ-হযরত (সা.)-এর প্রতি গভীর অনুরাগ ও ভালোবাসার কারণে যারা বেশিরভাগ সময়ই মসজিদে পড়ে থাকতেন যাতে তারা হ্যুর (সা.)-এর পরিত্র মুখনিঃস্ত কোন কথা শোনা থেকে বাধ্যত না হন, তাদেরকেই আস্হাবে সুফ্ফা বলে। 'সুফ্ফা' মসজিদে নব্বীর অংশ-বিশেষ। উপরোক্ত সাহাবাগণ সুফ্ফায় বসবাস করতেন বিধায় তাদেরকে 'আস্হাবে সুফ্ফা' বলা হত।

প্র. এমন একজন মহিলা সাহাবীয়ার নাম বলুন যিনি হ্যুর (সা.)-এর সাথে বহু যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন?

উ. হযরত উমেম আম্বারা (রা.)।

প্র. এমন একজন সাহাবীর নাম বলুন যিনি বালক বয়স থেকে হ্যুর (সা.)-এর মৃত্যু অবধি তাঁর খেদমতে উৎসর্গীকৃত ছিলেন?

উ. হযরত আনাস বিন মালেক (রা.)।

প্র. কোন সাহাবীকে হত্যা করার সময় তিনি জল্লাদের সম্মুখে মাথা পেতে দিয়ে এ পংক্তি বলেছিলেন, "আমি যখন মুসলমান থাকা অবস্থায় নিহত হতে যাচ্ছি তখন আমার কোন

অঙ্কেপ নেই যে, আমার ধড় কোন দিকে পড়বে, এ সমস্ত কিছু খোদার জন্য। আমার খোদা চাইলে আমার দেহের খড়-বিখড় করা টুকরোগুলোর উপর অশেষ কল্যাণ ও আশিষ বর্ষিত হতে থাকবে।”

উ. হযরত খোবায়েব (রা.) ।

প্র. যখন বিবে মাউনা নামক স্থানে সন্তুর জন হাফেয়ে কুরআনকে শহীদ করা হচ্ছিল তখন তাদের অনেকে মুখ থেকে কী শব্দ-উচ্চারণ করেছিলেন?

উ. **اللّٰهُ أَكْبَرُ فِي ذٰلِكَ وَرَبُّ الْكَوْنَاتِ**

(আল্লাহ আকবর, ফিযতু ওয়া রাবিল কা'বাতি)

অর্থ: আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, কা'বার মালিকের কসম! আমি আমার লক্ষ্যে পৌছে গেছি।

প্র. কোন সাহাবীর উপাধি ‘যুল জানাহাইন’ (দুই ডানাধারী) ছিল?

উ. হযরত জাফর বিন আব্দুল মুতালিব (রা.)। (বুখারী) ।

প্র. কোন সাহাবীকে উদ্দেশ্য করে ভ্যুর (সা.) বলেছিলেন, “প্রত্যেক নবীর হাওয়ারী থাকে। নিশ্চয় আমার হাওয়ারী হল—”?

উ. হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)। (বুখারী) ।

প্র. কোন সাহাবীকে উদ্দেশ্য করে ভ্যুর (সা.) এ দোয়া করেছিলেন, “আল্লাহমা আল্লিমহুল হিকমাতা”, “হে আল্লাহ! তাকে তুমি অশেষ প্রজ্ঞা শিক্ষা দাও?” (বুখারী) ।

উ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবুস (রা.) ।

প্র. রসূল (সা.) কোন দুইজন সাহাবীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, “এরা দু'জন জান্নাতের যুবকদের সর্দার এবং এ পৃথিবীতে আমার দু'টি সুগন্ধিযুক্ত ফুল”? (বুখারী) ।

উ. আঁ-হযরত (সা.)-এর প্রিয় দুই দৌহিত্র হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.) ও হযরত হোসেন ইবনে আলী (রা.) ।

প্র. ভ্যুর (সা.) হযরত খাদীজা (রা.)-এর সম্মানে কী বলেছেন?

উ. মরিয়ম ছিলেন (তৎকালীন দুনিয়ার) সকল নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আর খাদীজা হলো সমগ্র নারী জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (বুখারী) ।

প্র. রসূল (সা.) কাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, “প্রত্যেক উম্মতের একজন বিশ্বস্ত লোক থাকে, আমার উম্মতের বিশ্বস্ত লোকটি হল—”?

উ. হযরত আবু উবায়দা ইবনে জাবরাহ (রা.)। (বুখারী) ।

প্র. এমন একজন চরম বিরুদ্ধবাদীর নাম বলুন যাকে ভ্যুর (সা.) তার কৃতকর্মের জন্য হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছিলেন?

উ. হযরত ইকরামা ইবনে আবু জাহল (রা.) ।

প্র. মসজিদে নববীর যে জায়গা রসূল (সা.) দু'জন এতীম বালকের কাছ থেকে ক্রয় করে

নিয়েছিলেন তাদের নাম কী?

উ. হয়রত সাহল (রা.) ও হয়রত সোহায়েল (রা.) ।

প্র. মসজিদে নববী নির্মাণের সময় সাহাবারা ইট, মাটি উঠানের সময় হয়রত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ (রা.)-এর যে সমস্ত পংক্তি আবৃত্তি করতেন তার একটি বলুন?

উ. **هَذَا أَبْرَزَتْ بَأْطَهُرٌ هَذَا الْعِمَالُ لِأَجِمَالٍ خَنِيبَر**

(হাযাল হিমালু লা হিমালা খায়বারা হায়া আবারকু রাবানা ওয়া আতহারু)

অর্থ: এ বোৰা খায়বারের ব্যবসায়িক দ্রব্যাদী নয় যা গাধার উপর চড়ানো হয়ে থাকে বৰং হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! এই বোৰা তাকওয়া ও পবিত্রতার বোৰা যা আমরা তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য উত্তোলন করছি।

প্র. ঐতিহাসিক বিখ্যাত আরবী পংক্তিমাল্য ‘সাব’-আ মুআল্লাকাত (সাতটি ঝুলন্ত কবিতা)-এর একজন কবি হ্যুর (সা.)-এর পবিত্র সাহাবী হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, তাঁর নাম কী?

উ. হয়রত লবীদ বিন রাবিঁ’আ (রা.) ।

প্র. ইহুদীদের মাঝে সর্বপ্রথম কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে হ্যুর (সা.)-এর সাহাবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন?

উ. হয়রত হুসাইন বিন সালাম (রা.) ।

প্র. মদীনায় হিজরতের পরে মুহাজিরদের মধ্যে সর্বপ্রথম কোন শিশু জন্মগ্রহণ করেন?

উ. হয়রত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) । পিতা: হয়রত যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) যিনি হ্যুর (সা.)-র ফুফাতো ভাই ছিলেন। হয়রত আব্দুল্লাহর মায়ের নাম ছিল হয়রত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.)। যিনি হয়রত আয়েশা (রা.)-র বড় বোন ছিলেন।

প্র. কোন সাহাবী হ্যুর (সা.)-এর বিশেষ লেখকরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর (সা.) নির্দেশে হিব্রু ভাষা শিখেছিলেন?

উ. হ্যুর (সা.)-এর চিঠিপত্র প্রেরণ, গ্রহণ ও যোগাযোগের পরিধি বৃদ্ধি পাবার কারণে হ্যুর (সা.) হয়রত যায়েদ বিন সাবেত (রা.)-কে তাঁর বিশেষ লেখক বা প্রাইভেট সেক্রেটারীরূপে নিযুক্ত করেছিলেন। হ্যুর (সা.)-এর নির্দেশে তিনি মাত্র ১৫ দিনে হিব্রু ভাষার উপর বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন।

প্র. কোন সাহাবীর ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরা আবাসা অবতীর্ণ হয়?

উ. অন্ধ সাহাবী হয়রত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) ।

প্র. পবিত্র কুরআনে কোন তিনজন সাহাবীর তওবা কবুল হয়েছে মর্মে ওই অবতীর্ণ হয়েছিল এবং এর উল্লেখ কোথায় আছে?

উ. সেই তিনজন সাহাবী হলেন- (১) হয়রত কাব বিন মালেক (রা.), (২) হয়রত হিলাল বিন উমাইয়া (রা.), (৩) হয়রত মুরারাহ বিন রাবি (রা.)। তাবুক যুদ্ধে অলসতা করে না

যাওয়ার কারণে হ্যুর (সা.)-এর নির্দেশে মুসলমানরা তাদের সাথে কথাবার্তা বন্ধ রাখেন এবং তারা সমাজচ্যুত অবস্থায় ৫০ দিন অতিবাহিত করেন। এ সময় তারা খোদার দরবারে সকাতরে অনুতপ্ত হয়ে দোয়া ও কাল্পনাকাটি করতে থাকেন। ফলক্ষণিতে আল্লাহ তাল্লা সুরা তওবার ১১৮ নং আয়াত অবতীর্ণ করে তাদের তওবা কবুল হয়েছে মর্মে ঘোষণা করেন।

প্র. কোন সাহাবীয়াকে ‘যাতুন নিতাকায়ন’ (দুই বন্ধনীর অধিকারী) নামে ডাকা হয় এবং কেন?

উ. হ্যরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.)-কে। কেননা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হিজরতের পূর্ব মুহূর্তে খাবার ও পানীয় যে দু'টি পাত্রে ভর্তি করা হয়েছিল, তা বাঁধার জন্য কোন কিছু না পাওয়ার কারণে তিনি তাঁর কোমরবন্ধনীর কাপড় লাশালমি দু'ভাগ করে পাত্র দু'টির মুখ বেঁধে দিয়েছিলেন। এ কারণে তাঁর নাম ‘যাতুন নিতাকায়ন’ হয়ে গিয়েছিল।

তথ্যসূত্র:

- ১) সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাকেব।
- ২) দীনি মাল্যমাত, মজলিস খোদামুল আহমদীয়া, পাকিস্তান।
- ৩) সীরাতে খাতামান্নাবীষ্টিন, হ্যরত মির্যা বশির আহমদ, এম.এ. (রা.)।
- ৪) হাদীকাতুস সালেহীন।

বুয়ুর্গানে ইসলাম (ইসলামের প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গ)

প্র. ফিকাহ শাস্ত্রের উৎস কয়টি ও কী কী?

উ. ফিকাহ শাস্ত্রের উৎস চারটি। এগুলো হল- ১) কুরআন, ২) সুন্নত ও হাদীস, ৩) ইজমা, ৪) কিয়াস।

প্র. সুন্নত কাকে বলে?

উ. হ্যুর আকরাম (সা.)-এর কাজ এবং তাঁর কার্য-পদ্ধতিকেই সুন্নত বলা হয়।

প্র. ফিকাহ শাস্ত্রের চারজন ইমামের নাম লিখুন।

- উ. (১) হ্যরত ইমাম আবু হানীফা (রহ.) [৮০ হিজরি-১৫০ হিজরি]।
- (২) হ্যরত ইমাম মালিক ইবনে আলাস (রহ.) [৯৫ হিজরি-১৭৯ হিজরি]।
- (৩) হ্যরত ইমাম শাফী (রহ.) [১০৫ হিজরি-২০৪ হিজরি]।
- (৪) হ্যরত ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হামল (রহ.) [১৬৪ হিজরি-২৪১ হিজরি]।
- প্র. ‘তাবেঙ্গেন’ কাদের বলা হয়? দু’জন বিখ্যাত তাবেঙ্গেনের নাম লিখুন।
- উ. ‘তাবেঙ্গেন’ তাদেরই বলা হয় যারা সাহাবীদের সংস্কর্ষে এসে ফয়েয় (আধ্যাত্মিক

কল্যাণ) লাভ করেছিলেন। হ্যরত হাসান বসরী (রহ.) এবং হ্যরত ওয়ায়েস কারণী (রহ.) ছিলেন দু'জন বিখ্যাত তাবেঙ্গেন।

প্র. পর্যায়ক্রমে উম্মতে মুহাম্মদীয়াতে আবির্ভূত প্রত্যেক শতাব্দীর মুজাদ্দিদগণের নাম লিখুন।

- উ. প্রথম শতাব্দী : হ্যরত উমর বিন আব্দুল আয়ীয় (রহ.)
 - দ্বিতীয় শতাব্দী : হ্যরত ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এবং
হ্যরত ইমাম আহমদ বিন হাষাল (রহ.)
 - তৃতীয় শতাব্দী : হ্যরত ইমাম আবু শারাহ (রহ.) এবং
হ্যরত ইমাম আবুল হাসান আশআরী (রহ.)
 - চতুর্থ শতাব্দী : হ্যরত ইমাম আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরী (রহ.) এবং
হ্যরত কাজী আবু বকর বাকলানী (রহ.)
 - পঞ্চম শতাব্দী : হ্যরত ইমাম গায্যালী (রহ.)
 - ষষ্ঠ শতাব্দী : হ্যরত সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)
 - সপ্তম শতাব্দী : হ্যরত ইমাম ইবনে তাহিমিয়া (রহ.) এবং
হ্যরত খাজা মষ্টনুল্লীন চিশতী আজমিরী (রহ.)
 - অষ্টম শতাব্দী : হ্যরত ইমাম হাফেয় ইবনে হাজর আসকালানী (রহ.) এবং
হ্যরত সালেহ বিন ওমর (রহ.)
 - নবম শতাব্দী : হ্যরত আল্লামা জালাল উদ্দিন সুযুতি (রহ.)
 - দশম শতাব্দী : হ্যরত ইমাম মোহাম্মদ তাহের গুজরাটি (রহ.)
 - একাদশ শতাব্দী : হ্যরত মোজাদ্দেদ আলফে সানী আহমদ সারহিন্দী (রহ.)
 - দ্বাদশ শতাব্দী : হ্যরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলভী (রহ.)
 - ত্রয়োদশ শতাব্দী : হ্যরত সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরলভী (রহ.)
- (নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী প্রণীত : “ হজাজুল কিরামা ফি আসারিল
কাদিমাহ”, পৃ. ১২৭-১২৯)।
- চতুর্দশ শতাব্দী : হ্যরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রূত মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)।
 - প্র. কোন একজন মুসলমান সুফি মহিলার নাম বলুন।
 - উ. হ্যরত রাবেয়া বসরী (রহ.)।
 - প্র. হ্যরত নেয়ামত উল্লাহ ওলী সম্পর্কে কিছু বলুন।
 - উ. হ্যরত নেয়ামত উল্লাহ (রহ.) দিল্লীর একজন পরম আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের অধিকারী,
দিব্যদর্শন লাভকারী এবং অলৌকিক মোজেয়া প্রদর্শনকারী দরবেশ ছিলেন। তাঁর
আধ্যাত্মিক পরম উৎকর্ষতার সাক্ষ্য পাওয়া যায় হ্যরত ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কে তাঁর

- একটি ফারসি কবিতা থেকে—যা শতাব্দীর পর শতাব্দী লোকমুখে প্রচলিত আছে।
 প্র. হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.) তাঁর কোন পুস্তকে হ্যরত শাহ নেয়ামত উল্লাহ (রহ.) ও তাঁর কাসীদা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন?
 উ. নিশানে আসমানী।
 প্র. হ্যরত নেয়ামত উল্লাহ (রহ.)-এর দু'টি পংক্তি লিখুন— যা থেকে মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা প্রমাণিত হয়।
 উ. বাংলা অনুবাদ :
 ১) যখন বসন্তবিহীন শীতকাল— অর্থাৎ, ত্রয়োদশ শতাব্দীর হেমন্তকাল অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন চতুর্দশ শতাব্দীর বসন্তের সূর্য উদয় হবে—যুগের মুজাদিদ আগমন করবে।
 ২) যখন তাঁর যুগ অতি সফলতার সাথে অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন তাঁর আদর্শ ও মর্যাদাবিশিষ্ট পুত্র তাঁর স্মৃতিস্মরণ থাকবে। (নিশানে আসমানী, বাংলা অনুবাদ, পৃ. ২৬)
 প্র. হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.) কোন মাসলা-মাসায়েলের সমাধানের জন্য কুরআন, সুন্নত ও হাদীসের পর কোন ইমামের মতকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার প্রদান করতে বলেছেন?
 উ. হ্যরত ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-র।
 প্র. কাকে দ্বিতীয় উমর বলা হয়?
 উ. উমাইয়া খলীফা হ্যরত উমর বিন আবুল আযিয (রহ.)-কে।
 প্র. হ্যরত ইমাম গায়্যালী (রহ.) কী পুস্তক রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন?
 উ. ইমাম গায়্যালী দর্শন শাস্ত্রের উপর ‘কিমিয়ায়ে সাদাত’ নামক পুস্তক রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।
 প্র. মুসলিম বিশ্বের সুফিকূল শিরোমণি কে ? তাঁর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থের নাম কী?
 উ. হ্যরত মুহাউদ্দিন ইবনে আরাবী (রহ.)। গ্রন্থের নাম হল “ফুতুহাতে মক্কীয়া”।

তথ্যসূত্র:

- ১) দ্বীনি মালুমাত, মজলিস খোদামুল আহমদীয়া, পাকিস্তান।
- ২) ফিকাহ আহমদীয়া।

ইসলামের ইতিহাস

- প্র. কত প্রিস্টাদে ইসলামের প্রকাশ হয়?
 উ. ৬১০ প্রিস্টাদে।
 প্র. ওরাকা বিন নাওফাল কে?

উ. তিনি ছিলেন হয়রত খাদীজা (রা.)-এর চাচাতো ভাই এবং খ্রিস্টান পণ্ডিত। যখন আঁ-হযরত (সা.) নিজের প্রথম ওহী লাভের অভিজ্ঞতা ওরাকা বিন নাওফালের কাছে বর্ণনা করেন তখন তিনি বলেছিলেন, ‘আমি নিশ্চিত, আপনার ওপর সেই ফিরিশ্তাই নাযিল হয়েছে, যে ফিরিশ্তা মুসা (আ.)-এর ওপর নাযিল হয়েছিল। হায়! আমি যদি সেদিন জীবিত থেকে আপনাকে সাহায্য করতে পারতাম—যেদিন আপনার জাতি আপনাকে বিতাড়িত করবে।’

প্র. হাবশায় হিজরত করা সম্পর্কে কী জানেন?

উ. যখন মক্কার কুরাইশদের অত্যাচার সীমা অতিক্রম করল তখন রসূল (সা.)-এর নির্দেশে নবুওয়তের পঞ্চম বছরে কিছু সংখ্যক মুসলমান পুরুষ, নারী ও শিশু হাবশায় (আবিসিনিয়ায়) হিজরত করেন। মক্কাবাসীরা হাবশার বাদশাহ নাজাশীকে অনেকবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে উভেজিত করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। বরং বাদশাহ মুসলমানদের সাথে ন্যায়পরাণ্যতার সাথে আচরণ করতে থাকেন। হাবশার বাদশাহ পরবর্তীতে নিজেও ঈমান আনয়ন করেন। তিনি সর্বপ্রথম মুসলমান বাদশাহ ছিলেন।

প্র. চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মোজেয়া কী ছিল?

উ. মক্কার কিছু কাফের হ্যুর (সা.)-কে বারবার মোজেয়া (আলৌকিক ঘটনা) প্রদর্শন করতে বলে। হ্যুর (সা.) তাদের উপর্যুক্তি কথার প্রেক্ষিতে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার মোজেয়া প্রদর্শন করে দেখান। এ ঘটনার বিবরণ কুরআন মজীদের সূরা কমরের ০২ নং আয়াত থেকে ০৭ নং আয়াত পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।

প্র. আ'মুল হায়ন (দুঃখের বছর) বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

উ. শি'বে আবু তালিব বা আবু তালিবের উপত্যকায় অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার কিছুদিন পরই রসূল আকরাম (সা.) পালাক্রমে দু'টি দুঃখজনক ঘটনার সম্মুখীন হন। অর্থাৎ, হযরত খাদীজা (রা.) এবং হযরত আবু তালিব উভয়ই একজনের পর অন্যজন ইস্তেকাল করেন। তাদের উভয়ের মৃত্যুতে হ্যুর (সা.) বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়েন। এ কারণে নবুওয়তের দশম বছরকে ‘আ'মুল হায়ন’ বা দুঃখের বছর বলা হয়।

প্র. মিরাজ ও ইসরার মাঝে পার্থক্য কী?

উ. ‘মিরাজ’ হ্যুর (সা.)-এর সেই আধ্যাত্মিক সফরকে বলা হয় যার মাধ্যমে তাঁকে মক্কা থেকে আল্লাহ'র দরবার পর্যন্ত নেয়া হয়েছিল। মিরাজ সফরে তিনি আধ্যাত্মিকভাবে আকাশের স্তরগুলো সফর করেছিলেন। সূরা নজরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। ‘ইসরার’ অপর একটি আধ্যাত্মিক সফর যা হ্যুর (সা.)-কে মক্কা থেকে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত করানো হয়েছিল। সূরা বলী ইসরাইলে এ সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে।

প্র. আকাবার প্রথম বয়াত কী?

উ. নবুওয়তের দ্বাদশতম বছরে মদীনার ১২ সদস্যের একটি দল হজ্জ করার জন্য মক্কায় আগমন করে। এদের মধ্যে পাঁচজন পূর্বের বছর মুসলমান হয়েছিলেন। হ্যুর (সা.)

তাদের সাথে আকাবা (প্রশস্ত পাহাড়ী রাস্তা) নামক স্থানে সাক্ষাৎ করে ইসলামের দাওয়াত দিলে অবশিষ্ট সাতজনও ইসলাম গ্রহণ করতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। তখন হ্যুর (সা.) তাদের নিম্নে বর্ণিত শর্তের ওপর আমল করার অঙ্গীকার নিয়ে বয়াত গ্রহণ করেন।
শর্তগুলো হল-

১) আল্লাহ তাঁ'লার একত্ববাদে সর্বদা বিশ্বাস রাখবে, ২) কখনো শিরক করবে না, ৩) ছুরি করবে না, ৪) ব্যভিচার করবে না, ৫) কাউকে হত্যা করবে না, ৬) কারো ওপর অপবাদ আরোপ করবে না, ৭) প্রত্যেক পুণ্যকাজে সর্বান্তকরণে হ্যুর (সা.)-এর একনিষ্ঠ আনুগত্য করবে। ইসলামের ইতিহাসে এ বয়াতই ‘আকাবার প্রথম বয়াত’ নামে প্রসিদ্ধ।
প্র. আকাবার দ্বিতীয় বয়াত কী?

উ. মহানবী (সা.) মক্কায় থাকাকালে মদীনা হতে নও-মুসলিমদের একটি দল ৬২২ খ্রিস্টাব্দে হজ্জের সময়ে আকাবার উপত্যকায় মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাত করে। এ সাক্ষাতে তাঁরা শপথ করেন, মহানবী (সা.) মদীনায় গেলে তারা তাঁর (সা.)-এর নিরাপত্তার জিম্মাদার থাকবেন। এ বয়াতে ৭০ জন পুণ্যাত্মা অংশ নেন। ইসলামের ইতিহাসে এটিই ‘আকাবার দ্বিতীয় বয়াত’ নামে পরিচিত। বয়াতের পর হ্যুর (সা.) হ্যরত মূসা (আ.)-এর ন্যায় তাদের মধ্য থেকে ১২ জন ‘নকীব’ (নেতা) নিযুক্ত করেন-যারা হ্যুর (সা.)-এর পক্ষ থেকে নিজ-নিজ গোত্রের তত্ত্বাবধান করবে এবং তাদের প্রত্যেকেই নিজ গোত্রের জন্য তাঁর (সা.) কাছে জবাবদিহি করবে।

প্র. মদীনায় হিজরত করা সম্পর্কে কী জানেন?

উ. হ্যুর (সা.) আল্লাহ তাঁ'লার আদেশে ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদীনার দিকে হিজরত করেন। হিজরত করার সময় হ্যরত আবু বকর (রা.) তাঁর সাথী ছিলেন। পথিমধ্যে তারা মক্কা থেকে তিন মাইল দক্ষিণে অনুর্বর, শুষ্ক, তৃণলতাহীন পাহাড়ের ‘সওর’ নামক গুহায় আশ্রয় নেন। মক্কার কাফেররা পদচিহ্ন অনুসন্ধান করতে-করতে গুহার মুখে এসে উপস্থিত হয়। এমনকি শক্রদের পা গুহার ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাঁ'লার আশ্র্য পরিকল্পনার ফলে তারা গুহায় প্রবেশ না করে ফিরে যায়। এমতাবস্থায় হ্যরত আবু বকর (রা.) যখন হ্যুর (সা.)-এর ধরা পড়ার আশংকায় ভীত-সন্ত্রিত হয়ে পড়লেন তখন তিনি (সা.) তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন, “লা তাহ্যান ইন্নাল্লাহা মা-আনা”- অর্থাৎ, ভয় করো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর সোমবার তারা উভয়ে সওর গুহা থেকে বের হয়ে মদীনা অভিযুক্তে রওনা দেন।

(সীরাতে খাতামান্নাবিঙ্গন, পৃ. ২৩৯ ও দ্বীনি মাল্যমাত, ম.খো.আ.পাকিস্তান, পৃ. ২৭)

প্র. মদীনায় হিজরত করার সময় কোন ব্যক্তি হ্যুর (সা.)-এর পশ্চাদ্বাবন করেছিল? তাঁর সম্বন্ধে কী ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল? তা কবে পূর্ণ হয়েছিল?

উ. সওর গুহা হতে বের হয়ে হ্যুর (সা.) এবং হ্যরত আবু বকর (রা.) যখন মদীনার পথে রওয়ানা হলেন তখন যথেষ্ট পুরস্কারের লোভে ‘সুরাকা বিন মালিক’ তাঁদের

পশ্চাদ্বাবন করে তাঁদের নিকটবর্তী হলে হ্যুর (সা.) তাকে দেখে বললেন: “সুরাকা সেই সময় তোমার কী অবস্থা হবে যখন তোমার হাতে কিসরার (পারস্যের সম্রাটের) কংকন থাকবে?” এ ভবিষ্যদ্বাণী হ্যরত উমর (রা.)-এর খিলাফতের সময় পারস্য সম্রাজ্য বিজয়ের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে। পুরুষের স্বর্ণ ব্যবহার যদিও নিষিদ্ধ তবুও এ মহান ভবিষ্যদ্বাণী, যার মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্বের এবং হ্যরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতা ও ইসলামের সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়, এর পূরণার্থে হ্যরত উমর (রা.) সুরাকাকে পারস্য সম্রাটের স্বর্ণের কংকন পরিধান করান।

প্র. হিজরতের পর আঁ-হ্যরত (সা.) সর্বপ্রথম কোন মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন?

উ. মসজিদে কুবা। এটি মদীনা হতে দুই বা আড়াই মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত। আনসারদের গোত্রগুলোর মধ্য থেকে বেশ কয়েকটি পরিবার এখানে বসবাস করত। আঁ-হ্যরত (সা.) মুক্ত হতে হিজরতের পর এ স্থানে ১০/১২ দিন অবস্থান করার পর মদীনায় যান।

প্র. মদীনায় মহানবী (সা.)-এর আগমনের সময় তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে মদীনার আনসার মহিলা ও শিশুরা যে পংক্তি আবৃত্তি করছিল তা বলুন?

উ.

مَلَعُ الْبَرْعَاعِيَّةِ مِنْ ثَرَيَّاتِ الْوَدَاعِ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَادَعَ عَالِيَّوَدَاعِ

(তালা'-আল বাদরং আ'লায়না মিন সানিয়্যাতিল বাদায়ি
ওয়াজাবাশ্শ শুকরুন আ'লায়না মা দা'-আ লিল্লাহি দাঁস্ট)

অর্থ: আজ আমাদের ওপর বিদা পাহাড়ের উপত্যকা থেকে পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হয়েছে। এজন্য এখন আমাদের ওপর সর্বদা খোদার কৃতজ্ঞতা আদায় আবশ্যিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্র. মদীনার পূর্ব নাম কী ছিল?

উ. মদীনার পূর্ব নাম ছিল ইয়াসরেব (রোগের শহর)। যখন হ্যুর (সা.) এ স্থানে আগমন করলেন তখন থেকে এ শহরের নাম হল ‘মদীনাতুর রসূল’ (রসূলের শহর)। (সীরাতে খাতামান্নাবীদিন, পৃ. ২৬১)।

প্র. হিজরতের প্রাথমিক দিনগুলোতে হ্যুর (সা.) কুবায় এবং মদীনায় কোন-কোন সাহাবীর বাড়িতে অবস্থান করেন?

উ. কুবাতে হ্যরত কুলসুম বিন হিদাম (রা.) এবং মদীনায় হ্যরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর বাড়িতে।

প্র. মদীনায় কোন-কোন গোত্রের বসতি ছিল?

উ. আনসারদের দু'টি গোত্র আওস এবং খায়রাজ। আর ইহুদীদের তিনটি গোত্র বনু কায়নুআকা, বনু নয়ীর এবং বনী কুরায়য়া।

প্র. ইসলামী পরিভাষায় ‘গাযওয়া’ এবং ‘সারিয়া’-এর মাঝে পার্থক্য কী?

উ. ‘গাযওয়া’ হলো সে যুদ্ধ যেখানে ভ্যুর (সা.) স্বয়ং উপস্থিত হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন আর ‘সারিয়া’ হলো যে যুদ্ধে রসূল (সা.) কোন কারণে অংশগ্রহণ করতে পারেননি।

প্র. ‘মুয়াখাত’ (আত্ম বন্ধন) কী?

উ. মঙ্গা হতে হিজরতকারীদের (মুহাজিরদের) জন্য আঁ-হ্যরত (সা.) নির্দেশ দেন যেন মদীনার প্রতিটি মুসলিম একজন মুহাজিরকে নিজের ভাই হিসেবে বরণ করে নেয়। একেই ইসলামের ইতিহাসে ‘মুয়াখাত’ বলা হয়।

প্র. বদরের যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে সাহাবাদের আভাবিলীনতার একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন।

উ. বদরের যুদ্ধের পূর্বে আঁ-হ্যরত (সা.) সাহাবাদের কাছে পরামর্শ চাচ্ছিলেন। এমন সময়ে আনসারদের সর্দার হ্যরত মেকদার বিন আমর (রা.) দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন, “হে আল্লাহর রসূল! আমরা মূসা (আ.)-এর সঙ্গীদের ন্যায় আপনাকে কখনও বলব না, তুমি আর তোমার প্রভু যাও এবং শক্রদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো, আমরা এখানেই বসে থাকলাম বরং আমরা আপনার ডানে লড়বো, আপনার বামে লড়বো, আপনার সামনে লড়বো, আপনার পিছনে লড়বো। হে আল্লাহর রসূল! যে সকল দুশ্মন আপনার ক্ষতি সাধন করতে এসেছে তারা আপনাকে কখনও স্পর্শ করতে পারবে না যতক্ষণ তারা আমাদের লাশের ওপর দিয়ে যায়।”

প্র. বদরের যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়েছিল এবং কতজন অংশগ্রহণ করেছিলেন?

উ. হিজরতের দ্বিতীয় সনে ১৭ রম্যান শুক্রবার মোতাবেক ১৪ মার্চ ৬২৩ খ্রিস্টাব্দে কাফির এবং মুসলমানদের মাঝে বদরের প্রাঞ্চের এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধকে ‘ইয়াও-মুল ফুরকান’- অর্থাৎ, সত্য-মিথ্যার পার্থক্যের দিনও বলা হয়ে থাকে। এতে ৩১৩ জন মুসলিম সৈন্য এবং কাফিরদের ১০০০ সৈন্য যোগাদান করে। এতদসত্ত্বেও লাঞ্ছনার সাথে কাফিরদের পরাজয় বরণ করতে হয়। (সীরাতে খাতামানাবীষ্টিন, পৃ.৩৫৭)

প্র. উভদ যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়েছে?

উ. উভদের যুদ্ধ হিজরতের তৃতীয় বছরের শাওয়াল মাস মোতাবেক মার্চ ৬২৪ সালে মদীনার ০৫ মাইল পশ্চিমে উভদ নামক উপত্যকায় অনুষ্ঠিত হয়। যুদ্ধে মুসলমানগণ প্রথমে বিজয় লাভ করে কিন্তু হ্যরত আবুল্ফ্লাহ বিন জাবির (রা.)-এর নেতৃত্বে এক দল তীরন্দাজ বাহিনীকে আঁ-হ্যরত (সা.) একটি গিরিখাদের উপর পাহারায় নিযুক্ত করেছিলেন। বিজয় দেখে সেনাপতির হকুম অমান্য করে আনন্দের অতিশয়ে গিরিখাদে নিযুক্ত হওয়া সৈন্যরা যুদ্ধ ময়দানে উপস্থিত অন্যান্য মুসলিম সৈন্যদের সাথে বিজয়ানন্দে অংশগ্রহণ করতে এলে মুসলমানদের বিজয় অনিষ্টিত হয় এবং হ্যরত হাময়া (রা.)-সহ ৭০ জন সাহাবা শহীদ হন। এদের মধ্যে ৬ জন ছিলেন মুহাজির আর অন্যান্য সকল শহীদ ছিলেন আনসার। এ যুদ্ধে রসূল (সা.)-এর দাঁত মোবারক শহীদ হয় এবং তিনিসহ ১২ জন সাহাবা গুরুতর আহত হন।

(সীরাতে খাতামান্নাবীঙ্গন, পৃ. ৫০০ এবং দীনি মাল্যমাত, ম.খো.আ.পাকিস্তান, পৃ. ২৯) প্র. কীভাবে তালহা (রা.)-এর হাত উহুদের যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়?

উ. উহুদের যুদ্ধের এক পর্যায়ে যখন হয়রত তালহা (রা.) লক্ষ্য করলেন, শক্রপক্ষ আঁ-হয়রত (সা.)-কে লক্ষ্য করে অজস্র তীর নিক্ষেপ করছে, তখন তিনি তাঁর হাত রসূল (সা.)-এর মুখের সামনে তুলে ধরে আড়াল দিলেন। তীরের পর তীর তাঁর হাতে এসে পড়েছিল। আর সেই মহান অনুগত সাহাবী (রা.) হাত একটুও সরাচ্ছিলেন না এই ভেবে যে, তীর আঁ-হয়রত (সা.)-এর পরিত্র মুখমণ্ডলে না আবার আঘাত করে। এভাবে তীরের আঘাতে-আঘাতে হয়রত তালহা (রা.)-এর হাত ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়।

প্র. আহয়াবের যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়? একে খন্দকের যুদ্ধ বলা হয় কেন?

উ. পঞ্চম হিজরি সনের শাওয়াল মাস মোতাবেক ৬২৭ খ্রিস্টাব্দে এ যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে আঁ-হয়রত (সা.)-এর বিশিষ্ট সাহাবী হয়রত সালমান ফারাসি (রা.)-এর পরামর্শক্রমে মদীনার চতুর্দিকে পরিখা খনন করা হয়, তাই এ যুদ্ধ পরিখা বা খন্দকের যুদ্ধ নামেও খ্যাত।

প্র. ‘বয়াতে রিয়ওয়ান’ কী? কুরআন করীমের কোন সূরায় এর উল্লেখ করা হয়েছে?

উ. হৃদায়বিয়ার সন্ধির খুব সংকটাপন্ন অবস্থায় প্রায় ১৫০০ জন সাহাবী সকল প্রকারের কুরবানী করার জন্য আঁ-হয়রত (সা.)-এর হাতে যে বয়াত করেন, তা-ই ‘বয়াতে রিয়ওয়ান’ নামে পরিচিত। এটা সেই বয়াত যার মাধ্যমে মুসলমানরা খোদাঁ তাঁলার পরম সন্তুষ্টি লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। সূরা ফাতাহৰ ১১-১৯ নং আয়াতে এ সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্র. হৃদায়বিয়ার সন্ধি বলতে কী বুঝেন?

উ. ষষ্ঠ হিজরির ফিলকদ মাস মোতাবেক ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে হৃদায়বিয়া নামক স্থানে মুসলমান এবং কাফিরদের মাঝে একটি সন্ধি হয়। এটাই হৃদায়বিয়ার সন্ধি নামে খ্যাত।

প্র. হাবশায় হিজরতকারীগণ কোন বিজয় লাভের পর হাবশা থেকে ফিরে আসেন?

উ. খায়বার যুদ্ধে বিজয় লাভের পর। আঁ-হয়রত (সা.) তাদের ফিরে আসাতে এত বেশি আনন্দিত হয়েছিলেন যে, তিনি বলেছিলেন, “জানি না আমি কিসে বেশি আনন্দিত-খায়বার বিজয়ের জন্য নাকি জাফরের আগমনের জন্য।”

প্র. গাযওয়া ‘ঘাতুর রিকা’ (পটি দেওয়া যুদ্ধ) কখন সংঘটিত হয় আর এ যুদ্ধের এরকম নামকরণ হওয়ার কারণ কী?

উ. এ গাযওয়া সপ্তম হিজরির জমাদিউস সানি মাসে ‘নজদ’ এলাকার দিকে সংঘটিত হয়। সফরের কাঠিন্য আর বাহন সম্পত্তির কারণে সাহাবীদের পায়ের চামড়ায় ক্ষত সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। অনেকের পায়ের নখ ফেঁটে রক্ত বের হচ্ছিল। তখন সাহাবীরা নিজেদের কাপড় ছিঁড়ে পায়ের মধ্যে পটি দিতে থাকে। যখন সে কাপড় রক্তে ভিজে যাচ্ছিল তখন পুনরায় সাহাবারা বার বার নতুন করে পটি দিতে থাকে। আর এভাবে তারা সমস্ত রাস্তা

অতিক্রম করে। এ কারণে এ যুদ্ধের নাম ‘যাতুর রিকা’ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

প্র. মক্কা বিজয় সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

উ. অষ্টম হিজরির রমযান মাস মোতাবেক ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে নবী আকরাম (সা.) দশ হাজার পবিত্রাত্মা সাহাবীদের নিয়ে মক্কা বিজয় করেন। মক্কাবাসীর সীমাহীন অত্যাচার, নিপীড়ন এবং মাত্রাতিরিক্ত দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও হ্যুর (সা.) ক্ষমা, অনুকম্পার এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করে মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন এই বলে—

لَا شَرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيُومَ إِذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الْطَّلَقاءُ

(লা তাসরিবা আলায়কুমুল ইয়াওমা ইয়হাবু ফাআনতুমুত তুলাকায়ু)

অর্থাৎ, আজকের দিনে তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই। যাও, তোমরা সবাই স্বাধীন।

প্র. মক্কা বিজয়ের পর যখন আঁ-হ্যরত (সা.) পবিত্র কাৰ্বা গৃহে সংরক্ষিত মূর্তিগুলো ভাঙ্গিলেন তখন তিনি কুরআনের কোন আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন?

جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ أَبَاطِلٌ إِنَّ أَبَاطِلَ كَانَ رَهْوًا ^①

(জাআল হাকু ওয়া যাহাকুল বাতিলু ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুকা)

অর্থ: সত্য এসেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, নিশ্চয় মিথ্যা বিলীন হওয়ারই যোগ্য। (সূরা বনী ইসরাইল: ৮২)।

প্র. তাবুকের যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়? এ যুদ্ধের অপর নাম কী?

উ. এ যুদ্ধ নবম হিজরি মোতাবেক ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়। একে গাযওয়া-এ-উসরা (কষ্টের যুদ্ধ) নামেও ডাকা হয়। কেননা এ যুদ্ধে মুসলমানদেরকে অনেক দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর সফর করতে হয় এবং অত্যন্ত কষ্টকর সফর অসীম ধৈর্যের সাথে সম্পন্ন করতে হয়।

প্র. বিদায় হজ্জ বলতে কী বুঝেন?

উ. দশম হিজরি মোতাবেক ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে আঁ-হ্যরত (সা.)-এর ওপর হজ্জের সময় এ আয়াত অবতীর্ণ হয় “আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ করলাম। আর আমি ইসলামকে তোমাদের জন্য ধর্মরূপে মনোনীত করলাম।” (সূরা মায়দাঃ ০৮)। এরপর তিনি (সা.) এ আয়াত মুজদালেফার ময়দানে হজ্জের উদ্দেশ্যে সমবেত মানুষের সামনে উচ্চস্থরে পাঠ করে শুনান। তারপর হ্যুর (সা.) আরাফাতের ময়দানে দাঁড়িয়ে উপস্থিত মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন— যা পরবর্তীতে ‘বিদায় হজ্জের ভাষণ’ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ ভাষণে তিনি উম্মতকে ‘আল বিদা’ বলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক রীতিনীতির মূল বিষয়াবলী অত্যন্ত সুন্দর-সাবলীলভাবে উপস্থাপন করে গিয়েছেন। হ্যুর আকরাম (সা.)-এর জীবনের এটিই ছিল সর্বশেষ হজ্জ।

প্র. ১) হিলফুল ফুয়ুল, ২) দারুন নদওয়া, ৩) শিংবে আবু তালিব, ৪) হাজরে আসওয়াদ, ৫) আরাফাত, ৬) দারে আরকাম বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

উ. (১) **হিলফুল ফুয়ুল (শান্তিসংঘ):** প্রাচীন আরবের কিছু সন্তান্ত ব্যক্তি মনে করল আমরা সম্মিলিতভাবে এই অঙ্গীকার করি যে, সর্বদা নিপীড়িত মানুষকে সাহায্য করব, অন্যায়ের প্রতিবাদ করব, অধিকার বাধিতদের তাদের অধিকার আদায় করে দিতে সার্বিক সহযোগিতা করব। ‘ফুয়ুল’ শব্দটি আরবি ‘ফফল’ শব্দের বহুবচন। এই অঙ্গীকারকারী ব্যক্তিদের মধ্যে তিন ব্যক্তির নাম ‘ফফল’ ছিল। এ কারণে পরবর্তীতে এই অঙ্গীকার ‘হিলফুল ফুয়ুল’ নামে সুখ্যাতি লাভ করে।

(২) **দারুন নদওয়া (পরামর্শ গৃহ):** কুসাই বিন কিলাব কাবা শরীফের নিকটে একটি গৃহ তৈরী করেছিলেন। কুরাইশরা এ গৃহে একত্রিত হয়ে তাদের প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী আলোচনা করতেন। এ গৃহকেই ‘দারুন নদওয়া’ বলা হয়।

(৩) **শিংবে আবু তালিব (আবু তালিবের উপত্যকা):** এটি মক্কার একটি পাহাড়ী উপত্যকার নাম। যার মালিক ছিলেন হুয়ুর (সা.)-এর আপন চাচা হযরত আবু তালিব। এ উপত্যকাতেই বনু হাশিম, বনু আব্দুল মুতালিব গোত্র হুয়ুর (সা.)-এর সাথে তিন বছর পর্যন্ত অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল।

(৪) **হাজরে আসওয়াদ (ক্ষণ পাথর):** কাবা শরীফের এক পার্শ্বে অবস্থিত একটি বিশেষ কালো পাথর যাকে হজের সময় তাওয়াফকালে চুম্বন করতে হয় বা চুম্বন করতে না পারলে হাত দিয়ে ইশারা করতে হয়। এ প্রাক্ত থেকেই তাওয়াফ শুরু করতে হয় এবং প্রতি চক্রে শেষে একে চুম্বন করতে হয়।

(৫) **আরাফাত:** এটি সে ময়দান যেখানে ৯ মিলহজ্জ তারিখে হাজীরা একত্রিত হয়ে থাকে। যোহর ও আসর নামায জমা করে পড়ে এবং ইমাম সাহেবের খুতুবা শুনে। কিয়ামে আরাফাত বা আরাফাতে অবস্থান হজের অন্যতম একটি প্রধান ফরয়।

(৬) **দারে আরকাম (আরকামের গৃহ):** এটি হল হযরত আরকাম বিন আরকাম (রা.)-এর সেই গৃহ যেটিকে হুয়ুর (সা.) নবুওয়তের ৪৮ বছর থেকে শুরু করে নবুওয়তের ৬ষ্ঠ বছর পর্যন্ত ইসলাম প্রচার এবং তালীম-তরবিয়তের কেন্দ্র বানিয়েছিলেন। এ জন্য ইতিহাসে এই গৃহ ‘দারুল ইসলাম’ (ইসলামের গৃহ) নামে বিশেষভাবে পরিচিত।

প্র. হযরত ইমাম হাসান (রা.) এবং হযরত ইমাম হোসেন (রা.) কবে জন্মগ্রহণ করেন?

উ. হযরত ইমাম হাসান (রা.) তৃতীয় হিজরির রময়ান মাসে— অর্ধাং রোখসাতানার প্রায় দশ মাস পর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর চেহারা, আকার-আকৃতি ও প্রকৃতির সাথে হুয়ুর (সা.)-এর অনেক বেশি সাদৃশ্য ছিল। তাঁকে ৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে বিষপ্রয়োগে শহীদ করা হয়। হযরত ইমাম হোসেন (রা.) ৪৮ হিজরির শাবান মাসে জন্মগ্রহণ করেন।

তথ্যসূত্র:

- ১) দ্বিনি মাল্যমাত, মজলিস খোদায়ুল আহমদীয়া, পাকিস্তান।
- ২) সীরাতে খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা : হ্যরত সাহেবযাদা মির্যা বশির আহমদ, এম.এ. (রা.) ।

বিবিধ (১)

প্র. কার শাসনামলে পবিত্র কুরআনের মধ্যে হরকত (যবর, যের, পেশ, সাকিন ইত্যাদি) সন্নিবেশিত করা হয়?

উ. হাজাজ বিন ইউসুফ -এর।

প্র. বিখ্যাত মুসলমান চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকের নাম লিখুন।

উ. বু আলী সিনা (চিকিৎসক), জাবির ইবনে হাইয়ান (বৈজ্ঞানিক) এবং ইবনে রশ্মদ (দার্শনিক)।

প্র. ‘জান্নাতুল বাকী’ কী ?

উ. মদীনার প্রসিদ্ধ কবরস্থান যেখানে আঁ-হ্যরত (সা.)-এর পবিত্র স্তুগণ, সাহাবা (রিজওয়ানুল্লাহি আলায়হিম) এবং রসূল করিম (সা.)-এর আহলে বায়েত (বংশধর) সমাহিত আছেন।

প্র. উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? এ বংশের রাজত্বকাল কত বছর ছিল?

উ. হ্যরত আমীর মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রা.) কর্তৃক হিজরি ৪১ সন মোতাবেক ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে বনী উমাইয়াদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং হিজরি ১৩২ মোতাবেক ৭৪৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় মারওয়ানের সময় এদের পতন হয়।

প্র. আবুরাসীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? এ বংশের রাজত্বকাল কত বছর ছিল?

উ. আবু আবুস আব্দুল্লাহ বিন সাফফাহ কর্তৃক হিজরি ১৩২ সন মোতাবেক ৭৪৯ খ্রিস্টাব্দে আবুরাসীয় বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং হিজরি ৬৫৬ মোতাবেক ১২৫০ খ্রিস্টাব্দে হালাকু খান কর্তৃক শেষ বাদশাহ মু'তাসিম বিল্লাহ নিহত হলে এ বংশের রাজত্বের পতন ঘটে।

প্র. মিশর, পারস্য, স্পেন ও সিন্ধু বিজেতাগণের নাম লিখুন।

উ. মিশর : হ্যরত আমর ইবনুল আস (রা.), পারস্য : হ্যরত সাদ বিন আবু ওয়াকাস (রা.), স্পেন : তারিক বিন ফিয়াদ এবং সিন্ধু : মুহাম্মদ বিন কাসিম।

প্র. গায়েবানা জানায়ার নামায কখন থেকে শুরু হয়?

উ. অবিসিনিয়ার বাদশাহ আসহামাহ নাজাশীর মৃত্যুর পর নবী করিম (সা.) তার মরদেহের অনুপস্থিতিতে জানায়ার নামায আদায় করেন। তখন থেকেই গায়েবানা জানায়ার নামাযের সূচনা ঘটে।

প্র. কারবালায় হযরত ইমাম হোসেন (রা.)-এর মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনা কত খ্রিস্টান্দে সংঘটিত হয়?

উ. ইয়াখিদ ইবনে মুয়াবিয়ার শাসনামলের ১০ মহররম ৬১ হিজরি মোতাবেক ১০ অক্টোবর ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে।

প্র. সর্বপ্রথম আরবি অভিধান ও আরবি ব্যাকরণ কে প্রণয়ন করেন? এগুলোর নাম কী?

উ. প্রথম আরবি অভিধান প্রণয়ন করেন হযরত খালিদ বিন আহমদ। এই অভিধান ‘কিতাবুল আইন’ নামে পরিচিত। তার পারস্যবাসী শিষ্য সিবাওয়াহ প্রথম আরবি ব্যাকরণ পুস্তক রচনা করেন। এ পুস্তক ‘আল কিতাব’ নামে পরিচিত।

প্র. বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

উ. আবুরাসীয় খলীফা আবু জাফর আল মনসুর (৭৬২-৭৬৬ খ্রি.)।

প্র. ঐতিহাসিক ক্রুসেডের সময় কোন মুসলিম সেনানায়কের রণকৌশল ও দক্ষতার বলে মুসলমানরা পবিত্র নগরী যেরূষালেম নিজেদের দখলে রাখতে পেরেছিল?

উ. হযরত গাজী সালাহউদ্দীন আইয়ুবী (রহ.)-এর।

প্র. বিশেষ ইতিহাসের সর্বপ্রথম সংবিধানের নাম কী? এ সন্দ কয়টি শর্ত সম্বলিত ছিল?

উ. মদীনা সন্দ। এটি ৪৭টি শর্ত সম্বলিত ছিল।

প্র. স্পেনে মুসলমানরা কত বছর পর্যন্ত রাজত্ব করেছিল?

উ. প্রায় ৭০০ বছর পর্যন্ত।

প্র. স্পেনের রাজপ্রাসাদ ‘আল হামরা’-য় আরবি লিপিতে কী লিখিত রয়েছে?

উ.

الْعَزَّةُ لِلَّهِ، الْقُدْرَةُ لِلَّهِ، الْحُكْمُ لِلَّهِ، لَا يَغْلِبُ إِلَّا اللَّهُ۔

(আল ইয়মাতু লিল্লাহি, আল কুদরাতু লিল্লাহি, আল হক্ম লিল্লাহি, লা গালিবা ইল্লা আল্লাহ্)

অর্থ: মহা সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ'র জন্য, মহা প্রতাপ ও শক্তি আল্লাহ'র জন্য, শাসন ক্ষমতাও আল্লাহ'র জন্য। আল্লাহই একমাত্র বিজয়ী।

তথ্যসূত্র:

- ১) দীনি মাল্যমাত, মজলিস খোদামুল আহমদীয়া, পাকিস্তান।
- ২) ইসলামের ইতিহাস, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

ইসলামের পুনর্জাগরণ

(আখাৰিন যুগ)

- হয়েছে মির্ধা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
- হয়েছে মসীহ মাওউদ (আ.)-এর কতিপয় ইলহাম ও ভবিষ্যদ্বাণী
- আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস
- আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বয়আত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত
- হয়েছে খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)
- হয়েছে খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)
- হয়েছে খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.)
- হয়েছে খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)
- হয়েছে খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)
- বিবিধ - ২

অষ্টম পরিচেন্দ

হ্যরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)

প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী

প্র. মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যত্বাণী অনুযায়ী হ্যরত মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.) কে? তিনি কবে এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন?

উ. হ্যরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। তিনি ১২৫০ হিজরির ১৪ শাওয়াল মৌতাবেক ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার ভারতের বাটালা পরগণার গুরুদাসপুর জেলার ‘কাদিয়ান’ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

প্র. তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা এবং শ্রদ্ধেয় মাতার নাম কী?

উ. পিতার নাম: হ্যরত মির্যা গোলাম মর্তুজা সাহেব (তিনি কাদিয়ানের সর্দার ছিলেন); মাতার নাম: হ্যরত চেরাগ বিবি সাহেবা।

প্র. বাল্যকালে হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.) কাদের কাছে শিক্ষা লাভ করেন?

উ. হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.) সর্বপ্রথম মুসী ফযল ইলাহী সাহেবের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীতে মৌলভী ফযল আহমদ সাহেবের কাছে কিছু আরবি ব্যাকরণ এবং মৌলভী গুল আলী শাহ সাহেবের কাছে আরবি ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। এছাড়া পিতার কাছে তিনি হেকিমী শাস্ত্রের উপর কিছু বই নিয়েও পড়াশুনা করেন। তিনি কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেননি।

প্র. হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.) যৌবনে কোথায় চাকুরী করেছিলেন?

উ. ১৮৬৪ সালে সিয়ালকোটে শেরেঙ্গাদারের চাকুরী করেছিলেন যেমন আমাদের প্রিয় নবী হ্যরত মুহাম্মদ (সা.) হ্যরত খাদীজা (রা.)-এর অধীনে ব্যবসায় করেছিলেন।

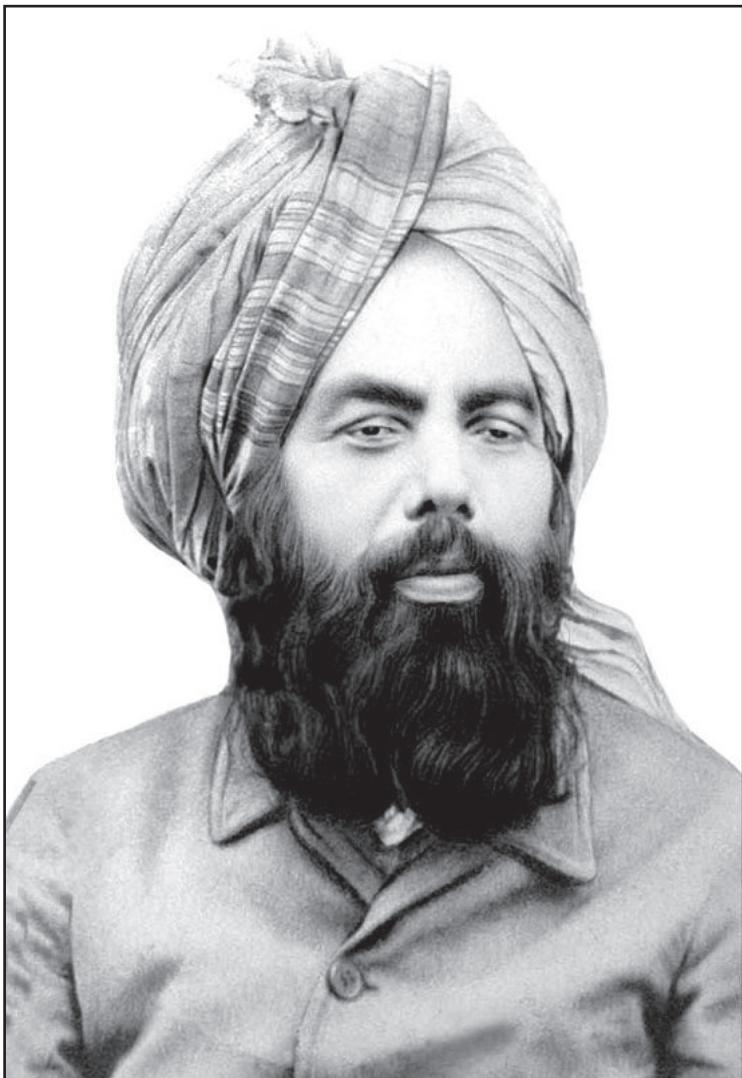
প্র. হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বিরণে সর্বপ্রথম কখন মামলা দায়ের করা হয় এবং তা কে করেছিল?

উ. ১৮৭৭ সনে রালইয়ারাম নামক এক খ্রিস্টান ব্যক্তি। এই মামলা ‘ডাকঘর মামলা’ নামে খ্যাত।

প্র. হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর দ্বিতীয় বিবাহ কোন বৎশে এবং কার সাথে সম্পন্ন হয়?

উ. ১৮৮৪ সালের ১৭ নভেম্বর দিল্লীর বিখ্যাত সুফি হ্যরত খাজা মীর দর্দ (রহ.)-এর বৎশে উম্মুল মু'মিনীন হ্যরত সাইয়েদা নুসরত জাহাঁ বেগম সাহেবা (রা.)-এর সাথে হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.) দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

প্র. হ্যরত মসীহ নাসেরী (আ.) এবং হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ‘ইরহাস’ কে ছিলেন? (‘ইরহাস’ অর্থ সেই ব্যক্তি যে তার পরবর্তীতে আগমনকারী ব্যক্তির জন্য নির্দর্শন



হ্যরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রূত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)
জন্ম: ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫, মৃত্যু: ২৬ মে ১৯০৮

ও স্মৃতিচিহ্নস্মরণ হয়ে থাকেন)

উ. হযরত মসীহ নাসেরী (আ.)-এর ইরহাস হযরত ইয়াহিয়া (আ.) ছিলেন। ইঞ্জিলে যাকে ‘যোহন’ নামে সম্মোধন করা হয়েছে। আর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ইরহাস হযরত সৈয়দ আহমদ বেরলভী (রহ.) ছিলেন।

প্র. হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ভূশিয়ারপুর সফর আহমদীয়াতের ইতিহাসে কেন বিখ্যাত?

উ. তিনি ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ভূশিয়ারপুরে সফর করেন। তিনি সেখানে চল্লিশ দিন পর্যন্ত একান্তে চল্লিকাশি করেন— অর্থাৎ, পৃথক হয়ে ইবাদতে মগ্ন থাকেন। এ সময়ে তিনি ‘মুসলেহ মাওউদ’ সংক্রান্ত মহা সুসংবাদ প্রাপ্ত হন।

প্র. বয়াতের দশটি শর্তের ঘোষণা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কখন করেছিলেন?

উ. ১৮৮৯ সনের ১২ জানুয়ারি ‘তাকমীলে তৰলীগ’ নামক বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে।

প্র. তিনি কখন এবং কোথায় প্রথম বয়াত নেয়া শুরু করেন? কারা সেদিন বয়াত করেছেন?

উ. তিনি ২০ রাজব, ১৩১০ হিজরি মোতাবেক ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ তারিখে লুধিয়ানা নিবাসী হযরত সূফী আহমদ জান সাহেবের মহল্লা জাদীদস্ত গ্রহে প্রথম বয়াত নেয়া শুরু করেন। সেদিন ৪০ জন ভুয়ুর (আ.)-এর হাতে বয়াত গ্রহণ করেন। তাঁদের মাঝে সর্বপ্রথম বয়াত করেন হেকিম মাওলানা নূরগন্দীন সাহেব (রা.)। এছাড়া উল্লেখযোগ্য আরও যারা বয়াত করেছেন তারা হলেন, হযরত হাফেয় হামিদ আলী সাহেব (রা.), হযরত মুসি আব্দুল্লাহ সানোরি সাহেব (রা.), হযরত মুসি আড়োচা খান সাহেব (রা.), হযরত মুসি জাফর আহমদ সাহেব (রা.), হযরত পীর সিরাজুল হক নোমানী সাহেব (রা.) ও হযরত মৌলভী আব্দুল করিম সিয়ালকোটি সাহেব (রা.)।

প্র. হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কতগুলো পুস্তক প্রণয়ন করেছেন? সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ রচিত পুস্তকের নাম কী?

উ. সর্বমোট ৮৫টি পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। প্রথম ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে ‘বারাহীনে আহমদীয়া’ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) এবং সর্বশেষ ‘পয়গামে সুলত’ ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে। (দ্বিনি মালুমাত, ম. খো. আ. পাকিস্তান, পৃ. ৩৭)।

প্র. হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সুসংবাদপ্রাপ্ত সন্তানদের নাম ও জন্ম-মৃত্যু তারিখ বলুন।

উ. ১) সাহেবযাদী ইসমত সাহেবা [জন্ম: মে ১৮৮৬-মৃত্যু: জুলাই ১৮৯১]

২) সাহেবযাদা বশির আউয়াল [জন্ম: ৭ আগস্ট ১৮৮৭-মৃত্যু: ৮ নভেম্বর ১৮৮৮]

৩) হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)
[জন্ম: ১২ জানুয়ারি ১৮৮৯, মৃত্যু: ৮ নভেম্বর ১৯৬৫]

৪) সাহেবযাদী শওকত সাহেবা [জন্ম: ১৮৯১-মৃত্যু: ১৮৯২]

৫) হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশির আহমদ সাহেব এম.এ. (রা.) [জন্ম: ২০ এপ্রিল ১৮৯৩-মৃত্যু: ২ৱা সেপ্টেম্বর ১৯৬৩]

৬) হযরত সাহেবযাদা মির্যা শরিফ আহমদ সাহেব (রা.) [জন্ম: ২৪ মে ১৮৯৫-মৃত্যু: ২৬ ডিসেম্বর ১৯৬১]

৭) হযরত সাহেবযাদী নওয়াব মোবারেক বেগম সাহেবা (রা.) [জন্ম: ২ৱা মার্চ ১৮৯৭-মৃত্যু: ২৩ মে ১৯৭৭]

৮) হযরত সাহেবযাদা মির্যা মোবারক আহমদ সাহেব [জন্ম: ১৪ জুন ১৮৯৯-মৃত্যু: ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯০৭]

৯) সাহেবযাদী আমাতুন নাসির সাহেবা [জন্ম: ২৮ জানুয়ারি ১৯০৩-মৃত্যু: ৩ৱা ডিসেম্বর ১৯০৩]

১০) হযরত সাহেবযাদী আমাতুল হাফিয় বেগম সাহেবা (রা.) [জন্ম: ২৫ জুন ১৯০৪-মৃত্যু: ৬ মে ১৯৮৭]

এর মধ্যে ৩, ৫, ৬, ৭, ও ১০ নং ক্রমিকের সদস্যগণ দীর্ঘ জীবন লাভ করেছেন, বাকিরা শৈশবেই মারা গিয়েছেন।

প্র. হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কোন স্থানকে নিজের দ্বিতীয় জন্মভূমি বলে বর্ণনা করেছেন?

উ. সিয়ালকোটকে।

প্র. হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কপুরথলা এবং কপুরথলা জামা'ত সমক্ষে কী বলেছেন?

উ. তিনি কপুরথলাবাসীদেরকে লিখেছেন- “আমি আশা করছি কিয়ামতের দিনও আপনারা আমার সাথে থাকবেন, কেননা দুনিয়াতেও আপনারা আমার সাথী হয়েছেন।”

প্র. হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর পাঁচজন সাহাবীর নাম লিখুন।

উ. ১) হযরত ড. মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.)

২) হযরত মাওলানা শের আলী সাহেব (রা.)

৩) হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.)

৪) হযরত মাওলানা সারওয়ার শাহ সাহেব (রা.)

৫) হযরত হাফেয় রৌশন আলী সাহেব (রা.)

প্র. হ্যুর আকদাস (আ.) কখন মসীহ মাওউদ হবার দাবি করেছিলেন?

উ. ১৮৯০ সনে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাল্লার পক্ষ থেকে তাঁকে ইলহাম করে বলা হয়েছে:-

سُكْنِيْ اَبْنِ رَسُولِ اللّٰهِ فَوْتَ هُوَ چَكَّا بِهِ اُورَا سِكْرِنْجِ مِيلْ ہُوَ كَوْرِ وَعْدَهِ كَمْ مُوافِقٍ تَوْ آیَةٍ بِهِ وَكَانَ وَعْدَ اللّٰهِ مَفْعُولًا۔

(মসীহ ইবনে মারিয়াম রাসূলুল্লাহ ফওত হো চুকা হ্যা অওর উসকে রাঙ মে হো কার ওয়াদা কে মাওয়াফেক তু আয়া হ্যায়। ওয়া কানা ওয়াদাল্লাহি মাফ'উলা)

অর্থ: আল্লাহর রসূল মসীহ ইবনে মরিয়ম মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাঁর রঙে রঙীন হয়ে আল্লাহ তাঁ'লার প্রতিশ্রূতি অনুযায়ী তুমি আগমন করেছ। আল্লাহর প্রতিশ্রূতি পূর্ণ হওয়া অবশ্যজ্ঞাবী।

নোট: তিনি (আ.) মামুর (প্রত্যাদিষ্ট) হওয়ার ইলাহামের ওপর ভিত্তি করেই আল্লাহ তাঁ'লার অবুমতিক্রমে বয়াতের কার্যক্রম শুরু করেছিলেন।

প্র. জামাঁতে আহমদীয়ার প্রথম সালানা জলসা কবে অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে কত লোক অংশগ্রহণ করেন?

উ. ১৮৯১ সনের ২৭ ডিসেম্বর, মসজিদে আকসা, কাদিয়ানে এবং ৭৫ জন আহমদী এ জলসায় অংশগ্রহণ করেন।

প্র. হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) সাধারণভাবে মুসলিম উলামাদের প্রতি প্রথম কবে মোবাহালার চ্যালেঞ্জ দেন?

উ. ১৮৯২ সনের ১০ ডিসেম্বর তারিখে।

প্রঃ ‘জঙ্গে মুকাদ্দাস’ কী?

উ. হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ১৮৯৩ সনে পাদ্রী ডেপুটি আব্দুল্লাহ আখমের সাথে যে লিখিত এবং মৌখিক বাহাস (বিতর্ক) করেন এটাই ‘জঙ্গে মুকাদ্দাস’ (পরিত্র যুদ্ধ) নামে খ্যাত।

প্র. হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ‘বারাকাতুদ্দ দোয়া’ পুস্তকটি কখন, কী উদ্দেশ্যে রচনা করেছিলেন?

উ. দোয়া সম্পর্কে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের দৃষ্টিভঙ্গির সংশোধনের জন্য ১৮৯৩ সনের এপ্রিল মাসে হ্যাঁর (আ.) এ পুস্তক রচনা করেন।

প্র. চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ-এর নির্দর্শন কখন প্রকাশিত হয়েছিল?

উ. মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক হিন্দুস্তানে- অর্থাৎ পূর্ব গোলার্ধে ১৩ রম্যান ১৩১১ হিজরি (২১ মার্চ ১৮৯৪ ইং) সনে চন্দ্রগ্রহণ এবং ২৮ রম্যান ১৩১১ হিজরি (৬ এপ্রিল ১৮৯৪ ইং) সনে সূর্যগ্রহণ এর নির্দর্শন প্রকাশিত হয়। অনুরূপভাবে পঞ্চম গোলার্ধে ১১ মার্চ ১৮৮৫ তারিখে চন্দ্রগ্রহণ এবং ২৬ মার্চ ১৮৯৫ তারিখে সূর্যগ্রহণ হয়।

প্র. কাদিয়ানে সর্বপ্রথম কবে প্রেস স্থাপিত হয়?

উ. ১৮৯৫ সনে ‘যিয়াউল ইসলাম প্রিন্টিং প্রেস এবং লাইব্রেরি’ স্থাপিত হয়। এ প্রেস হতেই সর্বপ্রথম “যিয়াউল হক” পুস্তক প্রকাশিত হয়।

প্র. হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ‘ইশকে রসূল (সা.)’ [রসূলপ্রেম] সম্বন্ধে রচিত আরবি, ফার্সি এবং উর্দু কবিতা থেকে একটি করে পংক্তি বলুন?

উ. আরবি: جَسْمِيْ يَطِيرُ إِلَيْكَ مِنْ شَوْقٍ عَلَى بَأْيَتْ كَائِنَ قُرْءَةُ الطَّيْرَانِ

(জিসমি ইয়াতিরু ইলায়কা মিন শাওকিন আল্লা
ইয়া লায়তা কানাত কুওয়াতুত তায়রান)

অর্থ: হে মুহাম্মদ (সা.)! তোমার প্রেম ও ভালবাসার টানে আমার দেহ তোমার দিকে
উড়ে যেতে চায়। হায়! আমার যদি উড়ার শক্তি থাকতো।

ফার্সি:

بعد از خدا بخش محمد حرم
گرفت ایں بود بخدا بخت کافر

(বাদ আয় খোদা বা-ইশকে মুহাম্মদ মুখাম্মরম
গার কুফর সঁ বাওয়াদ বা-খোদা সাখ্ত কাফিরাম)

অর্থ: খোদার পরে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রেমে আমি বিভোর। যদি এটি কুফরী হয়, তাহলে
খোদার কসম আমি পাকা কাফির।

উর্দু:

ربط ہے جان محمد سے مری جاں کو مدام
دل کو وہ جام لباب ہے پیارا ہم نے

(রাবত হ্যা জা-নে মুহাম্মদ (সা.) সে মেরী জাঁ কো মুদাম
দিল কো ওহ জামে লাবালাৰ হ্যায় পিলায়া হামনে)

অর্থ: মুহাম্মদ (সা.)-এর হৃদয়ের সাথে মোর হৃদয়ের সম্পর্ক চিরস্তন, আমি
কাণায়-কাণায় প্রেম সুরায় ভরা পেয়ালা পান করেছি।

প্র. বিশ্বধর্ম সম্মেলন কখন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

উ. ২৬-২৯ ডিসেম্বর ১৮৯৬ সনে লাহোরের টাউন হলে।

প্র. বিশ্বধর্ম সম্মেলন উপলক্ষ্যে কী নির্দর্শন প্রকাশিত হয়েছিল?

উ. এ সম্মেলনের জন্য হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.) একটি প্রবন্ধ লিখেন এবং আল্লাহ তাল্লার পক্ষ থেকে সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পূর্বে এই ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ তাল্লা আমাকে বলেছেন, ‘আমার এ প্রবন্ধ সকল প্রবন্ধের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে’, বাস্তবিক এরপরই হয়েছিল। যখন হ্যরত আব্দুল করিম সিয়ালকোটি (রা.) তাঁর (আ.) রচিত প্রবন্ধ পাঠ করলেন তখন সকলে একবাক্যে এই সম্মতি জ্ঞাপন করল, যির্যা সাহেবের প্রবন্ধ সকল প্রবন্ধের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। পরবর্তীতে এই প্রবন্ধ “ইসলামী নীতিদর্শন” নামে প্রকাশিত হয়।

প্র. হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ওপর কী কারণে ‘ইন্নি উহাফিযু কুল্লা মান ফিদদ্বার (তোমার গৃহের চতুর্সীমার মধ্যে অবস্থানকারী লোকদের আমি সুরক্ষা করবো) ইলহাম অবতীর্ণ হয়েছিল?

উ. হ্যুর (আ.)-এর বাড়ি ‘দারুল মসীহ’-তে অবস্থানকারী সদস্য-সদস্যা এবং নিষ্ঠাবান আহমদী ব্যক্তিগত প্রেগ থেকে সুরক্ষিত থাকবে এ সম্পর্কে হ্যুর আকদাস (আ.)-কে
আশ্বস্ত করে উক্ত ইলহাম অবতীর্ণ হয়।

প্র. হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যাদের মৃত্যু হয়েছে এমন পাঁচজন বিকৰণবাদীর নাম বলুন।

উ. (১) পাদ্রী আব্দুল্লাহ আথম : ১৮৯৬ ইং

(২) পডিত লেখরাম পেশওয়ারী : ১৮৯৭ ইং

(৩) মুসিং ইলাহি বখশ, একাউন্ট্যান্ট, লাহোর : ১৯০৭ ইং,

(৪) সান্দ উল্লাহ লুধিয়ানভী : ১৯০৭ইং

(৫) আমেরিকা নিবাসী ড. আলেকজান্ডার ডুই : ১৯০৭ ইং

প্র. হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) তাঁর কোন ঘট্টে প্রমাণ করেছেন, আরবি সব ভাষার জননী?

উ. ‘মিনানুর রহমান’ ঘট্টে।

প্র. হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-র ‘ইশ্কে কুরআন’ (কুরআন প্রেম) সম্পর্কে রচিত যে কোন একটি পংক্তি বলুন।

উ. دل میں کبی ہے ہر دم تیرا چینہ چوموں
قرآن کے گرد ھوموں کعبہ مرا کبی ہے

(দিল মেঁ যাহী হ্যা হার্দাম তেরা সাহীফা চুম্ব
কুরআঁ কে গিরদ দুম্বুঁ কা'বা মেরা যাহী হ্যা)

অর্থ: আমার আন্তরিক বাসনা হলো, সর্বদা যেন তোমার কিতাব চুম্বন করি আর কুরআনের চতুর্দিকে থদক্ষিণ করি; বস্তত আমার কা'বা এটাই।

প্র. হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) রচিত গ্রন্থগুলোর নাম লিখুন।

উ. বারাহীনে আহমদীয়া (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ও ৫ম খন্দ), পুরানী তাহরীরেঁ, এক ঈসায়ী কে চার সাওয়ালেঁ কা জওয়াব, সুরমা চশমায়ে আরিয়া, শাহানায়ে হকু, সাব্য ইশতেহার, ফতেহ ইসলাম, তৌষিয়ে মারাম, ইয়ালায়ে আওহাম (১ম ও ২য় খন্দ), আলহক্ মোবাহাসা লুধিয়ানা, আলহক্ মোবাহাসা দিল্লী, আসমানী ফয়সালা, নিশানে আসমানী, আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, বারাকাতুদোয়া, হজ্জাতুল ইসলাম, সাচায়ী কা ইয়েহার, জঙ্গে মুকদ্দাস, শাহাদাতুল কুরআন, তোহফায়ে বাগদাদ, কিরামাতুস সাদেকীন, হামামাতুল বুশরা, নূরুল হক (১ম ও ২য় খন্দ), ইতমামুল হজ্জা, সিরাজুল খিলাফা, আনোয়ারুল ইসলাম, মিনানুর রহমান, যিয়াউল হক, নূরুল কুরআন (১ম ও ২য় খন্দ), মেঁয়ারুল মাযহাব, আরিয়া ধরম, সৎ বচন, ইসলামী উসুল কী ফিলাসফী, আঞ্জামে আথম, সিরাজ-ই-মুনীর, ইস্তিফ্তা, হজ্জাতুল্লাহ, তোহফায়ে কায়সারীয়া, জালসায়ে আহবাব, মাহমুদ কী আমীন, কিতাবুল বারীয়া, আল-বালাগ, জরংরতুল ইমাম, নাজমুল হৃদা, রায়ে হাকীকত, কাশফুল গিতা, আইয়ামুস সুলাহ, হাকীকাতুল মাহদী, মসীহ হিন্দুস্থান মেঁ, সিতারায়ে কায়সারীয়া, তিরিয়াকুল কুলুব, তোহফায়ে গজনভীয়া, রোয়েদোদ জলসা দোয়া, খুতবায়ে ইলহামীয়া, লুজ্জাতুন নূর, গর্ভন্মেন্ট আংরেজী অওর জিহাদ,

তোহফায়ে গোলড়ভীয়া, আরবাস্টন (১, ২, ৩, ৪), ইজায়ুল মসীহ, এক গলতি কা ইয়ালা, দাফেউল বালা, আল্হুদা, নুয়ুলুল মসীহ, কিশ্তিয়ে নৃহ, তোহফাতুন নদওয়া, ই'জায়ে আহমদী, রিভিউ বার মোবাহাসা বাটালভী চকরালভী, মোওয়াহিবুর রহমান, নাসিমে দাওয়াত, সনাতম ধরম, তাফকিরাতুশ শাহাদাতাইন, সীরাতুল আব্দাল, লেকচার লাহোর, লেকচার সিয়ালকোট, আহমদী অওর গয়ের আহমদী মে ফারক, লেকচার লুধিয়ানা, আল ওসিয়ত, চশমায়ে মসীহী, তাজালিয়াতে ইলাহীয়া, কাদিয়ান কী আরিয়া অওর হাম, হাকীকাতুল ওহী, চশমায়ে মারফেত, পয়গামে সুলেহ।

প্. হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.) তাঁর কোন বইতে তৎকালীন বৃটিশ সম্রাজ্ঞী রাণী ভিঞ্চেরিয়া-কে ইসলামের দাওয়াত দেন?

উ. ১৮৯৭ সনে রচিত ‘তোহফায়ে কায়সারীয়া’।

প্. আহমদীয়া জামা’তের প্রথম ম্যাগাজিন কোনটি?

উ. আল্হাকাম। ১৮৯৭ সনের ৮ অক্টোবর তারিখে এটি প্রথম অমৃতসর হতে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এটি কাদিয়ান হতে প্রকাশিত হয়।

প্. হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘মসীহ হিন্দুস্থান মেঁ’ (ভারতে যীশু) কখন প্রকাশিত হয়?

উ. ১৮৯৯ সনের এপ্রিল মাসে। এ বইয়ে হ্যরত ঈসা (আ.)-এর ক্রুশ পরবর্তী ঘটনা এবং ভারতবর্ষে তাঁর আগমন সম্পর্কে বহু ঐতিহাসিক তথ্য সংলিঙ্গে সন্তুষ্ট হয়েছে।

প্. হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর নিম্নোক্ত পংক্তি কার সম্পর্কিত এবং কীভাবে পূর্ণতা পেয়েছিল?

الا اے دُخْنِ نَادَان ، بَے رَاه
مُحَمَّدْ بَابِ خَلْقِ تَرَسْ

[অলো আয়ে দুশ্মানে নাদান ও বে রাহ

বেতারস আয তিগে বার্রানে মুহাম্মদ (সা.)]

অর্থ: হে নির্বোধ ও দিক্বন্ধু শক্র সাবধান! তুই মুহাম্মদ (সা.)-এর কর্তনকারী তরবারীকে ভয় কর।

উ. আর্য সমাজী পভিত লেখরাম পেশওয়ারী সম্পর্কে যাকে আল্লাহ্ তা'লা একজন ফেরেশতার মাধ্যমে ১৮৯৭ সনে মুহাম্মদ (সা.)-এর তরবারীর শিকার বানিয়েছিলেন।

প্. ‘খুতবায়ে ইলহামীয়া’ কী?

উ. ১৯০০ সনের ১১ এপ্রিল ঈদুল আযহার দিনে মহান আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.) আরবি ভাষায যে খুতবা প্রদান করেন তা-ই ‘খুতবায়ে ইলহামীয়া’ নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। সম্পূর্ণ খুতবাটি ইলহাম আকারে তাৎক্ষণিকভাবে হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর উপর নায়িল হয়।

প্. জামা’তে আহমদীয়ার নাম ‘আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত’ কখন রাখা হয়?

উ. ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে আদম শুমারীর প্রাক্কালে।

প্র. The Review of Religions পত্রিকাটি কেন বিখ্যাত?

উ. ইংরেজি ভাষাভাষীদের কাছে ইসলাম প্রচারের জন্য হয়রত মসীহ মাওউদ (আ.)

১৯০২ সনের জানুয়ারি মাসে কাদিয়ান হতে এ পত্রিকাটির প্রকাশনা আরম্ভ করেন। এখন পত্রিকাটি লক্ষণ ও কাদিয়ান হতে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

প্র. ‘মিনারাতুল মসীহ’ এবং ‘বায়তুদ দোয়া’- এর ভিত্তিপ্রস্তর কে, কখন রেখেছিলেন?

উ. সৈয়দনাহা হয়রত মসীহ মাওউদ (আ.) ১৩ মার্চ ১৯০৩ সনে।

প্র. হয়রত মাওলানা আব্দুল করিম সাহেব সিয়ালকোটি (রা.) এবং হয়রত মৌলভী বুরহান উদ্দিন সাহেব জেহলমী (রা.) কখন মৃত্যুবরণ করেন?

উ. হয়রত মৌলভী আব্দুল করিম সাহেব সিয়ালকোটি (রা.) ১১ অক্টোবর ১৯০৫ সনে এবং হয়রত মৌলভী বুরহান উদ্দিন সাহেব জেহলমী (রা.) ৩ ডিসেম্বর ১৯০৫ সনে মৃত্যুবরণ করেন।

প্র. বেহেশতি মাকবেরো কত সনে প্রতিষ্ঠিত হয়?

উ. ১৯০৫ সনে।

প্র. বেহেশতি মাকবেরোয় কে সর্বপ্রথম সমাহিত হন?

উ. ১৯০৫ সনের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে হয়রত আব্দুল করিম সিয়ালকোটি সাহেব (রা.)।

প্র. সদর আঙ্গুমানে আহমদীয়া কখন প্রতিষ্ঠিত হয়?

উ. ২৯ জানুয়ারি ১৯০৬ সনে।

প্র. বঙ্গভঙ্গ রদের ভবিষ্যদ্বাণী কখন করা হয়?

উ. হয়রত মসীহ মাওউদ (আ.) ১৯০৬ সনে বঙ্গভঙ্গ রদের ভবিষ্যদ্বাণী করেন। এটি ১৯১১ সনে পূর্ণতা লাভ করে।

প্র. হয়রত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বিখ্যাত সাহাবী হয়রত চৌধুরী জাফরগুল্লাহ খান সাহেব (রা.) কবে বয়াত নেন?

উ. ১৯০৭ সনের ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখে। এর পূর্বেও শৈশবকালে তিনি তাঁর পিতা-মাতার বয়াত গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্র. ওয়াকফে জিন্দেগী’র (জীবন উৎসর্গকারী) সুশৃঙ্খল তাহরীকের ব্যবস্থাপনা কখন সর্বপ্রথম সূচনা হয়?

উ. ১৯০৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে।

প্র. কোন আমেরিকান হয়রত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সাথে পত্রালাপের মাধ্যমে বয়াত নেন?

উ. মি. আলেক্সিজাভার রাসেল ওয়েব। তিনি খ্রিস্টধর্মে বীতশ্রদ্ধ হয়ে সত্যের সন্ধানে বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে পড়েশুনা করেন। পরিশেষে হয়রত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর দাবির কথা জেনে তাঁর সাথে পত্রালাপের মাধ্যমে বয়াত নেন।

প্র. একজন ইংরেজ সৌরবিজ্ঞানীর নাম বলুন— যিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়াত নেন?

উ. প্রফেসর ক্লিমেন্ট রিগ ১৯০৮ সনের ১২ এবং ১৮ মে লাহোরে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি প্রশ্ন জিজেস করেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর দেয়া উভরে তিনি খুবই সন্তুষ্ট হন এবং তাঁর হাতে বয়াত নেন।

প্র. আল্লামা ইকবালের পিতা কী আহমদী ছিলেন?

উ. হ্যাঁ, ড. আল্লামা ইকবালের পিতা শেখ নূর মোহাম্মদ সাহেব আহমদী ছিলেন। তিনি মাওলানা আব্দুল করিম সিয়ালকোটি (রা.) ও সৈয়দ হামিদ শাহ সাহেবের তরণীগে বয়াত নেন। আল্লামা ইকবালও ১৮৯৭ সনে বয়াত নেন। এমনকি তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর শানে ‘আফতাবে সাদেক’ নামক একটি নথম লিখেন। (সূত্র. তারিখে আহমদীয়াত)

প্র. কোন-কোন প্রতিষ্ঠান হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জীবদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

উ. (১) তালীমুল ইসলাম হাই স্কুল : ১৮৯৮ সনে এর ভিত্তি রাখা হয়। প্রথমে এটি পাইমারী পর্যায়ে ছিল। পরবর্তীতে উচ্চ বিদ্যালয় হয়।

(২) তালীমুল ইসলাম কলেজ : ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ২৮ মে তারিখে আরম্ভ হয়। কিন্তু বিভিন্ন অসুবিধার কারণে ২ বছর পর বন্ধ করে দিতে হয়। পুনরায় ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে কাদিয়ানে আরম্ভ হয়।

(৩) মদ্রাসা আহমদীয়া : জামা'তের বিশিষ্ট আলেমগণের অন্তর্ধানের প্রেক্ষিতে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে মদ্রাসা আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন জামেয়া আহমদীয়া নামে প্রচলিত আছে। এর মাধ্যমে মুবাল্লিগ (প্রচারক) তৈরী হচ্ছে।

প্র. আহমদীয়া জামা'তের এমন দু'টি পত্রিকার নাম বলুন-যেগুলোকে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) জামা'তের ‘দু'টি বাহু’ বলে আখ্য দান করেছেন?

উ. (১) আল হাকাম, (২) আল বদর। আল হাকাম বর্তমানে লঙ্ঘন থেকে নতুনভাবে প্রকাশ হচ্ছে আর আল বদর এখনও ‘সাম্প্রতিক বদর’ নামে কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।

প্র. হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কখন তাঁর জীবনের শেষ বক্তৃতা দেন?

উ. লাহোরে ১৯০৮ সনের ২৫ মে আসরের নামাযের পর তাঁর প্রিয় সাহাবীদের উদ্দেশ্যে জীবনের শেষ বক্তৃতা দেন।

প্র. হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কবে, কোথায় ইন্তেকাল করেন?

উ. ২৬ মে ১৯০৮ সনে লাহোরে হ্যুৰ আকদাস (আ.) ইন্তেকাল করেন এবং ২৭ মে ১৯০৮ সনে খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) বেহেশতি মাকবেরা কাদিয়ানে তাঁর জানায়া নামায পড়ান এবং সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

প্র. মৃত্যুর সময় হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মুখ নিঃস্ত সর্বশেষ শব্দ কী ছিল?

উ.

اللَّهُمَّ إِنِّي بِيَارِ اللَّهِ

‘আল্লাহ, মেরে পেয়ারে আল্লাহ’ (আল্লাহ, আমার প্রিয় আল্লাহ)।

হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর কতিপয় বিখ্যাত ইলহাম ও ভবিষ্যদ্বাণী

প্র. হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর উপর প্রথম ইলহাম কখন অবতীর্ণ হয় এবং তা কী ?

উ. ১৮৬৫ সনে তাঁর কাছে প্রথম ইলহাম হয়। ইলহামটি ছিল:

سَمَاءِينَ حَوْلًا أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ أَوْ تَرِيدُ عَلَيْهِ سِبِيلًا وَتَرِى نَسْلًا بَعِيدًا

(সামানীনা হাওলান্ আও কারীবাম্ মিন্ যালিকা-আও তায়ীদু আ'লায়হি সিনীনান ওয়া
তারা নাসলাম্ বা'য়ীদা)

অর্থ: তোমার বয়স ৮০ বছরের মত হবে অথবা দুই-চার কম অথবা বেশি, এবং তুমি
এত বয়স পাবে যে অনেক প্রজন্ম দেখতে পাবে। (তায়কেরা, প্রকাশিত: ১৯৬৯, পৃ. ৭)

প্র. কখন তিনি মাঝুর (প্রত্যাদিষ্ট) হিসাবে ইলহাম প্রাপ্ত হন?

উ. ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ তারিখে ইলহাম প্রাপ্ত হন। ইলহামটি ছিল:

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ

(কুল ইঞ্জী উমিরতু ওয়া আনা আউয়ালুল মু'মিনীন)

অর্থ: তুমি বল, নিশ্চয় আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং এতে আমিই প্রথম বিশ্বাসী।

প্র. হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ ইলহাম:

شَاتَانٌ تُدْبَحَان

(শাতানে তুর্যবাহানে)

অর্থ: দুঁটি বকরী জবাই করা হবে- এর তাৎপর্য কী?

উ. এ ইলহামে হ্যরত মৌলভী আব্দুর রহমান সাহেব (রা.) এবং হ্যরত সাহেবযাদা
আব্দুল লতীফ সাহেব (রা.)-এর হাদয় বিদারক শাহাদাতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ
দুই বুয়গকে আহমদী হওয়ার কারণে আফগানিস্তানে শহীদ করা হয়। হ্যরত সাহেবযাদা
আব্দুল লতীফ সাহেব (রা.) ১৯০৩ সনের ১৪ জুলাই শাহাদাত বরণ করেন।

প্র. হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ আরবি, ফার্সি, ইংরেজি, উর্দু এবং
পাঞ্জাবি ভাষার একটি করে ইলহাম লিখুন।

উ. আরবি ইলহাম:

الْيَسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ

(আলায়সাল্লাহ বিকাফিন আ'বদাহ)

অর্থ: আল্লাহ কী তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?

ফার্সি ইলহাম:

مَنْ تَكِيهَ بِرَعْمَنَا پَا سَيِّدَار

(মাকুন তাকিয়া বর উমরে না পায়েদার)

অর্থ: এ অস্তায়ী জীবনের উপর ভরসা করো না।

ইংরেজি ইলহাম :- I shall give you a large party of Islam.

অর্থ: আমি তোমাকে ইসলামের একটি বিশাল জামাত দান করব।

পাঞ্জাবি ইলহাম:

جے توں میرا ہور ہیں سب جگ تیرا ہو

(জে তু মেরা হো রাহে সব জাগ তেরা হো)

অর্থ: তুমি আমার হলে গোটা জগৎ তোমার হবে।

উর্দু ইলহাম:

دنیا میں ایک نذر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا

اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آ و حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا

(দুনিয়া মেঁ এক নায়ির আয়া, পার দুনিয়ানে উসকো কবুল না কিয়া, লেকিন খোদা উসে কবুল কারেগা অওর বাড়ে যোর আওর হামলোঁ সে উসকি সাচ্ছাই যাহের কার দেগা)

অর্থ: পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছেন। কিন্তু পৃথিবী তাঁকে গ্রহণ করেনি। কিন্তু খোদা তাঁকে গ্রহণ করবেন এবং মহা শক্তিশালী প্রচন্ড আক্ৰমণসমূহের মাধ্যমে তাঁর সত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

প. সমগ্র পৃথিবীব্যাপী আহমদীয়া জামাতের বিজয়ের জন্য কী ইলহাম নায়িল হয়েছিল?

উ.

میں تیری تبلیغ کوز میں کے کناروں تک پہنچاؤں گا

(ম্যাঁ তেরি তবলীগ কো যামীন কে কিনারোঁ তাক পঁচাউঙ্গা)

অর্থ: আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রাণ্তে-প্রাণ্তে পৌঁছাব।

প. হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর দু'টি ইলহাম লিখুন যাতে কাদিয়ান হতে হিজরত এবং প্রত্যাবর্তনের উল্লেখ করা হয়েছে।

উ. (১) 'দাগে হিজরত' (হিজরতের চিহ্নবলী) (২) 'ইন্নাল্লাহী ফারায়া আলায়কাল কুরআনা লারা-আদুকা ইলা মায়াদিন' (সেই সত্তা যিনি তোমার উপর কুরআনের সেবা ফরয করেছেন অবশ্যই তিনি তোমাকে তোমার ঠিকানায় ফিরিয়ে আনবেন)।

প্র. হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর এমন একটি ইলহামী দোয়া বলুন- যা তিনি খুব বেশি করে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

উ.

رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِي وَانْصُرْنِي وَارْحَمْنِي

(রাবিব কুলু শাহিয়িন খাদিমুকা রাবিব ফাহফায়িন ওয়ানসুরিনি ওয়ার হামানি)

অর্থঃ হে আমার প্রভু! যা কিছু আছে সবই তোমার সেবক; সুতরাং হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে রক্ষা কর। তুমিই আমাকে সাহায্য কর আর তুমিই আমার প্রতি করুণা কর।

প্র. **جَرِيْلُ اللَّهِ فِي حُلَلِ الْأَنْبِيَاءِ** (জারিউল্লাহি ফি হুলালিল আবিয়ায়ি)– অর্থাৎ, ‘নবীগণের পোষাকে খোদার পাহলোয়ান’ কে এবং কেন?

উ. এ উপাধি আল্লাহ্ তাঁলা ইলহামের মাধ্যমে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে দান করেছেন। কেননা, আঁ-হযরত (সা.)-এর পূর্ণ আনুগত্য ও দাসত্বের কল্যাণে তিনি পূর্ববর্তী নবীদের বুরুজে (প্রতিচ্ছবিতে) পরিণত হয়েছেন।

প্র. হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ইলহাম ‘মুসলমানোঁ কা লিডার’ (মুসলমানদের নেতা) দিয়ে কাকে বুঝানো হয়েছে?

উ. ‘মুসলমানোঁ কা লিডার’ দিয়ে হযরত মৌলভী আব্দুল করিম সিয়ালকোটি (রা.)-কে বুঝানো হয়েছে।

প্র. হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কাকে ‘শেইখে আয়ম’ বলে সম্মোধন করেছেন?

উ. হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতিফ (রা.)-কে ‘শেইখে আয়ম’ বলে সম্মোধন করেছেন।

প্র. হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ তাঁর জীবনের শেষের দিকের একটি ইলহাম লিখুন।

উ.

أَرْجِعْنِي إِلَيْهِ أَشْجِيلَ أَتَمْوَثُ الْقَرِيبَ

(আর রাহিলু সুম্মার রাহিলু আল্ মাউতুল কুরীব)

অর্থঃ বিদায়, বিদায়, মৃত্যু সন্ধিকটে।

প্র. রাশিয়ার জার (স্মাট) সম্বন্ধে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কী ইলহামী ভবিষ্যদ্বাণী করেন?

উ. ‘জার ভি হোগা তো হোগা উস্য ঘাড়ি বাহালে যার’ (সেই সময়ে জারের শোচনীয় অবস্থা হবে)। ১৯১৭ সনে রাশিয়ার মহাপ্রাতাপশালী স্মাট জারের পতনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁলার অস্তিত্বের একটি শক্তিশালী নির্দেশ হিসেবে এ ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণতা পায়।

প্র. হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মহান ভবিষ্যদ্বাণী “বাদশাহ তেরে কাপড়ে সে বারকাত চুড়েঙ্গে” (বাদশাহ তোমার বস্ত্র থেকে কল্যাণ অব্রেষণ করবে) কীভাবে পূর্ণতা পায়?

উ. ১৯৬৫ সনে গান্ধিয়ার গভর্ণর জেনারেল আলহাজ্জ স্যার এফ. এম. স্যাঙ্গাটে হয়রত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.)-এর কাছে হয়রত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র কাপড় পাওয়ার আবেদন করেন। তখন তাকে এটা প্রদান করা হয়। আর এভাবে এ ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণতা পায়।

এখনও প্রায় প্রতি বছর বৃটেনের সালানা জলসায় বহু রাজা ও বাদশাহ এ পবিত্র কাপড়ের কল্যাণ লাভ করছেন।

প্রতিশ্রুত মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী

(১) “সেই রাতেই (৩০ জানুয়ারি, ১৯০৩) স্পন্দে দেখলাম, যেন জারের (রাশিয়ার সন্তাট) রাজদণ্ড আমার হাতে রয়েছে এবং এর ভিতরে গুপ্তভাবে বন্দুকের নলও রয়েছে, উভয় কাজই চালানো যায়। আরও দেখলাম, সেই বাদশাহ যাঁর কাছে বু আলী সিনা ছিলেন— তাঁর ধনুক আমার কাছে রয়েছে। আর আমি সেই ধনুক থেকে একটা সিংহের প্রতি তাঁর নিষ্কেপ করলাম। আর মনে হলো, বু আলী সিনা আমার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন এবং সেই বাদশাহও (দাঁড়িয়ে আছেন)।” (দ্রষ্টব্য: তায়কেরা, পৃ. ৪৫৮)।

(২) সাহেবযাদা পীর সিরাজুল হক নোমানী সাহেব (রা.) লিখেছেন, একবার হয়রত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছিলেন:

“খোদা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন, আমার সিলসিলার মাঝেও প্রচণ্ড মতবিরোধ দেখা দিবে এবং ফেত্না ও বিদ্রেশপরায়ণ ব্যক্তিরা পৃথক হয়ে যাবে। এরপর আল্লাহ তাঁ'লা সেই মতবিরোধকে মিটিয়ে দেবেন। বাকী যারা পৃথক হওয়ার যোগ্য এবং যারা সাধুতার সাথে সম্পর্ক রাখে না এবং ফেতনাপরায়ণ তারা পৃথক হয়ে যাবে। দুনিয়াতে এক হাশর হবে; আর সেটা হবে প্রথম হাশর। তখন রাজা-বাদশাহরা একে অপরের উপরে আক্রমণ চালাবে। এত বেশি হত্যাকাণ্ড হবে, ভূ-পৃষ্ঠ রক্তে প্লাবিত হয়ে যাবে। প্রত্যেক বাদশাহুর প্রজারাও নিজেদের মাঝে ভয়াবহ যুদ্ধ-বিঘ্নে ব্যাপৃত হবে। এক বিশ্বজোড়া ধ্বংসকাণ্ড সংঘটিত হবে। এ সব ঘটনারই কেন্দ্র হবে শাম বা সিরিয়া। সাহেবযাদা সাহেব! [সাহেবযাদা পীর সিরাজুল হক নোমানী (রা.)] সেই সময়ে আমার প্রতিশ্রুত পুত্র হবে। খোদা তাঁর সাথেই নির্ধারিত করে রেখেছেন সেসব ঘটনাকে। সেসব ঘটনার পর আমাদের সিলসিলার উন্নতি হবে এবং রাজা-বাদশাহরা আমাদের সিলসিলায় দাখিল হবেন। তোমাদেরকে সেই প্রতিশ্রুতিকে চিনে নিতে হবে।” (তায়কেরাতুল মাহদী, ২য় খন্ড, পৃ. ৩)।

(৩) হ্যুর (আ.) বলেছেন, “বিরঞ্চবাদীরা আমাদের তবলীগকে প্রতিহত করতে চায়, আমাকে তো আল্লাহ তাঁ'লা আমার জামা'তকে (কাশফ বা দিব্যদৃষ্টিতে) বালুকারাশির

ন্যায় বিপুল সংখ্যায় দেখিয়েছেন।”

(৪) হ্যুর (আ.) আরও বলেছেন, “আমি (কাশফ বা দিব্যদৃষ্টিতে) আমার জামা’তকে রাশিয়ার এলাকায় বালুকারাশির মত দেখতে পাচ্ছি।” (তায়কেরা, পৃ. ৮১৩)।

(৫) “এখন সেই দিন সন্নিকটে যখন সত্যতার সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে এবং ইউরোপবাসী সত্য খোদার সন্ধান লাভ করবে। তারপর তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।” (তায়কেরা, পৃ. ২৯৪)।

(৬) “আমি আপনাকে (স্যার সৈয়দ আহমদ খান সাহেব) এ নিশ্চয়তা দান করছি, আমাকে একথাও পরিক্ষার ভাষায় বলা হয়েছে, পুনরায় একবার ইসলামের দিকে হিন্দু ধর্মের প্রবলভাবে প্রত্যাবর্তন ঘটবে।” (ইশতেহার, ১২ মার্চ ১৮৯৭)।

(৭) “তোমার জন্যে সিরিয়ার সাধুগণ এবং আরবের আল্লাহর বান্দারা প্রার্থনা করছে।” এ ইলহাম প্রসঙ্গে হ্যুর (আ.) বলেছেন, খোদা জানেন এটা কী ব্যাপার এবং তা কখন, কীভাবে প্রকাশ পাবে।

(৮) “আমি (স্পন্দে) দেখলাম, আমি লক্ষন শহরের একটি বক্তৃতামণ্ডে দাঁড়িয়ে আছি এবং ইংরেজি ভাষায় জোরালো যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে ইসলামের সত্যতা তুলে ধরছি। এরপর আমি অনেকগুলো পাখি ধরলাম যেগুলো ছোট-ছোট গাছের ওপরে বসা ছিল। পাখগুলো ছিল সাদা রঙের এবং আকারে তিতির পাখির সমান।

পরে, আমি এর তা’বির করলাম, যদিও আমি নিজে নই, তবু আমার বক্তৃতাবলী সেসব লোকের মাঝে প্রচারিত হবে এবং বহুসংখ্যক সৎ ও ন্যায়বান ইংরেজ সত্যের শিকারে পরিগত হবে।” (ইয়ালায়ে আওহাম, পৃ. ৫১৫-৫১৬)।

(৯) “কাশ্ফী (দিব্যদৃষ্টির) অবস্থায় এ অধম দেখতে পেল, মানুষের চেহারায় দুই ব্যক্তি একটি বাড়িতে বসে আছে। একজন মাটির ওপরে অপরজন ছাদের কাছে। আমি তখন সেই ব্যক্তিকে, যে মাটিতে বসা ছিল তাকে সম্মোধন করে বললাম, আমার এক লাখের একটি (আধ্যাত্মিক) সেনাবাহিনী দরকার, কিন্তু সে চুপ করে থাকলো, কোন জবাবই দিল না। তখন আমি অপর ব্যক্তির দিকে ফিরলাম, যে ছাদের কাছাকাছি আকাশের দিকে ছিল এবং তাকে সম্মোধন করে বললাম, আমার এক লাখের একটা সেনাবাহিনী দরকার। সে আমার এ কথা শুনে বলল, এক লাখ তো পাওয়া যাবে না, তবে পাঁচ হাজার সিপাহী দেয়া যাবে। তখন আমি মনে মনে বললাম, পাঁচ হাজার যদিও সংখ্যায় অল্পই, তবু খোদা তাঁলা চাইলে অল্প বহু সংখ্যকের ওপর জয়লাভ করতে পারে। সেই সময় আমি এ আয়াত পাঠ করলাম-

“কত ছোট-ছোট দল আল্লাহর হুকুমে বড়-বড় দলের উপর জয়যুক্ত হয়েছে।” (ইয়ালায়ে আওহাম, তায়কেরা, পৃ. ১৭৮)।

(১০) “আর আমি (কাশফে) দেখতে পাচ্ছি, মক্কার অধিবাসীরা সর্বশক্তিমান খোদার বাহিনীতে দলে-দলে যোগদান করছে এবং এটি হবে আকাশের প্রভুর পক্ষ থেকে, যা এ

পৃথিবীবাসীর চোখে বিস্ময়কর ঠেকবে।” (নূর্হ হক, ২য় খন্ড, তায়কেরা, পৃ. ২৫৬)।

১১. “আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি কাদিয়ানের দিকে আসছি। খুব অন্ধকার। রাস্তা সন্তুষ্ট করাই কঠিন। আমি অনুমানের ওপর পা বাঢ়লাম। একটা অদৃশ্য হাত আমাকে সাহায্য করছিল এবং আমি কাদিয়ানে পৌঁছে গেলাম এবং যে মসজিদটি শিখদের দখলে আছে, তা আমার দৃষ্টিতে এল। এরপর আমি সেই সোজা রাস্তাটি ধরে চলতে থাকলাম যেটি কাশীরের দিক থেকে এসেছে। সেই সময়ে আমি এতো আতঙ্গহস্ত হয়ে পড়েছিলাম যেন মনে হচ্ছিল, সেই আতঙ্কে আমি বেঁশ হয়ে যাবো। তখন আমি বার-বার এ দোয়া পড়তে থাকলাম ‘রাবির তাজাল্লা, রাবির তাজাল্লা (হে প্রভু! তুমি প্রকাশিত হও, হে প্রভু! তুমি প্রকাশিত হও) এক দেওয়ানার হাতে আমার হাত ছিল, এবং সে রাবির তাজাল্লা পড়ছিল। আর আমি খুব জোরের সঙ্গে দোয়া করছিলাম এবং এর আগে, আমার মনে আছে আমি আমার জন্য, আমার স্ত্রীর জন্য এবং আমার ছেলে মাহমুদের জন্য অনেক দোয়া করেছিলাম। পরে আমি স্বপ্নে দেখলাম দু’টি কুকুর, একটি খুব কালো, অন্যটি সাদা। আর এক ব্যক্তি কুকুর দু’টির পাঞ্জা কাটছে। এরপর ইলহাম হলঃ

كُنْتُمْ حَيْرًا مِّمَّا أَخْرَجْتُ لِلثَّالِثِ

(কুন্তুম খাইরা উম্মাতিন উখরিজাত লিনাসি)

অর্থ: “তোমরাই সর্বোৎকৃষ্ট উম্মত, যাদেরকে মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্যে উপ্রিত করা হয়েছে।” (তায়কেরা, পৃ. ২০৭- ২০৮)।

আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের প্রতিষ্ঠাতা হ্যরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, প্রতিক্রিয়া মসীহ ও ইমাম মাহ্মুদ মসীহ মাওউদ (আ.) তাঁহার “আইয়ামুস সুলেহ্” পুস্তকে বলেছেন:

“আমরা ঈমান রাখি, খোদা তা’লা ব্যতীত কোন মা’বুদ নাই এবং সৈয়দনা হ্যরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল এবং খাতামুল আধিয়া। আমরা ঈমান রাখি, ফেরেশতা, হাশর, জাল্লাত এবং জাহানাম সত্য এবং আমরা আরও ঈমান রাখি, কুরআন শরীফে আল্লাহ তা’লা যা বলেছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে যা বর্ণিত হয়েছে— উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তা সবই সত্য। আমরা এ-ও ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হতে বিন্দুমাত্র বিচুত হয় অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্যকরণীয় বলে নির্ধারিত তা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বন্ধকে বৈধকরণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিরোধী। আমি আমার জামা’তকে উপদেশ দিচ্ছি, তারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এ ঈমান নিয়ে মৃত্যু বরণ করে। কুরআন শরীফ হতে যাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনবে। নামায, রোয়া, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্বৰ্তীত খোদা তাঁলা এবং তার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করে, যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করে সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বৃহুর্গানের ‘ইজমা’- অর্থাৎ, সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত ওয়াল জামা’তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেয়া হয়েছে, সেসব সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া বা খোদাভীতি এবং সততা বিসর্জন দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকবে, কবে সে আমাদের বুক চিরে দেখেছিল, আমাদের এই অঙ্গীকার থাকা সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?”

“আলা ইন্না লান্নাতাল্লাহি আলাল কায়বীনা ওয়াল মুফতারীনা-”

অর্থাৎ, সাবধান! নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়াত (দীক্ষা)

গ্রহণের দশ শর্ত

(হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.) কর্তৃক প্রণীত)

- (১) বয়আত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করবে, এখন থেকে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শিরক (খোদা তাঁলার অংশীবাদিতা) হতে পবিত্র থাকবে।
- (২) মিথ্যা, ব্যভিচার, কুন্দষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুগ্ম (অত্যাচার) ও খেয়ানত (আত্মসাঙ্গ), অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হতে দূরে থাকবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হোক না কেন, তার শিকারে পরিণত হবে না।
- (৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল (সা.)-এর ছক্কুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়বে, রসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলায়ি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুর্লদ পড়বে, প্রত্যহ নিজের পাপসমূহ ক্ষমার জন্য আল্লাহ তাঁলার নিকট প্রার্থনা করবে ও নিয়মিত ইস্তেগফার পড়বে, এবং আবেগাপ্লুত হৃদয়ে তাঁর অপার অনুগ্রহ স্মরণ করে তাঁর হাম্দ ও তাঁরিফ (প্রশংসা) করবে।
- (৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে সাধারণত আল্লাহর সৃষ্টি কোন জীবকে, বিশেষত কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তক্ডীরের বিধানের উপরে সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঙ্গনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

(৭) অহংকার ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার, সহিষ্ণু ও দরবেশী জীবনযাপন করবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি সহানুভূতিকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্মতি, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন থেকে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

(৯) আল্লাহ তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্টি জীবের সেবায় যত্নবান থাকবে এবং খোদার দেয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করবে।

(১০) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধিমের (হ্যরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালামের) সাথে যে ভাত্ত বন্ধনে আবদ্ধ হলো, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে। এই ভাত্ত বন্ধন এত বেশি গভীর ও ঘনিষ্ঠ হবে যে, কোন প্রকার পার্থিব আত্মীয়তা ও অন্যান্য সম্পর্ক এবং সেবকসুলভ অবস্থার মধ্যে এর তুলনা পাওয়া যাবে না।

(ইশ্তেহার তকমীলে তবলীগ : ১২ জানুয়ারি, ১৮৮৯ ইং)।

খিলাফতে আহমদীয়া খলীফাতুল মসীহ আউয়াল হ্যরত হাফেয় মাওলানা আলহাজ হেকিম নূরদীন (রা.)

প. হ্যরত হেকিম মৌলভী নূরদীন (রা.) কখন, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ. তিনি (রা.) ১২৫৬ হিজরি মোতাবেক ১৮৪১ সালে পাঞ্জাবের শাহপুর জেলার ভেরা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

প. হ্যরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)-এর সম্মানিত পিতা-মাতার নাম বলুন?

উ. পিতার নাম: মোহতরম হাফেয় গোলাম রসূল সাহেব এবং মাতার নাম: মোহতরমা নূর বখত সাহেবা।

প. হ্যরত মৌলভী নূরদীন (রা.) ইসলামের কোন খলীফার বংশধর ছিলেন?

উ. বংশানুক্রমিক ধারায় তিনি হ্যরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দ্বিতীয় খলীফা হ্যরত উমর

(রা.)-এর ৩৪তম অধ্যক্ষন পুরুষ
ছিলেন।

প্র. হ্যুর (রা.) কত সালে কাবাগ্হে হজ্জ
পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন?

উ. ১৮৬৫ ইং সনে।

প্র. হ্যুর আনোয়ার (রা.) জগানার্জনের
জন্য যে সকল শহরে ভ্রমণ করেছিলেন
তার মধ্যে থেকে কয়েকটি শহরের নাম
বলুন?

উ. মক্কা মোকাররমা, মদীনা মুওনাওয়া-
রা, বোম্বাই, রাওয়ালপিণ্ডি, রামপুর,
লক্ষ্মী এবং ভূপাল ইত্যাদি।

প্র. তিনি (রা.) কত সালে সর্বপ্রথম
সৈয়দিনা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-
এর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন?

উ. ১৮৮৫ ইং সনে।

প্র. হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) হযরত হেকিম নূরুল্লাহ (রা.)-কে কত সালে সদর
আঙ্গুমানে আহমদীয়ার সর্বপ্রথম সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত করেন?

উ. ২৯ জানুয়ারি ১৯০৬ ইং সনে।

প্র. হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)-এর প্রসিদ্ধ পুস্তকাবলীর নাম লিখুন।

উ. ১) ফাসলুল খিতাব, ২) তাসদিকে বারাহীনে আহমদীয়া, ৩) আবতালে উলুহিয়্যাতে
মসীহ।

প্র. হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)-এর ইতায়াতের বিষয়ে হযরত মসীহ
মাওউদ (আ.) কী মন্তব্য করেছিলেন?

উ. “তিনি আমার এক একটি নির্দেশের এমন অনুসরণ করেন যেমন ‘নব্য কী হ্রকত
তানাফ্ফুস কী হ্রকত’ (হৃদয়ের স্পন্দনের সাথে ধৰ্মগীর স্পন্দন)।” [আয়নায়ে
কামালাতে ইসলাম]।

প্র. আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রথম খলীফা কে? কবে তিনি খিলাফতের আসনে
সমাচীন হন?

উ. হযরত হাফেয় মাওলানা হাজীউল হারামাট্রেন শরীফাঁস্টন হেকিম নূরুল্লাহ (রা.)
তিনি ১৯০৮ সালের ২৭ মে তারিখে আহমদীয়া খিলাফতের আসনে সমাচীন
হন।

প্র. হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)-এর প্রতি



হযরত হাফেয় মাওলানা আলহাজ্জ
হেকিম নূরুল্লাহ (রা.)

কিরণে তাঁর আস্থা ব্যক্ত করেছেন?

উ. হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন :-

چہ خوش بودے گر ہر یک از امت نور دیں بودے
ہمیں بودے گر ہر دل پر از نور یقین بودے

(চেহ খোশ বুদে গার হার ইয়াক আয উম্মাতে নূরে দী বুদে
হার্মি বুদে গার হার দিল পুর আয নূর ইয়াকুই বুদে)

অর্থ: “কতো আনন্দের ব্যাপার হতো যদি উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তি নূরান্দীন হতো, কতোই না ভাল হতো যদি প্রত্যেকটি হৃদয় একীনের নূরে (দৃঢ় বিশ্বাসের জ্যোতিতে) পরিপূর্ণ হতো!”

প্র. হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) ‘বায়তুল মাল’ বিভাগ কখন কার্যেম করেন?

উ. ৩০ মে ১৯০৮ সনে।

প্র. তালীমুল ইসলাম হাই স্কুল, কাদিয়ানের বোর্ডিং ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর কে, কখন রেখেছিলেন?

উ. ১৯১০ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)।

প্র. হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)-এর তাফসীরে কুরআন কী নামে প্রকাশিত হয়েছে?

উ. হাকারেকুল ফুরকান (কুরআনের তত্ত্বকথা)।

প্র. হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)-এর মারাত্কভাবে আহত হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করুন।

উ. ১৯১০ সনের অক্টোবর মাসে মুলতান সফরের প্রাক্কালে তিনি ঘোড়া হতে পড়ে গিয়ে মারাত্কভাবে আহত হন। তা সত্ত্বেও তিনি (রা.) আনন্দিত হন; কেননা এভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করে যাতে ইঙ্গিত ছিল, ‘নূরান্দীন ঘোড়া হতে পড়ে যাবে।’

প্র. একজন বাঙালির নাম উল্লেখ করুন যিনি হৃষুর (রা.)-এর হাতে বয়াত নেন?

উ. ব্রাক্ষণবাড়িয়ার বিখ্যাত মাওলানা হযরত সৈয়দ মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব এক বিশেষ দীনি সফরে সমস্ত ভারতবর্ষের বিশিষ্ট ওলামাদের সাথে আলাপ-আলোচনা শেষে ১৯১২ সনের ১লা নভেম্বর হৃষুর (রা.)-এর পরিত্র হাতে বয়াত নেন।

প্র. আলু ফয়ল পত্রিকার প্রকাশনা কখন আরম্ভ হয়?

উ. ১৯১৩ সনের ১৮ জুন হৃষুর (রা.)-এর অনুমতিক্রমে ও সাহেবেয়াদা মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) সাহেবের সম্পাদনায় শুরুতে সাঞ্চাহিক পত্রিকা হিসাবে ‘আল ফয়ল’- এর প্রকাশনা আরম্ভ হয়। এরপর এ পত্রিকা তিনি দিন পর পর প্রকাশ হতে থাকে

এবং অবশেষে ১৯৩৫ সনের ৮ই মার্চ হতে এটা দৈনিক হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমানে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল্খামেস (আই.)-এর তত্ত্বাবধানে লঙ্ঘন হতে ‘সাঙ্গাহিক আল্ফযল ইন্টারন্যাশনাল’ নামে এর একটি সংক্ষরণ বের হচ্ছে।

প্র. আফ্রিকায় আহমদীয়াত সম্বন্ধে হ্যুর (রা.) কী ভবিষ্যদ্বাণী করেন?

উ. ১৯১৪ সনের ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে হ্যুর (রা.) ঘোষণা করেন, ‘অসুস্থাবস্থায় খোদা তালা আমার সাথে ওয়াদা করেছেন, আফ্রিকায় ৫ লক্ষ খ্রিস্টান মুসলমান হবে।’

প্র. প্রথম খিলাফত কালের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কর্মকাণ্ড বলুন?

উ. • মোবাল্লেগ পাঠানোর কার্যক্রমের সূচনা হয়। (সর্বপ্রথম মোবাল্লেগ ছিলেন হযরত চৌধুরী ফতেহ মোহাম্মদ সাইয়াল সাহেব (রা.) যাকে ইংল্যান্ডে প্রেরণ করা হয়)।

- বায়তুল মাল গঠন।

- আনুষ্ঠানিক লঙ্ঘরখানার ব্যবস্থাপনার সূচনা।

- “নূর” পত্রিকা এবং “আল হক” পত্রিকা প্রকাশ।

(“নূর” পত্রিকা শিখদের জন্য এবং “আল হক” পত্রিকা হিন্দুদের মধ্যে তবলীগি কাজের জন্য প্রকাশ করা হয়েছিল)।

- আনুষ্ঠানিক মাদ্রাসা আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা।

- কাদিয়ানে ‘পাবলিক লাইব্রেরি’ প্রতিষ্ঠা।

প্র. হ্যুর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত নিজ জীবনের ঘটনাবলী যে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে এর নাম কী?

উ. মীরাকাতুল ইয়াকীন ফী হায়াতে নূরওদীন।

প্র. হ্যুর (রা.) কবে কখন ইন্টেকাল করেন?

উ. ১৯১৪ সনের ১৩ মার্চ শুক্রবার বাদ জুয়ু’আ দুপুর ২:৩০ মিনিটে কাদিয়ানে। তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সমান আয়ুপ্রাপ্ত হন (৭৩ বছর); যেখানে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত রসূল করিম (সা.)-এর সমান আয়ুপ্রাপ্ত হয়েছিলেন (৬৩ বছর)।

খলীফাতুল মসীহ সানী

হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ আল মুসলেহ মাওউদ (রা.)

প্র. হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) কবে, কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন?

উ. ১৮৮৯ সালের ১২ জানুয়ারি কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন।

প্র. হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) হযরত রসূল করিম (সা.)-এর কোন ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নকারী সাব্যস্ত হয়েছিলেন?

উ. بَسْرُوجْ وَبُولْدَلَه. (ইয়াতায়াওয়্যাজু ওয়া

ইউলাদু লাহ)- অর্থাৎ, আগমনকারী ইমাম



হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ
আহমদ আল মুসলেহ মাওউদ (রা.)

মাহদী বিবাহ করবে এবং তাঁর ওরসে এক
অসাধারণ সন্তান জন্মগ্রহণ করবে।

প্র. হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) কবে
সর্বপ্রথম সালানা জলসায় বক্তৃতা দেন?

উ. ১৯০৬ সনের ডিসেম্বর মাসে মাত্র সতর
বছর বয়সে তিনি কাদিয়ানে সালানা জলসায়
বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল ‘শিরকের
মূলোৎপাটন’।

প্র. হযরত (রা.) কবে খিলাফতের আসনে
অধিষ্ঠিত হন?

উ. ১৪ মার্চ, ১৯১৪ সনে।

প্র. উপমহাদেশের বাইরে জামা'তে
আহমদীয়ার সর্বপ্রথম তবলীগি মিশন কখন
কার মাধ্যমে, কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?

উ. ২৮ জুন ১৯১৪ সনে লন্ডন, ইংল্যান্ডে হযরত চৌধুরী ফতেহ মুহাম্মদ সাইয়াল (রা.)-র
মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্র. হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ওপর অবতীর্ণ ‘তা-ঈ আয়ি’ (বড় চাচী এলেন)
ইলহামটি কখন পূর্ণতা পায়?

উ. হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বড় ভাই মির্যা গোলাম কাদের সাহেবের বিধবা স্ত্রী
১৯১৬ সনের মার্চ মাসে হ্যার (রা.)-এর হাতে বয়াত নেন। এভাবে ‘তা-ঈ আয়ি’
ইলহামটি পূর্ণতা পায়?

প্র. হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী ওয়াকফে জিন্দেগী (জীবন উৎসর্গ) করার সর্বপ্রথম
তাহরীক কখন করেছিলেন?

উ. ৭ ডিসেম্বর ১৯১৭ সনে।

প্র. সদর আঙ্গুমানে আহমদীয়ায় ‘নায়ারাত’ (পর্যবেক্ষণ বিভাগ) কত সালে প্রতিষ্ঠা করা
হয়?

উ. ১লা জানুয়ারি ১৯১৯ সনে।

প্র. জামা'তে আহমদীয়ার মজলিসে মুশাবিরাত (পরামর্শ সভা) কখন আরম্ভ হয়?

উ. হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) কর্তৃক ১৯২২ সনের ১৫-১৬ এপ্রিল।

প্র. হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) অভ্যন্তরীণভাবে জামা'তকে কী কী সংগঠনে বিভক্ত
করেন।

উ. (১) লাজনা ইমাইল্লাহ : ১৯২২ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৫ বছরের উর্দ্ধে আহমদী

মহিলাদের জন্য, (২) নাসেরাতুল আহমদীয়া : ১৯২৮ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত বালিকাদের জন্য, (৩) মজলিস খোদামুল আহমদীয়া : ১৯৩৮ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়, ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত আহমদী যুবকদের জন্য, (৪) মজলিস আতফালুল আহমদীয়া : ১৯৩৮ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়, ৭ থেকে ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত আহমদী বালকদের জন্য। (৫) মজলিসে আনসারুল্লাহ : ১৯৪০ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়, ৪০ বছরের উর্ধ্বে আহমদী পুরুষদের জন্য,

প্র. শুন্দি আন্দোলন কী? এর প্রতিরোধকল্পে হ্যুর (রা.) কী পদক্ষেপ নেন?

উ. ভারতের উত্তর প্রদেশে আর্য সমাজীরা ১৯২২ সনে সেখানকার গ্রামাঞ্চলের মুসলমানদেরকে (যারা হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছিল) জোরপূর্বক হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্যে এক ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি করে। এটিই ইতিহাসে ‘শুন্দি আন্দোলন’ নামে খ্যাত। এর প্রতিরোধকল্পে হ্যরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) জিহাদের ডাক দেন এবং আহমদীদের সেখানে গিয়ে ইসলামের স্বপক্ষে প্রচারণা ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে বলেন যাতে ধর্মত্যাগী মুসলমানরা আবার ইসলাম ধর্মে ফিরে আসে।

প্র. হ্যুর (রা.) কবে এবং কোন উপলক্ষে প্রথম লক্ষণ যান?

উ. ধর্মীয় সম্মেলন উপলক্ষে তিনি ১৯২৪ সনে ইসলামের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রথম লক্ষণে যান। এ উপলক্ষে তিনি ‘আহমদীয়াত’ তথা প্রকৃত ইসলাম (Ahmadiyyat or True Islam) শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেন— যা পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি পাঠ করেন হ্যরত চৌধুরী স্যার মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেব (রা.)। পথিমধ্যে তিনি মিসর, সিরিয়া এবং ফিলিস্তিনেও অবস্থান করেন।

প্র. হ্যরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ভারত উপমহাদেশের বাইরে কোন মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর নিজ পবিত্র হাতে স্থাপন করেন?

উ. লক্ষণের ‘মসজিদ ফফল’। ১৯২৪ সনে এর ভিত্তি রাখা হয় এবং ১৯২৬ সনে সম্পূর্ণ হয়। ১৯২৬ সনের ঢরা অঙ্গোবর স্যার আব্দুল কাদির লক্ষণ মসজিদের উদ্বোধন করেন।

প্র. তাঁর দশটি পুস্তকের নাম লিখুন।

উ. ১) দাওয়াতুল আমীর, ২) তাঁলুক বিল্লাহ, ৩) হাস্তিয়ে বারী তাঁলা, ৪) মিনহ-জুত্তালিবীন, ৫) ইসলাম কা ইকতেসাদী নেয়াম, ৬) নেয়ামে নও, ৭) সীরাতে খায়রুর রসূল, ৮) আয়নায়ে সাদাকাত, ৯) মালায়িকাতুল্লাহ, ১০) যিকরে ইলাহী।

প্র. কখন সর্বপ্রথম আহমদী মহিলাদের জলসা সালানার সূচনা হয়?

উ. ডিসেম্বর ১৯২৬ সনে।

প্র. হ্যুর (রা.)-এর তাহরীক অনুযায়ী সর্বপ্রথম কখন সমগ্র ভারত উপমহাদেশব্যাপী ‘সীরাতুন নবী (সা.) দিবস’ উদযাপন করা হয়?

উ. ১৭ জুন ১৯২৮ সনে।

প্র. মুসলমানরা কখন হ্যুর (রা.)-কে কাশ্মীরের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত

‘অল ইন্ডিয়া কাশ্মীর কমিটি’-এর প্রথম সভাপতি নির্বাচিত করেন?

উ. ১৯৩১ সনের ১৫ জুলাই। এই সম্মেলনে আল্লামা ইকবাল, সৈয়দ মোহসিন শাহ, সৈয়দ হাবীব এবং খাজা হাসান নিজামীর মতো গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। আল্লামা ইকবাল সাহেব সভাপতি হিসেবে হ্যুর (রা.)-এর নাম প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিলেন।

প্র. পাকিস্তানের জাতির জনক কায়েদে আয়ম মুহাম্মদ আলী জিল্লাহ ‘মসজিদ ফফল’ লন্ডনে কখন বক্তৃতা দিয়েছিলেন?

উ. ২৩ এপ্রিল ১৯৩৩ সনে।

প্র. হ্যুর (রা.) কত সালে তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা দেন? এর মোতালেবাত (দাবি) কয়টি ছিল?

উ. ১৯৩৪ সনে। সর্বমোট ২৭টি মোতালেবাত ছিল। যেমন: সহজ-সরল, অনাড়ম্বর জীবন-যাপন, ওয়াকারে আমল, ওয়াকফে জিন্দেগী ইত্যাদি।

প্র. তাহরীকে জাদীদের প্রথম বছর হ্যুর (রা.) কত টাকা চাঁদা আদায় হ্বার জন্য তাহরীক করেন আর জামা’ত কত টাকা আদায় করেছিল?

উ. হ্যুর (রা.) ২৭০০০/- (সাতাশ হাজার) টাকা চাঁদা আদায় করার জন্য তাহরীক করেন। কিন্তু খোদার প্রেমে বিভোর ইসলামের খাঁটি প্রেমিকরা এক লক্ষ চার হাজার টাকার ওয়াদা করে এবং পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা নগদ আদায় করে হ্যুরের খেদমতে পেশ করে।

প্র. মসজিদে আকসা, কাদিয়ানে লাউড স্পিকারের মাধ্যমে হ্যরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) সর্বপ্রথম কখন খুতবা জুমু’আ প্রদান করেছিলেন?

উ. ৭ জানুয়ারি ১৯৩৮ সনে।

প্র. হ্যরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর দু’টি উল্লেখযোগ্য তাহরীকের নাম বলুন?

উ. ১) ওয়াকফে জিন্দেগীর তাহরীক, ২) হিফয়ে কুরআনের তাহরীক।

প্র. কত সালে জামা’তে আহমদীয়ার ৫০ বছর পূর্তি এবং হ্যরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর খিলাফত কালের ২৫ বছর পূর্তি উদযাপন করা হয়?

উ. ১৯৩৯ সনে।

প্র. ‘লাওয়ায়ে আহমদীয়া’— অর্থাৎ, আহমদীয়াতের পতাকা কবে সর্বপ্রথম উত্তীন করা হয়?

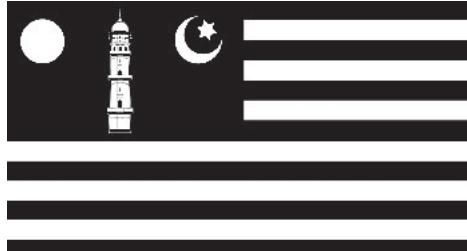
উ. হ্যুর (রা.) ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে ‘লাওয়ায়ে আহমদীয়া’ উত্তোলন করেন। পতাকার কাপড়ের কার্পাশ এক সাহাবী নিজ জমিতে উৎপন্ন করেন। পুরুষ সাহাবাগণ এ থেকে তুলা বের করেন এবং মহিলা সাহাবীরা নিজ হাতে সুতা কাটেন। তারপর এ সুতা দিয়ে পুরুষ সাহাবীরা কাপড় তৈরী করেন। পতাকার কাপড়ের রং কালো, লম্বা ১৮ ফুট এবং প্রস্থ ৯ ফুট, মধ্যখানে শুভ্র রং-এর মিনারাতুল মসীহ- এর একদিকে বদর (পূর্ণ চন্দ্র) এবং

অন্যদিকে হিলাল (দ্বিতীয়ার চাঁদ)।



লাওয়ায়ে আহমদীয়া (আহমদীয়াতের পতাকা)

প্র. ‘লাওয়ায়ে খোদামুল আহমদীয়া’ কখন উত্তোলন করা হয়? এর আকৃতি ও নকশা কী? উ. ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর লাওয়ায়ে আহমদীয়া উত্তোলন করার পর হ্যরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) নিজ পবিত্র হাতে প্রথমবারের মতো ‘লাওয়ায়ে খোদামুল আহমদীয়া’ উত্তোলন করেন। পতাকার দৈর্ঘ্য ১৮ ফুট এবং প্রস্থ ৯ ফুট। এক-ত্রৈয়াংশে লাওয়ায়ে আহমদীয়ার মতো নকশা করা এবং বাকী অংশ তেরটি সাদাকালো রেখায় বিভক্ত। এর তেরটি রেখা ইসলামের তের শতাব্দীর প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।



মজলিস খোদামুল আহমদীয়ার পতাকা

প্র. খোদামুল আহমদীয়া পতাকার ডিজাইনার এর নাম কী?

উ. মোহতরম মালেক আতাউর রহমান সাহেব।

প্র. খোদামুল আহমদীয়া যুব সংগঠনের প্রথম শহীদের নাম কী?

উ. এই যুব সংগঠনের প্রথম শহীদ হলেন হাফেয় বশীর আহমদ সাহেব। তিনি ২৩ মে ১৯৩৮ সালে শাহাদাত বরণ করেন।

প্র. হ্যুর (রা.) কত সালে হিজরি শামসি সনের প্রবর্তন করেন?

উ. ১৯৪০ সনে।

প্র. খ্রিস্টিয় সন থেকে কিভাবে হিজরি শামসি সন বের করতে হয় ?

উ. খ্রিস্টিয় সন থেকে ৬২১ বছর বাদ দিলে হিজরি শামসি সন পাওয়া যাবে। যেমন :
 $2013-621 = 1392$ হিজরি শামসি ।

প্র. হ্যুর (রা.)-এর মুসলেহ মাওউদ হবার দাবি সম্বন্ধে সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

উ. মহামহিম খোদা তালা ১৯৪৪ সনের ৫-৬ জানুয়ারির মধ্যবর্তী রাতে হ্যুর (রা.)-কে ‘মুসলেহ মাওউদ’ হওয়ার ব্যাপারে কাশ্ফ দেখান। এ সম্পর্কিত ইলহামটি হলো:

أَنَّ الْمَسِيحَ الْمُوعُودَ مَيْلَةً وَخَلِيفَتَهُ

(আনাল মাসীহুল মাওউদু মাসীলুহু ওয়া খালীফাতুহ)

অর্থাৎ- আমি মসীহ মাওউদের সন্দৃশ্য এবং তাঁর খলীফা ।

২৮ জানুয়ারি কাদিয়ানে হ্যুর (রা.) সর্বসাধারণের সামনে সর্বপ্রথম মুসলেহ মাওউদ হওয়ার ঘোষণা দেন। সেই বছরেই হ্যুর (রা.) ছশিয়ারপুরে (২০ ফেব্রুয়ারি), লাহোরে (১১ মার্চ) এবং লুধিয়ানায় (২৩ মার্চ) তিনিটি বিশেষ জলসায় তাঁর মুসলেহ মাওউদ দাবির ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন।

প্র. তালীমুল ইসলাম কলেজ, কাদিয়ান- এর উদ্বোধন কখন এবং কে করেছিলেন?

উ. ১৯৪৪ সনের ৪ জুন সৈয়দনা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ।

প্র. হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) কাদিয়ান থেকে পাকিস্তানে কখন হিজরত করেন?

উ. ৩১ আগস্ট ১৯৪৭ সালে ।

প্র. লাহোরে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, পাকিস্তান কত সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়?

উ. ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সনে ।

প্র. পাকিস্তানের প্রথম মজলিসে শূরা কখন অনুষ্ঠিত হয়?

উ. ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সনে ।

প্র. কে, কখন রাবওয়া শহরের গোড়াপত্তন করেন?

উ. হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রা.) নিজের এক কাশফ (দিব্য দর্শন) এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ‘দাগে হিজরত’ (হিজরতের চিহ্নবলী)-কে পূর্ণ করার মানসে ১৯৪৮ সনের ২০ সেপ্টেম্বর রাবওয়া শহরের গোড়াপত্তন করেন।

প্র. তাহরীকে জাদীদের দ্বিতীয় দণ্ডের কত সনে কায়েম হয়?

উ. ২৪ নভেম্বর ১৯৪৪ সনে ।

প্র. বাংলা ভাষার ওপর অন্যায় হস্তক্ষেপ না করার জন্যে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষকে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) কী পরামর্শ দিয়েছিলেন?

উ. হ্যুর (রা.) বলেছিলেন, “মাদারী যবান মেঁ তালীম দিই জায়ে, ইস সিলসিলে মেঁ মাশরেকি পাকিস্তান পার যোর না দি যায়ে কে ওহ যবুর উর্দু কো যারিয়া তালীম বানায়ে, ওয়ারনা ওহ পাকিস্তান সে আলায়হিদা হো যায়েগা; কিংতুকে ওয়াহাঁকে বাসীন্দোঁ কো বাঙালা যবান সে এক কিসিম কা ইশ্ক হ্যা ।”

অর্থাৎ: “মাত্তভাষায় যেন শিক্ষা দেয়া হয়। এ ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানিদের যেন বাধ্য করা না হয় যে, অবশ্যই তারা উদুকে শিক্ষার মাধ্যম বানায়। নতুবা তারা পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়ে যাবে। কেননা, সেখানকার অধিবাসীদের বাংলা ভাষার প্রতি এক অগাধ ভালোবাসা রয়েছে।” (তারিখে আহমদীয়াত, ১০ তম খন্ড, পঃ. ৪২২ এবং দৈনিক আল ফযল, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৪৭)।

প্র. হ্যুর (রা.) কোন স্থানকে নিজের দ্বিতীয় জন্মভূমি বলে উল্লেখ করেছেন?

উ. লাহোর-কে (দৈনিক আল ফযল, রাবওয়া, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৪৭)।

প্র. পাকিস্তানে জামা’তে আহমদীয়ার সালানা জলসা কবে, কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

উ. ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর ১৯৪৭ সনে লাহোরে।

প্র. রাবওয়াতে প্রথম জলসা সালানা কবে অনুষ্ঠিত হয়?

উ. ১৫, ১৬ ও ১৭ এপ্রিল ১৯৪৯ সনে।

প্র. কে, কখন রাবওয়াতে নিম্নোল্লিখিত বিভাগসমূহের কেন্দ্রীয় অফিসের ভিত্তি রাখেন?

১) ‘কাসরে খিলাফত’, ২) ‘সদর আঞ্চলিকে আহমদীয়ার দণ্ড’, ৩) ‘তাহরীক জাদীদ আঞ্চলিকে আহমদীয়ার দণ্ড’, ৪) ‘লাজনা ইমাইল্লাহ্র দণ্ড’।

উ. হ্যরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ১৯৫০ সনের ৩১ মে।

প্র. আহমদীয়াবিরোধী আন্দোলন চলাকালে হ্যরত সাহেবেয়াদা মির্যা শরিফ আহমদ সাহেব (রা.) এবং হ্যরত সাহেবেয়াদা মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.)-কে কখন গ্রেফতার করা হয়?

উ. ১লা এপ্রিল ১৯৫৩ সনে।

প্র. হ্যুর (রা.)-কে হত্যা করার জন্য কীভাবে হামলা চালানো হয়?

উ. ১৯৫৪ সনের ১০ মার্চ, বুধবার হ্যুর (রা.) মসজিদ মোবারক, রাবওয়াতে আসরের নামায পড়াচিলেন। এমন সময় প্রথম কাতারে দাঁড়ানো আব্দুল হামিদ নামক এক ব্যক্তি হঠাৎ ছুরি দিয়ে তাঁর ঘাড়ে আঘাত করে। পরে প্রাথমিকভাবে হ্যুর (রা.) এ আঘাত হতে সেরে উঠলেও তা তাঁর স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্ক প্রভাব ফেলে।

প্র. হ্যুর (রা.) প্রথমবার কখন ইউরোপ সফর করেন? এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

উ. হ্যুর (রা.) ১৯২৪ সনের ১২ জুলাই প্রথমবারের মত ইউরোপ সফরে বের হন।

• ১৯২৪ সনের ১৮ আগস্ট: হ্যুর (রা.) ইটালীর প্রধানমন্ত্রী মুসোলিনীর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

• ১৯২৪ সনের ২২ আগস্ট: হ্যুর (রা.) প্রথম দফা লভন সফর করেন।

• ১৯২৪ সনের ০৯ সেপ্টেম্বর: হ্যুর (রা.) ইস্ট এন্ড ওয়েস্ট ইউনিয়নে প্রথম ইংরেজিতে বক্তৃতা দেন।

• ১৯২৪ সনের ১৯ অক্টোবর: হ্যুর (রা.) লভন মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

প্র. হ্যুর (রা.) কবে, কখন দ্বিতীয়বার ইউরোপ সফরে যান?

উ. হ্যুর (রা.) ২৯ এপ্রিল ১৯৫৫ সনে দ্বিতীয়বার ইউরোপ সফরের উদ্দেশ্যে করাচী থেকে যাত্রা করেন। জুরিখ, হামবুর্গ এবং লন্ডনে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে তাঁর দেহে আঘাতের স্থান ভালভাবে পরীক্ষা করানো হয়। এ সফরে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন মিশন পরিদর্শন করেন। পরবর্তীতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মিশনারীদের নিয়ে তিনি লন্ডনে কনফারেন্স করেন। এতে তিনি তাদের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দান করেন।

প্র. হ্যুর (রা.) কখন জামা'তের কোন তিনজন বুয়ুর্গকে 'খালিদ' উপাধি প্রদান করেন?
 উ. ১৯৫৬ সনের জলসা সালানার সময় নিম্নোক্ত তিনজন বুয়ুর্গকে 'খালিদ' উপাধি প্রদান করেছিলেন:

- ১) হ্যরত মাওলানা জালালুদ্দীন শামস সাহেব (রা.)।
 - ২) হ্যরত মাওলানা আবুল আতা জলদুরী সাহেব।
 - ৩) মোকাররম মালিক আব্দুর রহমান খাদেম সাহেব।
- প্র. ওয়াকফে জাদীদ-এর নেয়াম কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

উ. ডিসেম্বর ১৯৫৭ সনে।
 প্র. হ্যরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) কবে ইস্তেকাল করেন?
 উ. ১৯৬৫ সনের ৭-৮ নভেম্বর মধ্যবর্তী রাত ২:২০ মিনিটে রাবওয়া, পাকিস্তানে।

খলীফাতুল মসীহ সালেস হযরত হাফেয় মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.)

প্র. হযরত সাহেবযাদা মির্যা নাসের আহমদ
কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ. ১৬ নভেম্বর ১৯০৯ সালে কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ
করেন।

প্র. তাঁর (রাহে.) সমষ্টে হযরত মসীহ মাওউদ
(আ.)-এর কাছে কী ইলহাম হয়েছিল?

উ. ইলহাম: *إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ نَافِلَةً لَكَ*

(ইন্না নুবাশশিরকা বিগুলামীন নাফিলাতাল্লাকা)
[হাকীকাতুল ওহী, প. ৯৫]।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এ ইলহামের
অনুবাদ করেন, “আমি তোমাকে একজন পুত্রের
সুসংবাদ দিচ্ছি, যে তোমার পৌত্র হবে।”

প্র. হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.)
কবে কুরআন শরীফ সম্পূর্ণ হিফয (মুখ্যত)
করেন?

উ. ১৭ এপ্রিল ১৯২২ সনে। তখন তাঁর (রাহে.) বয়স ছিল মাত্র ১৩ বছর।

প্র. হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) খিলাফতে সমাসীন হবার পূর্বে জামা'তের
কোন-কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্বরত ছিলেন?

উ. • ১৯৩৯-১৯৪৪ ইং: প্রিসিপাল, জামেয়া আহমদীয়া, কাদিয়ান।

• ১৯৩৯-১৯৪৯ ইং: বিশ্ব সদর, মজলিস খোদামুল আহমদীয়া।

• ১৯৪৪-১৯৬৫ ইং: প্রিসিপাল, তালীমুল ইসলাম কলেজ, কাদিয়ান, লাহোর এবং
রাবওয়া।

• ১৯৫৪-১৯৬৮ ইং: বিশ্ব সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ।

• ১৯৫৫-১৯৬৫ ইং: সদর, সদর আঙ্গুমানে আহমদীয়া, রাবওয়া।

প্র. তৃতীয় খলীফার নির্বাচন কবে হয়?

উ. ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ৮ নভেম্বর হযরত সাহেবযাদা মির্যা আযিয আহমদ সাহেবের
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ‘মজলিসে ইন্তেখাবে খিলাফত’-এর সভায় হযরত সাহেবযাদা
হাফেয মির্যা নাসের আহমদ এম.এ. (অক্সন) তৃতীয় খলীফা নির্বাচিত হন এবং
নির্বাচনের পরপরই রাবওয়ার মসজিদে মোবারকে বয়াত নেয়া আরম্ভ করেন।



হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.)
খলীফাতুল মসীহ সালেস

প্র. তৃতীয় খিলাফতের সর্বপ্রথম আর্থিক কুরবানীর তাহরীক কোনটি ছিল এবং কত টাকা চাঁদা আদায় করার টাগেটি দেয়া হয়েছিল?

উ. সর্বপ্রথম আর্থিক কুরবানীর তাহরীকটি ছিল ‘ফযলে উমর ফাউন্ডেশন’ এবং তিনি বছরের মধ্যে ২৫ লক্ষ টাকা চাঁদা আদায় করার টাগেটি দেয়া হয়েছিল। এ তাহরীকের উদ্দেশ্য ছিল হ্যরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর অসামান্য কার্যক্রমকে অব্যাহত গতিতে সামনে এগিয়ে নিয়ে চলা।

প্র. কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান আহমদী হয়েছিলেন এবং কোন ভবিষ্যদ্বাণীর বিকাশস্থল হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন?

উ. পশ্চিম আফ্রিকার দেশ গামিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান আলহাজ স্যার এফ.এম. স্যাঙ্গাটে (তিনি ১৯৬৩ সনে আহমদী হয়েছিলেন এবং ১৯৬৫ সনে রাষ্ট্রপ্রধান পদে আসীন হয়েছিলেন)। তিনি হ্যরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) এর নিকট বরকত ও কল্যাণ লাভের জন্য হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র বস্ত্র লাভ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। এভাবে সেই ভবিষ্যদ্বাণী ‘বাদশাহ তোমার বস্ত্র থেকে কল্যাণ অন্বেষণ করবে’ পূর্ণতা লাভ করে।

প্র. তাহরীকে জাদীদের তৃতীয় দণ্ডের কখন, কে শুরু করেন?

উ. ২২ এপ্রিল ১৯৬৬ সনে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) তৃতীয় দণ্ডের ঘোষণা দেন এবং বলেন, “এই দণ্ডের ১৯৬৫ সন থেকে শুরু হয়েছে বলে গণনা করা হবে, যাতে করে হ্যরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর মোবারক সময়কাল এ দণ্ডের অস্তর্ভুক্ত হয়।”

প্র. ওয়াকফে জাদীদ দণ্ডের আতফাল কখন প্রতিষ্ঠিত হয়?

উ. ১৭ অক্টোবর ১৯৬৬ সনে। হ্যরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) আহমদী শিশু-কিশোরদেরকে ৫০ হাজার টাকা জমা করার টাগেটি প্রদান করেন।

প্র. রাবওয়ার মসজিদুল আকসার ভিত্তিস্থাপন ও উদ্বোধন কে করেন এবং কখন?

উ. সৈয়দনাহ হ্যরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ২৮ অক্টোবর এ মসজিদের ভিত্তি রাখেন এবং ৩১ মার্চ ১৯৭২ সনে এ মসজিদের উদ্বোধন করেন।

প্র. হ্যুর (রাহে.) কখন ইউরোপ সফর করেন এবং কোন-কোন দেশে সফর করেন?

উ. ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ জুলাই তারিখে হ্যুর (রাহে.) রাবওয়া হতে ইউরোপের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং ২৪ আগস্ট প্রত্যাবর্তন করেন। এ বরকতময় সফরে তিনি জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, হল্যান্ড, ডেনমার্ক এবং ইংল্যান্ড সফর করেন।

প্র. এ সফরে তিনি কোন মসজিদের উদ্বোধন করেন?

উ. ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুলাই তিনি ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে ‘মসজিদ নুসরত জাহাঁ’-র উদ্বোধন করেন।

প্র. হ্যুর (রাহে.) কবে ইউরোপের মাটিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরচন্দে ছাঁশিয়ারী উচ্চারণ

করেন?

উ. হ্যুর (রাহে.) লভনের ওয়াক্স ওয়ার্থ টাউন হলে ১৯৬৭ সনের ২৮ জুলাই এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এতে তিনি পাশ্চাত্য জাতিসমূহকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানান। হ্যুর (রাহে.) বলেন, তারা যদি ইসলামের ছায়াতলে না আসে তাহলে তাদের এ তথাকথিত সভ্যতা অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। হ্যুর (রাহে.)-এর এ ঐতিহাসিক ভাষণ A message of peace and word of warning. (একটি শান্তির বাণী ও এক হঁশিয়ারি) নামক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

প্র. হ্যরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.)-এর বিশেষ-বিশেষ তাহরীকগুলো কী কী? উ. ১) গরীব মিসকানদের খাবার দেয়া, ২) ফযলে উমর ফাউন্ডেশন, ৩) তালীমুল কুরআন, ৪) ওয়াকফে আরয়ী, ৫) সিলসিলা ইলমী তাকারীর (মজলিসে ইরফান), ৬) মজলিসে মুসীয়ান, ৭) ওয়াকফে জাদীদের দায়িত্ব শিশুদের ক্ষেত্রে অর্পণ করার আশা পোষণ, ৮) বিশ্ব মুসলিম এক্য, ৯) আহমদী জামা'তের শতবার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষে নির্দিষ্ট সংখ্যায় তসবীহ, তাহ্মীদ, দুরদ শরীফ, ইস্তিগফার ইত্যাদি পাঠ করা, ১০) আধ্যাত্মিক শ্লোগানসমূহ, ১১) সূরা বাকারার প্রথম ১৭ আয়াত মুখস্থ করা, ১২) নুসরত জাহাঁ রিজার্ভ ফান্ড, ১৩) আহমদীয়া শতবার্ষিকী জুবিলী পরিকল্পনা, ১) বিশ্বব্যাপী আহমদীদের কলমী বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করা, ১৫) সর্বদা হাসিখুশী থাকা, ১৬) বেশি-বেশি সালামের প্রচলন করা, ১৭) প্রতি মাসের শেষ সোমবার বা বৃহস্পতিবার নফল রোয়া রাখা, ১৮) এশার নামাযের পর হতে ফজরের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে দু রাকা'ত নফল নামায পড়ে ইসলামের বিজয়ের জন্য দেয়া করা, ১৯) “হাসবুনাল্লাহ ওয়া নি'মাল ওয়াকীল নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসীর”- এ দোয়া অধিক সংখ্যায় পাঠ করা, ২০) দৈনিক কমপক্ষে সাত বার সূরা ফাতিহা পাঠ করা এবং এর মাহাত্ম্য সম্পর্কে চিন্তা করা প্রভৃতি।

প্র. হ্যুর (রাহে.)-এর উপর নাখিল হয়েছে এমন দু'টি ইলহাম লিখুন।

উ. **بُشْرَى لَكُمْ** (বুশ্রা লাকুম), অর্থ: তোমাদের জন্য সুসংবাদ।

میں تینوں ان دیوانگا کے تواریخ جاویگا

(ম্যায় তিনি ইন্না দেওয়াঙ্গা কে তুঁ রাজ জাবেগা)

অর্থ: আমি তোমাকে এত দেব যে, তুমি পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে।

প্র. রাবওয়ার ‘খিলাফত লাইব্রেরি’ ভবনের ভিত্তিস্থাপন ও উদ্বোধন কে, কখন করেন?

উ. ১৮ জানুয়ারি ১৯৭০ সনে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.)-এর ভিত্তি রাখেন এবং ৩ অক্টোবর ১৯৭১ সনে হ্যুর (রাহে.) এর উদ্বোধন করেন।

প্র. ১৯৭০ সনের আফ্রিকা সফরের সময় হ্যুর (রাহে.) কোন-কোন দেশের রাষ্ট্র ও

সরকার প্রধানদের সাথে সাক্ষাৎ করেন?

ট. নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান জনাব ইয়াকুবু গোবান, ঘানার রাষ্ট্রপ্রধান, লাইবেরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান টাৰ্ব মিন, গান্ডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান দাউদ আজওয়ারা এবং সিয়েরালিওনের প্রধানমন্ত্রীর সাথে।

প্র. নুসরত জাহাঁ পরিকল্পনা কী?

ট. ২৪ মে ১৯৭০ সনে ঐতিহাসিক পশ্চিম আফ্রিকা সফর শেষে লঙ্ঘন প্রত্যাবর্তনের পর ঐশী ইঙ্গিতে হ্যুর (রাহে.) আফ্রিকার আর্ট-মানবতার কল্যাণের লক্ষ্যে মসজিদ ফখল, লঙ্ঘনে ‘নুসরত জাহাঁ ক্ষিম’-এর ঘোষণা দেন এবং ১২ জুন রাবণ্যাতে নুসরাত জাহাঁ রিজার্ভ ফান্ডের তাহরীক করেন। এ পরিকল্পনার অধীনে আফ্রিকায় স্কুল, কলেজ, হাসপালতাল, হেলথ সেন্টার, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি স্থাপন করা হয়। আহমদী সদস্য-সদস্যাগণ শিক্ষক, ডাক্তার, স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এসব প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন।

প্র. এমন একটি ইলহামের উপরে করুন— যা হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.), হ্যরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এবং হ্যরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.)-এর ওপর অবর্তীর্ণ হয়েছে।

ট. ইলহাম:

يَا أَوْدِ إِنَّا جَعْلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ

(ইয়া দাউদু ইঞ্জা জাঁ’আলনাকা খলীফাতান্ ফিল্ আরয়ি)

অর্থ: হে দাউদ! নিশ্চয় আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছি।

প্র. খোদামুল আহমদীয়াকে কোন খলীফা, কখন ‘রঢ়মালের মতো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী’ বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন?

ট. কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা চলাকালীন ৫ অক্টোবর ১৯৭২ সনে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.)।

প্র. ভ্যুর (রাহে.) কত সনে ‘আহমদীয়া শতবার্ষিকী জুবিলী পরিকল্পনা’-এর ঘোষণা দেন?

ট. ২৮ ডিসেম্বর ১৯৭৩ সনে জলসা সালানা চলাকালীন সময়ে হ্যুর (রাহে.) শতবার্ষিকী জুবিলী পরিকল্পনা পেশ করেন এবং ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ সনে দোয়াসহ আধ্যাত্মিক কর্মসূচী পালনের তাহরীক উপস্থাপন করেন।

প্র. ১৯৭৪ সনে পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে জামা’তে আহমদীয়ার যে প্রতিনিধিদল গিয়েছিলেন তাদের নাম বলুন।

ট. ১) হ্যরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) ২) হ্যরত সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) ৩) মোহতরম শেখ মুহাম্মদ আহমদ মাযহার সাহেব ৪) মোহতরম মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব ৫) মোহতরম মাওলানা দোষ্ট মুহাম্মদ শাহেদ সাহেব।

প্র. ১৯৭৪ সনে পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে জামা’তে আহমদীয়ার প্রতিনিধিবর্গ কতদিন পর্যন্ত আলোচনা-পর্যালোচনার সুযোগ পেয়েছিল?

উ. দুইদিন পর্যন্ত হয়রত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) ‘মাহয়ারনামা’ (স্মারক লিপি) পাঠ করেন এবং তারপর ১১ দিন পর্যন্ত প্রশ্ন-উত্তরের কার্যক্রম অব্যাহত ছিল।

প্র. হ্যুর (রাহে.) আহমদী যুবকদের জন্য কী নীতি-ব্যাক্য নির্ধারণ করেছেন?

উ. হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ইলহাম “তরে আয়েয়োনা রাহে উসকো পাসান্দ আয়ি।”

অর্থ: তোমার বিনয়ীভাব তিনি পছন্দ করেছেন।

প্র. ১৯৭৪ সনে জামা’তে আহমদীয়াকে সংখ্যালঘু অমুসলিম সম্প্রদায় ঘোষণাকারী পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের সংসদীয় নেতা এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোকে কবে, কোথায় ফাঁসি দেয়া হয়?

উ. ১৪ এপ্রিল ১৯৭৯ সনে কেন্দ্রীয় কারাগার, রাওয়ালপিণ্ডি, পাকিস্তানে।

প্র. ঐতিহাসিক “কাসরে সলীব কনফারেন্স” (ক্রুশ ধ্বংস সম্মেলন) কবে, কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

উ. ২, ৩ ও ৪ জুন ১৯৭৯ সনে লন্ডনে। এতে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) অংশগ্রহণ করেন এবং ৪ঠা জুন সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন।

প্র. ‘আতফালুল আহমদীয়া’-কে “বড় আতফাল” ও “ছোট আতফাল” হিসেবে কত সালে পৃথক করা হয়?

উ. ১৯৮০ সনে। ১৩ থেকে ১৫ বছর বয়সের বালকেরা বড় আতফাল হিসেবে পরিগণিত হবে এবং ৭ থেকে ১২ বছরের বালকেরা ছোট আতফাল রূপে বিবেচিত হবে।

প্র. ১৯৮০ সনে কেন্দ্রীয় মজলিস খোদামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমা কোন বিশেষ স্বাতন্ত্রের অধিকারী ছিল?

উ. এই ইজতেমা চতুর্দশ ও পঞ্চদশ হিজরি শতাব্দীর মিলনস্থলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ইজতেমার তিনিদিনই হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) ঈমান উদ্দীপক এবং হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন।

প্র. স্পেনের “মসজিদে বাশারাত” সম্পর্কে কি জানেন?

উ. এটি স্পেনে প্রায় ৭০০ বছর পরে নির্মিত প্রথম মসজিদ। এ মসজিদ নির্মাণের সৌভাগ্য জামা’তে আহমদীয়া লাভ করেছিল, আলহামদুলিল্লাহ। হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) ৯ অক্টোবর ১৯৮০ সনে এর ভিত্তি রাখেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ সনে এ মসজিদের উদ্বোধন করেন।

প্র. হ্যুর (রাহে.) এর কয়েকটি পুস্তকের নাম বলুন?

উ. কুরআনী আনওয়ার (কুরআনের জ্যোতি), তামিরে বাযতুল্লাহ কে তেইস আয়িশুশান মাকাসেদ (কাবাগৃহ নির্মাণের তেইশটি মহান উদ্দেশ্য), এক সাচে অওর হাকিকী খাদেম কে বারাহ আওসাফ, (একজন সত্যিকার ও প্রকৃত সেবকের বারাটি বৈশিষ্ট্য), হামারে আকায়েদ (আমাদের বিশ্বাস), আল মাসাবিহ, জলসা সালানা কি

দু'আয়ে (বার্ষিক সম্মেলনের দোয়াসমূহ), আমন কা পয়গাম অওর এক হরফে ইনতেবাহ, (একটি শান্তির বাণী ও এক হঁশিয়ারি)।

প্র. জামা'তে আহমদীয়া সর্বপ্রথম কত সমে আহমদী ছাত্র-ছাত্রীদের কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার প্রদান শুরু করে?

উ. হ্যরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) ২৮ অক্টোবর ১৯৭৯ সালে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য আহমদী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা দেন এবং সে অনুযায়ী ১৩ জুন ১৯৮০ সমে রাবণ্যা, পাকিস্তানে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে সর্বপ্রথম সনদপত্র ও পুরস্কার প্রদান করা হয়।

প্র. হ্যরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.)-এর স্ত্রী হ্যরত সৈয়দা মনসুরা বেগম সাহেবা করে মৃত্যুবরণ করেন?

উ. তিরিমের ১৯৮১ সনে।

প্র. হ্যুর (রাহে.) কখন, কার সাথে দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন?

উ. ১৯৮২ সনের এপ্রিল মাসে হ্যরত সৈয়দা তাহেরা সিদ্দিকা সাহেবার সাথে।

প্র. হ্যুর (রাহে.)-এর বর্হিদেশে তরবিয়তী ও ইসলাম প্রচারমূলক সফরসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

- ১৯৬৭ [০৬ জুলাই-২৪ আগস্ট]: ইউরোপের ৫টি দেশ সফর এবং ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে মসজিদ নুসরত জাহাঁ-এর উদ্বোধন।
- ১৯৭০ [০৪ এপ্রিল-০৮ জুন]: হ্যুর (রাহে.) পশ্চিম আফ্রিকার ৬টি দেশ নাইজেরিয়া, ঘানা, আইভেরি কোস্ট, লাইবেরিয়া, গান্ধীয়া এবং সিয়েরালিওন সফর এবং ইউরোপের কয়েকটি দেশ সফর করেন।
- ১৯৭৩ [১৩ জুলাই-২৬ সেপ্টেম্বর]: ইউরোপের ৬টি দেশ জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন ও ইংল্যান্ড সফর।
- ১৯৭৫ [০৫ আগস্ট-২৯ অক্টোবর]: ইউরোপের ৩টি দেশ ইংল্যান্ড, সুইডেন ও নরওয়ে সফর। সুইডেনের গোটেনবার্গে ‘মসজিদ নাসের’-এর ভিত্তি স্থাপন।
- ১৯৭৬ [২০ জুলাই-২০অক্টোবর]: আমেরিকা ও কানাডায় তরবিয়তী ও তবলীগি সফর। ইউরোপের ৭টি দেশে সফর এবং সুইডেনের গোটেনবার্গে ‘মসজিদ নাসের’-এর উদ্বোধন।
- ১৯৭৮ [০৮ মে-১১ অক্টোবর]: আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ‘কাসরে সলীব (ক্রুশ ধ্বংস) কনফারেন্সে’ যোগদান উপলক্ষে ইংল্যান্ড গমন। ইউরোপের কয়েকটি দেশ সফর।
- ১৯৮০ [২৬ জুন-২৬ অক্টোবর]: পাশ্চাত্য দেশসমূহে তরবিয়তী ও তবলীগি সফর। ঐতিহাসিক সফরে ইউরোপের ৯টি দেশ পশ্চিম জার্মানী, ইংল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে, হল্যান্ড ও স্পেন; আফ্রিকার নাইজেরিয়া, ঘানাসহ ১৩ টি রাষ্ট্র এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া পরিভ্রমণ করেন। এ সফরকালে স্পেনে

প্রায় ৭০০ বছর পর পুনরায় ‘মসজিদে বাশারত’-এর ভিত্তি স্থাপন করা হয়।

প্র. হ্যুর (রাহে.) মেধাশক্তি বৃদ্ধির জন্যে কী ব্যবহার করতে বলেছেন?

উ. সয়ালেসেথিন (Soy Lecithin) ব্যবহার করতে বলেছেন।

প্র. হ্যুর (রাহে.) কবে, কখন ইতেকাল করেন?

উ. ১৯৮২ সনের ৮-৯ জুনের মধ্যবর্তী রাত পৌনে একটার সময় বায়তুল ফযল, ইসলামাবাদ, পাকিস্তানে হ্যুর (রাহে.) ইতেকাল করেন।

খলীফাতুল মসীহ রাবে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)

প্র. হযরত সাহেবেয়াদা মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) কখন, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

তাঁর পিতা ও মাতার নাম বলুন।

উ. হযরত মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল, মসীহ রাবে (রাহে.) ১৮
ডিসেম্বর ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে কাদিয়ানে
জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম:
হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ
আহমদ, খলীফাতুল মসীহ সন্মী আল্
মুসলেহ মাওউদ (রা.) এবং মাতার নাম:
হযরত সৈয়দা মরিয়ম বেগম সাহেবা।

প্র. হযরত মির্যা তাহের আহমদ
(রাহে.)-এর শিক্ষাজীবন সম্পর্কে কী
জানেন?

উ. • ১৯৪৪ সনে তিনি তালিমুল ইসলাম
হাই স্কুল, কাদিয়ান থেকে ম্যাট্রিক পাশ
করেন। এরপর গর্ভনেন্ট কলেজে,
লাহোর থেকে ইন্টারমিডিয়েট এবং প্রাইভেটভাবে বি.এ. পরীক্ষায় পাশ করেন।

- ৭ ডিসেম্বর ১৯৪৯ সনে তিনি জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়াতে ভর্তি হন এবং ১৯৫৩
সনে শাহেদ ডিপ্রি নিয়ে জামেয়া আহমদীয়া থেকে পাশ করেন।

• ১৯৫৫-১৯৫৭ সন পর্যন্ত লন্ডনে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন।

প্র. হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)-এর বিবাহ কার সাথে, কত সালে অনুষ্ঠিত হয়?

উ. ১৯৫৭ সনের ৫ ডিসেম্বর হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) হযরত সৈয়দা আসেফা



হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)
খলীফাতুল মসীহ রাবে

বেগম সাহেবা, পিতা : সাহেবযাদা মির্যা রশিদ আহমদ সাহেব-এর সাথে তাঁর বিয়ের এলান করেন এবং ১১ ডিসেম্বর ১৯৫৭ সনে তাঁর ওলীমা অনুষ্ঠিত হয়।

প্র. খিলাফতে আসীন হওয়ার পূর্বে তিনি জামা'তী কি কি গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন?

উ. • তিনি দীর্ঘদিন ওয়াকফে জাদীদের নামেই ইরশাদ ছিলেন।

• বিশ্ব সদর, মজলিস খোদামুল আহমদীয়া (১৯৬৬-১৯৬৯ ইং)।

• বিশ্ব সদর, মজলিস আনসরুল্লাহ (১৯৭৯- খিলাফতে আসীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত)।

• এছাড়া তিনি ত্তীয় খলীফার আমলে দীর্ঘদিন নায়েব অফিসার জলসা সালানা ছিলেন।

প্র. হ্যারত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) সর্বপ্রথম কখন, কোন বিষয়ে জলসা সালানায় বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন? খিলাফতে আসীন হওয়ার পূর্বে জলসায় প্রদত্ত তাঁর কয়েকটি বক্তৃতার নাম বলুন?

উ. তিনি ১৯৬০ সনে কেন্দ্রীয় জলসা সালানা, রাবওয়াতে “ওয়াকফে জাদীদের গুরুত্ব” বিষয়ে সর্বপ্রথম বক্তৃতা প্রদান করেন। খিলাফতে আসীন হওয়ার পূর্বে তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বক্তৃতা হচ্ছে - ১) মানব সৃষ্টি এবং আল্লাহ ত'লার অস্তিত্ব [১৯৬২], ২) আহমদীয়াত বিশ্বকে কী দিয়েছে? [১৯৬৪], ৩) হ্যারত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর কুরআন সেবা [১৯৭০], ৪) যুদ্ধে আঁ-হ্যারত (সা.)-এর উত্তম আচরণ [১৯৭৯-১৯৮১]।

প্র. হ্যারত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) কবে, কোথায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের চতুর্থ খলীফা হিসেবে নির্বাচিত হন?

উ. ১০ জুন ১৯৮২ সনের রোজ বৃহস্পতিবার যোহরের নামাযের পর রাবওয়ার মসজিদে মোবারকে হ্যারত মুসলেহ মাওউদ (রা.) কর্তৃক নির্ধারিত ‘মজলিসে ইন্তেখাবে খিলাফত’ (খিলাফতের নির্বাচক-মন্ত্রী)-এর সভা সাহেবযাদা মির্যা মুবারক আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে ঐশ্বী আকাঞ্জন্যায়ী হ্যারত সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেব খলীফাতুল মসীহ রাবে নির্বাচিত হন।

প্র. হ্যার রাবে (রাহে.) জামা'তের নামে সর্বপ্রথম কখন লিখিত বাণী প্রদান করেন এবং কী উদ্দেশ্যে দিয়েছিলেন?

উ. ১৩ জুন ১৯৮২ সনে প্রথম জামা'তের নামে লিখিত বাণী প্রদান করেছিলেন যেখানে তিনি ফিলিস্তিনের নির্যাতিত-নিপীড়িত মুসলমানদের জন্য দোয়ার তাহরীক করেছিলেন।

প্র. হ্যার রাবে (রাহে.) খিলাফতে আসীন হওয়ার পর সর্বপ্রথম কখন বিদেশ সফরে যান?

উ. ১৯৮২ সালের ২৮ জুলাই খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথমবারের মত ইউরোপ যাত্রা করেন। এ সফরের সময় ১০ সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি স্পেনের কর্ডোবার নিকটে পেত্রোয়াবাদে ‘মসজিদে বাশারত’-এর শুভ উদ্বোধন করেন। এছাড়া এ সফরে তিনি নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, পশ্চিম জার্মানী, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, লুক্সেমবার্গ, হল্যান্ড, ইংল্যান্ড এবং ক্ষেত্রল্যান্ডে গমন করেন।

প. দুঃস্থ ও এতীমদের জন্য হ্যুর রাবে (রাহে.) কোন স্কীমের ঘোষণা দেন?

উ. ১৯৮২ সনের ২৯ অক্টোবর হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) ‘বুয়ুতুল হামদ’ স্কীমের তাহরীক করেন। এ স্কীমের অধীনে দুঃস্থ ও এতীমদের জন্য বাড়ি-ঘর নির্মাণ করা হয়ে থাকে। এটি চতুর্থ খিলাফতের প্রথম আর্থিক তাহরীক ছিল।

প. হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) কখন দণ্ডের আউয়ালের (প্রথম পর্যায়ের, ১৯৩৪-১৯৪৪) মুজাহেদীনদের কুরবানীকে চির জাগরুক রাখার জন্যে তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি তাগিদপূর্ণ নসীহত করেন?

উ. ১৯৮২ সনের ৫ নভেম্বর জুমু'আর খুতবায়।

প. কত সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) তাহরীকে জাদীদের ত্তীয় দণ্ডের (১৯৬৬-১৯৮৪) দায়িত্ব লাজনা ইমাইল্লাহ্র ওপরে ন্যস্ত করেন?

উ. ১৯৮২ সনের ৫ নভেম্বর জুমু'আর খুতবায়।

প. চতুর্থ খিলাফতের প্রথম সালানা জলসা কখন, কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

উ. ১৯৮২ সনের ২৬-২৮ ডিসেম্বর চতুর্থ খিলাফতের অধীনে প্রথম সালানা জলসা রাবওয়া, পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় ২ লক্ষ ২০ হাজার লোক উপস্থিত হয়।

প. সারা বিশ্বের আহমদীদের দাঁই ইলাল্লাহতে পরিণত হবার জন্য হ্যুর রাবে (রাহে.) কখন জোর তাগিদ দেন?

উ. ২৮ জানুয়ারি ১৯৮৩ সনে মসজিদুল আকসা, রাবওয়ায় খুতবার মাধ্যমে হ্যুর রাবে (রাহে.) সারা বিশ্বের আহমদীদেরকে ‘দা-ই-ইলাল্লাহ’তে পরিণত হওয়ার জোর তাগিদ দেন। এটা ছিল একটি ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী ঘোষণা। এর ফলশ্রুতিতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে তবলীগের ক্ষেত্রে এক নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয়।

প. হ্যুর রাবে (রাহে.) খেদমতে খালক এর ব্যাপারে কবে জামা'তের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন?

উ. হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) ১৯৮৩ সনের ১২ জুলাই ঈদের খুতবায় খেদমতে খালক (সৃষ্টির সেবা) সম্পর্কে একটি তাংপর্যপূর্ণ শিক্ষা উপস্থাপন করেন। হ্যুর (রাহে.) ঈদের অনন্দে নিজের গরীব ভাইদেরকে অংশীদার করার তাগিদ দেন এবং বলেন, ঈদের খুশি সত্যিকার অর্থে এটা ছাড়া লাভ করা সম্ভব নয়। বন্ধুগণ এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং এখনও করে যাচ্ছেন।

প. আমেরিকায় জামা'তে আহমদীয়ার প্রথম শহীদের নাম এবং শাহাদাতের তারিখ বলুন?

উ. ৮ আগস্ট ১৯৮৩ সালে ডেট্রয়েট, আমেরিকাতে মোকাবরম ডা. মোয়াফ্ফর আহমদ সাহেবকে গুলি করে শহীদ করা হয়।

প. পাকিস্তানে কত তারিখে আহমদীদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়? এর ফলশ্রুতিতে হ্যুর রাবে (রাহে.) কবে ইংল্যান্ডে হিজরত করেন?

উ. ১৯৮৪ সনের ২৬ এপ্রিল পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক জামা'তে আহমদীয়ার উপরে বাধ্যবাধকতা আরোপ করার নিমিত্তে ‘কাদিয়ানীদের নিষিদ্ধ ঘোষণা অর্ডিন্যাস’ জারী করে। এ অন্যায় আইন জারীর কারণে যুগ-খলীফার পক্ষে সেই দেশ থেকে নিজ দায়িত্ব পালন করা সভ্য নয় বলে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) ২৯ এপ্রিল ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে হিজরত করেন।

প্র. হিজরতের পূর্বে রাবওয়াতে হ্যুর (রাহে.) সর্বশেষ বক্তৃতা কখন প্রদান করেন?

উ. ২৮ এপ্রিল ১৯৮৪ সালে এশার নামায়ের পর মসজিদে মোবারক, রাবওয়া, পাকিস্তানে।

প্র. হ্যুর রাবে (রাহে.) পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্র সম্পর্কিত ঐতিহাসিক ধারাবাহিক খুতবা কখন থেকে প্রদান করা শুরু করেন?

উ. ২০ জুলাই ১৯৮৪ থেকে। এই ধারাবাহিক খুতবা প্রদান ১৭ মে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। পরবর্তীতে ‘যাহাকাল বাতিল’ নামে পুনৰুৎসব আকারে এটি প্রকাশিত হয়।

প্র. আন্তর্জাতিক মানের সুইমিংপুল রাবওয়াতে কখন নির্মাণ করা হয়?

উ. ৩১ জুলাই ১৯৮৪ সালে ভিত্তি রাখা হয় এবং ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ সালে উদ্বোধন করা হয়।

প্র. ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড, ইংল্যান্ড এবং নাসেরবাগ, জার্মানী সম্পর্কে কী জানেন?

উ. ১৮ মে ১৯৮৪ সনে হ্যুর রাবে (রাহে.) ইংল্যান্ড ও জার্মানীতে দু'টি বড় মিশন হাউস নির্মাণ করার তাহরীক করেন। যার ফলশ্রুতিতে জার্মানীতে নাসেরবাগ এবং ইংল্যান্ডের টিলফোর্ডে ইসলামাবাদ নামে দু'টি মিশন হাউস নির্মাণ করা হয়।

প্র. তাহরীকে জাদীদ ‘চতুর্থ দণ্ড’-এর যাত্রা কে, কবে থেকে শুরু করেন?

উ. হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) ২৫ অক্টোবর ১৯৮৫ সন থেকে।

প্র. বৃটেনে কখন যুগ খলীফার উপস্থিতিতে আহমদীয়া জামা'তের ঐতিহাসিক সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়?

উ. ১৯৮৫ সনের ৫-৭ এপ্রিল বৃটেনের টিলফোর্ড যুক্তরাজ্য আহমদীয়া জামা'তের ঐতিহাসিক সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৫টি মহাদেশের ৪৮টি দেশ থেকে হাজার-হাজার আহমদী যোগদান করেন।

প্র. হ্যুর রাবে (রাহে.) কবে ওয়াকফে জাদীদকে সারা বিশ্বে বিস্তৃতি দান করেন?

উ. হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) ১৯৮৫ সনের ডিসেম্বর মাসে ‘ওয়াকফে জাদীদ’-কে সারা বিশ্বে বিস্তৃতি দানের ঘোষণা দেন। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ওয়াকফে জাদীদের প্রবর্তন করেছিলেন হ্যরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)। প্রাথমিক অবস্থায় এ ক্ষীম পাক-ভারত-বাংলাদেশের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল। (দ্বিনি মালুমাত, ম.খো.আ. পাকিস্তান, পৃ. ৫৭)।

প্র. জামা'তের শাহাদত বরণকারীদের স্মৃতিকে চিরজাগরণক রাখার জন্য হ্যুর রাবে

(রাহে.) কোন ফান্ডের প্রবর্তন করেন?

উ. ১৯৮৬ সনের ৪ঠা মার্চ হ্যুর রাবে (রাহে.) জামা'তের শাহাদত বরণকারীদের স্মরণে 'সৈয়দনা বেলাল ফান্ড'-এর প্রবর্তন করেন।

প্র. কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা আহমদীয়া বিরোধী অর্ডিন্যাসকে মানবাধিকার লজ্জন বলে ঘোষণা করেছে?

উ. জাতিসংঘ, ২৯ এপ্রিল ১৯৮৬ সনে।

প্র. প্রথম আহমদী মহিলা শহীদের নাম কী?

উ. মোহতরমা রোখসানা সাহেবো। তাঁকে ৯ জুন ১৯৮৬ সনে পাকিস্তানে শহীদ করা হয়।

প্র. ধর্মের সেবার জন্য হ্যুর রাবে (রাহে.) কখন ঐতিহাসিক ওয়াকফে নও তাহরীকের ঘোষণা দেন?

উ. ১৯৮৭ সনের ৩ এপ্রিল হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) জুম'আর খুতবায় জামা'তের বন্ধুগণকে ওয়াকফে নও-এর তাহরীক করে বলেন, নিজেদের ভাবী সন্তানদেরকে এখন থেকেই ধর্মের সেবার জন্যে উৎসর্গ করা উচিত। প্রথমে এ তাহরীক ছিল পাঁচ হাজার সন্তানের জন্য। কিন্তু এখন ৪৮ হাজারের অধিক ছেলে-মেয়ে এ তাহরীকে অন্তর্ভুক্ত আছে এবং এ তাহরীক এখনও জারী আছে।

প্র. সারা বিশ্বে বন্দী 'আসীরানে রাহে মাওলা'-দের জন্য হ্যুর রাবে (রাহে.) কখন দোয়ার তাহরীক করেন?

উ. ১৯৮৭ সনের ৪ঠা ডিসেম্বর হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) 'আসীরানে রাহে মাওলা' (আল্লাহর পথে বন্দী)-দের মুক্তির জন্য দোয়ার তাহরীক করেন।

প্র. রাবওয়াতে এতীমদের জন্য নির্মিত ভবনের নাম কী? কত সালে এর ভিত্তি রাখা হয়?

উ. ১৯৮৭ সালের ০৫ ডিসেম্বর 'দারুল ইয়াতামা' (এতীমদের ভবন)-এর ভিত্তি রাখা হয়। এর নামা রাখা হয় 'দারুল ইকরাম'।

প্র. হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) করে সারা বিশ্বে আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধবাদীদের মুবাহালার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন?

উ. ১৯৮৮ সনের ১০ জুন হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) জুম'আর খুতবায় বিশ্বের সকল আহমদী জামা'তের বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি 'মুবাহালা' চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। এ আহ্বানের পরপরই ১৭ আগস্ট আল্লাহ' তাঁলা একটি অসাধারণ নির্দর্শন দেখান। আহমদীয়া বিরোধী অর্ডিন্যাস জারীকারী পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক অলৌকিকভাবে সর্বাধুনিক বিমানে ১১ জন জেনারেলসহ বিমান বিক্ষেপিত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। হ্যুর (রাহে.) পুনরায় জানুয়ারি ১৯৯৭ সনে দ্বিতীয়বার এ মুবাহ-লালার চ্যালেঞ্জ দেন।

প্র. শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী কখন উদযাপন করা হয়?

উ. জামা'তে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা লাভের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সারা বিশ্বের সকল

আহমদী কর্তৃক আল্লাহ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায়স্বরূপ শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী ২৩ মার্চ ১৯৮৯ সনে উদযাপন করা হয়। বাংলাদেশ জামা'তও মহাসমারোহে এ উৎসব পালন করে। (অবশ্য পাকিস্তান সরকার রাবওয়া ও দেশের অন্যান্য শহরে জুবিলী উপলক্ষে যে কোন প্রকারের কর্মসূচীর ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এমনকি সে দেশে আলোকসজ্ঞা, মিষ্টি বিতরণ পর্যন্ত করতে দেয়া হয়নি)।

প্র. আহমদীয়া জামা'তের দ্বিতীয় শতাব্দীর সূচনালগ্নে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) আল্লাহ তা'লার কাছ থেকে কী মোবারক ইলহাম লাভ করেন?

উ. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমতুল্লাহ।

প্র. শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী উপলক্ষে কোন-কোন দেশ স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে?

উ. সিয়েরালিওন ও গায়ানা।

প্র. হ্যুর রাবে (রাহে.) মানুষের কয়টি মৌলিক চরিত্রমূলক গুণের কথা বলেছেন? সেগুলো কী কী?

উ. পাঁচটি। সেগুলো হল- ১) সত্য বলার অভ্যাস, ২) ন্ম ভাষণ, পাক ও অনিন্দ্য কথন এবং পরম্পর সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন, ৩) দৈর্ঘ্য ও সহনশীলতা, ৪) অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীলতা, ৫) দৃচ্ছসংকলন ও সাহসিকতা।

প্র. হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর জুমু'আর খুতবা সরাসরি সম্প্রচারের কার্যক্রম কখন থেকে শুরু হয়?

উ. ২৪ মার্চ ১৯৮৯ সনে প্রথমবারের মতো টেলিফোন সিস্টেমের মাধ্যমে হ্যুর রাবে (রাহে.)-এর জুমু'আর খুতবা সরাসরি শুনা গিয়েছিল।

প্র. ১৯৯১ সনে খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) যে সকল তাহরীক করেন সে সম্পর্কে বলুন?

উ. • জানুয়ারি : হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) এ মাসে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ তাহরীকগুলো করেন:

- ওয়াকেফে জাদীদে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ ও মুয়াল্লিমদের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ।
- বিশ্বের নিরাপত্তা ও শান্তি এবং মুসলমানদের দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত হওয়ার জন্যে দোয়ার তাহরীক।
- আফ্রিকার দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের জন্যে সারা বিশ্বের আহমদীদের কাছে সাহায্যের আবেদন।
- উপসাগরীয় যুদ্ধ শেষ হওয়ার জন্য আহমদীদের সদকা দেয়ার তাহরীক।
- মার্চ : হ্যুর খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) এ মাসে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ তাহরীকগুলো করেন:

- সফলতা লাভ করার জন্যে বিধৰ্মী রাজনীতি পরিত্যাগ করে ধর্মীয় রাজনীতির নীতিসমূহের আভীকরণের তাহরীক।
- অন্য দেশের প্রতি নির্ভরশীলতা, জ্ঞান ও কৌশলাদিতে উন্নতি করা আর উদ্দেশ্যকে স্বচ্ছ করে মানবতাকে সংজ্ঞীবিত করার তাহরীক।
- লাইবেরিয়ার মুহাজিরদের সাহায্যার্থে তাহরীক।
- মসন্নুন দোয়া পড়ার তাহরীক।
- মে : হ্যুর খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) এ মাসে নিম্নোক্ত তাহরীকগুলো করেন:
- জাপানে প্রথম আহমদীয়া মসজিদ নির্মাণে যারা আর্থিক সাহায্য করেন তাদের জন্য দোয়ার তাহরীক।
- ওয়াকফে নও শিশুদের তরবিয়ত দেয়ার ব্যাপারে বিশেষ পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের তাহরীক-যেন তারা অন্যদের চাইতে আলাদা বলে দৃশ্যমান হয়।
- সন্তান-সন্ততিকে সর্বদা খুতবা শুনার সাথে সম্পৃক্ত করার তাহরীক।
- আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে সংরক্ষণের তাহরীক।
- রাশিয়ায় তবলীগের কাজে বেশি-বেশি ওয়াকফে আরয়ী করার তাহরীক।

প্র. হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) সর্বপ্রথম কখন কাদিয়ান আগমন করেন?

উ. ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯১ সালে আহমদীয়া ‘জামা’তের শতবার্ষিকী জলসা সালানায়। এতে ৪৪ বছর পরে খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) যোগদান করেন। উপমহাদেশ বিভাগের পর কোন বুগ-খলীফার এটাই ছিল প্রথম কাদিয়ান গমন। উল্লেখ্য, প্রথম জলসা সালানা কাদিয়ানে ১৮৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়।

প্র. হ্যুর রাবে (রাহে.) কবে কাদিয়ানে শিল্পপ্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়-বাণিজ্য করার তাহরীক করেন?

উ. ১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাসে হ্যুর রাবে (রাহে.) সারা বিশ্বের ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও সচল ব্যক্তিদেরকে কাদিয়ানে শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়-বাণিজ্য করার জন্য তাহরীক করেন।

প্র. কত সালে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর জুম'আর খুতবা ইউরোপে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দেখা ও শুনা গিয়েছিল?

উ. ৩১ জানুয়ারি ১৯৯২ সনে।

প্র. কত সালে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর জুম'আর খুতবা ৪টি মহাদেশেই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে প্রচার আরম্ভ হয়?

উ. ২১ আগস্ট ১৯৯২ সনে। এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী ভবিষ্যদ্বাণী ‘আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে-প্রান্তে পৌঁছাব’ পূর্ণতা লাভ করে যা জগতের অদ্বিতীয় এক ঘটনা বলে স্বীকৃত।

প্র. হযরত শেখ মুহাম্মদ আহমদ মাযহার (১৮৯৪-১৯৯৩)-এর মহান উল্লেখযোগ্য কর্ম কী?

উ. হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) তাঁর মিনানুর রহমান গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন এবং বলেছেন, আরবি সকল ভাষার জননী। আর এ বুয়র্গ হযরত শেখ মুহাম্মদ আহমদ মাযহার সাহেব প্রায় ৫০টি ভাষার ওপর গবেষণা করে এ বিষয়টিই প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে আরবিই সকল ভাষার জননী এবং মূল উৎস।

প্র. আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল করে থেকে প্রকাশিত হওয়া শুরু হয়?

উ. ৩০ জুলাই ১৯৯৩ সনে যুক্তরাজ্যের জলসা সালানার সময় সাংগীতিক আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল-এর পরীক্ষামূলক কপি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রধান সম্পাদকরূপে জনাব রশিদ আহমদ চৌধুরীকে প্রথম দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এটি ৭ জানুয়ারি ১৯৯৭ সন থেকে নিয়মিতভাবে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।

প্র. কখন প্রথম আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়?

উ. ৩১ জুলাই ১৯৯৩ সনে যুক্তরাজ্যের ২৮তম সালানা জলসার সময় ৮৪টি দেশের, ১১৫ টি জাতির ২ লক্ষ ৪ হাজার ৩০৮ জন লোক ডিশ এন্টেনার মাধ্যমে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর কাছে বয়াতের মাধ্যমে আহমদীয়া জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হন এবং সমগ্র জামা'ত-এর মাধ্যমে পুনরায় বয়াত নবায়ন করে। বিশ্বের ইতিহাসে এ এক বিরল ঘটনা। এদিন বয়াত নেবার সময় হ্যুর (রাহে.) হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর কোট পরিহিত ছিলেন।

প্র. এমটিএ করে থেকে ১২ ঘন্টার সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু করে?

উ. ১৯৯৪ সনের ০৭ জানুয়ারি হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) এমটিএ- তথা 'আহমদীয়া মুসলিম টেলিভিশন'-এর নিয়মিত দৈনিক ১২ ঘন্টা সম্প্রচার উদ্বোধন করেন।

প্র. চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের শতবার্ষিকী কত সালে পালিত হয়?

উ. ১৯৯৪ সনে।

প্র. ১৯৯৪ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর কোন ইলহামী দোয়া অধিক পরিমাণে পাঠ করার জন্য তাহরীক করেন?

উ.

اللَّهُمَّ مَرْ فِهْمُ كُلَّ مُمْرَقٍ وَسَحْفَهُمْ تَسْحِيفًا

(আল্লাহমা মায়িকহুম কুল্লা মুমায়িকাকিন ওয়া সাহত্তিকহুম তাসহিকা)

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে (আহমদীয়া জামা'তের শক্রদের) সম্পূর্ণভাবে টুকরো-টুকরো কর এবং তাদের সমূলে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দাও।

প্র. দ্বিতীয় ও তৃতীয় আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠান সম্রক্ষকে বলুন?

উ. ১৯৯৪ সনের ৩১ জুলাই আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাজ্যের ২৯তম সালানা জলসা উপলক্ষে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৯৩টি দেশের ১৫৫

জাতির ১২০টি ভাষার ৪ লক্ষ ১৮ হাজার ২শত ৬ জন ব্যক্তি হয়েরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর পবিত্র হাতে এমটিএ -এর মাধ্যমে বয়াত হয়ে আহমদীয়া জামা'তে দাখিল হন।

১৯৯৫ সনের জুলাই মাসে জামা'তে আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের ৩০তম সালানা জলসা 'ইসলামাবাদ'-এ অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে এমটিএ -এর মাধ্যমে তৃতীয় আন্তর্জাতিক বয়াতে ৯৬টি দেশের ১৬২টি জাতির ১২০ ভাষার ৮,৪৫,২৯৪ জন ব্যক্তি হয়েরত খলীফ-তুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর কাছে বয়াত হয়ে সিলসিলা জামা'তে আহমদীয়ায় দাখিল হন।

প্র. কবে থেকে এমটিএ ২৪ ঘন্টা সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু করে?

উ. ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা এপ্রিল এমটিএ -এর ২৪ ঘন্টা প্রোগ্রাম শুরু হয়। এ উপলক্ষে হয়েরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) মসজিদ ফযল, লন্ডনে এক ঈমানবর্ধক ভাষণ দেন।

প্র. 'ইসলামী উস্ল কি ফিলাসফী' পুস্তকের একশ বছর পূর্তি কবে অনুষ্ঠিত হয় ?

উ. ১৯৯৬ সনে 'ইসলামী উস্ল কি ফিলাসফী'(ইসলামী নীতি-দর্শন) পুস্তকের ১০০ বছর পূর্তি উদযাপিত হয়।

প্র. হয়েরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর কয়েকটি ইংরেজি পুস্তকের নাম বলুন?

উ. ১. Islam's respons to the contemporary issues.

২. Christianity- A Journey from Facts to Fiction.

৩. Revelation, Rationality, Knowledge and Truth.

৪. Murder in the Name of Allah.

প্র. MTA International কখন থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যম সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু করে?

উ. ৫ জুলাই ১৯৯৬ সনে পাকিস্তান সময় অনুযায়ী ভোর চারটায়।

প্র. হয়েরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বৎশে শাহাদাতের মর্যাদা লাভকারী সৌভাগ্যবান শহীদের নাম বলুন।

উ. মোকাবররম সাহেবযাদা মির্যা গোলাম কাদের আহমদ সাহেব, পিতা: মোহতরম সাহেবযাদা মির্যা মজিদ আহমদ সাহেব। তিনি হয়েরত সাহেবযাদা মির্যা বশির আহমদ এম.এ. (রা.)-এর পৌত্র এবং হয়েরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর প্রপৌত্র ছিলেন। ১৪ এপ্রিল ১৯৯৯ সনে তাঁকে অপহরণ করার পর শহীদ করা হয়।

প্র. হ্যুন্দি রাবে (রাহে.) Friday the 10th উপলক্ষে জামা'তকে কী বিশেষ বাণী প্রদান করেন?

উ. ১০ অক্টোবর ১৯৯৭ সনে হ্যুন্দি রাবে (রাহে.) Friday the 10th উপলক্ষে জামা'তকে নামায পড়ার বিশেষ বাণী প্রদান করেন।

প. ১৯৯৮ সনে চতুর্থ খিলাফতকালীন সময়ে উল্লেখযোগ্য তাহরীক ও কার্যক্রম কী ছিল?

- ২ৱা জানুয়ারি: হ্যুর রাবে (রাহে.) ওয়াকফে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা করেন এবং সেই সাথে হ্যুর প্রত্যেক জামা'তের সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদকে ‘নও মোবাসিন’ সদস্যদেরকেও এতে অঙ্গভূক্ত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।
- ২৮ মার্চ: লন্ডনের মসজিদ ‘বায়তুল ফুতুহ’-এর প্রস্তাবিত স্থানে হ্যুর রাবে (রাহে.) ঈদুল আযহার নামায পড়ান। এতে ৮,৫০০ জন আহমদী যোগদান করেন।
- ০৫ জুন: হ্যুর রাবে (রাহে.) কর্তৃক এলুমিনিয়ামের বাসন-কোসন ব্যবহার না করে স্টিলের বাসন-কোসন ব্যবহার করার নির্দেশ প্রদান করেন।
- এ বছর হ্যুর রাবে (রাহে.)-এর বিখ্যাত পুস্তক Revelation, Rationality, Knowledge and Truth প্রকাশিত হয়।
- ২রা আগস্ট: ঘষ্ট আন্তর্জাতিক বয়াতে ৯৩ টি দেশের ২২৩ জাতির ৫০ লক্ষ ৪ হাজার ৬ জন লোক অংশগ্রহণ করেন।
- ০৭ আগস্ট: হ্যুর রাবে (রাহে.)-এর পক্ষ থেকে সকল দেশে, জামা'তে, বিভাগে এবং বাড়িতে “লাল খাতা” রাখার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

প. হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পুস্তকের নাম বলুন।

উ. ১) যওকে ইবাদাত অওর আদাবে দোয়া (ইবাদতের স্বাদ এবং দোয়ার পদ্ধতি), ২) যাহাকাল বাতিল (মিথ্যার বিলুপ্তি), ৩) সীরাত ও সাওয়ানেহ ফযলে ওমর, ১ম ও ২য় খন্দ, ৪) মাযহাব কে নাম পার খন (ধর্মের নামে রক্তপাত), ৫) ভিসালে ইবনে মরিয়ম (মরিয়মপুত্রের মৃত্যু), ৬) নিয়ামে জাহানে নও (নতুন বিশ্ব ব্যবস্থাপনা)।

প. এমটিএ -এর কোন কোন প্রোগ্রামে হ্যুর রাবে (রাহে.) বিশেষভাবে সশরীরে উপস্থিত থাকতেন?

উ. দরসুল কুরআন, মূলাকাত, লিকা মা'আল আরব, হোমিওপ্যাথি ক্লাস, চিল্ড্রেন ক্লাস, উদ্ধৃত ক্লাস।

প. হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) কখন, কোথায় সালাতুল কুসুফ (সূর্য়গ্রহণের নামায) আদায় করেন?

উ. ১১ আগস্ট ১৯৯৯ সনে লন্ডনে সূর্য়গ্রহণ হলে হ্যুর রাবে (রাহে.) মসজিদ ফযল, লন্ডনে সালাতুল কুসুফ এর নামায আদায় করেন।

প. হ্যুর রাবে (রাহে.) প্রথমবারের মতো কখন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন।

উ. সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ সনে। হ্যুর রাবে (রাহে.) অসুস্থতার কারণে দু'সপ্তাহের বিশ্রামের পরে ১০ সেপ্টেম্বর Friday the 10th-এর খুতৰা দেন। হ্যুর রাবে (রাহে.)-এর অসাধারণ স্বাস্থ্য লাভ খোদা তাঁ'লার একাটি বিশেষ নির্দেশনের রূপ ধারণ করে।

প. কত সনে মসজিদ বায়তুল ফুতুহ -এর ভিত্তিপ্রস্তর রাখা হয়?

উ. ১৯৯৯ সনের ১৯ অক্টোবর হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) লক্ষনে ‘বায়তুল ফুতুহ’ মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর রাখেন। এটি ইংল্যান্ডের মর্ডেনে অবস্থিত।

প্র. ২০০০ খিস্টাদে জামা’তের উল্লেখযোগ্য কী কী কাজ ছিল?

- ৪ ঠা মার্চ: খুতবা ইলহামিয়ার শতবার্ষিকী উদযাপন।
- ১৯ জুন-১১ জুলাই: হ্যুর রাবে (রাহে.)-এর ঐতিহাসিক ইন্দোনেশিয়া সফর।
- ৩০ জুলাই: ৮ম আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৭০টি দেশের ৪, ১৩, ০৮, ৩৭৬ জন লোক বয়াত করেন। এবারকার জলসায় ৭৭টি দেশ থেকে উপস্থিত ছিল ২৩,৪০৭ জন।
- ১১-১২ আগস্ট: ড. আলেকজান্ডার ড্রাই-এর পতনের শতবার্ষিকী পালিত হয়। উল্লেখ্য, এ তথাকথিত এলীয় নবী মুহাম্মদী মসীহ (আ.)-কর্তৃক প্রদত্ত মুবাহলায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।
- ২৯ ডিসেম্বর: হ্যুর রাবে (রাহে.) এ শতাব্দী ও সহস্রাব্দের শেষ জুমু’আর খুতবা প্রদান করেন।
- ৩১ ডিসেম্বর: নতুন শতাব্দীতে কেউ যেন বে-নামায়ী হয়ে প্রবেশ না করে সেজন্য জামা’তের সদস্যদের শতকরা ১০০ ভাগ নামায়ী হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত। দিবাগত রাত্রে বা-জামা’ত তাহাজ্জুদ ও দোয়ার মাধ্যমে নতুন শতাব্দী ও সহস্রাব্দকে স্বাগত জানানো হয়।

প্র. জামা’তে আহমদীয়ার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.alislam.org কখন প্রতিষ্ঠিত হয়?

উ. জানুয়ারি ২০০১ সনে।

প্র. হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) কখন থেকে আল্লাহ্ তা’লার সিফত বা গুণাবলীর ওপরে ধারাবাহিক খুতবা প্রদান শুরু করেন?

উ. ২০০১ সনের এপ্রিল মাস থেকে।

প্র. ২০০১ সনের আন্তর্জাতিক সালানা জলসা কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

উ. ২৪-২৬ আগস্ট জার্মানীর মেইনহামে আন্তর্জাতিক সালানা জলসা ২০০১ অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, গরুর খুরা রোগের কারণে ব্র্টেন সরকার প্রতিবারের ন্যায় লক্ষনে এ জলসা করার অনুমতি দেয়নি। এ জলসায় প্রায় ৫০ হাজার নর-নারী অংশ নেন। ৫টি মহাদেশের ১৭৬টি দেশের কোটি-কোটি লোক স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এ জলসার কর্মসূচী দেখেন। এ জলসার আন্তর্জাতিক বয়াতে সর্বোচ্চসংখ্যক মোট ৮ কোটি ১০ লক্ষ ৬ হাজার ৭২১ জন লোক বয়াত করেন, আলহামদুলিল্লাহ।

প্র. হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) এমটিএ- এর কতটি ক্লাসে ‘তরজমাতুল কুরআন’ সম্পূর্ণ করেছিলেন?

উ. ৩০৫ টি ক্লাস।

প্র. ২০০২ খিস্টাদে জামা’তের কোন বিশিষ্ট কবি মৃত্যুবরণ করেন?

উ. ১৩ জানুয়ারি জামা'তের বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক মোহতরম সাকিব যিরভী মৃত্যুবরণ করেন।

প্র. হ্যারত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) কখন পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়েন?

উ. ২০০২ সালের ৫ জুলাই শুক্রবার খুতবা দেয়ার প্রাক্কালে হ্যারত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) অসুস্থ হয়ে পড়েন।

প্র. হ্যারত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর জীবনের শেষ জলসা সম্পর্কে কিছু বলুন।

উ. ২০০২ সালের ২৬-২৮ জুলাই যুক্তরাজ্য জামা'তের ৩৬তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর বয়াত হয় ২ কোটি ৬ লক্ষ ৫৪ হাজার। জলসার উপস্থিতি ছিল ১৯,৪০০ জন। এটাই হ্যার (রাহে.)-এর জীবনের শেষ জলসা ছিল।

প্র. কবে হ্যারত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর রক্তবাহী ধরণীর অপারেশন করা হয় এবং কবে হ্যার হাসপাতাল থেকে ফিরে আসেন?

উ. ২০০২ সনের ৩০ অক্টোবর লন্ডনের এক হাসপাতালে। অপারেশনের পরে হ্যার (রাহে.) ৭ নভেম্বর হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরে আসেন। উল্লেখ্য, হ্যার (রাহে.)-এর অসুখের সময় বিশ্ব জামা'ত সদকার মাধ্যমে হ্যার (রাহে.)-এর জন্য দোয়া করতে থাকে। এরপর হ্যার মোটামুটি সুস্থ হতে থাকেন আর আস্তে-আস্তে তিনি সব কাজই সুস্থিতাবে করতে থাকেন। এ যাত্রায় হ্যার অলৌকিকভাবে সুস্থিতা লাভ করেন।

প্র. "A Man of God" পুস্তক সম্পর্কে কি জানেন?

উ. "A Man of God" পুস্তকটি হ্যারত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর ঘটনাবণ্ণল জীবনী ও তাঁর মহান পৃতপবিত্র চরিত্র সম্পর্কিত। পুস্তকটি ইয়ান এডামসন নামক একজন খ্রিস্টান লেখক লিখেছেন। এর উর্দ্দু অনুবাদ 'এক মর্দে খোদা' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

প্র. কত সালে 'মরিয়ম শান্তী ফান্ড'-এর তাহরীক করা হয়?

উ. ২০০৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি হ্যারত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) তাঁর শ্রদ্ধেয় মাতার স্মরণে 'মরিয়ম শান্তী ফান্ড'-এর তাহরীক করেন। উদ্দেশ্য ছিল এ ফান্ড থেকে জামা'তের গরীব মেয়েদের বিয়েতে সাহায্য করা হবে যাতে তাদের পিতা-মাতা বিয়ের সময় তাদের কিছু উপহার সামগ্রী দিতে পারেন।

প্র. হ্যারত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) জীবনের শেষ জুমু'আর খুতবা কবে প্রদান করেন?

উ. ১৮ এপ্রিল ২০০৩ সালে হ্যারত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) জীবনের শেষ জুমু'আর খুতবা দেন ও মজলিসে ইরফানে যোগ দেন।

প্র. হ্যারত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) কবে, কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?

উ. ১৯ এপ্রিল লন্ডন সময় সকাল ৯:৩০ মিনিটে হ্যারত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) প্রায় ৭৫ বছর বয়সে হঠাত হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইসলামাবাদ,

টিলফোর্ড, ইংল্যান্ডে তাঁর অনুসারীদের দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে তাঁর প্রকৃত শ্রষ্টা আল্লাহর কাছে চলে যান। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়ি রাজিউন)।

২২ এপ্রিল ২০০৩ লন্ডন সময় রাত্রি ৯:৩০ মিনিটে টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে নবনির্বাচিত খলীফা তাঁর জানায়ার নামায পড়ান এবং পরে সেখনকার কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর (রাহে.) জানায়ায প্রায় ২৫ হাজার লোক অংশগ্রহণ করেন। এভাবেই ইসলামের দ্বিতীয় বিকাশের চতুর্থ নির্দেশন দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

খলীফাতুল মসীহ আল খামেস নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম হ্যরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.)

প্র. হ্যরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? তাঁর পিতা-মাতার নাম কী?

উ. হ্যরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) ১৯৫০ সনের ১৫ সেপ্টেম্বর রাবণ্যা, পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সম্মানিত পিতার নাম হ্যরত সাহেবযাদা মির্যা মনসুর আহমদ সাহেব ও সম্মানিত মাতার নাম হ্যরত সাহেবযাদী নাসেরা বেগম সাহেবা। তিনি হ্যরত মির্যা শরীফ আহমদ (রা.)-এর পৌত্র এবং হ্যরত মসীহ মাওলান্দ (আ.)-এর প্রপৌত্র।

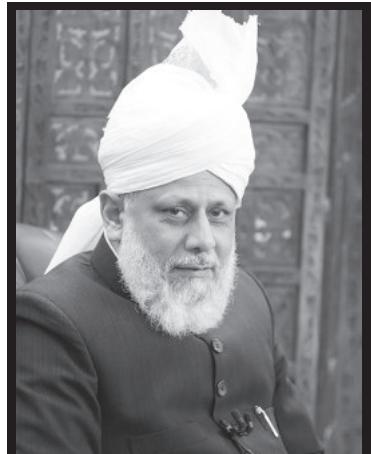
প্র. হ্যরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.)-এর শিক্ষা জীবন সম্পর্কে বলুন?

উ. • তিনি রাবণ্যার তালীমুল ইসলাম হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং রাবণ্যার তালীমুল ইসলাম কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট এবং বি.এ. পাশ করেন।

• ১৯৭৬ সনে তিনি ফয়সালাবাদ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি-অর্থনীতিতে এম.এস.সি. ডিগ্রী লাভ করেন।

প্র. হ্যরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) কত বছর বয়সে নেয়ামে ওসীয়তে অন্তর্ভুক্ত হন?

উ. ১৯৬৭ সনে মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি ওসীয়ত করেন।



হ্যরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.)
খলীফাতুল মসীহ খামেস

প্র. হ্যরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.)-এর বিবাহ কার সাথে, কখন অনুষ্ঠিত হয়?

উ. হ্যরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) হ্যরত সাহেবযাদী আমাতুল হাকীম ও সৈয়দ দাউদ মুজাফফর শাহ সাহেবের কন্যা মুকারুরমা হ্যরত সৈয়দা আমাতুস সাবুহ বেগম সাহেবার সাথে ১৯৭৭ সনের ৩১ জানুয়ারি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৭৭ সনের ২৩ ফেব্রুয়ারি তাঁর ওলীমা অনুষ্ঠিত হয়।

প্র. হ্যরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.)-এর সন্তানদের নাম বলুন?

উ. হ্যুর (আই.)-এর একমাত্র মেয়ের নাম মুকারুরমা আমাতুল ওয়ারিস ফাতেহ সাহেব। তাঁর স্বামী হলেন নওয়াবশাহ নিবাসী মুকারুরম ফতেহ আহমদ দাহিরী সাহেব। হ্যুর (আই.)-এর একমাত্র পুত্র হলেন সাহেবযাদা মির্যা ওয়াকাস আহমদ সাহেব।

প্র. হ্যরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) কত সালে ইসলামের সেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করেন?

উ. তিনি (আই.) আগস্ট ১৯৭৭ সালে জীবন উৎসর্গ করেন এবং নুসরত জাহাঁ ক্ষীম-এর অধীনে ঘানা চলে ঘান।

প্র. খিলাফতে আসীন হওয়ার পূর্বে হ্যরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) যে সমস্ত জামাঁতী দায়িত্বে কর্মরত ছিলেন তার বিবরণ দিন।

উ. ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৫ :

- আহমদীয়া সেকেন্ডারী স্কুলের প্রিসিপাল।
- দুই বছরের জন্য ইসারচার আহমদীয়া সেকেন্ডারী স্কুলের প্রিসিপাল।
- দুই বছরের জন্য উভয় ঘানার আহমদীয়া কৃষি খামারের ম্যানেজার ছিলেন। এ সময়ে তিনি সফলতার সাথে প্রথমবারের মত ঘানায় গমের চাষ করেন।
- ১৯৮৫ সনে তিনি পাকিস্তানে ফিরে আসেন এবং ১৯৮৫ সনের ১৭ মার্চ থেকে Department Incharge of Financial Affairs- নিযুক্ত হন।
- তিনি কেন্দ্রীয় খোদামূল আহমদীয়ার মোহতামীম সেহতে জিসমানী (১৯৭৬-৭৭), মোহতামীম তাজনীদ (১৯৮৪-১৯৮৫), মোহতামীম মজলিস বেইরুন বা বহির্দেশ বিষয়ক ১৯৮৫-৮৬ থেকে ১৯৮৮-৮৯ এবং ১৯৮৯ থেকে ৯০ পর্যন্ত মজলিস খোদামূল আহমদীয়ার নায়ের সদর ছিলেন।
- ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত তিনি কায়া বোর্ডের সদস্য ছিলেন।
- ১৯৮৮ সনের আগস্টে তিনি ‘মজলিসে কারপরদায় বেহেশতি মাকবেরার’ সদর নিযুক্ত হন।
- ১৯৯৪ সনের ১৮ জুন তিনি নায়ের তা'লীম নিযুক্ত হন।
- ১৯৯৯ সনে তিনি মজলিস আনসারুল্লাহ পাকিস্তানের কায়েদ সেহতে জিসমানী ছিলেন

এবং ১৯৯৫-১৯৯৭ পর্যন্ত কায়েদ তালীমুল কুরআন ছিলেন।

• ১৯৯৪ সন থেকে ১৯৯৭ সন পর্যন্ত তিনি ‘নাসের ফাউন্ডেশন’-এর চেয়ারম্যান ছিলেন। একই সময়ে তিনি রাবওয়াকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার দায়িত্বে নিয়োজিত কমিটির প্রধান ছিলেন। তিনি ‘গুলশানে আহমদ’ নাসীরীয়ার উদ্যোগো এবং তাঁর ব্যক্তিগত চেষ্টায় রাবওয়াক সবুজ-শ্যামল শহরে পরিগত হয়।

• ১৯৯৭ সনের ১০ ডিসেম্বর তিনি নায়েরে আল্লাও ও আমীর মোকামী নিযুক্ত হন। খলীফা নির্বাচিত হবার আগ পর্যন্ত তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

• নায়েরে আলা থাকাকালে তিনি নায়ের যিয়াফত ও নায়ের যিরায়াত-এর দায়িত্বে পালন করেন।

প্র. হ্যারত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) কবে আসীরানে রাহে মাওলা (আল্লাহর পথে বন্দী) হন?

উ. ১৯৯৯ সনের ৩০ এপ্রিল তিনি আল্লাহর পথে বন্দী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং ১০ মে মুক্তি লাভ করেন।

প্র. হ্যারত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পথওম খলীফা হিসেবে কবে নির্বাচিত হন?

উ. ২০০৩ সনের ২২ এপ্রিল মসজিদ ফখল, লঙ্ঘনে নামায মাগরিব ও এশার পর ‘মজলিসে ইন্তেখাবে খিলাফত’ (খিলাফতের নির্বাচকমণ্ডলী)-এর সভা মোহতরম চৌধুরী হামিদ উল্লাহ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে ঐশ্বী আকাঞ্জানুয়ায়ী হ্যারত সাহেবযাদা মির্যা মাসরুর আহমদ-কে খলীফাতুল মসীহ আল্লাহর পথে ঘোষণা করা হয়। খিলাফতের মহান পদে অধিষ্ঠিত হবার সময়ে তাঁর বয়স ছিল ৫৩ বছর।

আমরা দোয়া করি আল্লাহ তাঁর হাতকে শক্তিশালী করুন এবং জামা'তকে পরিচালনা করার সফল ও দীর্ঘ জীবন তাঁকে দান করুন। আর তাঁর পরিচালনাধীনে আল্লাহ জামা'তের ওপরে আশিস বর্ষণ করতে থাকুন এবং একে ফুলে-ফলে সুশোভিত করুন, (আমীন)।

প্র. ২০০৩ সনে হ্যুর (আই.) কর্তৃক তাহরীকগুলোর বর্ণনা দিন।

উ. তিনি (আই.) ২০০৩ সনে নিম্নোক্ত তাহরীকগুলো করেছেন:

• ২২ এপ্রিল: হ্যুর (আই.) তাঁর প্রথম বৃক্তায় জামা'তকে সর্বপ্রথম দোয়ার তাহরীক করেন। হ্যুর বলেন, ‘অনেক দোয়া করুন, অনেক দোয়া করুন, অনেক দোয়া করুন। আল্লাহ তালীম নিজ থেকে সাহায্য ও সমর্থন করুন যেন আহমদীয়াতের এ কাফেলা উন্নতির ধাপ অতিক্রম করে দ্রুত সামনে অগ্রসর হতে থাকে।’

• ২৫ এপ্রিল: আমি আবারও দোয়ার আহমান জানাচ্ছি, আমার জন্য বেশি-বেশি দোয়া করুন। বেশি-বেশি দোয়া করুন। বেশি করে দোয়া করুন খোদা তালীম যেন আমার মাঝে এমন সব গুণ ও যোগ্যতা সৃষ্টি করেন যার মাধ্যমে আমি হ্যারত মসীহ মাওউদ (আ.)-

- এর প্রিয় জামা'তের সেবা করতে পারি। আর আমরা যাতে হ্যারত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারি, আমীন।
- সেপ্টেম্বর : আহমদী ডাঙ্গারদের সাময়িক উৎসর্গের তাহরীক।
 - মানবমঙ্গলীর প্রতি সহানুভূতি পোষণ করার তাহরীক এবং অধিক সংখ্যায় দুরুদ শরীফ পাঠ করার তাহরীক করেন।
 - ১০ ডিসেম্বর : ইরানের ভয়াবহ ভূমিকম্পে আক্রান্ত লোকদের সাহায্যের জন্যে তাহরীক।
- প্র. হ্যুর (আই.) আহমদী ছাত্র-ছাত্রীদের কমপক্ষে কতটুকু পর্যন্ত পড়াশুনা করার জন্য তাহরীক করেন?
- উ. ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত।
- প্র. হ্যারত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কখন ‘তাহের ফাউন্ডেশন’ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন?
- উ. ২৬ জুলাই ২০০৩ সনে।
- প্র. হ্যুর আনোয়ার (আই.)-এর খিলাফতকালের সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক জলসা কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
- উ. এ জলসা ২৫-২৭ জুলাই ২০০৩ সালে ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড, ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয়। ৯৮ দেশের ২২৯ জাতির ৮ লক্ষ ৯২ হাজার ৪০৩ জন বয়াত নেয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। ২৫ হাজারের অধিক লোক এ জলসায় অংশ নেয়।
- প্র. হ্যুর (আই.) সর্বপ্রথম কবে, কখন, কোন দেশ সফর করেন এবং কবে ফিরত আসেন?
- উ. হ্যুর আনোয়ার (আই.) ১৯ আগস্ট ২০০৩ সনে জার্মানীর উদ্দেশ্যে প্রথম সফর করেন এবং ৮ সেপ্টেম্বর ফ্রান্স থেকে লন্ডন ফেরত আসেন।
- প্র. হ্যুর আনোয়ার (আই.) তাঁর সর্বপ্রথম সফরে কোন-কোন দেশে সফরে যান?
- উ. বেলজিয়াম, জার্মানী, হল্যান্ড, ফ্রান্স।
- প্র. জামেয়া আহমদীয়া, কানাডার উদ্বোধন কখন হয়?
- উ. ২০০৩ সনের ৭ সেপ্টেম্বর।
- প্র. পশ্চিম ইউরোপের সর্ববৃহৎ মসজিদ ‘বায়তুল ফুতুহ’-র ভিত্তি কে, কখন রাখেন এবং এর উদ্বোধন কে, কখন করেন?
- উ. হ্যারত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) ১৯৯৯ সনের ১৯ অক্টোবর লন্ডনে মসজিদে মোবারক, কাদিয়ানের ইট দিয়ে এ মসজিদের ভিত্তি রাখেন এবং হ্যারত খলীফাতুল মসীহ খামেস (আই.) ৩ অক্টোবর ২০০৩ সনে জুমু'আ নামায আদায় করার মাধ্যমে এর শুভ উদ্বোধন করেন।
- প্র. ২০০৪ সনে হ্যুর (আই.) কর্তৃক তাহরীকগুলোর বর্ণনা দিন।

উ. তিনি (আই.) ২০০৪ সনে নিম্নোক্ত তাহরীকগুলো করেছেন:

- ২৩ জানুয়ারি: এতীম ও দরিদ্রদের সাথে সদাচারণ করার তাহরীক। শর্তানুযায়ী যাকাত আদায় করার তাহরীক।
 - মার্চ: বাংলাদেশের অবস্থার পরিবর্তনের জন্যে দোয়ার তাহরীক। এ দোয়াটি বেশি-বেশি পাঠ করতে বলেছেন—“রাববানা লা তুষিগ কুলুবানা বাঁদা ইয হাদায়তানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান- ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব।” (সুরা আল ইমরান : ৯)।
 - এপ্রিল: শিশুদের উন্নত মানের শিক্ষা প্রদানের তাহরীক।
 - মে: শর্তানুযায়ী চাঁদা দেয়ার তাহরীক।
 - জুন: আফ্রিকার মসজিদ, মিশন হাউস, স্কুল, হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সেবার জন্যে আহমদী আর্কিটেক্ট ও প্রকৌশলীদের সামনে এগিয়ে আসার তাহরীক।
 - লাঘোরী চাঁদাগুলো আদায়ে যত্নবান হওয়ার তাহরীক।
 - আগস্ট: নেয়ামে ওসীয়তে অঙ্গুরুক্ত হওয়ার তাহরীক। বর্তমান বছরে যেন ১৫,০০০ নতুন ওসীয়তকারী হন। ২০০৮ সনের মধ্যে সারা বিশ্বে প্রত্যেক জামা'তে যেন ৫০% চাঁদা দাতা ওসীয়তের অঙ্গুরুক্ত হন। আনসারচল্লাহ'র সফে দওম সদস্যরা যেন এতে বেশি অংশ নেন।
 - ৩ সেপ্টেম্বর: প্রত্যেক আহমদীকে ইসলামের শাস্তির বাণী সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার তাহরীক করেন।
 - সেপ্টেম্বর: নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াতের তাহরীক।
 - ৫ নভেম্বর: নওমোবাইন্ডেরকেও ওয়াকফে জাদীদের চাঁদায় অঙ্গুরুক্তির তাহরীক।
 - প্র. রাবওয়াতে অবস্থিত টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনসিটিউট কখন প্রতিষ্ঠিত হয়?
- উ. ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ সনে।
- প্র. হ্যুর (আই.) পশ্চিম আফ্রিকাতে কখন সর্বপ্রথম সফরে যান এবং কোন-কোন দেশ সফর করেন?
- উ. ১৩ মার্চ ২০০৪ থেকে ১৩ এপ্রিল ২০০৪ পর্যন্ত তিনি পশ্চিম আফ্রিকা সফর করেন। এ সফরে তিনি ঘানা, বুরকিনাফাসু, বেনিন, নাইজেরিয়া সফর করেন।
- প্র. এ সফরে এমন দু'টি দেশের নাম বলুন যেখানে কোন যুগ খলীফা সর্বপ্রথম সফর করেন?
- উ. বুরকিনাফাসু এবং বেনিন।
- প্র. এমটিএ-২ কবে থেকে যাত্রা শুরু করে?
- উ. ২২ এপ্রিল ২০০৪ সনে।
- প্র. হ্যুর (আই.) সর্বপ্রথম কখন কানাডা সফর করেন?
- উ. ২১ জুন থেকে ০৫ জুলাই ২০০৪ সালে হ্যুর (আই.) সর্বপ্রথম কানাডা সফর করেন।

প্র. হ্যুর (আই.) তাহরীকে জাদীদের পথও দণ্ডের ঘোষণা কবে প্রদান করেন?

উ. ২০০৪ সনের ৫ নভেম্বর।

প্র. ২০০৫ সনে হ্যুর (আই.) কর্তৃক তাহরীকগুলোর বর্ণনা দিন।

উ. তিনি (আই.) ২০০৫ সনে নিম্নোক্ত তাহরীকগুলো করেছেন:

- ১৮ ফেব্রুয়ারি : নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে আরোপিত ঘৃণ্য আপন্তিসমূহের জবাব দেয়ার জন্যে খোদাম ও লাজনার বিশেষ টিম গঠনের তাহরীক।

- ২৭ মে : শতবার্ষীকী খিলাফত জুলিলি উপলক্ষে জামা'তের বন্ধুগণের প্রতি নিম্নোক্ত দোয়া ও ইবাদতসমূহ পালন করার তাহরীক:

১. প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোধা রাখা।

২. প্রত্যেক দিন 'দু'রাকা'ত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত— অথবা যোহরের নামাযের পর) আদায়।

৩. সূরা ফাতিহা প্রত্যহ কমপক্ষে ৭ বার পাঠ করা এবং এর ওপর গভীরভাবে চিন্তা করা।

৪. রাবৰানা আফরিগ আলায়না সাবরাওঁ ওয়া সারিবত আকুদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কুওমিল কাফিরীন। (সূরা বাকারা : ২৫১) [প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করা]।

৫. রাবৰানা লা তুয়িগ কুলুবানা বাঁদা ইয়া হাদায়তানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহহাব। (সূরা আলে ইমরান : ৯) [প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করা]।

৬. আল্লাহম্মা ইন্না নাজআলুকা ফী নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম। (আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত) [প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করা]।

৭. আসতাগফিরল্লাহ রাবী মিন কুল্লি যাস্মিওঁ ওয়া আতুরু ইলায়হি। [প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করা]।

৮. সুবহানল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানল্লাহিল আযীম আল্লাহম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। [প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করা]।

৯. দুরদ শরীফ (নামাযে যেটি পাঠ করা হয়) [প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করা]।

- তৃতীয় জুন: 'তাহের হার্ট ফাউন্ডেশন'র জন্যে আর্থিক কুরবানীর তাহরীক। খোদাম, আনসারল্লাহ সফে দওম এবং লাজনা ইমাইল্লাহ যেন বেশি-বেশি এতে অংশ নেয়।

- হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) কর্তৃক প্রবর্তিত 'মরিয়ম শাদী' ফাস্তে জামা'ত যেন বেশি-বেশি করে অংশগ্রহণ করে এ জন্য তাহরীক।

- সেপ্টেম্বর: বৃক্ষেনে ২০৮ একর বিস্তৃত জায়গা ক্রয় করার জন্যে তাহরীক। পরবর্তীতে এ জায়গা ক্রয় করা হয়। বর্তমানে এখানে যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ জায়গার নাম হল 'হাদীকাতুল মাহদী'।

- ২৩ সেপ্টেম্বর: নরওয়েতে মসজিদ নির্মাণের জন্যে তাহরীক।

প্র. হ্যুর (আই.) কবে, স্পেনের কোন শহরে দ্বিতীয় আহমদীয়া মসজিদ নির্মাণের

তাহরীক করেছেন?

উ. জানুয়ারি ২০০৫ সনে স্পেনের বিখ্যাত শহর ভ্যালেসিয়ায়।

প্র. তাহের হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল কখন, কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?

উ. ১৭ এপ্রিল ২০০৫ সনে, রাবওয়া, পাকিস্তানে।

প্র. নূরুল আইন কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের নাম?

উ. এটি পাকিস্তানের রাবওয়াতে অবস্থিত জামা'তের সর্বপ্রথম Eye Bank Hospital এবং Blood Bank -এর নাম।

প্র. হ্যুর আনোয়ার (আই.) পূর্ব আফ্রিকাতে কখন সর্বপ্রথম সফর করেন এবং কোন-কোন দেশে সফর করেন?

উ. ২৬ এপ্রিল ২০০৫ থেকে ২৫ মে ২০০৫ পর্যন্ত পূর্ব আফ্রিকায় সর্বপ্রথম সফর করেন। এ সফরে তিনি কেনিয়া, তানজানিয়া এবং উগান্ডায় যান।

প্র. হ্যুর আনোয়ার (আই.) সর্বপ্রথম কখন কাদিয়ানের পবিত্র মাটিতে সফর করেন?

উ. ১৫ ডিসেম্বর ২০০৫ সনে।

প্র. হ্যুর (আই.) সর্বপ্রথম কবে দূরপ্রাচ্যে সফর করেন? এ সফরে তিনি কোন-কোন দেশ সফর করেন?

উ. হ্যুর (আই.) ৪ঠা এপ্রিল ২০০৬ থেকে ১৫ মে ২০০৬ পর্যন্ত সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া, ফিজি, নিউজিল্যান্ড এবং জাপান সফর করেন।

প্র. হ্যুর (আই.) কখন শিশু ও নব-দীক্ষিতগণকে ওয়াকফে জাদীদের অন্তর্ভুক্ত করার তাহরীক করেন?

উ. ২০০৬ সালের ০৬ জানুয়ারি।

প্র. পৃথিবীর এক প্রান্ত (ফিজি) থেকে কখন হ্যুর (আই.) সরাসরি জুমু'আর খুতবা প্রদান করেন?

উ. ২৮ এপ্রিল ২০০৬ সনে। এর মাধ্যমে হ্যরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর প্রতি অবর্তীর্ণ পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে তওহাদের বাণী উচ্চকিত হবার ভবিষ্যতবাণীর সত্যতার নির্দর্শন প্রতিবীৰাম্বণী পুনরায় দেখতে পায়।

প্র. আরবি ভাষাভাষীদের মাঝে আহমদীয়াতের বার্তা পৌছে দেয়ার জন্য কোন চ্যানেল উদ্বোধন করা হয়?

উ. এমটিএ আল আরাবিয়া। ২৩ মার্চ ২০০৭ সনে এ চ্যানেলের উদ্বোধন করা হয়।

প্র. হ্যরত সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসিম আহমদ সাহেব কবে ইস্তেকাল করেন?

উ. ২৯ এপ্রিল ২০০৭ সনে। দেশ বিভাগের পর তিনি কাদিয়ানেই অবস্থান করেন এবং মৃত্যু অবধি নায়েরে আলা এবং আমীরে মোকামী কাদিয়ান হিসেবে গুরুত্বায়িত পালন করেন। হ্যুর (আই.) তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, তিনি আমার সত্যিকার 'সুলতানে নাসির' ছিলেন।

প. হ্যুর (আই.) কবে ঘানা সফর করেন? এ সফরের সময় সে দেশের রাষ্ট্রপতি হ্যুর (আই.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন, তার নাম কী?

উ. হ্যুর আনোয়ার (আই.) ১৫-২২ এপ্রিল ২০০৮ সনে ঘানা সফর করেন। এ সফরে সে দেশের রাষ্ট্রপতি Nana Addo Danouah Akufo Addo হ্যুর (আই.)-র সাথে সাক্ষাৎ করেন।

প. ১৩ এপ্রিল ২০০৮ সনে বেনিনের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন এবং রেডিওতে কী ঘোষণা দেয়া হয়।

উ. বেনিন সরকারের তথ্য ও প্রচারমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন এবং রেডিওতে এ ঘোষণা দেন, “বেনিন সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে এ ঘোষণা করছে যে, নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া সম্প্রদায়ের বর্তমান ইমাম হ্যরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) ২৩ এপ্রিল ২০০৮ সনে বেনিন সফর করবেন। এ সম্মানিত অতিথি দেশের রাষ্ট্রীয় অতিথির মর্যাদা লাভ করবেন।”

প. ২৪ এপ্রিল ২০০৮ সনে বেনিনের রাষ্ট্রপতি হ্যুর (আই.)-এর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেন, তার নাম কী?

উ. রাষ্ট্রপতির নাম হল Hon Thomas Yayi Boui.

প. নাইজেরিয়া সফরে হ্যুর (আই.) সে দেশের নতুন জলসাগাহের উদ্বোধন করেন। জলসাগাহের নাম ও উদ্বোধনের তারিখ বলুন।

উ. ‘হাদিকায়ে আহমদ’ (আহমদের বাগান)। ২ৱা মে ২০০৮ সনে উদ্বোধন করা হয়।

প. ২৭ মে ২০০৮ সনে হ্যুর (আই.) লঙ্ঘনের কোন স্থান থেকে খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলীর টুমান উদ্বীপক ভাষণ প্রদান করেন?

উ. লঙ্ঘনের এক্সেল সেন্টার থেকে।

প. হ্যুর আনোয়ার (আই.) সকল আহমদী সদস্যদের কাছ থেকে খিলাফত শতবার্ষিকী উপলক্ষে যে অঙ্গীকার ধৃহণ করেছিলেন তা বলুন।

উ. খিলাফত আহমদীয়া শতবার্ষিকী জুবিলীর অঙ্গীকারনামা:

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাল্লাহ লা শারীকালাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

আজ খেলাফাতে এ্যাহমদীয়া কে সও সাল পুরে হোনে পার হাম আল্লাহ্ তা'লা কি কাসাম খা কার ইস বাত কা এ্যাহেদ কারতে হ্যায় কে হাম ইসলাম অওর এ্যাহমদীয়াত কি ইশায়াত অওর মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (সা.) কা নাম দুনিয়া কে কিনারোঁ তাক পঁচানে কে লিয়ে আপনি জিন্দেগীওঁ কে আখেরী লামহা তাক কোশিশ কারতে চালে জায়েঙ্গে। অওর ইস মোকাদ্দাস ফারিয়ে কি তাকমিল কে লিয়ে হামেশা আপনি জিন্দেগীয়াঁ খোদা অওর উসকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কে লিয়ে ওয়াক্ফ রাক্খেঙ্গে, অওর

হার বাড়ী সে বাড়ী কুরবানী পেশ কার কে কেয়ামাত তাক ইসলাম কে ঝাণ্ডে কো দুনিয়া কে হার মূলক মে উঁচা রাকখেঙ্গে। হাম ইস বাত কা ভি ইকরার কারতে হ্যাঁ কে হাম নেয়ামে খেলাফাত কি হেফায়াত অওর ইস কে ইসতেকাম কে লিয়ে আখেরী দাম তাক জিদ্দো-জুহুদ কারতে রাহেঙ্গে। অওর আপনি আওলাদ দার আওলাদ কো হামেশা খেলাফাত সে ওয়াবাসতা র্যাহনে অওর উসকি বারাকাত সে মুসতাফিয হোনে কি তালকিন কারতে রাহেঙ্গে। তা কে কেয়ামাত তাক খেলাফাতে এ্যাহমাদীয়া মাহফুয চালি জায়ে। অওর কেয়ামাত তাক সিলসিলায়ে এ্যাহমাদীয়া কে যারিয়ে ইসলাম কি ইশায়াত হোতি রাহে। অওর মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.) কা বাস্তা দুনিয়া কে তামাম ঝান্ডো সে উঁচা ল্যাহরানে লাগে। এ্যায় খোদা তু হামে ইস এ্যাহেদ কো পুরা কারনে কি তৌফিক আতা ফারাম। আল্লাহহ্মা আমীন। আল্লাহহ্মা আমীন। আল্লাহহ্মা আমীন।

অনুবাদ: আমি সাক্ষ্য দিছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিছি যে, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বাস্তা ও রসূল। আজ আহমদীয়া খিলাফতের শত বছর পৃত্তি উপলক্ষে আমরা আল্লাহর নামে শপথ করে এই অঙ্গীকার করছি, আমরা ইসলাম ও আহমদীয়াতের প্রসার আর হ্যরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নাম পৃথিবীর প্রান্তে-প্রান্তে পৌঁছানোর জন্যে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করে যাব। এই পবিত্র দায়িত্ব সম্পাদনের লক্ষ্যে সর্বদা আমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর জন্য আমাদের জীবন উৎসর্গ করে রাখব এবং সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের পতাকাকে বিশ্বের প্রতিটি দেশে সম্মুক্ত রাখব। আমরা আরও অঙ্গীকার করছি, খিলাফত ব্যবস্থার সুরক্ষা ও এর দৃঢ়তার লক্ষ্যে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবিরাম চেষ্টা করে যাব, অধিকন্ত বংশ পরম্পরায় নিজ সন্তান-সন্ততিদের খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকা ও এর কল্যাণরাজি অর্জনের বিষয়ে সচেষ্ট থাকার নিষিদ্ধ করে যাব যেন কিয়ামত পর্যন্ত আহমদীয়া খিলাফত সুরক্ষিত থাকে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আহমদীয়া জামাতের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার অব্যাহত থাকে। আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পতাকা যেন অন্য সব পতাকার উর্ধ্বে থাকে। হে খোদা! তুমি আমাদেরকে এই অঙ্গীকার পূর্ণ করার সামর্থ্য দাও। হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর। হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর।

প্র. হ্যুর আনোয়ার (আই.) কবে জামেয়া আহমদীয়া, জার্মানীর উদ্বোধন করেন?

উ. ২০ আগস্ট ২০০৮ সনে।

প্র. ২৪ জুন ২০০৮ সনে হ্যুর (আই.) যখন ওয়াশিংটন থেকে টরোন্টো, কানাডার উদ্দেশ্যে রওনা দেন তখন কোন ফ্লাইটে রওনা দেন এবং তার বোর্ডিং কার্ডে কী লেখা ছিল?

উ. কন্টিনেন্টাল এয়ারলাইন। বোর্ডিং কার্ডের মধ্যে খিলাফত আহমদীয়া শতবার্ষিকী জুবিলী ২০০৮ এর লোগো সংযুক্ত ছিল এবং এর একদিকে মিনারাতুল মসীহ্র ছবি ছিল।

কার্ডের ওপর লিখা ছিল Khilafat Flight এবং আরেকটি অংশে Ahmadiyya Community এবং নীচের অংশে Khilafat Centenary Celebrations লেখা ছিল।

প্র. হ্যুর আনোয়ার (আই.) কবে জার্মানীতে ‘মসজিদে খাদিজা’-এর শুভ উদ্বোধন করেন?

উ. ১৭ অক্টোবর ২০০৮ সনে জুমআর খুতবার মাধ্যমে।

প্র. মসজিদে খাদিজা উদ্বোধনী জুমআর খুতবায় হ্যুর (আই.) বাংলাদেশের কোন কৃতী সন্তানের অবদানের কথা তুলে ধরেন?

উ. জার্মানীর প্রথম মোবাল্লেগ খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী বাঙালির।

প্র. মসজিদ খাদিজা উদ্বোধনীর সময় কোন-কোন দেশের প্রেস ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত হয়েছিলেন? কতটি টিভি চ্যানেল মসজিদ উদ্বোধনের খবর সম্প্রচার করে?

উ. ৮টি দেশের প্রেস ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত হয়েছিলেন। দেশগুলো হলো- জাপান, চেক রিপাবলিক, পোল্যান্ড, হল্যান্ড, ইটালী, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স এবং সুইডেন। আর নয়টি টিভি চ্যানেল মসজিদ উদ্বোধনের খবর সম্প্রচার করে।

প্র. কত তারিখে হ্যুর আনোয়ার (আই.) যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট ভবনে সমসাময়িক বিশ্ব পরিস্থিতির উপর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন?

উ. ২২ অক্টোবর ২০০৮ তারিখে।

প্র. হ্যুর আনোয়ার (আই.) দ্বিতীয়বার কখন ভারত সফর করেন?

উ. ২৩ নভেম্বর ২০০৮ সনে হ্যুর আনোয়ার (আই.) দ্বিতীয়বারের মতো ভারতে আসেন। এ সফরে তিনি ২৪ নভেম্বর চেন্নাইয়ে মসজিদে হাদীর উদ্বোধন করেন। এরপর কেরালাতে ২৫ নভেম্বর মসজিদ বায়তুল কুদুস এবং ২৮ নভেম্বর বায়তুল আফিয়াত, বায়তুল হাদী, মসজিদে মাহমুদ, মসজিদে নাসের, মসজিদে উমর এর উদ্বোধন করেন।

প্র. হ্যুর (আই.) কবে জামেয়া আহমদীয়া, জার্মানীর একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনের ভিত্তি রাখেন?

উ. ১৫ ডিসেম্বর ২০০৯ সালে।

প্র. ইটালীর মাটি থেকে সর্বপ্রথম হ্যুর (আই.)-এর জুম'আর খুতবা কখন সম্প্রচারিত হয়?

উ. ১৬ এপ্রিল ২০১০ সালে।

প্র. হ্যুর (আই.) কখন, কোথায় মসীহ নাসেরী হ্যরত ঈসা (আ.)-এর কাফন দেখার জন্য গিয়েছিলেন?

উ. হ্যুর (আই.) ৩০ এপ্রিল ২০১০ সালে ইটালীর বিখ্যাত শহর তুরিনে মসীহ নাসেরী হ্যরত ঈসা (আ.)-এর কাফন দেখার জন্য গিয়েছিলেন।

প্র. হ্যুর আনোয়ার (আই.) স্পেন সফরের সময় কবে, কোথায় দেশের দ্বিতীয় আহমদীয়া মসজিদের ভিত্তি রাখেন?

উ. ১১ এগ্রিল ২০১০ সালে স্পেনের ভ্যালেপিয়া শহরে মসজিদ ‘বায়তুর রহমান’-এর।

প্র. আয়ারল্যান্ডের মাটিতে সর্বপ্রথম আহমদীয়া মসজিদের ভিত্তি কে, কখন রাখেন? মসজিদের নাম কী?

উ. আয়ারল্যান্ডে জামা’তের সর্বপ্রথম মসজিদের নাম হল ‘মসজিদে মরিয়ম’। হ্যুর আনোয়ার (আই.) ১৭ অক্টোবর ২০১০ শুক্রবার গ্যালওয়ে (Galway) শহরে এ মসজিদের ভিত্তি রাখেন।

প্র. কানাডার প্রধানমন্ত্রী হ্যুর আনোয়ার (আই.)-কে কোন উপাধিতে ভূষিত করে?

উ. Champion of Peace. (শান্তির শিরোপাধারী)।

প্র. হ্যুর (আই.)-এর সম্মানিত শুশুর হয়রত সৈয়দ দাউদ মুজাফফর শাহ সাহেব কবে ইন্তেকাল করেন?

উ. ০৮ মার্চ ২০১১ সনে ৯১ বছর বয়সে।

প্র. হ্যুর আনোয়ার (আই.)-এর পরম শুদ্ধেয় সম্মানিতা মাতা মোহতরমা সাহেবযাদী নাসেরা বেগম সাহেবা কখন ইন্তেকাল করেন এবং তাঁকে কোথায় সমাহিত করা হয়?

উ. ২৯ জুলাই ২০১১ সনে। তাঁকে বেহেশতি মাকবেরা, রাবওয়াতে সমাহিত করা হয়।

প্র. ক্ষ্যান্তিনেভিয়ার সর্ববৃহৎ মসজিদ কবে, কে উদ্বোধন করেন?

উ. ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১১ সনে হয়রত খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস (আই.) নরওয়ের অসলোতে ক্ষ্যান্তিনেভিয়ান দেশসমূহের সর্ববৃহৎ মসজিদ ‘বায়তুন নাসর’-এর উদ্বোধন করেন। এ মসজিদে একসাথে ৪,৫০০ জন মুসল্লি নামায পড়তে পারেন।

প্র. কবে হ্যুর (আই.) পোপকে চিঠি পাঠান? এ চিঠি পাঠানো সম্পর্কে কী জানেন?

উ. ইসরাইলের কাবাবির জামা’তের আমীর জনাব মুহাম্মদ শরীফ ওদেহ সাহেবের আবেদনের প্রেক্ষিতে হ্যুর (আই.) পোপ ঘোড়শ বেনেডিক্টের কাছে ধর্মীয় সহনশীলতা ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় তার প্রভাবকে কাজে লাগানোর আহ্বান জানিয়ে চিঠি পাঠান। ১০ নভেম্বর ২০১১ সনে ভ্যাটিকান সফরের সময় মুহাম্মদ শরীফ ওদেহ সাহেব সরাসরি পোপের হাতে হ্যুরের (আই.) চিঠি ও ইটালিয়ান ভাষায় কুরআনের অনুবাদ উপহারস্বরূপ তুলে দেন।

প্র. কবে হ্যুর (আই.) ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠান? এর বিষয়বস্তু কী ছিল?

উ. হ্যুর (আই.) ৫ মার্চ ২০১২ সনে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনয়ামিন নেতানিয়াহুর নামে চিঠি পাঠান। এতে হ্যুর (আই.) তাকে তৃতীয় বিশ্ববুদ্ধের সূচনার পথ সৃষ্টি না করার জন্য এবং এর ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে সতর্ক করেন।

প্র. কবে হ্যুর (আই.) বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কাছে চিঠি পাঠান? এ চিঠিগুলোর বিষয়বস্তু কী

ছিল?

উ. ২৫ মার্চ ২০১২ সনে হ্যুর (আই.) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, কানাডার প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হার্পার ও ইরানের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমদিনেজাদের কাছে পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি উল্লেখ করে এবং এর প্রতিরোধে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে চিঠি প্রেরণ করেন।

প্র. সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতির কোন ফতোয়ার বিরঞ্জনে, কবে হ্যুর (আই.) কঠোর সমালোচনা করে বক্তব্য প্রদান করেন?

উ. ৮ এপ্রিল ২০১২ সনে হ্যুর (আই.) সৌদি গ্র্যান্ড মুফতি আব্দুল আয়ীয় আল শায়খ-এর সৌদি আরবসহ আরব দেশগুলোতে অবস্থিত গীর্জাসমূহ ধ্বংস করার ফতোয়ার কঠোর সমালোচনা করেন এবং এর বিরঞ্জনে কুরআনের দলিল পেশ করেন।

প্র. হ্যুর (আই.) কখন তাঁর ঐতিহাসিক উত্তর আমেরিকা সফর সম্পন্ন করেন?

উ. হ্যুর (আই.) জুন-জুলাই ২০১২ সনে উত্তর আমেরিকায় তাঁর ঐতিহাসিক সফর সম্পন্ন করেন।

প্র. কবে হ্যুর (আই.) আমেরিকার ক্যাপিটল হিলে তাঁর ঐতিহাসিক বক্তব্য প্রদান করেন? এর সম্বন্ধে কী জানেন?

উ. ২৭ জুন ২০১২ সনে হ্যুর (আই.) আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত মার্কিন পার্লামেন্ট ক্যাপিটল হিলে এক ঐতিহাসিক বক্তব্য প্রদান করেন। হ্যুর (আই.) তাঁর বক্তব্যে বিশ্বাস্তি প্রতিষ্ঠায় কুরআনের শিক্ষা তথা প্রকৃত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব তুলে ধরেন। এতে মার্কিন সিনেট ও কংগ্রেসের ৩০জন সদস্যসহ ১১৯ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

প্র. ২০১১-২০১২ সনে যে নতুন দু'টি দেশে আহমদীয়াত পৌছেছে সেগুলির নাম কী?

উ. ২০১১-২০১২ সনে যে নতুন দু'টি দেশে আহমদীয়া পৌছেছে সেগুলোর নাম হল পানামা সিটি ও আমেরিকান সামাবা।

প্র. ২০১৩ সন পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বে কতটি দেশে আহমদীয়াত প্রবেশ করেছে? ২০১২-২০১৩ সনে যে নতুন দু'টি দেশে আহমদীয়াত পৌছেছে সেগুলির নাম কী?

উ. ২০৪টি দেশে। নতুন দু'টি দেশের নাম হল কোস্টারিকা ও মন্টিনিয়ো।

প্র. ২০১২-২০১৩ সনে কতজন ব্যক্তি বয়াত করে আহমদীয়া সিলসিলায় প্রবেশ করেছে?

উ. ৫ লক্ষ ৪০ হাজারের অধিক ব্যক্তি বয়াত করে আহমদীয়া জামা'তে প্রবেশ করেছে।

প্র. ২০১৭-২০১৮ সনে নতুন যে দু'টি দেশে আহমদীয়াত পৌছেছে সে দু'টি দেশের নাম কী?

উ. ২০১৭-২০১৮ সনে নতুন যে দু'টি দেশে আহমদীয়াত পৌছেছে সে দু'টি দেশের নাম হল- (১) ইস্ট তিমুর ও (২) জর্জিয়া।

প্র. ২০১৭-২০১৮ সনে কতজন ব্যক্তি বয়াত করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তভুক্ত হয়েছেন?

উ. ২০১৭-২০১৮ সনে ৬ লাখ ৪৭ হাজার ৮৬৯ জন বয়াত করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তভূক্ত হন।

প্র. এ পর্যন্ত (২০১৮) কতটি দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠিত?

উ. এ পর্যন্ত (২০১৮) ২১২টি দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠিত।

প্র. হ্যুরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরচন্দে অবমাননাকর চলচিত্র নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে হ্যুর আনোয়ার (আই.) কত তারিখে ঐতিহাসিক জুমু'আর খুতবা প্রদান করেন?

উ. লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদে ২১ সেপ্টেম্বর ২০১২ সনে হ্যুর (আই.) ঐতিহাসিক জুমু'আর খুতবা প্রদান করেন।

প্র. কবে হ্যুর (আই.)-কে লন্ডনের মেয়র লন্ডনস্ট সিটি হলে আমন্ত্রণ জানান?

উ. ১৯ নভেম্বর, ২০১২ তারিখে লন্ডনের মেয়র মি: বরিস জনসন হ্যুর (আই.)-কে সিটি হলে আমন্ত্রণ জানান। ৪৫ মিনিটের সাক্ষাতকারে হ্যুর এবং মেয়র মহোদয় বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠাসহ ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষাসমূহ, চরমপন্থা দূরীকরণে আহমদীয়া জামা'তের প্রচেষ্টাসমূহ এবং কতিপয় দেশে এ জামা'তের নির্যাতিত হবার বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেন।

প্র. কখন হ্যুর আনোয়ার (আই.) ইউরোপীয় পার্লামেন্টে ঐতিহাসিক বক্তব্য প্রদান করেন?

উ. ৪ঠা ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে হ্যুর আনোয়ার (আই.) ব্রাসেলসের ইউরোপীয় পার্লামেন্টে ৩০টি দেশের প্রতিনিধিত্বকারী ৩৫০ এরও অধিক অতিথির উপস্থিতিতে এক ঐতিহাসিক বক্তব্য প্রদান করেন।

প্র. ২০১৩ সনে কোন দু'টি দেশ নিজ-নিজ দেশে আহমদীয়া জামা'তের শতবার্ষিকী জুবিলী উদযাপন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে?

উ. বাংলাদেশ ও ইংল্যান্ড। হ্যুর (আই.) বাংলাদেশ জামা'তের শতবার্ষিকী উপলক্ষে ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সনে বাংলাদেশের ৮৯তম সালানা জলসায় এম.টি.এ.-এর মাধ্যমে সরাসরি ঐতিহাসিক বক্তব্য প্রদান করেন।

প্র. কত তারিখে হ্যুর (আই.) কানাডার বৃটিশ কলম্বিয়া প্রদেশের ত্যানকুভার শহরে জামা'তের নব-নির্মিত মসজিদ উদ্বোধন করেন? এবং মসজিদটির নাম কী?

উ. ১৮ মে ২০১৩ সনে। মসজিদের নাম হলো-“বায়তুর রহমান”।

বিবিধ (২)

- প্র. হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মা ও বাবা কখন মারা যান?
- উ. হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বয়স যখন ৩৩ বছর— অর্থাৎ, ১৮৬৮ সনে তাঁর মা মারা যান এবং যখন তাঁর বয়স ৪১ বছর তখন— অর্থাৎ, ১৮৭৬ সনে তাঁর বাবা মারা যান।
- প্র. হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর প্রথম স্ত্রীর নাম কী?
- উ. হুরমত বিবি। এ স্ত্রীর গর্ভে হযরত সাহেবযাদা মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব ও সাহেবযাদা মির্যা ফযল আহমদ সাহেবে জন্মগ্রহণ করে। হযরত সাহেবযাদা মির্যা সুলতান আহমদ সাহেবে পরবর্তীতে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী আল মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর হাতে বয়াত নেন।
- প্র. ২৩ মার্চ এবং ২০ ফেব্রুয়ারি আহমদীয়াতের ইতিহাসে বিখ্যাত কেন?
- উ. ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ তারিখে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) লুধিয়ানা নিবাসী সূফী আহমদ জান সাহেবের মহল্লা জাদীদস্থ বাড়ীতে প্রথম বয়াত নেয়া আরম্ভ করেন। এ বয়াত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ জামা'তের সূচনা হয়।
- ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি তিনি (আ.) ‘মুসলেহ মাওউদ’ সংক্রান্ত ইশ্তেহার প্রকাশ করেন। যাতে প্রতিশ্রূত পুত্রের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত আছে।
- প্র. কাদিয়ানে প্রথম রেলগাড়ি চলাচল কবে আরম্ভ হয়?
- উ. ১৯২৮ সনের ১লা ডিসেম্বর।
- প্র. কাদিয়ানে প্রথম টেলিফোন যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা হয় কবে?
- উ. ১৯৩৬ সনের ১৪ ডিসেম্বর। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) সর্বপ্রথম হযরত চৌধুরী মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ খান (রা.) সাহেবের সাথে কথা বলেন।
- প্র. হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সম্বন্ধে একজন গয়ের আহমদী মাওলানার ফতোয়া উল্লেখ করুন।
- উ. ১৯৪২ সনের ১১ মে মিশ্রের আল আজহার ইউনিভার্সিটির রেষ্টের আল্লামা মাহমুদ সালতুত ফতোয়া দেন, “পবিত্র কুরআন অনুসারে হযরত ঈসা (আ.) এ পৃথিবীতেই স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন”।
- প্র. কাদিয়ানের দরবেশ কারা?
- উ. ১৯৪৭ সনে দেশ বিভাগের সময় কাদিয়ান হতে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর হিজরতের পর যেসব আহমদী কাদিয়ানে রয়ে গিয়েছিলেন তারাই ‘কাদিয়ানের দরবেশ’ নামে পরিচিত। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) তাদেরকে কাদিয়ানের হেফায়তের জন্য রেখে যান। এতে সাতজন বাঙালি অস্তর্ভুক্ত ছিলেন।
- প্র. হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর কাদিয়ান হতে পাকিস্তানে হিজরত সম্বন্ধে কী

জানেন ?

উ. হয়রত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ১৯৪১ সনের ১২ ডিসেম্বর তাঁর দেখা এক স্বপ্নের বর্ণনায় বলেন, তাঁকে হিজরত করতে হবে এবং এক পাহাড়ী এলাকায় নতুন কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। পরে দেশ বিভাগের সময় ১৯৪৭ সনে হ্যুর (রা.) কাদিয়ান হতে পাকিস্তানের লাহোরে হিজরত করেন। পরে লাহোর হতে ৯৫ মাইল দূরে একটি জনমানবহীন কংকরময় পাহাড়ী অঞ্চলে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠান জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ স্থানই রাবওয়া নামে খ্যাত। ১৯৪৮ সনের ৫ আগস্ট জামা'ত পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে রাবওয়ার ভূমি দ্রুত করে নেয় এবং ২০ সেপ্টেম্বর হ্যুর (রা.) রাবওয়ার উদ্ঘোধন করেন।
 প্র. জামা'তে আহমদীয়ার মহিলাগণ কর্তৃক বহির্দেশে কোন-কোন মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়?

উ. (১) মসজিদ ফযল: লক্ষ্মণ (২) মসজিদ মুবারক: হেগ, হল্যান্ড (৩) মসজিদে নুসরাত জাহাঃ কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক (৪) মসজিদ খাদীজা: বার্লিন, জার্মানী।

প্র. পাঞ্জাব দাঙ্গা কী?

উ. ১৯৫৩ সনে গৌলভী আবুল আলা মওদুদী ও অন্যান্য গোঁড়া মোল্লাদের প্ররোচনায় পাকিস্তানের কয়েকটি অঞ্চলে বিশেষত পাঞ্জাবে আহমদীদের বিরুদ্ধে যে কুখ্যাত দাঙ্গা-হঙ্গামা পরিচালনা করা হয় তা-ই ‘পাঞ্জাব দাঙ্গা’ নামে পরিচিত। হয়রত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর সুযোগ্য নেতৃত্বে জামা'ত এ সময় অসাধারণ সংযম প্রদর্শন করে অল্প সময়ের মাঝেই সব সাময়িক ক্ষতি কাটিয়ে ওঠে।

প্র. হয়রত খলীফাতুল মসীহ সালী (রা.) জামা'তে আহমদীয়ার ইতিহাস লেখার জন্য কাকে নিযুক্ত করেছিলেন ?

উ. জামা'তের ইতিহাসবিদ মাওলানা দোষ্ট মুহাম্মদ শাহেদ সাহেবকে (১৯৫৫ সনে)।

প্র. ১৯৭৪ সনে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পাশকৃত ‘নট-মুসলিম’ আইন সম্বন্ধে উল্লেখ করুন।

উ. ১৯৭৩ সনে হয়রত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) কর্তৃক শতবার্ষিকী জুবিলী পরিকল্পনা ঘোষণার পর পাকিস্তানের গোঁড়া মোল্লারা আহমদীয়াতের অগ্রিম বন্ধ করার জন্য সুদূরপ্রসারী ঘণ্ট ঘড়িয়ে মেতে ওঠে। এ ঘড়িয়ের অংশ হিসেবে রাবওয়া রেলস্টেশনে মোল্লাসমর্থক ছাত্রদের হঙ্গামাকে কেন্দ্র করে সারা দেশে আহমদী বিরোধী রক্তক্ষরী দাঙ্গা শুরু হয়। অসংখ্য নিরীহ আহমদীদের ঘর-বাড়ি, দোকানপাট লুট করা হয়। আহমদীদের ওপর দৈহিকভাবেও অত্যাচার চালানো হয়। মোল্লারা পাকিস্তানের ভূট্টো সরকারের সাথে অবৈধ যোগসাজশ করে সংসদে আহমদীদের বিরুদ্ধে ‘নট-মুসলিম’ বিল উত্থাপন করে। সংসদে আহমদীদের প্রতিনিধিত্ব করেন হয়রত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.)। তাঁকে সহযোগিতা করেন হয়রত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফ-তুল মসীহ রাবে (রাহে.), মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব, শেখ মুহাম্মদ আহমদ মায়হার সাহেব এবং মাওলানা দোষ্ট মুহাম্মদ শাহেদ সাহেব। অজ্ঞাত কারণে সংসদের

উল্লেখিত সময়ের কার্যবিবরণী জনসমক্ষে প্রকাশিত হতে দেয়া হয়নি। পরিশেষে ১৯৭৪ সনের ৭ সেপ্টেম্বর এক সাজানো নাটকের মাধ্যমে আহমদীদেরকে ‘নট-মুসলিম’ ঘোষণা করা হয়।

প্র. প্রথম কখন যুগ খলীফা ইংল্যান্ডের সালানা জলসায় অংশ নেন?

উ. ১৯৮৫ সনের ২৪-২৫ আগস্ট হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) ইংল্যান্ডের ১১তম সালানা জলসায় অংশ নেন।

প্র. প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক কখন পাকিস্তানে আহমদী বিরোধী কুখ্যাত অর্ডিন্যান্স জারী করেন?

উ. ১৯৮৪ সনের ২৬ এপ্রিল। এ অর্ডিন্যান্স জারীর মাধ্যমে আহমদীদের নিজেকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেয়া, সালাম দেয়া, আযান দেয়া এবং ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ ঘোষণা করা হয়।

প্র. আহমদীদের সম্বন্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার সুপ্রীম কোর্ট কী রায় প্রদান করেন?

উ. ১৯৮৫ সনের ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার সুপ্রীম কোর্ট রায় প্রদান করে বলে, “আহমদীরা মুসলমান এবং তারা মসজিদে নামায আদায়ের ও মুসলমানদের ক্ষেত্রে সমাহিত হওয়ার অধিকার রাখে।”

প্র. বহির্দেশে তবলীগ করতে গিয়ে যে সকল মুরুক্বী ইঙ্গেকাল করেছেন তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম লিখুন?

উ. ১) হযরত মাওলানা নয়ীর আহমদ আলী সাহেব (সিয়েরালিওন), ২) হযরত হাফেয ওয়াবায়দুল্লাহ্ সাহেব (মরিশাস), ৩) হযরত আব্দুর রহমান খান বাঙালি সাহেব (আমেরিকা), ৪) হযরত মাওলানা আবু বকর আইয়ুব সাহেব (হল্যান্ড), ৫) মোকাররম মাওলানা মোবাশশের আহমদ চৌধুরী সাহেব (নাইজেরিয়া)।

প্র. “আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও তত্ত্বজ্ঞানে এমন উৎকর্ষতা অর্জন করবেন যে, স্বীয় সত্যতার জ্যোতি, দলিল-প্রমাণ ও নির্দর্শনে অন্য সকলের মুখ বন্ধ করে দিবে”— হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর এ ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার সত্যায়নের অধিকারী দুইজন আহমদীর নাম বলুন।

উ. ১) হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেব (রা.), ২) মোহতরম ড. আব্দুস সালাম সাহেব।

প্র. হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেব (রা.)-এর জন্ম-মৃত্যু তারিখ এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়াতের তারিখ বলুন?

উ. জন্ম: ৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩, মৃত্যু: ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৮৫। তিনি ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯০৭ সালে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়াত নেন।

প্র. হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেব জাগতিক কোন-কোন উল্লেখযোগ্য পদে আসীন ছিলেন?

উ. • পাঞ্জাব আইনসভার সদস্য

• সভাপতি, অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ, ১৯৩১

• সদস্য, গোল টেবিল বৈঠক, লঙ্ঘন

• বিচারপতি, সুপ্রিম কোর্ট, ভারত

• রেলমন্ত্রী, ভারত

• পাকিস্তানের প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী

• সহকারী প্রধান বিচারপতি এবং প্রধান বিচারপতি, আন্তর্জাতিক আদালত

• জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্ট

প্র. কর্মজীবনে হয়রত চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরঝাহ খান (রা.)-এর একটি বিরল কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করুন।

উ. এখন পর্যন্ত তিনিই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি একাধারে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্ট ছিলেন (১৯৬২) এবং আন্তর্জাতিক আদালতের প্রধান বিচারপতি ছিলেন (১৯৭০-৭৩)।

প্র. নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রথম মুসলমান বিজ্ঞানীর নাম কী? কত সালে কোন বিষয়ের উপর তিনি এ পুরস্কার লাভ করেন? তাঁর আবিক্ষারের মূল বিষয় কী ছিল?

উ. প্রফেসর ড. আব্দুস সালাম। ১৯৭৯ সালে তিনি তাঁর মর্যাদাপূর্ণ গবেষণামূলক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজে ভূষিত হন। তিনি বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বল ও দুর্বল পারমাণবিক বল-এ দুটো বলকে অভিন্ন প্রমাণ করেন। এটা আইনস্টাইনও প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি একজন আহমদী মুসলমান এবং সারা বিশ্বে প্রথম কাতারের আহমদী হিসাবে পরিচিত।

প্র. প্রফেসর ড. আব্দুস সালাম সাহেবের জন্ম-মৃত্যু তারিখ বলুন। তাঁকে কোথায় সমাহিত করা হয়?

উ. জন্ম: ২৯ জানুয়ারি ১৯২৬, মৃত্যু: ২১ নভেম্বর ১৯৯৬ সনে তিনি অক্সফোর্ডে ইন্টেকাল করেন। ২৫ নভেম্বর ১৯৯৬ সনে তাঁকে বেহেশতি মাকবেরা, রাবওয়াতে সমাহিত করা হয়।

প্র. ইসলামী নীতি দর্শন পুস্তকের শতবার্ষিকী কীভাবে উদযাপন করা হয়?

উ. ১৯৯৬ সনে হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বিখ্যাত পুস্তক ‘ইসলামী নীতি দর্শন’-এর শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে এ পুস্তকের এক লক্ষ কপি প্রকাশিত হয়, বিভিন্ন ভাষায় এ পুস্তক অনুবাদ করা হয় এবং হ্রয়ের খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) সকল আহমদীকে এ পুস্তক পাঠ করার তাহরীক করেন। জামা’তের বিভিন্ন পত্রিকা এ পুস্তকের শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে।

প্র. ১৯৯৭ সনে কোন অসাধারণ নির্দর্শনের শতবার্ষিকী পূর্ণ হয়?

উ. রসূল আকরাম (সা.)-কে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজকারী আর্য সমাজী নেতা পভিত্ত লেখরাম পেশওয়ারীর ঐশ্বী শাস্তিস্বরূপ যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর শতবর্ষ পূর্ণ হয় যা— ৬ মার্চ ১৮৯৭ সনে হয়েরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক সংঘটিত হয়েছিল।

প্র. কেন্দ্রীয় খোদামূল আহমদীয়ার মুখ্যপত্র ‘মাসিক খালিদ’ কবে থেকে প্রকাশিত হওয়া শুরু হয়?

উ. অক্টোবর ১৯৫২ থেকে।

প্র. রাবওয়া থেকে প্রকাশিত কেন্দ্রীয় পত্রিকা-ম্যাগাজিনের নাম বলুন।

উ. • মাসিক খালিদ : মজলিস খোদামূল আহমদীয়া

- মাসিক তাশহীয়ুল আয়হান : মজলিস আতফালুল আহমদীয়া

- মাসিক আনসারঞ্জাহ : মজলিস আনসারঞ্জাহ

- মাসিক মিসবাহ : লাজনা ইমাইঞ্জাহ

- মাসিক তাহরীকে জাদীদ : আঙ্গুমানে তাহরীকে জাদীদ।

প্র. লস্তন থেকে প্রকাশিত আহমদী পত্র-পত্রিকার নাম বলুন।

উ. • Monthly Review of Religions, The Weekly Al Hakam

- সাপ্তাহিক আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল

- মাসিক তাকওয়া (আরবি)

- মাসিক আখবারে আহমদীয়া (আহমদীয়া সংবাদ)

প্র. ১৯৯৭ সনের জার্মানীর জলসা সালানার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

উ. হ্যুর খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর নির্দেশে এ জলসার সময় বসন্তিয়ান, আলবেনিয়ান এবং আরববাসীদের পৃথক-পৃথকভাবে প্রথমবারের মতো জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

প্র. ২০০৫ সনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কী?

উ. এ বছর নেয়ামে ওসীয়তের শতবর্ষ পূর্ণ হয়। সেই সাথে খিলাফতে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠার ১০০ হিজরি শতাব্দীও পূর্ণ হয়।

প্র. আহমদীয়া খিলাফতের শতবার্ধিকী বছর ২০০৮ সনে আল্লাহর পথে শহীদ আহমদী সদস্যদের নাম বলুন।

উ. ১) মোকাররম শহীদ ডা. আব্দুল মানান সিদ্দিকী সাহেব, আমীর, জেলা: মিরপুর খাস, পাকিস্তান। (৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮)।

২) মোকাররম শহীদ শেঠ মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব, আমীর, জেলা: নওয়াব শাহ, পাকিস্তান। (৯ সেপ্টেম্বর ২০০৮)।

৩) মোকাররম শহীদ শেখ সাইদ আহমদ সাহেব, করাচী, পাকিস্তান। (১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

প্র. জামা'তে আহমদীয়া ইংল্যান্ডের তত্ত্বাবধানে মসজিদ বায়তুল ফুতুহ, লন্ডনে কবে শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়?

উ. ২১ মার্চ ২০০৯ সনে।

প্র. প্রথম বৃটিশ আহমদী সদস্যর নাম বলুন যাকে ইংল্যান্ডের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ 'হাউজ অব লর্ডস'- এর 'লর্ড' হিসেবে মনোনোয়ন দান করেছেন?

উ. মোকাররম লর্ড তারেক আহমদ বিটি সাহেব।

প্র. প্রথম আহমদীয়া শান্তি পুরস্কার (Ahmadiyya Peace Award) কাকে এবং কখন দেয়া হয়?

উ. লর্ড এরিক এভারুরি (Lord Eric Avebury)-কে ২০ মার্চ ২০১০ সনের শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠানে।

প্র. ২০১০ সনের কোন তারিখ জামা'তে আহমদীয়ার ইতিহাসের সবচেয়ে হৃদয়বিদ্রোহ দিন? এ দিন কী ঘটেছিল?

উ. ২৮ মে ২০১০ ইং। এ দিন পাকিস্তানের লাহোরে অবস্থিত দু'টি আহমদীয়া মসজিদ গাড়ী শাহুর মসজিদ 'দারুল যিকর' এবং মসজিদ বায়তুল নূর, মডেল টাউন, লাহোরের ওপর আততায়ীদের হামলায় আগ্নাত্ত্ব রাস্তায় ৮৬ জন নিষ্ঠাবান আহমদী শাহাদাত বরণ করেন।

প্র. এমন একজন আহমদী সদস্যের নাম লিখুন যিনি নিজ মাতৃভূমির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন?

উ. মোকাররম শহীদ মেজর আফযাল আহমদ সাহেব। (পাকিস্তান)।

প্র. কবে, কি উপলক্ষে লন্ডনে অবস্থিত পাকিস্তানের হাই কমিশন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তকে প্রথমবারের মতো পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা উপহারস্বরূপ প্রদান করে?

উ. জুলাই ২০১০ সনে অনুষ্ঠিত যুক্তরাজ্য জামা'তের ৪৪তম সালানা জলসায় পতাকা উত্তোলনের জন্য।

প্র. কোন ব্যক্তিকে দ্বিতীয় 'আহমদীয়া শান্তি পুরস্কার' প্রদান করা হয়?

উ. পাকিস্তানের বিখ্যাত সামাজিক ব্যক্তিত্ব জনাব আব্দুস সাভার ইন্দি সাহেব।

প্র. কোন প্রতিষ্ঠানকে যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা ২০১২-তে তৃতীয় 'আহমদীয়া শান্তি পুরস্কার' লাভকারী বলে ঘোষণা করা হয়?

উ. তৃতীয় 'আহমদীয়া শান্তি পুরস্কার' লাভ করে প্রথমবারের মতো কোনো প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটির নাম হলো SOS Children's Villages UK. প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন এ প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ডেম মেরী রিচার্ডসন উইট।

প্র. চতুর্থ 'আহমদীয়া মুসলিম শান্তি পুরস্কার' কে লাভ করেন?

উ. ড. ওহেনেবা বোয়াচি-আদজেই। তিনি তাঁর যুগান্তকারী চিকিৎসা কর্মের জন্য পুরস্কৃত হন।

প্র. আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের website- এর ঠিকানা কী কী?

- উ. • আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের website- এর ঠিকানা হচ্ছে : www.alislam.org
• এমটিএ-এর website- এর ঠিকানা হচ্ছে : www.mta.tv
• বাংলা website- এর ঠিকানা হচ্ছে : www.ahmadiyyabangla.org
• মজলিস খোদামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের website- এর ঠিকানা হচ্ছে : www.mkabd.org

তথ্যসূত্র:

- ১) দীনি মাল্যমাত. মজলিস খোদামুল আহমদীয়া, পাকিস্তান।
- ২) খিলাফত আহমদীয়া শতবার্ষিকী জুবিলী স্মরণিকা, তাহরীকে জাদীদ, আঙ্গুমানে আহমদীয়া, পাকিস্তান।

নবম পরিচ্ছেদ

জামাতে আহমদীয়া ও এর প্রধান তিনি অঙ্গ-সংগঠনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

হ্যরত রাসুলে করিম (সা.) ধর্ম জগতের সূর্য এবং তাঁর অনুবর্তীতে আবির্ভূত হ্যরত মসিহ মাওউদ (আ.) ধর্ম জগতের চন্দ্ৰ। তিনি বিভিন্ন ধর্মের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ এবং শেষ যুগে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করার ইমামুজ্জামান। ফলে ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঐশ্বী নির্দেশে তিনি ২৩ মার্চ ১৮৮৯ তারিখ থেকে বয়াত গ্রহণ শুরু করেন। এর ফলে তাঁর অনুগত শিষ্য সৃষ্টির প্রবাহ শুরু হয়। আল্লাহ তাঁ'লা তাঁর প্রেরিত মামুৰ হ্যরত মসিহ মাওউদ (আ.)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন—“আমি তোমার প্রচারকে দুনিয়ার প্রাপ্তে-প্রাপ্তে পৌছে দেব”। (ইলহাম)। আর এরই ফলশ্রুতিতে প্রতিশ্রুতি মসিহ-র খেলাফতের অধিনে জামাতে আহমদীয়া আজ পৃথিবীর প্রায় সবকটি দেশে ক্রমবর্ধমান হারে সুবিস্তৃতিলাভ করছে।

বঙ্গদেশে জামাতে আহমদীয়া

প্র. বঙ্গদেশে জামাতে আহমদীয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলুন?

উ. ১৯০৪-১৯০৫ সালে বঙ্গমাতার এক সোনার সন্তান যুগ-ইমামের আবির্ভাবের সত্যতা উপলব্ধি করে তাঁর দীক্ষা গ্রহণে মনস্ত্বষ্টি লাভ করেন এবং ঐশ্বী নিয়ামতের অংশীদার হন। বাংলার সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটি হলেন, হ্যরত আহমদ কবির নুর মোহাম্মদ (রা.)। তিনি কাদিয়ানে হ্যরত মসিহ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়াত গ্রহণের মাধ্যমে সাহাবির মর্যাদা লাভকারী প্রথম বাঙালি। দ্বিতীয় বাঙালি আহমদী ব্যক্তি হলেন, হ্যরত রাইস উদ্দিন খাঁ (রা.)। তাঁর জন্মভূমি বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়ানী থানার অন্তর্গত নাগেরগাঁও প্রামে। তিনি বার্মায় ডাক বিভাগে কর্মরত অবস্থায় হ্যরত মসিহ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা উপলব্ধি করে ১৯০৬ সালে কাদিয়ান চলে যান এবং হ্যরত আকদাস (আ.)-এর হাতে বয়াত করে সাহাবি হওয়ার বিরল সম্মান লাভ করেন। তৃতীয় বাঙালি আহমদী হলেন, হ্যরত রাইস উদ্দিন খাঁ (রা.)-এর সহধর্মিণী সৈয়দা আজিজাতুল্লেহা সাহেবা। ১৯০৭ সালে স্বপ্নযোগে হ্যরত মসিহ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা নিশ্চিত হয়ে হ্যরত মসিহ মাওউদ (আ.)-এর বরাবরে পত্র মারফত বয়াতের আবেদন করে তিনি প্রথম বাঙালি আহমদী মহিলা হিসেবে অক্ষয় হয়ে আছেন।

১৯১২ সালে ব্রাক্ষণবাড়িয়ার প্রখ্যাত আলেম হ্যরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আবুল ওয়াহেদ (রহ.) ৩জন সফরসঙ্গীসহ কাদিয়ান গমন করে হ্যরত খলিফাতুল মসিহ

আউয়াল (রা.)-এর হাতে বয়াত গ্রহণ করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। তিনি ব্রাক্ষণবাড়িয়ায় ফিরে এসে ২৫ নভেম্বর ১৯১২ তারিখ থেকে বয়াত গ্রহণ শুরু করেন। ১৯১৩ সালে হযরত খলিফাতুল মসিহ আউয়াল (রা.) বিশিষ্ট সাহবি (পরবর্তীতে আমেরিকার মিশনারি) হযরত ড. মুফতি মোহাম্মদ সাদেক (রা.)-কে ব্রাক্ষণবাড়িয়ায় প্রেরণ করেন। তাঁর তাহরিকে ব্রাক্ষণবাড়িয়া শহর ও আশেপাশের গ্রামের আহমদীদের নিয়ে বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম ব্রাক্ষণবাড়িয়া আঞ্চুমানে আহমদীয়া গঠিত হয়। এ নবগঠিত জামাতের প্রেসিডেন্ট হন হযরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রহ.)। তখন মাওলানা সাহেবের পূর্বে যারা আহমদী হয়েছিলেন এবং বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিলেন তারাও এ জামাতের অন্তর্ভুক্ত হন।

১৯১৬ সালে ব্রাক্ষণবাড়িয়ায় বা-কায়দা আমারত প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম বঙ্গীয় প্রাদেশিক আমির নিযুক্ত হন হযরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রহ.)। তিনি প্রথম বাঙালি মোবাল্লেগও ছিলেন বটে।

বঙ্গদেশ ও তৎপরবর্তি পূর্ব পাকিস্তান এবং সর্বপরে স্বাধীন বাংলাদেশে জামাতে আহমদীয়ার আমিরদের (দেশীয় প্রধান) একটি তালিকা নিম্নে তুলে ধরা হল:

ক্র.	নাম	পদবী	সময়কাল
১.	মোহতরম মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রহ.)	প্রেসিডেন্ট	১৯১৩-১৯১৬
২.	মোহতরম মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রহ.)	আমির	১৯১৬-১৯২৬
৩.	মোহতরম প্রফেসর আব্দুল লতিফ	আমির	১৯২৬-১৯৩১
৪.	মোহতরম হেকিম আবু তাহের মাহমুদ আহমদ	আমির	১৯৩১-১৯৩৪
৫.	মোহতরম খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী	আমির	১৯৩৪-১৯৪০
৬.	মোহতরম খান সাহেব মৌলভি মোবারক আলী	আমির	১৯৪০-১৯৪৯
৭.	মোহতরম মৌলভি মোহাম্মদ	আমির	১৯৪৯-১৯৫৫
৮.	মোহতরম ক্যাপ্টেন চৌধুরী খোরশেদ আহমদ বাজওয়া	আমির	১৯৫৫-১৯৫৭
৯.	মোহতরম শেখ মাহমুদুল হাসান	আমির	১৯৫৭-১৯৬২
১০.	মোহতরম মৌলভি মোহাম্মদ	আমির	১৯৬২-১৯৮৭
১১.	মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	আমির	১৯৮৭-১৯৯৫
১২.	মোহতরম আলহাজ্জ আহমদ তোফিক চৌধুরী	আমির	১৯৯৫-১৯৯৭
১৩.	মোহতরম আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী	আমির	১৯৯৭-২০০৩
১৪.	মোহতরম আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান	আমির	২০০৩- বর্তমান

লাজনা ইমাইল্লাহ

প্র. লাজনা ইমাইল্লাহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলুন?
 উ. হ্যরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) ১৫
 ডিসেম্বর ১৯২২ সনে এ সংগঠন কার্যম করেন?
 এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর দাসীদের সংগঠন।
 লাজনা ইমাইল্লাহের সদস্যগণ হ্যরত আম্মাজান
 সৈয়দা নুসরাত জাহাঁ বেগম সাহেবা (রা.)-কে
 সভাপতির আসন অলংকৃত করার জন্য অনুরোধ
 করেন। ফলে এ সংগঠনের সর্বপ্রথম সম্মেলন



লাজনা ইমাইল্লাহের পতাকা

হ্যরত আম্মাজানের মোবারক উপস্থিতি ও সভাপতিত্বে যাত্রা শুরু করে। সম্মেলন চলাকালীন সময়েই হ্যরত আম্মাজান হ্যরত মাহমুদা বেগম সাহেবাকে [হ্যরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর প্রথম স্ত্রী ও হ্যরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.)-এর মা] সভাপতির আসনে বসান আর তিনি এ দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে ১৯২২ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত পালন করেন। এ সময়ে হ্যরত আমাতুল হাই বেগম সাহেবা [হ্যরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর স্ত্রী], হ্যরত সালেহা বেগম সাহেবা [হ্যরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর স্ত্রী], হ্যরত সৈয়দা মরিয়ম সিদ্দীকা সাহেবা [হ্যরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর স্ত্রী] এবং হ্যরত সৈয়দা মরিয়ম সিদ্দীকা সাহেবা জেনারেল সেক্রেটারীর দায়িত্ব অত্যন্ত কর্মদক্ষতার সাথে পালন করেন। ১৯৪০-৪১ সনে হ্যরত মাহমুদা বেগম সাহেবা দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার কারণে ছুটি নিলে হ্যরত সৈয়দা মরিয়ম সিদ্দীকা সাহেবা সদর নির্বাচিত হন এবং হ্যরত সৈয়দা উম্মে মতিন সাহেবা জেনারেল সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৪ সনের মার্চ মাসে হ্যরত সৈয়দা মরিয়ম সিদ্দীকা সাহেবা মৃত্যু বরণ করলে পুনরায় হ্যরত মাহমুদা বেগম সাহেবা সদর নির্বাচিত হন এবং মৃত্যু অবধি তথা ৩১ জুলাই ১৯৫৮ সন পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেন। আগস্ট ১৯৫৮ সন থেকে হ্যরত উম্মে মতিন সাহেবা সভাপতির পদে আম্ভুজ আসীন ছিলেন। উল্লেখ্য, ১৯৮৯ সন হতে খলীফাতুল মসীহ বিশ্ব সদরের পরিবর্তে দেশীয় সদর প্রবর্তন করেন। তাই হ্যরত সৈয়দা উম্মে মতিন সাহেবা ১৯৮৯ সন হতে ১৯৯৭ সন পর্যন্ত পাকিস্তানের সদর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯৯৭ থেকে নভেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত মোহরমা সাহেবেয়াদী আমাতুল কুদুস সাহেবা পাকিস্তানের লাজনা ইমাইল্লাহের সদরের দায়িত্বে আসীন ছিলেন। ২০০৫ সন থেকে বর্তমান অবধি সাহেবেয়াদী আমাতুল আলীম ইসমত সাহেবা পাকিস্তানের লাজনা ইমাইল্লাহ-এর সদরের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। ১৯২৮ সনে নাসেরাতুল আহমদীয়া সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর সার্বিক তদারকি লাজনা ইমাইল্লাহ এর উপর ন্যাস্ত হয়।

বঙ্গদেশে লাজনা ইমাইল্লাহ

অবিভক্ত বাংলায় ত্রিশ কিংবা চাল্লিশ দশকে সর্বপ্রথম লাজনা ইমাইল্লাহ সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে লাজনা ইমাইল্লাহ বাংলাদেশের মোট মজলিস সংখ্যা ১২৭টি। বাংলাদেশে ১৯৪৮ সন থেকে বর্তমান অবধি দায়িত্ব পালনকারী সংগঠন প্রধানদের নাম নিম্নে তুলে ধরা হল:

ক্র.	নাম	পদবী	সময়কাল
১.	মোহতরমা রাশিদা বেগম ফরহাত জাহান (মোহতরম চৌ. মোজাফফর উদ্দিন সাহেবের স্ত্রী)	প্রেসিডেন্ট	১৯৪৮---
২.	মোহতরমা বেগম খলীফা তাকিহউদ্দিন	প্রেসিডেন্ট	
৩.	মোহতরমা হৃকণনেসা বেগম	প্রেসিডেন্ট	
৪.	মোহতরমা আপা আমাতুন নাসির (মোহতরম মির্যা জাফর আহমদ সাহেবের স্ত্রী)	প্রেসিডেন্ট	
৫.	মোহতরমা বেগম মোসলেমা সালাম	প্রেসিডেন্ট	১৯৭১-১৯৭৩
৬.	মোহতরমা মাসুদা সামাদ খান চৌধুরী	প্রেসিডেন্ট	১৯৭৩-১৯৮৮
৭.	মোহতরমা মাসুদা সামাদ খান চৌধুরী	সদর	১৯৮৯-১৯৯৬
৮.	মোহতরমা মাকসুদা রহমান	সদর	১৯৯৭-২০০৮
৯.	মোহতরমা হোসনে আরা তাসাদুক	সদর	২০০৮-২০০৫
১০.	মোহতরমা ইশরাত জাহান	সদর	২০০৫-২০১২
১১.	মোহতরমা রওশন জাহান	সদর	২০১২-২০১৮
১২.	মোহতরমা রেহেনা খায়ের	সদর	২০১৮-বর্তমান

* উপরোক্ত তালিকা মোহতরমা মাকসুদা রহমান সাহেবা হতে সংগৃহিত। যিনি ১৯৭১ সনে লাজনা ইমাইল্লাহ বাংলাদেশের সেক্রেটারী নামেরাত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং পরবর্তীতে সদর নির্বাচিত হন।

মজলিস খোদামুল আহমদীয়া

প্র. খোদামুল আহমদীয়া সংগঠনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলুন?

উ. হ্যারত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর অনুমতিক্রমে ধর্মীয় চেতনায় উড্ডাসিত একদল যুবকের মাধ্যমে ১৯৩৮ সনের ৩১ জানুয়ারি একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। যার নাম হ্যারত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮ সনে ‘মজলিস খোদামুল আহমদীয়া’ রাখেন। এর অর্থ হচ্ছে আহমদী সেবকদের সংগঠন।

১৫ থেকে ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত অধিকারী যুবকগণ এই মজলিসের সদস্য হয়ে থাকেন। মোহতরম শেখ মাহবুব আলম খালিদ এম.এ. এ সংগঠনের প্রথম আহ্বায়ক ছিলেন।

কিছুদিন পরই এক বছরের জন্য সর্বপ্রথম সদরঞ্জপে হ্যুর (রা.) মোকাররম মাওলানা কর্মরউদ্দিন সাহেবকে অনুমোদন দান করেন। ১৯৩৮*(১৩১৭ ই. শা) সনে হ্যুর (রা.) মজলিস আতফালুল আহমদীয়া কায়েম করেন এবং এর সার্বিক তদারকি খোদামুল আহমদীয়ার ওপর ন্যস্ত করেন। একজন মোহতামীম আতফাল কর্তৃক এ মজলিসের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

* (ইতোপূর্বে প্রচলিত ভুল ধারনা হিসেবে আমাদের জানা ছিল আতফালুল আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠা সাল ১৯৪০। সংশোধিত ১৯৩৮ সালের তথ্যসূত্র: www.alislam.org/majlis-atfal-ul-ahmadiyya/usa; www.atfal.org.uk; website: Majlis Khuddamul Ahmadiyya Bharat/khuddam.in/atfal.)

মজলিস খোদামুল আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ১৯৮৯-৯০ পর্যন্ত সদর হিসেবে দায়িত্বপালনকারী বিশ্ব সদরদের নাম ও সময়কাল নিম্নে তুলে ধরা হল :

- ১) মোকাররম মাওলানা কর্ম উদ্দিন সাহেব: [১৯৩৮-১৯৩৯]।
- ২) হ্যরত সাহেবেয়াদা মির্যা নাসের আহমদ সাহেব (রাহে.): [১৯৩৯-৪০ থেকে ৩১ অক্টোবর ১৯৪৯]।
- ৩) সৈয়দনা হ্যরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.): [৩১ অক্টোবর ১৯৪৯-১৯৫৯-৬০] (এই সময় হ্যরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) ৩১ অক্টোবর ১৯৪৯-১৯৫৪ পর্যন্ত এবং মোকাররম মির্যা মনোয়ার আহমদ সাহেব ১৯৫৪-৫৫ থেকে ১৯৫৯-৬০ সন পর্যন্ত নায়েব সদর-১ রূপে দায়িত্ব পালন করেন)।
- ৪) মোকাররম সৈয়দ মীর দাউদ আহমদ সাহেব: [১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৬১-১৯৬২]।
- ৫) মোকাররম সাহেবেয়াদা মির্যা রফি আহমদ সাহেব: [১৯৬২-৬৩ থেকে ১৯৬৫-৬৬]।
- ৬) হ্যরত সাহেবেয়াদা মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.): [১৯৬৬-৬৭ থেকে ১৯৬৮-৬৯]।
- ৭) মোকাররম চৌধুরী হামিদ উল্লাহ সাহেব: [১৯৬৯-৭০ থেকে ১৯৭২-৭৩]।
- ৮) মোকাররম আতাউল মুজীব রাশেদ সাহেব: [১৯৭৩-৭৪ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫] (তিনি সদরঞ্জপে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় ইসলাম প্রচারের জন্য এ সময় জাপান গমন করেন)।
- ৯) মোকাররম সাহেবেয়াদা মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব: [ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৮-৭৯]।
- ১০) মোকাররম মাহমুদ আহমদ, শাহেদ, বাঙালি: [১৯৭৯-৮০ থেকে ১৯৮৮-১৯৮৯ পর্যন্ত]।

এরপর হ্যুর খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) কেন্দ্রীয় বিশ্ব সদর পদ বিলুপ্ত করে প্রত্যেক দেশে ‘দেশীয় সদর’ পদ কায়েম করেন। উল্লেখ্য সর্বশেষ বিশ্ব সদর মোহতরম মাহমুদ আহমদ বাঙালি সাহেব বাংলাদেশেরই কৃতী সন্তান।

তিনি দীর্ঘদিন অস্ট্রেলিয়ায় ন্যাশনাল আমীর ও মিশনারী ইনচার্জরূপে দায়িত্ব পালন করে গত ২৩ এপ্রিল ২০১৪ সনে ইন্টেকাল করেন।

বঙ্গদেশে মজলিস খোদামুল আহমদীয়া

অবিভক্ত বাংলায় ১৯৩৮ সনের ১৫ এপ্রিল মজলিস খোদামুল আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে খোদামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের স্থানীয় মজলিস ১০৯টি, জেলা মজলিস ১৭টি ও রিজিওনাল মজলিস ৬টি।

বঙ্গদেশের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে বর্তমান অবধি দায়িত্ব পালনকারী সংগঠন প্রধানদের নাম নিম্নে তুলে ধরা হল:

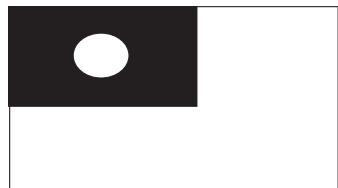
ক্রম.	নাম	পদবী	সময়কাল
১	মোহতরম সৈয়দ সাইদ আহমদ	প্রথম প্রেসিডেন্ট	১৯৩৮-১৯৪০
২	মোহতরম ইসহাক লক্ষ্মণ	প্রথম কায়েদ	১৯৪০*
৩	মোহতরম ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী	১ম রিজিওনাল কায়েদ	১৯৫৫-১৯৫৮
৪	মোহতরম শাহ মুহাম্মদ সোলায়মান	রিজিওনাল কায়েদ	১৯৫৮-১৯৬১
৫	মোহতরম আহমদ তোফিক চৌধুরী	রিজিওনাল কায়েদ	১৯৬১-১৯৬৪
৬	মোহতরম অধ্যক্ষ মোসলেহ উদ্দিন খাদেম	রিজিওনাল কায়েদ-২	১৯৬৭-১৯৭২
৭	মোহতরম অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল খালেদ	রিজিওনাল কায়েদ-১	১৯৬৭-১৯৭২
৮	মোহতরম মুহাম্মদ খলিলুর রহমান	প্রথম নায়েব সদর	১৯৭২-১৯৮০
৯	মোহতরম মুহাম্মদ খলিলুর রহমান	নায়েব সদর-১	১৯৮০-১৯৮১
১০	মোহতরম মুহাম্মদ হাবীবউল্লাহ	নায়েব সদর-২	১৯৮০-১৯৮১
১১	মোহতরম মুহাম্মদ হাবীবউল্লাহ	প্রথম ন্যাশনাল কায়েদ	১৯৮১-১৯৮৬
১২	মোহতরম মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	ন্যাশনাল কায়েদ	১৯৮৬-১৯৮৯
১৩	মোহতরম মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	প্রথম দেশীয় সদর	১৯৮৯-১৯৯৩
১৪	মোহতরম কে. এম. মাহমুদুল হাসান	সদর	১৯৯৩-১৯৯৫
১৫	মোহতরম ডা. মুহাম্মদ সেলিম খান	সদর	১৯৯৫-২০০০
১৬	মোহতরম মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ	সদর	২০০০-২০০১
১৭	মোহতরম মাহবুবুর রহমান	সদর	২০০১-২০০৭
১৮	মোহতরম আবু নঙ্গে আল মাহমুদ	সদর	২০০৭-২০১১
১৯	মোহতরম মুহাম্মদ আব্দুল মোমেন	সদর	২০১১-২০১৫
২০	মোহতরম মাহমুদ আহমদ বিপ্লব	সদর	২০১৫-২০১৭
২১	মোহতরম মুনাদিল ফাহাদ	সদর	২০১৭-বর্তমান

* ১৯৪০-১৯৫৫ সন পর্যন্ত এ দেশের মজলিস কেন্দ্রীয় মজলিস খোদামুল আহমদীয়ার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

মজলিস আনসারঞ্জাহ্

প্র. মজলিস আনসারঞ্জাহ্ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
লিখুন?

উ. সৈয়দনা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী
(রা.) ২৬ জুলাই ১৯৪০ সনে ৪০ বছর থেকে
তদুর্ধ বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য ‘মজলিস
আনসারঞ্জাহ্’ সংগঠন কার্যে করেন। এর অর্থ
হচ্ছে আল্লাহর সাহায্যকারীদের সংগঠন।



আনসারঞ্জাহ্ পতাকা

হযরত মাওলানা শের আলী (রা.) এ সংগঠনের প্রথম সদর ছিলেন। ১৯৪০ সন থেকে
১৯৮৯-৯০ পর্যন্ত মজলিস আনসারঞ্জাহ্ বিশ্ব সদর হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী সংগঠন
প্রধানদের নাম ও সময়কাল নিম্নে উল্লেখ করা হল:

- ১) হযরত মাওলানা শের আলী সাহেব (রা.): [১৯৪০-১৯৪৭]।
 - ২) হযরত চৌধুরী ফতেহ মুহাম্মদ সাইয়াল সাহেব (রা.): [১৯৪৭- নভেম্বর ১৯৫০]।
 - ৩) হযরত সাহেবযাদা মির্যা আযিয আহমদ সাহেব: [নভেম্বর ১৯৫০-১৯৫৪]।
 - ৪) হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.): [১৯৫৪ - ১৯৫৮]।
(এ সময় হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) নায়েব সদররূপে দায়িত্ব পালন করেন)
 - ৫) হযরত মির্যা নাসের আহমদ সাহেব (রাহে.): [১৯৫৯-১৯৬৮]।
 - ৬) মোকাররম সাহেবযাদা মির্যা মোবারক আহমদ সাহেব: [১৯৬৮-১৯৭৮]।
 - ৭) হযরত সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.): [১৯৭৯-১৯৮২]।
 - ৮) মোকাররম চৌধুরী হামিদ উল্লাহ সাহেব: [জুন ১৯৮২-১৯৮৯]।
- ১৯৮৯-৯০ ইং সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) বিশ্ব সদর পদ বিলুপ্ত করে
প্রত্যেক দেশে ‘দেশীয় সদর’ পদ সৃষ্টি করেন।

বঙ্গদেশে মজলিস আনসারঞ্জাহ্

এ যাবত প্রাণ্ত তথ্যানুযায়ী মজলিস আনসারঞ্জাহ্ বাংলাদেশ ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
সে মোতাবেক তখন থেকে বর্তমান অবধি দায়িত্ব পালনকারী সংগঠন প্রধানদের নাম
নিম্নে তুলে ধরা হল:

ক্র.	নাম	পদবী	সময়কাল
১	মোহতরম শামসুর রহমান, বার. এট 'ল	নায়েমে আলা	১৯৬৭-১৯৬৯
২	মোহতরম মকবুল আহমদ খান	নায়েমে আলা	১৯৬৯-১৯৭১
৩	মোহতরম এ.টি.এম. হক সাহেব	নায়েমে আলা	১৯৭১-১৯৭৩
৪	মোহতরম আলী কাশেম খান চৌধুরী	নায়েমে আলা	১৯৭৪-১৯৭৭

৫	মোহতরম ওবায়দুর রহমান ভুঁইয়া	নায়েমে আলা	১৯৭৭-১৯৮১
৬	মোহতরম মৌলভী মোহাম্মদ	নায়েমে আলা	১৯৮১-১৯৮২
৭	মোহতরম ওবায়দুর রহমান ভুঁইয়া	নায়েমে আলা	১৯৮২-
৮	মোহতরম ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী	নায়েমে আলা	১৯৮২-১৯৮৯
৯	মোহতরম ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী	১ম দেশীয় সদর	১৯৮৯-১৯৯৩
১০	মোহতরম নজির আহমদ ভুঁইয়া	সদর	১৯৯৩-১৯৯৭
১১	মোহতরম তাসান্দক হোসেন	সদর	১৯৯৮-২০০১
১২	মোহতরম মোবাশশের উর রহমান	সদর	২০০১-২০০৩
১৩	মোহতরম আলহাজ আহমদ তবশীর চৌধুরী	সদর	২০০৩-২০০৯
১৪	মোহতরম মুহাম্মদ হাবীবউল্লাহ	সদর	২০০৯-২০১৫
১৫	মোহতরম আলহাজ আহমদ তবশীর চৌধুরী	সদর	২০১৫-বর্তমান

তথ্যসূত্র:

- ১) আহমদীয়াতের ইতিহাসে বাংলার স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব, লেখক: জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল।
- ২) দীনি মাল্যমাত, মজলিস খোদামুল আহমদীয়া, পাকিস্তান।
- ৩) বাংলাদেশে আহমদীয়াত-১, লেখক : আলহাজ আহমদ তোফিক চৌধুরী।

দশম পরিচ্ছেদ

তুলনামূলক ধর্মীয় শিক্ষা

প্র. ইহুদী ধর্মের প্রবর্তক কে?

উ. হ্যারত মূসা (আ.)। তিনি বনী ইসরাইলদের বিখ্যাত নবী ছিলেন। হ্যারত ইবরাহীম (আ.)-এর ৫০০ বছর পরে এবং হ্যারত ঈসা (আ.)-এর ১৪০০ বছর পূর্বে তিনি আবির্ভূত হন।

প্র. হ্যারত মূসা (আ.) কোথায় আল্লাহ্ তাঁ'লার প্রত্যাদেশ পান?

উ. মিশরের 'সিনাই' পর্বতে।

প্র. 'সাব্বাত' কি?

উ. ইহুদীদের কাছে সঙ্গাহের গুরুত্বপূর্ণ দিন হলো শনিবার। শনিবারকে 'সাব্বাত' বলা হয়। 'সাব্বাত' অর্থ বিরতি বা বিশ্রাম।

প্র. ইহুদীদের জন্য হ্যারত মূসা (আ.) কী আসমানী কিতাব পেয়েছিলেন?

উ. ইহুদীদের জন্যে হ্যারত মূসা (আ.) তওরাত কিতাব পেয়েছিলেন। তওরাত অর্থ শিক্ষা।

প্র. ইহুদী ধর্মের প্রবর্তক হ্যারত মূসা (আ.)-এর হাদীস গ্রন্থের নাম কী?

উ. তালমুদ।

প্র. হ্যারত মূসা (আ.)-এর জন্মের সময় কে মিশরের শাসনকর্তা ছিলেন?

উ. ফেরাউন দ্বিতীয় রামেসিস।

প্র. ফেরাউন সম্বন্ধে কি জানেন?

উ. নীল নদীর উপত্যকা ও আলেকজান্দ্রিয়ার তৎকালীন স্মাটদের 'ফেরাউন' বলা হতো।

প্র. হ্যারত মূসা (আ.) কোন ফেরাউনের সময়ে মিশর থেকে হিজরত করেছিলেন?

উ. দ্বিতীয় মেরেনেপতাহ ফেরাউন-এর শাসনামলে হ্যারত মূসা (আ.) বনী ইসরাইলকে নিয়ে মিশর থেকে কেনানের উদ্দেশ্যে হিজরত করেন।

প্র. যখন হ্যারত মূসা (আ.) ও তাঁর অনুসারীরা একত্রে মিশর হতে হিজরত করেছিলেন, তখন ফেরাউন মেরেনেপতাহ যে হ্যারত মূসা (আ.)-এর পিছু-পিছু যাচ্ছিল, তার কী পরিণতি ঘটেছিল?

উ. হ্যারত মূসা (আ.) ও তাঁর অনুসারীরা যখন কেনানের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁদের পিছনে ধাবমান ফেরাউন সঙ্গী-সাথীসহ লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হয়েছিল। ফেরাউন নিজে সাগরে ডুবে মরেনি, বরং আল্লাহ্ তাঁ'লার ইচ্ছান্যায়ী সে পরে মৃত্যুর শিকারে পরিণত হয়।

প্র. বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক কে? তিনি কখন, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ. হযরত সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধ (আ.)। তিনি ৫৬৩ খ্রিষ্টপূর্বে ভারত-নেপাল সীমান্তবর্তী কপিলাবস্তু নগরের লুম্বিনী নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৪৮৩ খ্রিষ্টপূর্বে মারা যান।

প্র. বৌদ্ধ ধর্মের ধর্মগ্রন্থের নাম কি?

উ. ত্রিপিটক। এর অর্থ হল তিনটি ঝুড়ি। অর্থাৎ, এ পবিত্র গ্রন্থটি তিনটি গ্রন্থ— যথা বিনয় পিটক, সুভাষিতক এবং অভিধম্য পিটক-এর সমন্বয়ে গঠিত।

প্র. বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান দু'টি ফের্কার নাম কি?

উ. হৈনুযান ও মহাযান।

প্র. হযরত সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধ (আ.) কি আল্লাহ, রহ, ফেরেশতা, কিয়ামত এবং পুনরুত্থান সম্বন্ধে বিশ্বাসী ছিলেন?

উ. হ্যাঁ, হযরত সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধ (আ.) আল্লাহ, রহ, ফেরেশতা, কিয়ামত এবং পুনরুত্থান এর ওপর বিশ্বাসী ছিলেন।

প্র. যীশু খ্রিস্টের [হযরত ঈসা (আ.)] অনুসারীদের কী বলা হয়?

উ. খ্রিস্টান বলা হয়।

প্র. তাদেরকে খ্রিস্টান নাম কে দিয়েছিল?

উ. যীশুখ্রিস্ট মারা যাবার বছদিন পর তারা নিজেদের জন্য খ্রিস্টান নাম পছন্দ করে।

প্র. যীশু কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ. দু' হাজার বছর পূর্বে ফিলিস্তিনের নায়ারাথ হতে সন্তুর মাইল দূরে বেথেলহেমে জন্মগ্রহণ করেন।

প্র. যীশুর পিতা সম্বন্ধে কি জানেন?

উ. যীশুর কোন পিতা ছিল না। তিনি বিনা পিতায় আল্লাহর কুদরতে জন্মগ্রহণ করেন।

প্র. বিনা পিতায় কোন শিশুর জন্ম নেয়া কি সম্ভব?

উ. হ্যাঁ, বাইবেলে এ ধরনের ঘটনার বর্ণনা আছে। তাছাড়া বিনা পিতায় কিছু শিশুর জন্ম সম্ভব হয়েছে এ রকম প্রমাণ চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ক সাময়িকীতে দেখা যায়, যদিও এটি খুবই দুর্লভ ঘটনা।

প্র. যীশু কি খোদার পুত্র ছিলেন?

উ. মুসলিমানরা বিশ্বাস করে যীশু আল্লাহর নবী ছিলেন, আল্লাহর পুত্র ছিলেন না। আল্লাহর কোন পুত্র বা কন্যার প্রয়োজন নেই।

প্র. বাইবেলে কি কেবল যীশুর জন্যই ‘খোদার পুত্র’ কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে?

উ. ‘খোদার পুত্র’ কথাটি বাইবেলে শুধুমাত্র যীশুর জন্য ব্যবহৃত হয়নি বরং অন্যান্যদের জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে। আসলে এটি রূপকার্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্র. বাইবেল থেকে একটি দ্রষ্টান্ত দিন যেখানে যীশু ছাড়া অন্য কারও জন্য ‘খোদার পুত্র’

কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

উ. ‘ইন্সায়েল আমার পুত্র, আমার প্রথম জাত।’ (যাত্রাপুস্তক, ৪ : ২২)।

ট. যীশুর জন্ম তারিখ সম্বন্ধে কুরআন মজীদে কী বর্ণিত হয়েছে?

উ. যীশুর জন্ম সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে কোন সুনির্দিষ্ট তারিখ বর্ণিত হয়নি। কিন্তু বলা হয়েছে, যীশু যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন তখন জুড়েই নগরীতে খেজুর গাছে তাজা খেজুর পাওয়া যাচ্ছিল। এটা নির্দেশ করে যে, যীশু আগস্ট অথবা সেপ্টেম্বরে কোন এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং ২৫ ডিসেম্বর যীশুর জন্মদিন নয়। যদিও সে দিনটি সারা পৃথিবীতে তাঁর জন্ম দিবস হিসেবে উদযাপিত হচ্ছে।

প্র. যীশু কি নতুন শরীয়ত এনেছিলেন?

উ. না, তিনি কোন নতুন শরীয়ত আনেননি। তিনি মূসায়ী শরীয়ত অনুসরণ করেছিলেন। যেমন তিনি বলেছেন, ‘মনে করো না যে, আমি ব্যবস্থাকে লোপ করতে এসেছি; আমি লোপ করতে আসিনি, বরং পূর্ণ করতে এসেছি।’ (মাথি, ৫ : ১৭)

প্র. বেদ সম্বন্ধে কি জানেন?

উ. বেদ হিন্দুদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ। বেদের চারটি ভাগ, এ ভাগগুলোর নাম হল (১) ঋগ বেদ, (২) যজু বেদ, (৩) সাম বেদ, (৪) অথর্ব বেদ। এক সময়ে বেদ যখন বিশুদ্ধ অবস্থায় ছিল তখন তাতে হিন্দুদের জন্য ঐশ্বী নির্দেশনা ছিল কিন্তু পরবর্তীতে বেদে এত প্রক্ষেপণ বা পরিবর্তন হয়েছে যে, এখন সেগুলোর বৈধতা সন্দেহযুক্ত হয়ে গেছে।

প্র. কৃষ্ণ সম্বন্ধে কি জানেন?

উ. তিনি হিন্দুদের একজন মহান অবতার বা নবী ছিলেন।

প্র. কে এ মর্মে ইলহাম পেয়েছিলেন, “হে কৃষ্ণ রন্দ্র গোপাল! তোমার মহিমা গীতায় লিপিবদ্ধ আছে”?

উ. প্রতিশ্রূত মসীহ হ্যরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) উর্দুতে এ ইলহাম পেয়েছিলেন। যেমন তিনি দাবি করেছেন, তিনি হিন্দুদের জন্য কৃষ্ণের মত একজন অবতার, মুসলমানদের জন্য প্রতিশ্রূতি মাহদী ও খিস্টানদের জন্য প্রতিশ্রূত মসীহ।

প্র. মসীহ মাওউদ (আ.)-এর কয়েকটি বইয়ের নাম লিখুন যেগুলোতে তিনি বিশেষভাবে হিন্দুদের সম্বোধন করেছেন।

উ. ১) সুরমা চশমায়ে আরিয়া (উর্দু)

২) আরিয়া ধরম (উর্দু)

৩) শাহানায়ে হক (উর্দু)

প্র. ‘গ্রন্থ সাহেব’ সম্বন্ধে কি জানেন?

উ. গ্রন্থ সাহেব শিখদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ। এটি গুরু নানকের বাণী ও বক্তৃতার সংকলন। এতে ইসলামের মৌলিক কর্তব্যসমূহ, যেমন: দৈনিক পাঁচ গোয়াত্ত নামায, রোয়া, যাকাত এবং মক্কা গিয়ে হজ্জ পালন করার জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে। যারা এ দায়িত্বসমূহ পালন

করতে ব্যর্থ হবে তাদের জন্য রয়েছে গুরু নানকের কঠোর তিরঙ্কার।

প্র. ‘চোলা’ সম্বন্ধে কি জানেন?

উ. ‘চোলা’ হল গুরুনানকের পবিত্র পোশাক। শিখেরা চোলাকে তাদের গুরুর পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে গণ্য করে। এ পোশাকে পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত এবং ইসলামী কলেমা লিখিত আছে।

প্র. চোলাতে কী লিখিত ছিল তা দেখার জন্য হয়রত আহমদ (আ.) কতজন প্রতিনিধি পাঠ্যেছিলেন?

উ. হয়রত আহমদ (আ.) চারজনকে পাঠ্যেছিলেন। তাঁরা হলেন (১) হয়রত মির্যা ইয়াকুব বেগ, (২) হয়রত মুসী তাজউদ্দীন, (৩) হয়রত খাজা কামাল উদ্দীন এবং (৪) হয়রত মিএঞ্জা আবুর রহমান।

প্র. এ প্রতিনিধিরা কী বিবরণ দিয়েছিলেন?

উ. তাঁরা হয়রত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর নিকট বিবরণ দিয়েছেন যে, চোলায় কুরআনের ক্ষুদ্রতম সূরা ইখলাস, আয়াতুল কুরসী এবং সূরা আল ইমরানের ২০ নং আয়াত ও কলেমা লিখিত আছে।

প্র. হয়রত আহমদ (আ.) কখন নিজে স্বয়ং চোলাটি দেখতে গিয়েছিলেন?

উ. ডেরা বাবা নানক নামক স্থানে হয়রত আহমদ (আ.) নিজে স্বয়ং ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫ তারিখে চোলা দেখতে গিয়েছিলেন।

প্র. হিন্দুরা গুরু নানকের বিরুদ্ধে যে আপত্তি উত্থাপন করেছিল তা খণ্ডন করতে গিয়ে হয়রত মসীহ মাওউদ (আ.) কোন বই লিখেছিলেন?

উ. ‘সৎ বচন’ নামক বই লিখেছিলেন।

প্র. কেমন করে প্রমাণ করবেন যে, গুরু নানক একজন মুসলমান সাধক ছিলেন?

উ. শিখ ধর্ম গ্রন্থ হতে আমরা জানতে পারি বাবা নানক একদল মুসলিম সাধকদের সাথে সর্বদা থাকতেন এবং বিভিন্ন জায়গায় চিল্লায় (মুসলমানদের আধ্যাত্মিক শোধনপ্রণালী) গিয়েছিলেন। তিনি মুসলমানদের জামা'তে নামাযে যোগদান করতেন। এছাড়া তিনি মকায় গিয়ে হজ্জ করেছিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে আহমদীয়াত

প. বাংলার মনস্তি সংক্রান্ত ভবিষ্যত্বাণীটি এবং এ ইলহাম অবতীর্ণ হবার তারিখ বলুন?
উ. হ্যারত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬ সনে এবং
জুলাই ১৯০৬ সনে এ ইলহাম অবতীর্ণ হয়-

”পৃথিবীর কোন জাতি কোন জাতির জন্ম হবে এবং এই জন্মের জন্ম হবে।“

(প্রাচীন বাঙালি কি নিসবত জো কুছ হকুম জারী কিয়া গিয়া থা আব উনকি দিলজুয়ি
হোগি)

অর্থ: ইতোপূর্বে বাংলা সম্বন্ধে যে আদেশ জারী করা হয়েছিল এখন তাদের মনস্তি করা
হবে।

প. কোন দুইজন বাঙালি হ্যারত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র হাতে বয়াত
করার মাধ্যমে সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন?

উ. (১) প্রথম বাঙালি আহমদী হলেন চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানা নিবাসী হ্যারত
আহমদ কবীর নূর মুহাম্মদ (রা.), (২) বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী থানার
অন্তর্গত নাগেরগাঁও গ্রামের হ্যারত রইস উদ্দিন খান (রা.)।

প. প্রথম বাঙালি মহিলা আহমদীর নাম কি?

উ. হ্যারত সৈয়দা আজিজাতুন নেসা সাহেবা। স্বামী: হ্যারত রইস উদ্দিন খান (রা.)। এ
পুণ্যাত্মা মহিলা ১৯০৭ সনে পত্রের মাধ্যমে হ্যারত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর হাতে
বয়াত নেন।

প. বাংলাদেশে আহমদীয়াতের বার্তা কিভাবে সর্বপ্রথম এসেছে?

উ. লাহোর থেকে কবিরাজ হ্যারত হেকিম মুহাম্মদ কুরাইশী সাহেব (রা.) ‘মুফাররাহে
আস্মারী’ নামক এক কোটা ঔষধ পার্সেল করে ব্রাক্ষণবাড়িয়ার তৎকালীন প্রখ্যাত উকিল
মুসি দৌলত আহমদ খান সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন। হাকিম সাহেব সে ঔষধের
কোটার ভিতরে হ্যারত ইমাম মাহদী (আ.) আর্বিভূত হওয়া সম্পর্কে কয়েকটি উদ্দু
বিজ্ঞাপন পাঠান। আর এভাবে বাংলাদেশে আহমদীয়াতের বার্তা প্রবেশ করে।

প. “আপনার লেখার মধ্যে সাধুতা ও সৌভাগ্যের সুগন্ধ অনুভব করছি”- এ উক্তিটি
হ্যারত মসীহ মাওউদ (আ.) কোন বাঙালি বুর্যুর্গকে সম্মোধন করে লিখেছিলেন?

উ. হ্যারত মাওলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবকে।

প. হ্যারত মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব সম্পর্কে কী জানেন?

উ. ব্রাক্ষণবাড়িয়া নিবাসী পরম শ্রদ্ধেয় এ বুর্যুর্গ ১৯০২ সনে আহমদীয়াতের সংবাদ পান

এবং দীর্ঘদিন যাবৎ হয়েরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সাথে পত্রালাপ অব্যাহত রাখেন। অবশেষে তিনি ১৯১২ সনে ভারতবর্ষের প্রথ্যাত আলেমদের সাথে সাক্ষাৎ, কথোপকথন এবং দীর্ঘ সফর করার পর কাদিয়ানে এসে হয়েরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)-এর পরিত্র হাতে বয়াত করার মাধ্যমে আহমদীয়াতের ছায়াতলে আশ্রয় নেন।

প্র. আঙ্গুমানে আহমদীয়ার যাত্রা বাংলাদেশে কখন থেকে শুরু হয় এবং কত সালে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়?

উ. হয়েরত মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব ১৯১২ সনে কাদিয়ান থেকে দেশে ফিরে এসে ২৫ নভেম্বর ১৯১২ সনে সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিক বয়াত নেয়া শুরু করেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে অবিভক্ত বাংলার প্রথম আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। মাওলানা সাহেব জামা'তের প্রথম প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে ১৯১৬ সনে বঙ্গীয় আঙ্গুমানে আহমদীয়ার এমারত প্রতিষ্ঠিত হয়। মাওলানা সাহেব এমারত প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও আঙ্গুমানের প্রথম আমীর নিযুক্ত হন।

প্র. বাংলাদেশের প্রথম আহমদীয়া মসজিদের নাম কি? এটি কোথায় অবস্থিত?

উ. 'মসজিদুল মাহদী'। এটি ব্রাক্ষণবাড়িয়া শহরের মৌলভীপাড়ায় অবস্থিত।

প্র. অবিভক্ত বাংলায় সর্বপ্রথম সালানা জলসা কত সনে অনুষ্ঠিত হয়?

উ. ১৯১৭ সনের অক্টোবর মাসে (বাংলা আশ্বিন মাসে) ব্রাক্ষণবাড়িয়ায় সর্বপ্রথম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

প্র. বাংলার মাটিতে হয়েরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর যে সকল পুণ্যবান সাহাবীর পদধূলি পড়েছে তাদের মধ্যে থেকে পাঁচজনের নাম বলুন?

- উ. ১) হয়েরত ডা. মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.)।
- ২) হয়েরত মাওলানা চৌধুরী ফতেহ মুহাম্মদ সাইয়াল (রা.)।
- ৩) হয়েরত মাওলানা সৈয়দ সারওয়ার শাহ সাহেব (রা.)।
- ৪) হয়েরত মাওলানা গোলাম রসূল রাজেকী (রা.)।
- ৫) হয়েরত মাওলানা হাফেয় রওশন আলী (রা.)।

প্র. অবিভক্ত বাংলার প্রথম এমারতকালে কতজন লোক বয়াত করেন এবং কতটি জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়?

উ. ১৯১২-১৯২৩ সন পর্যন্ত যে সকল ব্যক্তি হয়েরত মাওলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের হাতে বয়াত করে জামা'তে আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন সে রেজিস্টার অনুযায়ী বয়াতগ্রহণকারীর সংখ্যা হল ১০১৬ জন এবং এ সময়ে ২৬টি জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্র. বাংলার প্রাচীনতম পত্রিকা "আহমদী" কখন থেকে প্রকাশিত হওয়া শুরু হয়?

উ. ১৯২২ সনের জানুয়ারি মাসে 'আহমদীয়া বুলেটিন' নামে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এ পত্রিকা মাসিক এবং তারপর মাসিক থেকে আলহামদুলিল্লাহ্ আজ পর্যন্ত

পাক্ষিকরূপে প্রকাশিত হয়ে আসছে। এ পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন মোহতরম গোলাম সামদানী খাদেম সাহেব।

প্র. বাংলায় সর্বপ্রথম আহমদী মিল্লারা কখন ঈদের নামায আদায় করেন?

উ. ১৯২২ সনে ঈদ-উল-আয়হার নামায আদায় করেন।

প্র. কোন বাংলাদেশি আহমদী জার্মানীর প্রথম মোবাল্লেগ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন?

উ. বগুড়া জেলা নিবাসী মোহতরম খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী। তিনি ১৯০৯ সনে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)-এর পবিত্র হাতে বয়াত করেন। পরবর্তীতে তিনি ইসলামের সেবার জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করেন এবং জার্মানীর প্রথম মোবাল্লেগ হবার সৌভাগ্যের অধিকারী হন। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঙ্গুমানে আমদায়ার পথের এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম আমীর হন।

প্র. ১৯২২ সনে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) কর্তৃক কুরআন শরীফের দরসের পরীক্ষায় কোন বাঙালি দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন?

উ. প্রফেসর মোহতরম আবুল লতীফ খান সাহেব। তিনি বাংলার দ্বিতীয় আমীর ছিলেন।

প্র. কাদিয়ানে ‘মিনারাতুল মসীহ’ নির্মাণে ১০০ বা ততোধিক টাকা চাঁদা প্রদানকারীর ২৯৮ জন সৌভাগ্যশালীদের মধ্যে একমাত্র বাঙালি কে ছিলেন?

উ. প্রফেসর মোহতরম আবুল লতীফ খান সাহেব।

প্র. হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর যে সকল পবিত্র বংশধর বাংলাদেশে আগমন করেছিলেন তাদের কয়েকজনের নাম লিখুন?

উ. ১) হ্যরত সাহেবেয়াদা মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব (রা.)

২) হ্যরত সাহেবেয়াদা মির্যা জাফর আহমদ সাহেব

৩) হ্যরত সাহেবেয়াদা মির্যা মোবারক আহমদ সাহেব

৪) হ্যরত সাহেবেয়াদা মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) এবং,

৫) হ্যরত সাহেবেয়াদা মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) খিলাফতে আসীন হবার পূর্বে বাংলাদেশে আগমন করেছিলেন।

প্র. মজলিস খোদামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? মজলিসের প্রথম প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন?

উ. ১৯৩৮ সনের ১৫ এপ্রিল বাদ জুমু'আ মাওলানা জিল্লুর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে ব্রাক্ষণবাড়িয়া জামাতের ০৮ জন সদস্য নিয়ে মজলিস খোদামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। মজলিসের প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন মোহতরম সৈয়দ সাঈদ আহমদ সাহেব।

প্র. মজলিস খোদামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ইজতেমা কত সনে অনুষ্ঠিত হয়?

উ. ১৯৬২ সনের ০৫ নভেম্বর ব্রাক্ষণবাড়িয়ার লোকনাথ ট্যাংকের পাড়ে। এ ইজতেমায়

তৎকালীন বিশ্ব সদর মজিলিস খোদামুল আহমদীয়া সাহেবেয়াদা মির্যা রফি আহমদ সাহেবে
যোগদান করেন।

প্র. মজিলিস খোদামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের প্রথম কেন্দ্রীয় সম্মেলন কখন, কোথায়
অনুষ্ঠিত হয়?

উ. ১৪ মে ১৯৭২ সনে দারুত তবলীগ মসজিদ কমপ্লেক্স, ঢাকায়।

প্র. বাংলাদেশের যে সকল কৃতী সত্তান বহির্বিশ্বে ইসলামের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ
করেছেন তাদের কয়েকজনের নাম লিখুন?

উ. ১) মোহতরম সুফি মতিউর রহমান বাঙালি সাহেব।

২) মোহতরম আব্দুর রহমান খান বাঙালি সাহেব।

৩) মোহতরম খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী সাহেব।

৪) মোহতরম মাওলানা আনিসুর রহমান সাহেব।

৫) মোহতরম মাওলানা মাহমুদ আহমদ বাঙালি। বর্তমানে তিনি অস্ট্রেলিয়া জামাতের
ন্যাশনাল আমীর ও মিশনারী ইনচার্জরপে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

৬) মোহতরম মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব। বর্তমানে তিনি লন্ডনে কেন্দ্রীয় বাংলা
ডেক্ষ দণ্ডরের ইনচার্জরপে দায়িত্ব পালন করছেন।

৭) মোহতরম মৌলভী আহমদ তারেক মুবাশ্রের সাহেব। বর্তমানে তিনি লন্ডনে কেন্দ্রীয়
বাংলা ডেক্ষ দণ্ডরের দায়িত্ব পালন করছেন।

প্র. বাংলাদেশে সর্বপ্রথম আহমদীয়াতের জন্য শাহাদাতবরণকারীদের নাম কী? তারা
কোন-কোন সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন?

উ. ১৯৬৩ সনের তোরা নভেম্বর ব্রাক্ষণবাড়িয়াতে আহমদীয়া জামা'তের বার্ষিক জলসায়
উগ্রপঙ্খী মোল্লাদের অতর্কিত আক্রমণে মোকাররম ওসমান গণী সাহেব এবং মোকাররম
আব্দুর রহিম সাহেবে মারাত্কভাবে আহত হন এবং পরদিন ৪ঠা নভেম্বর সর্বপ্রথম
মোহতরম ওসমান গণী সাহেব শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। তিনি বাংলাদেশের
এবং মজিলিস খোদামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের প্রথম শহীদ। তারপর মোহতরম
আব্দুর রহিম সাহেব শাহাদাত বরণ করেন। তিনি মজিলিস আনসারগ্লাহ, বাংলাদেশের
প্রথম শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।

প্র. ব্রাক্ষণবাড়িয়ায় আহমদীয়া মসজিদ মোল্লারা কবে জোরপূর্বক দখল করে নেয়?

উ. ১৯৮৭ সনের ২৭ এপ্রিল।

প্র. মজিলিস খোদামুল আহমদীয়া কোন বছর গোল্ডেন জুবিলী (৫০ বছর পূর্তি) পালন
করে?

উ. ১৯৮৮ সনে।

প্র. বাংলাদেশে আহমদী শহীদদের নাম বলুন?

উ. ১৯৯৯ সনের ৮ অক্টোবর খুলনা ‘দারুল ফযল’ আহমদীয়া মসজিদে টাইম বোমা

বিস্ফোরণে সাতজন আহমদী শাহাদত বরণ করেন। এরা হলেন:

- ১) শহীদ ডাঃ আব্দুল মাজেদ সাহেব (৪২)।
- ২) শহীদ সোবহান আলী মোড়ল সাহেব (৬৫)।
- ৩) শহীদ জি.এম মহিবুল্লাহ সাহেব (৩৫)।
- ৪) শহীদ নূর উদ্দিন আহমদ সাহেব (৩০)।
- ৫) শহীদ মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন সাহেব (২৪)।
- ৬) শহীদ জি.এম. আলী আকবর সাহেব (৩৯)।
- ৭) শহীদ জি.এম. মরতাজ উদ্দিন সাহেব (৫৫)।

এছাড়া শহীদ মোস্তফা আলী নানু সাহেব এবং শহীদ এ.টি.এম. হক সাহেব জামা'তী দায়িত্ব পালনকালে সড়ক দুর্ঘটনায় ১৯৯৫ সনের ২১ মে শাহাদাত বরণ করেন।

সর্বশেষ ২০০৩ সনের ৩১ অক্টোবর শুক্রবার বিকরগাছার রঘুনাথপুর বাগ গ্রামের স্থানীয় আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট ও ইমাম মোকাররম শাহ আলম সাহেবকে প্রকাশ্য দিবালোকে পিটিয়ে শহীদ করা হয়।

- প্র. দেশ বিভাগের সময় কাদিয়ানে অবস্থানকারী বাঙালি দরবেশদের নাম বলুন?
- উ. ১) মোহতরম দরবেশ তৈয়ব আলী বাঙালি সাহেব। (দরবেশ নম্বর: ৪১)। তিনি আল্লাহ' তাঁ'লার ফ্যলে এখনও জীবিত আছেন। বর্তমানে তিনি কাদিয়ানে বসবাস করছেন।
 - ২) মোহতরম দরবেশ ওসমান আলী বাঙালি সাহেব। (দরবেশ নম্বর: ১৬৭)। তিনি আল্লাহ' তাঁ'লার ফ্যলে এখনও জীবিত আছেন। বর্তমানে তিনি নারায়ণগঞ্জে বসবাস করছেন।
 - ৩) মোহতরম দরবেশ ওবায়দুর রহমান ফানী বাঙালি সাহেব। (দরবেশ নম্বর: ১৬৮)।
 - ৪) মোহতরম দরবেশ মোতাহার আলী বাঙালি সাহেব। (দরবেশ নম্বর: ১৭০)।
 - ৫) মোহতরম মাওলানা দরবেশ ওমর আলী বাঙালি সাহেব। (দরবেশ নম্বর: ১৭১)।
 - ৬) মোহতরম দরবেশ আবুস সালাম বাঙালি সাহেব। (দরবেশ নম্বর: ১৭২)।
 - ৭) মোহতরম দরবেশ আব্দুল মোতালেব বাঙালি সাহেব। (দরবেশ নম্বর: ১৭৩)।
- [তারিখে আহমদীয়াত, খন্দ: ১০, প্রকাশকাল: ২০০৭, পৃ: ৩৭১-৩৮৭]।
- প্র. আহমদীয়া জামা'ত, বাংলাদেশ কর্তৃক কখন, কী উপলক্ষে কুরআন মজীদের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়?
- উ. আহমদীয়া জামা'তের শতবার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষে ১৯৮৯ সনের জুন মাসে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় পরিত্র কুরআনের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়।
- প্র. কত তারিখে বকশীবাজারস্থ আহমদীয়া জামা'তের কেন্দ্রীয় মসজিদ ও মিশন হাউস উগ্রপন্থী মোল্লাদের আক্রমণের শিকার হয়?
- উ. ১৯৯২ সনের ২৯ অক্টোবর। এতে প্রায় পৌনে দুই কোটি টাকার সম্পদের ক্ষতি হয়।

প্র. কত তারিখে হয়রত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) বাংলাদেশীদের উদ্দেশ্যে প্রথমবারের মতো এমটিএ-এর মাধ্যমে নসীহতমূলক ভাষণ প্রদান করেন?

উ. ১৯৯৩ সনের ১০-১২ জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের ৬৯তম সালানা জলসার তৃতীয় দিনে হ্যুর রাবে (রাহে.) এমটিএ-এর মাধ্যমে জলসায় যোগদানকারীদের উদ্দেশ্যে প্রথমবারের মত নসীহতমূলক ভাষণ দেন।

প্র. কত তারিখে সাত বছর মেয়াদী (শাহেদ কোর্স) জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশের শুভ উদ্বোধন হয়?

উ. তৰা নভেম্বর ২০০৬ সনে।

প্র. খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষ্যে মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশ কর্তৃক কোন মসজিদ নির্মিত হয় এবং কত তারিখে উদ্বোধন করা হয়?

উ. ঢাকার অদূরে নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লায় ‘মসজিদ নূর’। ২০০৯ সনের ২২ মে এ মসজিদের উদ্বোধন হয়।

প্র. হ্যুর আনোয়ার (আই.) বাংলাদেশীদের উদ্দেশ্যে কবে সর্বপ্রথম এমটিএ-তে ভাষণ প্রদান করেন?

উ. ২০০৯ সনের ১৩ ফেব্রুয়ারি রবিবার বাংলাদেশ জামা’তের ৮৫তম সালানা জলসার তৃতীয় দিনের সমাপ্তি অধিবেশনে লক্ষণ থেকে সরাসরি এমটিএ-এর মাধ্যমে দ্বিমান উদ্বোধন ভাষণ প্রদান করেন।

প্র. জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশের বার্ষিক সাময়িকীর নাম কি?

উ. নূরুন্দীন।

প্র. মজলিস খোদামূল আহমদীয়া, বাংলাদেশের একমাত্র মুখ্যপত্রের নাম কি?

উ. মাসিক আহ্বান।

প্র. হ্যুর আনোয়ার (আই.) বাংলা ভাষাভাষী লোকদের মাঝে আহমদীয়াতের বার্তা পৌছে দেবার জন্য এমটিএ-তে সরাসরি প্রশ্ন-উত্তর পূর্বক কোন অনুষ্ঠান আয়োজনের সুযোগ প্রদান করে দিয়েছেন?

উ. সত্যের সন্ধানে।

প্র. জামা’তে আহমদীয়া, বাংলাদেশ কর্তৃক কখন ‘মাদ্রাসাতুল হিফয়ুল কুরআন’-এর শুভ উদ্বোধন হয়?

উ. ৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ সনে।

প্র. আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত, বাংলাদেশের শতবার্ষিকী পূর্তি (১৯৯৩-২০১৩) অনুষ্ঠান কত তারিখে বা-জামাত তাহাজুদের মাধ্যমে শুরু হয়?

উ. ২৫ নভেম্বর ২০১২ সনে।

প্র. মজলিস খোদামূল আহমদীয়া, বাংলাদেশ কোন বছর প্লাটিনাম জুবিলী (৭৫ বছর পূর্তি) উদযাপন করেছে?

উ. ২০১৩ সালে।

তথ্যসূত্র :

- ১) আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী স্মরণিকা, আ.মু.জা. বাংলাদেশ।
- ২) বাংলাদেশে আহমদীয়াত ১ ও ২, লেখক : আলহাজ্জ আহমদ তোফিক চৌধুরী।
- ৩) পূর্ব পাকিস্তানে আহমদীয়াত, বক্তা : মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব।
- ৪) আহমদীয়াতের ইতিহাসে বাংলার স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব, লেখক : মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ঐতিহাসিক উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ও ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা বিশ্ব ধর্ম সম্মেলন

স্বামী শোগান চন্দ্র ১৮৯৬ সনের ২৬, ২৭ এবং ২৮ ডিসেম্বর তারিখে পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মগুলোর এক সম্মেলনের প্রস্তাব করেন। সম্মেলনে প্রত্যেক বঙ্গাকে নিম্নের পাঁচটি মৌলিক প্রশ্নের উপর নিজ ধর্মীয় শিক্ষা অনুসারে বক্তব্য রাখতে বলা হয়-

১. মানুষের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা কী?
২. মানব জীবনের পারলোকিক অবস্থা কী?
৩. ইহলোকে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কী এবং সেই উদ্দেশ্য কী উপায়ে অর্জিত হতে পারে?
৪. ইহলোকে ও পরলোকে মানব জীবনের কর্মের ফল কী?
৫. আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের উপায় কী?

এ বিখ্যাত সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে হয়রত মসীহ মাওউদ (আ.) যে “ইসলামী উসূল কী ফিলাসফী” বা ইসলামী নীতি-দর্শন নামক প্রবন্ধ লিখেন এবং তা বিশ্বজুড়ে খ্যাতি লাভ করেছে। বহু ভাষায় প্রকাশিত হয়ে প্রবন্ধটি অনেক মানুষের হেদায়াতের কারণ হয়েছে এবং হতে থাকবে (ইনশাআল্লাহ)। লাহোরে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে হয়রত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর প্রবন্ধ পাঠ করেন হয়রত মৌলভী আব্দুল করাম সিয়ালকোটি সাহেব (রা.)। শ্রোতারা পিনপতন নিষ্ঠারায় গভীর মনোযোগের সাথে তাঁর বক্তৃতা শ্রবণ করেন। নির্ধারিত সময়ে বক্তৃতার প্রথম প্রশ্নের উত্তরও শেষ হয়নি। পরবর্তীতে শ্রোতাদের উপর্যুপরি অনুরোধের প্রেক্ষিতে সেই দিন বক্তৃতার সময় আরও বৃদ্ধি করা হয় এবং সম্মেলনের সময় আরও একদিন বর্ধিত করে সেই দিনও এ বক্তৃতার জন্য রাখা হয়। এ প্রবন্ধ আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে।

চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের নির্দর্শন

মহাবিশ্বে লক্ষ-কোটি জ্যোতিক্ষ নিজ-নিজ কক্ষপথে প্রতিনিয়ত বিচরণ করছে। চাঁদ, সূর্য, পৃথিবী এবং পরিক্রমায় চাঁদ, সূর্য, পৃথিবী যখন এক সরলরেখা বরাবর অবস্থান নেয়, তখনই চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ হয়। যখন সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে চাঁদ অবস্থান করে তখন চাঁদের ছায়া পৃথিবীর ওপর যে অঞ্চলে পড়ে সেখান থেকে সূর্যকে দেখা যায় না। একে বলে সূর্যগ্রহণ। আর যখন সূর্য ও চাঁদের মাঝে পৃথিবী অবস্থান নেয় তখন পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর

পড়ে। ফলে চাঁদকে দেখা যায় না। একে বলে চন্দ্রগ্রহণ। এক ব্যতিক্রমধর্মী চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ ঘটেছিল ১৮৯৪-৯৫ সনে যথাক্রমে পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধে। এটি হয়রত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতার এক জ্ঞান নির্দেশন হিসেবে বিখ্যাত হয়ে আছে। এ সম্পর্কে হয়রত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, “আমার মাহদীর সত্যতার এমন দুঁটি লক্ষণ আছে—যা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি অন্য কারও সত্যতার নির্দেশনস্বরূপ প্রদর্শিত হয়নি। (তা হলো) একই রমযান মাসে (চন্দ্রগ্রহণের নির্ধারিত রাতের) প্রথম রাতে চন্দ্রগ্রহণ হবে এবং (সূর্যগ্রহণের নির্ধারিত দিনের) মধ্যম দিনে সূর্যগ্রহণ হবে।” (দারকুতনী, ১ম খন্ড, পৃ. ১৮৮)।

সাধারণত একই আরবি মাসে চন্দ্রগ্রহণ-সূর্যগ্রহণ হলে এ দু'গ্রহণের মাঝে ব্যবধান থাকে ১৪ দিন। হয়রত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার নির্দেশনস্বরূপ একই রমযানে এ দুঁটি গ্রহণের ব্যবধান হবে ১৫ দিন। আর এ গ্রহণের বৈশিষ্ট্য এতেই নিহিত। আঁ-হয়রত (সা.)-এর উপরোক্ত মহান ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করে পূর্ব গোলার্ধে ইংরেজি ১৮৯৪ সনের ২১ মার্চে [তথা ১৩১১ হিজরির ১৩ রমযান] সন্ধ্যা ৭:৩০ মি. থেকে রাত ৯:৩০ মি. পর্যন্ত চন্দ্রগ্রহণ এবং ৬ এপ্রিল [২৮ রমযান] সকাল ৯:০০টা থেকে ১১:০০টা পর্যন্ত সূর্যগ্রহণের মাধ্যমে। ১৮৯৫ সনে পশ্চিম গোলার্ধে অনুরূপভাবে একই রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ ঘটে।

কাসরে সলীব (ত্রুশ ধৰ্মস) কনফারেন্স

হয়রত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর অন্যতম আরাধ্য কাজ ছিল ত্রুশ ধৰ্মস করা। বাস্তবিকপক্ষেই তিনি (আ.) কুরআন, হাদীস, বাইবেল ও ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে হয়রত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু প্রমাণ করে ত্রুশীয় বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত খ্রিস্টধর্মের অসারতা প্রতিপন্থ করে গেছেন। এ বিষয়ে জামা'তে আহমদীয়া ১৯৭৮ সনের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে লন্ডনে এক কনফারেন্সের আয়োজন করে। এতে মুসলমান, ইহুদী ও খ্রিস্টধর্মের পক্ষিতরাও উপস্থিত ছিলেন। এ কনফারেন্সে বৃটিশ কঙাল অব চার্চকে আমন্ত্রণ ও চ্যালেঞ্জ জানানো হয়। ৪ঠা জুন কনফারেন্সের সমাপ্তি অধিবেশনে হয়রত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) অত্যন্ত সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন। হয়রত ঈসা (আ.)-এর কাশ্মীরে হিজরত ও সেখানে মৃত্যুবরণ ইত্যাদি বিষয়ে কনফারেন্সে বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এ কনফারেন্সের ফলশ্রুতিতে পশ্চিমা বিশ্বে আহমদীয়াত সমষ্টি বেশ আগ্রহের সৃষ্টি হয়—যার ধারাবাহিকতা এখন পর্যন্ত বিরাজমান আছে।

স্পেনে ইসলাম- অতীত ও বর্তমান

৭১১ সনে মহাবীর তারিক বিন যিয়াদ ৭০০০ (মতান্তরে ৮০০০) সৈন্য নিয়ে স্পেনে অভিযান পরিচালনা করেন। এ অভিযানে স্পেনের রাজা রাডারিক তাঁর বিরাট বাহিনীসহ পরাজিত হন এবং তিনি নিজে নিরুদ্দেশ হন। এভাবে স্পেনে মুসলিম সাম্রাজ্য কার্যেম হয়। উমাইয়া বংশীয় মুসলিম বীর আব্দুর রহমানের শাসনামলে স্পেনে ব্যাপকভাবে সড়ক, সেতু, হাস্মামখানা, ইমারত ও মসজিদ নির্মাণ, পানি সরবরাহ প্রত্ব জনহিতৈষী প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। বিখ্যাত কর্তৃভা মসজিদটি তিনিই নির্মাণ করেন। বস্তুত স্পেনে মুসলিম শাসনামল ছিল জগনচর্চার স্বর্গযুগ। এ প্রসঙ্গে যোসেফ হিল এর এ উক্তিটি অধিক উপযুক্ত, যেমনটি তিনি বলেছেন, “ইউরোপের অন্ধকারে কর্তৃভা লাইট হাউসের মত আলো বিতরণ করছিল।” বিশ্বখ্যাত কর্তৃভা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেই ছিল ৪ লক্ষ পুস্তকসমূহ রাজকীয় লাইব্রেরী। ইউরোপসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হতে উচ্চ শিক্ষার জন্যে ছাত্ররা কর্তৃভায় ভৌত করতো। আত্মকলহের কারণে মুসলমানদের শাসন ব্যবস্থা শিথিল হতে আরম্ভ করে। এ সুযোগে খ্রিস্টানরা শক্তি সঞ্চয় করে মুসলমানদের উৎখাতের নানা প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। পরিশেষে ১৪৯২ সনের ২৩ জানুয়ারি শেষ মুসলিম শাসক আবু আব্দুল্লাহর পরাজয়ের মাধ্যমে গ্রানাডা তথা স্পেনের মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে। গ্রানাডার পতনের পর অকল্পনীয় নির্যাতন চালিয়ে লক্ষ-লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করা হয় ও অমানবিক অত্যাচার করে জোরপূর্বক খ্রিস্টান বানানো হয়।

স্পেন থেকে উৎখাতের দীর্ঘদিন পরে আবার স্থানে ইসলামের শাশ্বত বাণী প্রতিষ্ঠার জন্য হ্যরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর নির্দেশক্রমে মোহতরম মাওলানা করম এলাহী জাফর সাহেব ১৯৪৫ সনে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের বার্তা নিয়ে স্পেন পৌছেন। সে সময় স্পেনে ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাস ছাড়া অন্য সব ধর্মবিশ্বাসের প্রাচারণা ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাই তাঁকে নানা বাধা-নিষেধের মাঝে প্রচারণা চালাতে হয়। এ সময় তিনি সুগক্ষি দ্রব্যের ব্যবসায় করে জীবিকা চালান। ব্যবসায় অর্জিত লাভের অর্থে তিনি ১৯৪৮ সনে হ্যরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) রচিত “ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা” পুস্তকটির ৩০০০ কপি ছাপেন। পরবর্তীতে “ইসলামী উস্তুল কি ফিলাসফী” বইটি স্পেনিশ ভাষায় প্রকাশ করেন, কিন্তু ক্যাথলিক চার্চের প্রতিবাদের কারণে এটির সব কপি বাজেয়াঙ্গ করা হয়। পরবর্তীতে অনুমতি পেলে তিনি সর্বস্তরে বইটি ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। এভাবে ইসলামের মহাবীর জেলারেল এ পুণ্যাত্মা অবিরাম প্রচেষ্টা ও দোয়ার মাধ্যমে তাঁর কার্যক্রম চালিয়ে যান।

১৯৭০ সনে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) স্পেন সফরে যান। গ্রানাডায় আল্হামরা হোটেলে অবস্থানকালে তাঁর ওপর ইলহাম হয়, “যে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। আল্লাহ নিশ্চয় তাঁর উদ্দেশ্য সফল

করবেন। আল্লাহু প্রতিটি জিনিসের জন্যই একটি উপায় নির্ধারণ করে রেখেছেন।” এরপর স্পেনে মসজিদের জন্য জমি খোঁজা হয় এবং ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে পেন্ড্রোয়াবাদে মসজিদের জায়গা নির্ধারণ করা হয়। ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে কর্ডোভার পতনের সুদীর্ঘ ৭৪৪ বছর পরে ১৯৮০ সনের ৯ অক্টোবর তারিখে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) কর্ডোভায় ‘মসজিদে বাশারত’-এর ভিত্তি স্থাপন করেন। পরে ১৯৮২ সনের ১০ সেপ্টেম্বর শুক্রবার নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের ৪৮ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) স্পেনে ইসলামের পুনর্জাগরণের প্রতীক ‘মসজিদে বাশারত’ উদ্বোধন করেন। ১০ জন স্থপতি ৮ মাসের প্রচেষ্টায় এ মসজিদ নির্মাণ করেন। ইনশা’আল্লাহু সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন স্পেনে ইসলামের পতাকা আবার পত্পত্ত করে উড়বে। (কে. এম. মাহমুদুল হাসান রচিত ‘দেশে দেশে আহমদীয়াত’ পুস্তক হতে সংকলিত ও সংক্ষেপিত)।

১১ এপ্রিল ২০১০ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) ভ্যালেন্সিয়া নামক স্থানে স্পেনের দ্বিতীয় আহমদীয়া মসজিদ ‘বায়তুর রহমান’-এর ভিত্তি রাখেন এবং তৃতীয় এপ্রিল ২০১৩ সনে এর শুভ উদ্বোধন করেন।

মুসলিম ক্যালেন্ডার

“তারা তোমাকে নতুন চাঁদ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, (হে নবী!) তুমি বল, এটা লোকদের (সাধারণ কাজের) জন্যে এবং হজের জন্যে সময় নির্ণয়ের উপকরণ স্বরূপ।” (সূরা বাকারাঃ ১৯০)।

মুসলিম ক্যালেন্ডার চাঁদের পরিক্রমার ওপর নির্ভরশীল এবং সৌর বছরের তুলনায় ১১ দিনে কমে ৩৫৪ দিনে চান্দ্র বছর শেষ হয়। চান্দ্র বছরে (হিজরি কামরি) একটি নতুন চাঁদ হতে আরেক নতুন চাঁদ ওঠা পর্যন্ত সময়কে এক মাস বলে গণ্য করা হয়। চান্দ্র মাস তাই ২৯ বা ৩০ দিনে হয়। ধর্মীয় উৎসব বা দিনক্ষণ নির্ধারণে চাঁদ দেখা তাই গুরুত্বপূর্ণ। হিজরি কামরি সনের প্রবর্তন করেন হযরত উমর ফারুক (রা.)। বন্তত ৬২২ খ্রিস্টাব্দে আঁ-হযরত (সা.)-এর মদীনায় হিজরতের সময়কাল হতে হিজরি কামরি সন গণনা করা হয়ে থাকে।

হিজরি কামরি সনের অন্তর্ভুক্ত মাসগুলোর নাম:

মুহর্রম, সফর, রবিউল আউয়াল, রবিউস সানি, জমাদিউল আউয়াল, জমাদিউস সানি, রজব, শা'বান, রম্যান, শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজজ। এর মাঝে মুহর্রম, রজব, যিলকদ এবং যিলহজজ মাসকে পরিত্র মাস বলে গণ্য করা হয়। এ মাসগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

বক্ষত ইসলাম সময় পরিমাপের জন্য চান্দ ও সৌর উভয় পদ্ধতিই ব্যবহার করে। যেখানে দিনের বিভিন্ন সময় নামায পড়ার হুকুম এসেছে সেখানে সময় গণনায় সৌর পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। দিনে পাঁচ ওয়াজ্ত নামায পড়ার সময় নির্ধারণ এবং রময়ান মাসে প্রতিদিন রোয়া আরঙ্গ করা ও সমাপ্ত করার ব্যাপারে সৌর পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। আবার যখন কোনও ধর্ম-কর্মের সম্পাদন, মাস বা মাসের অংশ-বিশেষের জন্য নির্ধারিত করা হয়, তখন চান্দ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, যথা: রোয়া রাখার মাস বা হজ্জ পালনের তারিখ নির্ধারণে। অতএব ইসলাম উভয় পদ্ধতিই ব্যবহার করে, উভয় পদ্ধতিকেই ইসলামসম্মত মনে করা হয়।

খ্রিস্টিয় সৌর সনের সাথে হিজরি কামরি সনের সম্পর্ক:

তাহলে খ্রিস্টিয় সৌর সন ও হিজরি কামরি সনের সম্পর্ক নিম্নরূপ:

৩ x ক

স = ক - ----- + ৬২২

300

স - ৬১১

ক = স + ----- - ৫২

۶۸

তাহলে খ্রিস্টীয় ১৯৮৩ সৌর সনের সমতল্য হিজরি কামরি সন হল

విలువలు - 622

$$ক = ১৯৮৩ + \dots - ৬২২ \text{ (এখানে } s = ১৯৮৩\text{)}$$

۹۲

= ১৯৮৩-৬২২+৪২ (পূর্ণ সংখ্যা নিয়ে)

= ۱۹۶۱+۸۲

= ১৪০৩ হিজরি কামরি

[Muslims Festivals and Ceremonies - Rashid Ahmad Chaudhury]

ହିଜରି ଶାମସି (ହିଜରି ସୌର) ସନ

হয়রত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে হিজরি শামসি সনের প্রবর্তন করেন যেন এ ইসলামী বর্ষপঞ্জী খ্রিস্টিয় সৌর বর্ষপঞ্জীর পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়। হিজরি শামসি সনের মাসগুলোর নাম হলো:

১. সুলাহ (জানুয়ারি) : এ মাসে আঁ-হ্যরত (সা.) মক্কাবাসীদের সাথে হৃদায়বিয়ার সঞ্চি

স্থাপন করেন।

২. তবলীগ (কেন্দ্রিয়ারি) : ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হ্যুর (সা.) এ মাসে বাদশাহদের নামে তবলীগ পত্র প্রেরণ করেন।
৩. আমান (মার্চ) : এ মাসে বিদায় হজের সময় রাহমাতুল্লিল আলামীন (সা.) মানুষদের জীবন, সম্পদ ও সম্মের নিরাপত্তার ঘোষণা দেন।
৪. শাহাদত (এপ্রিল) : এ মাসে ইসলামের শক্তরা ধোঁকাবাজি এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে ‘রাজী’ এবং ‘বির মাউনা’ নামকস্থানে ৭৭ জন সাহাবীকে শহীদ করে দেয়। এ দুই স্থানের অধিবাসীরা ইসলামী শিক্ষা লাভের জন্যে আঁ-হ্যরত (সা.)-এর কাছে মুয়াল্লিম (শিক্ষক) চেয়ে আবেদন করেছিল। তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে হ্যুর (সা.) এ সকল সাহাবাদের প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা সকল সাহাবাদের নির্মত্বাবে শহীদ করে। বির মাউনায় শাহাদাতপ্রাণ্ড ৬৯ জন সাহাবী (রা.) কুরআন করিমের হাফিয় ছিলেন। (দীনি মালুমাত, ম.খো.আ.পাকিস্তান, পৃ.৫২)।
৫. হিজরত (মে) : এ মাসে আঁ-হ্যরত (সা.) প্রিয় জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করেন।
৬. ইহসান (জুন) : দয়ার সাগর নবী আকরাম (সা.) বানু তাউ-এর ইহুদীদের বিখ্যাত দানশীল হাতেম তাউ-এর সম্মানার্থে মৃত্যু করে দেন।
৭. ওফা (জুলাই) : এ মাসে ‘যাতুর রিকা’-এর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে দীর্ঘ সফর এবং যানবাহন কম থাকার জন্যে সাহাবীদের পা ছিদ্র হয়ে গিয়েছিল। অনেকের পা থেকে রক্ত ঝরে পড়েছিল, তবুও সাহাবারা (রা.) সততা এবং বিশ্বস্তার অনন্য, অসাধারণ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছিলেন।
৮. যত্ন (আগস্ট) : এ মাসে আল্লাহ তা'লা মুতার যুদ্ধের মাধ্যমে আরবের বাইরে ইসলাম প্রচারের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।
৯. তাবুক (সেপ্টেম্বর) : এ মাসে তাবুক যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
১০. ইখা (অক্টোবর) : দু'জাহানের আশিস (সা.) এ মাসে মক্কার মুহাজির এবং মদীনার আনসারদের মাঝে মুয়াখাত (ভাত্তুবদ্ধন) স্থাপন করেন।
১১. নবুওয়ত (নভেম্বর) : এ মাসে আল্লাহ তা'লা আঁ-হ্যরত (সা.)-কে নবুওয়তের মর্যাদায় ভূষিত করেন।
১২. ফাতাহ (ডিসেম্বর) : এ মাসে মক্কা বিজয় হয় এবং হ্যুর (সা.) সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন।

খ্রিস্টিয় সন ও হিজরি শামসি সনের সম্পর্ক

খ্রিস্টিয় সৌর সন হতে ৬২১ বছর বাদ দিলে হিজরি শামসি সন পাওয়া যায়। ২০০৮ খ্রিস্টিয় সৌর সনের সমতুল্য হিজরি শামসি সন = ২০১৩-৬২১= ১৩৯২ হি.শা।

হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর ইংল্যান্ডে হিজরত

১৯৭৪ সনে শাসনতান্ত্রিকভাবে পাকিস্তানে আহমদীদের ‘নট-মুসলিম’ ঘোষণা করার পরও যখন দেখা গেল, প্রকৃতপক্ষে জামা’তে আহমদীয়া ও এর খিলাফতের কোন ক্ষতি হয়নি, বরং এ জামা’ত তাদের ইসলাম প্রচারের কর্মসূচী নিয়ে যথারীতি এগিয়ে চলছে, তখন আহমদীদের বিবর্ণে মানবেতিহাসের বর্বরতম অর্ডিন্যান্সটি ২৪ এপ্রিল ১৯৮৪ সালে জেনারেল জিয়াউল হক জারী করে। এ অর্ডিন্যান্সের বলে পাকিস্তান সরকার আহমদী মুসলমানদের ধর্ম-কর্মের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, এমনকি তাদের দৈনন্দিন জীবনে ইসলামী কৃষ্টি-কালচার ও রীতি-নীতি অনুসরণের ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং এর বিরুদ্ধচারণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষিত হয়। অবস্থা এমন দাঁড়ায়, আহমদীদের পক্ষে অ-আহমদীদের সামনে স্বাচ্ছন্দে কথা-বার্তা বলাও বন্ধ হয়ে যায়। এসব কারণে বহু আহমদীকে শাস্তি দেয়া হয়। দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করে বহু মসজিদ ও ঘর-বাড়ি জালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়া হয়, নির্যাতন চালানো হয়, বহু হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করা হয় এবং খোদা তাঁ’লার খলীফাকে গ্রেফতার করার হীন ষড়যন্ত্র চালানো হয়। সৈয়দনা হ্যরত আমীরুল মু’মিনীনের পাসপোর্ট আটক এবং তাঁ’র বহির্দেশে গমন বন্ধ করার জন্যে আদেশ জারি করা হয়। কিন্তু আপন প্রিয় বান্দাদের জন্যে খায়রুল মাকেরীন-সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী খোদা তাঁ’লার পরিকল্পনা অভাবনীয় হয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও তা-ই হলো। সংক্ষেপে ঘটনাটি হচ্ছে:

জামা’তে আহমদীয়ার খলীফা যাতে দেশ থেকে বের হয়ে যেতে না পারেন সেজন্যে জেনারেল জিয়াউল হক নিজে এক ফরমান জারি করে। রাবওয়া শহর এবং এর আশেপাশে মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সহ পাঁচটি গোয়েন্দা দল মোতায়েন করা হয়। হ্যরত আকদাস (রাহে.)-এর কোন ইচ্ছা ছিল না, তিনি কোন প্রকার বাহানার আশ্রয় নিয়ে দেশ থেকে বেরিয়ে যান। কিন্তু উসমান চীনি সাহেবসহ আরও কয়েকজন বুর্যুর্গ আহমদীর স্বপ্নের ভিত্তিতে তিনি আল্লাহর ইচ্ছায় ও ইঙ্গিতে সব গোয়েন্দা দলের নাকের ডগার ওপর দিয়ে গাড়ি নিয়ে বের হয়ে করাচীর পথে রওনা হন। তিনি KLM বা ডাচ এয়ারলাইনস-এর একটি প্রাইভেট রুমে অপেক্ষা করতে থাকেন। ইতোমধ্যে জেনারেল জিয়াউল হকের সেই কঠোর ফরমান পৌছে যায় দেশের সব স্থানে, সব স্টেশন-বন্দরে, সব সীমান্ত চেকপোস্ট এবং সব বিমানবন্দরে। জেনারেল জিয়ার হুকুম পেয়ে করাচী বিমানবন্দরে KLM বিমানটিকে বিলম্ব করানো হয় এবং অতি সতর্কতার সাথে চেক করা হয়। এক ঘন্টা পরে উড্ডয়নের অনুমতি দেয়া হয় এবং KLM বিমানটি হ্যুর (রাহে.) এবং তাঁ’র সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে ইউরোপের পথে যাত্রা করে। কঠোর নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও করাচী বিমানবন্দরে আহমদীয়া জামা’তের খলীফাকে কেন আটক করা হলো না, তদন্তকালে এ ঘটনার রহস্য উন্মোচিত হয়। দেখা গেল জেনারেল জিয়াউল হক তার প্রদত্ত ফরমানে

মির্যা তাহের আহমদ লিখতে গিয়ে ভুল করে লিখেছে ‘মির্যা নাসের আহমদ’। কত সূক্ষ্ম ও কত বিচিত্র খোদা তাঁলার পরিকল্পনা! (শাহ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব প্রণীত ‘ইসলামে খীলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ’ পুস্তকাবলম্বনে)।

KLM বিমানটি হল্যান্ডের আমস্টার্ডামে গৌচার পর হ্যুর (রাহে.) লন্ডনের পরবর্তী ফ্লাইটেই লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওণা হন। হ্যুর (রাহে.) দুপুর ১২:৩০ মিনিটে লন্ডন মসজিদে পৌছেন। সেখানে প্রায় ৩০০ জন আহমদী হ্যুর (রাহে.)-কে সাদর অভ্যর্থনা জানান। এভাবে আল্লাহ তাঁলা তাঁর প্রিয় খলীফাকে অশুভ চক্রাত থেকে রক্ষা করেন।

আহমদীয়া জামা'তের শতবার্ষিকী জুবিলী

১৯৩৯ সনে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উদযাপনের প্রাক্কালে হ্যরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) আশা প্রকাশ করেছিলেন, জামা'তে আহমদীয়া ১৯৮৯ সনে প্রথম একশ' বছর পূর্তি অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে উদযাপন করবে। হ্যুর (রা.)-এর এ পবিত্র ইচ্ছার প্রক্ষিতে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) ১৯৭৩ সনে রাবণ্ডার সালানা জেলসায় শতবার্ষিকী জুবিলী উদযাপন উপলক্ষ্যে ব্যাপক আধ্যাত্মিক ও পার্থিব পরিকল্পনা জামা'তের সামনে উপস্থাপন করেন। মহান আল্লাহ তাঁলার অশেষ কৃপায় আহমদীয়া জামা'তের আবাল-বৃন্দ-বণিতা সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়ে সব প্রোগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে। এসব প্রোগ্রামের উপরেখ্যযোগ্য হলো, আল্লাহ তাঁলার হামদ এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য ও শুদ্ধাঙ্গাপন, সদকা, কুরবানী এবং দান-খয়রাত, ইজতেমায়ী



প্রষ্ঠাবর্ত: মূল ছবি রঙিন

দোয়া, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার তৎপরতা সম্পর্কিত প্রদর্শনী, প্রামাণ্য ভিডিও অনুষ্ঠান এবং বিশেষ জেলসার ব্যবস্থা, শতাধিক ভাষায় কুরআন মজীদের আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশ, শতাধিক ভাষায় নির্বাচিত হাদীসের অনুবাদ প্রকাশ, ব্যাপকভাবে হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর লিখিত পুস্তকাবলী ও অন্যান্য ইসলামী সাহিত্যের প্রকাশনা, পৃথিবীতে এক লক্ষ মসজিদ নির্মাণ, গরিবদের জন্য গৃহনির্মাণ পরিকল্পনার সম্প্রসারণ, এতীমদের প্রতিপালনসহ বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজকর্ম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, অনেকগুলো নতুন দেশসহ প্রায় ১২০টি দেশে আহমদীয়াতের মিশন প্রতিষ্ঠা, প্রেস ও মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা এবং আলোকসজ্জা, পতাকা উত্তোলন, শিশুদের জন্য মিষ্টি বিতরণ, খেলাধুলা ও পি.টি. প্রদর্শন ইত্যাদি।

হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) বলেন, আহমদীয়া শতবার্ষিকী জুবিলী উৎসব

মূলত একটি নতুন অঙ্গীকার- যার মাধ্যমে আমরা আসন্ন দ্বিতীয় শতকে আমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টাসমূহকে দ্বিগুণ করতে এবং সকল ধর্মের ওপর ইসলামের মহাবিজয় ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সর্বপ্রকার ত্যাগ ও কুরবানী করার জন্যে সংকল্প গ্রহণ করব যাতে হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আহমদীয়াতের তৃতীয় শতাব্দীতে ইসলামের বিশ্ববিজয়ের জন্য আমাদের সুমহান লক্ষ্য সুনিশ্চিতভাবে অর্জিত হতে পারে। (জুম'আর খুতবা, ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭ ইং)।

আহমদীয়া খিলাফতের শতবার্ষিকী জুবিলী

আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর মহান রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়াহি ওয়া সাল্লামের প্রতিশ্রূতি অনুযায়ী খিলাফত আলা মিন হাজিন নবুওয়াত- অর্থাৎ, নবুওয়াতের পদ্ধতিতে ঐশ্বী খিলাফত ব্যবস্থা ১৯০৮ সনের ২৭ মে তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, হ্যরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের পর হ্যরত হাজীউল হারামাইন শারীফাইন হোকিম মাওলানা নূরবদ্দীন (রা.)-এর খলীফা নির্বাচনের

মাধ্যমে খিলাফতের যে অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল- তা ২০০৮ সনের ২৭ মে তারিখে শতবর্ষে পদার্পণ করে। জাতীয় জীবনে কত ক্রান্তিলগ্ন এসে থাকে। এগুলোকে স্মরণীয়-বরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে পার্থিব ও ঐশ্বী উভয় সংগঠনই বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

নিঃসন্দেহে ২০০৮ সনের ২৭ মে এ ঐশ্বী জামা'তের একটি পরমলগ্ন। এ লগ্নকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্যে আমাদের বর্তমান প্রিয় খলীফা হ্যরত মির্যা মাসরুর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই)। ২০০৫ সনের ২৭ মে তারিখের খুতবায় আহমদীয়া খিলাফতের শতবার্ষিকী জুবিলী উৎসব পালন করার ঘোষণা দেন।

পার্থিব লোকেরা তাদের উৎসবের দিনগুলো নিছক আনন্দ-ফুর্তি ও ভোগ বিলাসে কাটিয়ে দেয়। কিন্তু ঐশ্বী জামা'তের বেলায় তা একেবারে ভিন্নধর্মী। আমাদের প্রিয় ইমাম শতবার্ষিকী খিলাফত জুবিলী পালনের ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হননি বরং তিনি এ কার্যক্রমের রূপরেখাও ঘোষণা করে দিয়েছেন এবং জামা'ত এর ভিত্তিতে একটি বিস্তারিত কর্মসূচী প্রণয়ন করেছিল। সারা বছর ধরে এ কর্মকাণ্ড চলেছে। ২০০৮ সনের ২৭ মে থেকে এ উৎসব শুরু হয়েছিল এবং ২০০৮ সনের কাদিয়ান জলসার মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। ২০০৮ সনের ২৭ মে বিশ্বের সকল আহমদীয়া বা-জামা'ত তাহাজুদের মাধ্যমে নতুন



দ্রষ্টব্য: মূল ছবি রঙিন

শতাব্দীতে পদার্পণ করে। বিশ্বের সকল জামা'ত খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী অনুষ্ঠান মহাসমারোহে উদয়াপন করে। এদিন সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং ঈমান উদ্দীপক বিষয় ছিল, সৈয়দনা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কর্তৃক লভনের এক্সেল সেন্টার থেকে হৃদয়ঘাসী, তেজোদীপ্তি এবং আগমামী দিনের আহমদীয়াতের স্বর্ণলী ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আবেগ-উদ্বেলিত ভাষণ। হ্যুর (আই.) তাঁর বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে বিশ্বের সকল আহমদীর কাছ থেকে ইসলাম ও আহমদীয়াতের প্রচার, প্রসার, সংরক্ষণ ও হেফায়তের ব্যাপারে দৃঢ় ও শক্তিশালী অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। নতুন রঙে রঙিন হয় সকল আহমদীর প্রাণ; সঞ্জীবিত হয় সকল আহমদীর ঈমান। যাত্রা শুরু হয় নতুন পথ চলা। এছাড়া খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী কর্মসূচীর অনেকটা জুড়েই ছিল আপামর আহমদী সদস্য-সদস্যাগণ কর্তৃক আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন দোয়া-দুরুদ, ইস্তিগফার পাঠ, নফল রোয়া পালন ও নামায আদায় এবং বিভিন্ন ধরনের আর্থিক কুরবানী এবং পশু কুরবানী দান। এছাড়াও ছিল বিগত একশ বছরে খিলাফতের বিস্তারিত কর্মকাণ্ড ও এর ঐতিহাসিক বিবরণ প্রকাশ, বিভিন্ন ভাষায় কুরআন অনুবাদ ও প্রকাশ এবং ইসলামী সাহিত্যে জামা'তের অবদানসূচক জামা'তী প্রকাশনার বিপুল সমাহার। বিশ্বব্যাপী জামা'তের কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত এ কর্মসূচী সারা বছর ধরে চলতে থাকে। সত্যিকার অর্থে এ কর্মসূচীর একটা অংশ- অর্থাৎ, দোয়া-দুরুদের আধ্যাত্মিক অংশ হ্যুর (আই.)-এর ঘোষণার পরপরই চালু হয়ে গিয়েছিল। এটা ঐশ্বী জামা'তের কর্মসূচী এবং আল্লাহর খলীফা কর্তৃক এর ঘোষণা করা হয়েছিল। সুতরাং এর সফলতার ব্যাপারে এক বিন্দু পরিমাণ সন্দেহেরও অবকাশ ছিল না এবং থাকার কথাও নয়।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের শতবার্ষিকী জুবিলী

আল্লাহ তাঁ'লার অপার অনুগ্রহে বাংলাদেশ সেই পরম সৌভাগ্যের অধিকারী দেশ- যারা শেষ যুগে আগত মসীহ ও মাহদীকে মেনে সর্বপ্রথম কোন জাতি হিসেবে শতবার্ষিকী উদয়াপন করছে। আজ থেকে একশত বছর পূর্বে ১৯১২ সালের ২৫ নভেম্বর বাংলার সবুজ-শ্যামল এক মনোরোম জেলা শহর ব্রাক্ষণবাড়িয়াতে হযরত মাওলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের পুরিত্ব হাতে জামা'তে আহমদীয়ার কার্যক্রমের ভিত রচিত হয়। যদিও ১৯০২ সনের দিকেই বাংলাদেশে আহমদীয়াতের বার্তা পৌঁছে গিয়েছিল এবং দুইজন সাহাবী মসীহ



দ্রষ্টব্য: মূল ছবি রঙিন

মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র হাতে বয়াত গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু সেই সময় আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১৯১৩ সালে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত গঠিত হয়। সেই অংশের স্মৃতিকে চির জাগরুক রাখার লক্ষ্যে হ্যুর আনোয়ার (আই.) আমাদেরকে শতবার্ষিকী উদযাপনের অনুমতি প্রদান করে চির কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। (জামাকুমুল্লাহ্ আহসানাল জায়া)

শতবার্ষিকী জুবিলী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশে আহমদীয়া জামা'তের পথিকৃৎ ব্রাক্ষণবাড়িয়ার হ্যরত মাওলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব মরহুমের বসতবাড়ি সংলগ্ন মসজিদুল মাহদীতে ২৫ নভেম্বর ২০১২ তারিখ ভোর রাতে বা-জামা'ত তাহাজ্জুদ ও ফজর নামায, দরসুল কুরআন ও ইজতেমায়ী দোয়ার রহানী কর্মসূচী পালন করা হয়। এরপর মরহুমের কবর জিয়ারত করা হয়। তারপর মোহতরম মোবাশেরের রহমান, ন্যশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ শতবার্ষিকী জুবিলীর লোগো উন্মোচন করেন। এরপর সকাল ১১ টায় মসজিদুল মাহদী প্রাঙ্গনে এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়া শতবার্ষিকী জুবিলী বছরের প্রথম কার্যক্রম হিসেবে সকল স্থানীয় জামাতে একযোগে ৪ঠা জানুয়ারি ২০১৩ তারিখ শুক্রবার দিবাগত রাতে বা-জামা'ত তাহাজ্জুদ আদায়, ফজর নামায, ইজতেমায়ী দোয়া এবং মিষ্টি বিতরণের পর খাসি সদকা করা হয়। এছাড়া দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে আপ্যায়ন করে সুধী সমাবেশ/সংবর্ধনা সভার আয়োজনও করা হয়। এছাড়া শতবার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষ্যে হ্যুর (আই.) নির্দেশিত আধ্যাত্মিক কর্মসূচী যথা সাংগ্রাহিক রোধা, প্রতিদিন নফল নামায ও দোয়ার অজিফা সর্বান্তকরণে জামা'তের সর্বস্তরের সদস্যগণ আদায় করার চেষ্টা করেন। বাংলাদেশ জামা'তের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ব্রাক্ষণবাড়িয়ার ক্ষেত্রে জামা'তে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সনে স্মারক মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়।

মজলিস খোদামুল আহমদীয়ার ৭৫ বর্ষ পূর্তি উদযাপন

১৯৩৮ সনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি মজলিস খোদামুল আহমদীয়া হ্যরত খলীফতুল মসীহ সানী (রা.)-এর পবিত্র হাতে কাদিয়ানের পবিত্র ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সন ছিল মজলিস খোদামুল আহমদীয়ার বিশ্বব্যাপী ৭৫ বছর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপনের বছর। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ও জাগতিক অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে এই জুবিলী উদযাপিত হয়েছে। মজলিস খোদামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ যেহেতু ১৯৩৮ সনের ১৫ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাই বাংলাদেশ মজলিসও একই সাথে দুটি প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীই মহান আল্লাহ তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও আনন্দ-উদ্বৃত্তির সাথে উদযাপন করেছে। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় এবং সকল স্থানীয় মজলিসগুলোতে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ও ১৫

এশিল বা-জামা'ত তাহাজ্জুদ নামায আদায়, খাসি সদকা, পতাকা উত্তোলন, মিষ্ঠি বিতরণ এবং আলোকসজ্জা করা হয়। এছাড়া হ্যুর (আই.) কর্তৃক সদয় অনুমোদন অনুসারে মাহীগঞ্জ জামা'তে প্লাটিনাম জুবিলী স্মারক মসজিদ নির্মাণ, 'ইসলামী ইবাদত ও দ্বিনি মালুমাত' পুস্তক প্রকাশ এবং বিভিন্ন আধ্যাতিক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল।



লোগো: মজলিস খোদামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের ৭৫ বর্ষ পূর্তি উদযাপন।

কুরআন মজীদে বর্ণিত কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী

কুরআন মজীদে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ আছে। এর মাঝে অন্ন কয়েকটি মাত্র এখানে বর্ণিত হলো:-

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الْدِيَنِ كُلِّهِ وَلَوْكَهُ الْمُشْرِكُونَ

(হয়াল্লায়ী আরসালা রাসূলাহু বিলহুদা ওয়া দীনিল হাকি লি ইউহিরাহু আলাদ্দীনি কুল্লিহী ওয়া লাও কারিহাল মুশরিকুন)।

(১) অর্থ: তিনিই (আল্লাহ) তাঁর রসূলকে হেদায়াত এবং সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন যেন তিনি একে সব ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করে দেন, মুশরিকরা যতই অসন্তুষ্ট হোক না কেন। (সূরা আস্স সাফ: ১০) তফসীরকারকদের অধিকাংশই এ বিষয়ে একমত, ইসলামের এ বিশ্ববিজয় প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সময়ে ঘটবে।

(২) অনেক পণ্ডিতের মতে, হ্যরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মৃক্ষা হতে হিজরত করার সময়ে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَآدُكَ إِلَى مَعَادٍ

(ইন্নাল্লায়ী ফারায়া আল্লায়কাল কুরআনা লারাদুকা ইলা মাল্লাদিন)

অর্থ: নিশ্চয় যিনি তোমার ওপর কুরআনকে ফরয করেছেন, তিনিই তোমাকে প্রত্যাবর্তনস্থলে পুনরায় ফিরিয়ে আনবেন। (সূরা আল-কাসাস: ৮৬)। স্পষ্টত এখানে বলা হয়েছে, মক্কা হতে হিজরত করে নবী করিম (সা.) পুনরায় বিজয়ীর বেশে মক্কায় ফিরে আসবেন।

(৩)

إِقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ

(ইক্তারাবাতিস্ সাঁআতু ওয়ান শাক্কাল ক্ষামারু)

অর্থ: নির্দিষ্ট মুহূর্ত নিকটবর্তী হলো এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হলো। (সূরা আল কামার: ২)। চন্দ্র ছিল আরব শক্তির প্রতীক আর চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে যাওয়ার অর্থ আরব শক্তির মূলোৎপাটিত হয়ে যাওয়া। এ আয়াত মক্কায় সেই সময়ে অবর্তীর্ণ হয় যখন আঁ-হ্যরত (সা.) এবং সাহাবা কেরাম (রা.) কাফিরদের দ্বারা চরমভাবে নিগৃহীত আর অত্যাচারিত হচ্ছিলেন। আয়াতটিতে বলা হয়েছে, একদিন আরবের অবিদ্ধাসী শক্তি পরাভূত হবে। একদিন মানুষ ঢাঁকে পৌছাবে এ ভবিষ্যদ্বাণীও অত্র আয়াতে নিহিত আছে।

(৪) মক্কায় যখন আঁ-হ্যরত (সা.) এবং সাহাবা কেরাম (রা.) কঠিন দিন অতিবাহিত করছিলেন তখন পার্শ্বদের হাতে রোমানরা অপমানজনক পরাজয় বরণ করে। এ সময় নিম্নের আয়াতসমূহ অবর্তীর্ণ হয়:

عَيْبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِيْبِهِمْ سَيَعْلَمُوْنَ فِي بِصْرِ سِنِّيْنِ

(গুলিবাতির রূম, ফি আদনাল আরয়ি ওয়া তুম মিম বাঁদি গালাবিহিম সাইয়াগলিবুন, ফি বিয়’ই সিনীন)।

অর্থ: রোমানরা পরাজিত হয়েছে নিকটবর্তী দেশে। আর তারা তাদের পরাজয়ের পর অচিরেই বিজয়ী হবে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে। (সূরা আররুম: ৩-৫)। আরবি বিয়’উন শব্দে সাধারণত ৩ হতে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো বুঝায়। ৬১৬ খ্রিস্টাব্দে এ আয়াত নাযিল হয় আর ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে স্বল্পসংখ্যক মুসলমানের হাতে মক্কার কোরাইশদের শৌর্য-বীর্য ভূল্পিত হওয়ার বছরে, রোমানরা পার্শ্বদের বিরুদ্ধে বিরাট বিজয় লাভ করে।

(৫) পবিত্র কুরআনের এক মহান ভবিষ্যদ্বাণী— যা ১৩০০ বছর পরে পূর্ণতা লাভ করেছে, তা হলো:

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْقَيْنَ ۝ بَيْهِمَا بَرْزَخٌ لَا يَعْلَمُ ۝ يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْمُؤْلُوْنُ وَالْمُرْجَانُ ۝
وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُسْتَثَثُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝

(মারাজাল বাহরায়নি ইয়ালতাফ্রিয়ান। বায়নাত্তুমা বারবাখুল লা ইয়াবগিয়ান। ইয়াখরঞ্জু মিনহুমাল লুলুউ ওয়াল মারজান। ওয়া লাহুল জাওয়ারিল মুনশাআতু ফিল বাহরি কাল আলাম)।

অর্থ: তিনি দু'টি সমুদ্রকে এমনভাবে প্রবাহিত করেছেন যে (এক সময়ে) উভয়ে মিলিত হবে। (বর্তমানে) উভয়ের মাঝে এক প্রতিবন্ধক আছে (যদর়ণ) এ দু'টি একে অপরের মাঝে প্রবেশ করতে পারে না। ... উভয় (সমুদ্র) হতে মুক্তা এবং প্রবাল বের হয়। ... এবং সমুদ্র বক্ষে পর্বতের ন্যায় সুউচ্চ দ্রুতগামী জাহাজগুলো তাঁরই। (সূরা আর রহমান : ২০, ২১, ২৩, ২৫)। আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে এরা মিলিত হবে আর পর্বতসদৃশ সুউচ্চ নৌযানগুলো এদের মিলনপথ দিয়ে যাতায়াত করবে। বর্তমানে সুয়েজ খাল ভূ-মধ্যসাগরকে লোহিত সাগরের সাথে সংযুক্ত করেছে আর পানামা খাল প্রশান্ত মহাসাগরকে আটলান্টিক মহাসাগরের সাথে সংযুক্ত করেছে। গত শতাব্দীতে এ খালগুলো খননের মাধ্যমে আলোচ্য আয়াতসমূহের ভবিষ্যদ্বাণী সুস্পষ্ট দিবালোকের ন্যায় পূর্ণতা লাভ করেছে।

(হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) কর্তৃক প্রণীত Introduction to the study of the Holy Quran অবলম্বনে)।

ଉତ୍ତରାଦଶ ପରିଚେତ୍

ବିବିଧ ତାହରୀକ (ଘୋଷଣା)

ନେୟାମେ ଓସୀଯତ (ଓସୀଯତ ବ୍ୟବସ୍ଥା)

ଏମନ ଏକ ସମୟ ଛିଲ ଯଥନ ଧନୀ ଓ ଦରିଦ୍ରେ ବୈଷମ୍ୟ ମାନବଜୀବନେର ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରେ ଏତ ବ୍ୟାପକଭାବେ ଅନୁଭୂତ ହେଲାନି । ଶିଙ୍ଗ-ବିଜାନେର ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତିର ଫଳେ ଧନୀ ଏବଂ ଦରିଦ୍ରେର ମାଝେ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରେ ଉତ୍ସନ୍ମାନ-ଅନୁନ୍ମାନ ଦେଶଗୁଲୋର ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲେର ବୈଷୟିକ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଧନବୈଷୟମେର ଜଟିଲ ସମସ୍ୟାବଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧେ ବିଶେଷଭାବେ ଚିନ୍ତା କରାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହେଛେ । ଇସଲାମୀ ଅଥନ୍ତିତର କୋନ-କୋନ ମୌଳିକ ବିଷୟ- ଯେମନ- ଯାକାତ, ସଦକା, ଆୟ-ବ୍ୟାଙ୍ଗନିତ ଅନୁଶାସନ ଇତ୍ୟାଦି ଛାଡ଼ାଓ ମିଳାତେ ଇସଲାମୀଯା ବା ମୁସଲିମ ସମାଜକେ ଆରାଓ ଅଧିକତର କୁରବାନୀ କରତେ ହେବ । ଆମରା ଅଧିକତର କୁରବାନୀ କରତେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ନା ହଲେ ଆମାଦେର ନିଜେଦେଇ ସରବାନଶ ତ୍ରାଣିତ ହେବ । କୁରାନାନ କରିମେ ସୂରା ବାକାରାଯ ବଳା ହେଯେଛେ:

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَنْقُوا بِأَيْدِيهِمُكُمْ إِلَى الشَّهْلَكَةِۚ وَأَحَسِنُواۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ^{୧୦}

(ଓସା ଆନଫିକୁ ଫୀ ସାବିଲିଲାହି ଓୟାଲା ତୁଲକୁ ବିଆୟଦିକୁମ ଇଲାତ୍ ତାହ୍ଲୁକାହ ଓୟା ଆହସିନୁ ଇଲାଲାହା ଇୟୁହିବରୁଲ ମୁହଁସିନୀନ)

ଅର୍ଥ: “ଏବଂ ତୋମରା ଆଲ୍‌ଲାହର ପଥେ ଖରଚ କର ଏବଂ ତୋମରା ସ୍ଵହଞ୍ଚେ ନିଜେଦେରକେ ଧର୍ମରେ ମାଝେ ନିକ୍ଷେପ କରୋ ନା । ଆର ତୋମରା ସଂକରମ କର । ନିଶ୍ଚୟ ଆଲ୍‌ଲାହ ସଂକରମଶୀଲଦେରକେ ପଢ଼ନ କରେନ ।” (ସୂରା ବାକାରା: ୧୯୬) । ଆଲ୍‌ଲାହର ପଥେ କଟୁକୁ ଏବଂ କୌଭାବେ ଖରଚ କରତେ ହେବ, କଟୁକୁ କୁରବାନୀ କରତେ ହେବ ତା ହସରତ ମୁହାମ୍ମଦ (ସା.) ନିଜେଓ ଏବଂ ଇସଲାମେର ଖଲීଫାଗଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଘୋଷଣା କରତେନ । ଅନୁରକ୍ତ ଏବଂ ଖୋଦାଭକ୍ତ ମୁସଲିମ ସମାଜ ଏ ଧରନେର ଘୋଷଣାର ପ୍ରତି ଅକମ୍ପିତ ହସରେ, ଅକୃପଣ ହଞ୍ଚେ ସର୍ବସ ଦିଯେ ସମର୍ଥନ ଜାନିଯେଛିଲେଣ । କୁରବାନୀର ଏ ସ୍ପତ୍ତାର ପରାକାର୍ତ୍ତା ଦେଖିଯେଛିଲେଣ ହସରତ ଆବୁ ବକର (ରା.), ହସରତ ଉମର (ରା.), ହସରତ ଉସମାନ ଗନ୍ତି (ରା.), ହସରତ ତାଲହା (ରା.), ହସରତ ଆବୁର ରହମାନ ବିନ ଆଓଫ (ରା.) ପ୍ରମୁଖ ସାହାବୀଗଣ । ତାରା କୁରବାନୀର ଯେ ଆଦର୍ଶ ରେଖେ ଗେଛେନ ତା ଯେମନ ନଜିରବିହୀନ ତେମନି ବାନ୍ଧବଧମୀ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗେ କୁରବାନୀର ଏକ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହସରତ ମସୀହ ମାଓଉଦ (ଆ.) କର୍ତ୍ତକ ‘ନେୟାମେ ଓସୀଯତ’ କାହେମ କରା ହେଯେଛେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗେର ଇମାମ ହସରତ ମସୀହ ମାଓଉଦ (ଆ.) ଯୁଗେର ପ୍ରୋଜେନେର ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତେ ୧୯୦୫ ମେ ତାରିଖ ମାତ୍ରରେ ଏକ ନିଜସ୍ତ ଧନ-ସଂପତ୍ତିର କମପକ୍ଷେ ଏକ-ଦଶମାତ୍ରଶ (ଦଶ ଭାଗେର ଏକ ଭାଗ) ହତେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏକ-ତୃତୀୟାଂଶ (ତିନ ଭାଗେର ଏକ ଭାଗ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସଲାମୀ ଖିଲାଫତେର ସଂଗଠନର ନାମେ

ওসীয়ত বা উইল করে দেয়। এ উইলকৃত অর্থ ইসলাম প্রচার, মৌলিক অভাব মোচন এবং অন্যান্য কল্যাণকর কাজে ব্যয় করা হবে।” এ ওসীয়ত ব্যবহার ফলে ইসলামী সংগঠন বা খিলাফতের কর্তৃত্বাধীনে ক্রমে-ক্রমে যথেষ্ট ধন-সম্পত্তি সংগৃহীত হবে, কোন প্রকার মনোকষ্টের সৃষ্টি হবে না, স্বাধীনতা খর্ব হবে না এবং এর মাধ্যমে খিলাফতের কর্তৃত্বাধীনে ধন-বৈষম্য দূর করার জন্যে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হতে থাকবে। এ অর্থের দ্বারা ধনী-দরিদ্রের চরম বৈষম্য দূর করা সম্ভব হবে।

হ্যরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) ২০০৫ সনের ২৭ মে খুতবা দিতে গিয়ে তাহরীক করেন যেন ২০০৮ সনের মধ্যে জামা'তের চাঁদাদাতা সদস্যগণের অর্ধেক নেয়ামে ওসীয়তের অন্তর্ভুক্ত হন। আলহামদুলিল্লাহ, অনেক জামা'ত হ্যুর (আই.)-এর এ তাহরীক মোতাবেক নেয়ামে ওসীয়তে শামিল হয়েছে।

তাহরীকে জাদীদ (নতুন ঘোষণা)

১৯৩৪ সনে যখন জামা'তে আহরার ও অন্যান্য বিরুদ্ধবাদী শক্তি কাদিয়ানের প্রতিটি ইট খুলে নেয়ার ঘোষণা দেয় এবং দুনিয়া হতে আহমদীয়াতকে মিটিয়ে দেয়ার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিঙ্গ হয় তখন তাদের এ মিথ্যা অহমিকাকে ধূলিসাং করে দিতে ঐশ্বী ইঙ্গিতে হ্যরত মুসলেহ মাউদ (রা.) তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা দেন। হ্যুর (রা.) তার খুতবাসমূহে তাহরীকে জাদীদের ২৭টি মোতালেবাত (দাবি) পেশ করেন, যথা: (১) সরল জীবন যাপন করা, এ উদ্দেশ্যে (ক) এক খাদ্য ও এক তরকারি ব্যবহার করা (বাঙালিদের জন্য এর অতিরিক্ত হিসাবে ডাল ব্যবহার করার অনুমতি আছে) (খ) পোশাক পরিচ্ছদ যথাসম্ভব কম ক্রয় বা প্রস্তুত করা, (গ) মহিলাদের নতুন অলংকার প্রস্তুত বা লেসফিতা, ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় বিলাসসামগ্ৰী ক্রয় করা হতে বিৱত থাকা, (ঘ) চিকিৎসা খৰচ লাঘব করা, পারতপক্ষে বেশি মূল্যের পেটেন্ট ঔষধ ক্রয় না করা, (ঙ) সিনেমা, বায়োক্ষোপ ইত্যাদি রং-তামাশা বৰ্জন করা, বিবাহ খৰচাদি সংকুচিত করে কেবল যা একেবারে অপরিহার্য, তা করা, (ছ) বৃথা সাজ-সরঞ্জাম বা আসবাবপত্র হতে বিৱত থাকা, (জ) ছেলেমেয়েদের শিক্ষা খৰচ যথাসম্ভব কম করা (২) মাসিক আয়ের এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) পর্যন্ত পৱৰবৰ্তী তিন বছৰ তাহরীকে জাদীদের আমানত ফান্তে জমা করা, (৩) বিরুদ্ধবাদীদের মিথ্যা প্রচারের জৰাব দেয়ার জন্য জামা'তের ফান্তে চাঁদা দেয়া, (৪) বহিৰ্দেশে ইসলাম প্রচারের জন্য চাঁদা দেয়া, (৫) তবলীগে ইসলামের বিশেষ ক্ষিমের জন্য চাঁদা দেয়া, (৬) সাইকেলযোগে তবলীগি সাৰ্ভের জন্য চাঁদা দেয়া, (৭) চাকুরীজীবিদের ছুটি প্রাপ্য থাকলে তিন মাসের ছুটি নিয়ে তবলীগি কাজে উৎসর্গ করা, ব্যবসায়ী বা কৃষকদের অবসরকাল তবলীগের জন্য উৎসর্গ করা (৮) গ্ৰামের, পূজাৱ বা বড় দিনের ছুটি তবলীগের জন্য উৎসর্গ করা, (৯) যুবকদের তিন বছৰের জন্য

নিজেদেরকে উৎসর্গ করা, (১০) সম্ভাষণ ও পদস্থ ব্যক্তিদেরকে নিজেদের বক্তা বা সম্মানিত প্রচারকরণে পেশ করা, (১১) ২৫ লক্ষ টাকার রিজার্ভ ফান্ডের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা, (১২) পেনশনপ্রাপ্ত লোকদের নিজেদেরকে সিলসিলার কাজের জন্য পেশ করা, (১৩) সঙ্গতিশীল ব্যক্তিদের সন্তানদেরকে শিক্ষার জন্য কাদিয়ান প্রেরণ করা, (১৪) উচ্চশিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের কেন্দ্র হতে ভবিষ্যৎ শিক্ষা সম্পদে পরামর্শ নেয়া, (১৫) যুবকদের বিদেশে গিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে তৰলীগ করা, (১৬) নিজের হাতে কাজ করার অভ্যাস সৃষ্টি করা, (১৭) বেকাররা যেন অবিলম্বে ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র বৈধ কাজে নিয়োজিত হয়, (১৮) কাদিয়ানে বাঢ়ি প্রস্তুত করতে চেষ্টা করা, (১৯) এ তাহরীকের সাফল্যের জন্য কায়মনোবাক্যে দোয়া করা (২০) ইসলামী কৃষি ও সভ্যতাকে সমৃদ্ধি রাখা, (২১) মহিলাদের অধিকার ও আবেগ অনুভূতির প্রতি দৃষ্টি রাখা, (২২) প্রত্যেক আহমদী পরিপূর্ণভাবে আমানতদার (বিশ্বস্ত) হবে আর কারও আমানত খেয়ানত (অবিশ্বস্ততা) করবে না, (২৩) খোদার সৃষ্টির সেবা করা, নিজ হাতে কাজ করে নিজের গ্রাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, ইত্যাদি, (২৪) প্রত্যেক আহমদীর অন্তরে দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করা উচিত, সরকার বাধ্য না করলে আদালতে কোন (দেওয়াণী) মোকাদ্দমা দায়ের করবে না বরং তাদের মোকাদ্দমা নিজস্ব আদালত বোর্ড বা কায়া বোর্ডে পেশ করবে আর এর রায়ের প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করবে, (২৫) সন্তানদেরকে ইসলামের জন্য উৎসর্গ করা, (২৬) সম্পত্তি ও আয় ওয়াকফ (উৎসর্গ) করা, (২৭) হিলফুল ফুয়লের ন্যায় সমিতি গঠন করা। বর্তমানে তাহরীকে জাদীদের চাঁদার কোন নির্ধারিত হার নেই। তবে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা প্রত্যেককে সাধ্যান্বয়ী অংশগ্রহণ করতে হবে। যারা আয় করে তাদেরকে মাসিক আয়ের একটি বিশেষ অংশ এ খাতে সারা বছর আদায় করা উচিত। হ্যরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন, “এ তাহরীকের উদ্দেশ্য সাময়িক নয়। সেই সময় আসছে যখন আমাদেরকে সারা দুনিয়ার বিবর্দ্ধনবাদীদের সাথে সংগ্রাম করতে হবে। আমাদের কর্মসূচী আমরা নিজেরা তৈরী করিনি বরং আমাদের কর্মসূচী আমাদের সৃষ্টিকর্তা প্রণয়ন করেছেন।” (আলু ফ্যল ৩/১২/১৯৩৫)।

আজ আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম সারা দুনিয়ার ২০৪টি রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়েছে। এর গোটা কৃতিত্বই তাহরীকে জাদীদের বললে অত্যুক্তি হবে না। এ তাহরীকে জাদীদ এবং নেয়ামে ওসীয়তের মাধ্যমে দুনিয়াতে নতুন বিশ্বব্যবস্থার (নেয়ামে নও) প্রবর্তন হতে যাচ্ছে। দিক্ষক্রিয়াবলে আমরা উষার সোনালী কিরণের ন্যায় তা দেখতে পাচ্ছি।

ওয়াকফে জাদীদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা হ্যরত মির্হা বশীরগন্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ওয়াকফে জাদীদ (নব উৎসর্গ)-এর ঘোষণা দেন। প্রাসঙ্গিকভাবে এ তাহরীকের উদ্দেশ্যে ছিল পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশের

প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ গোটা উপমহাদেশের জামা'তগুলোর সদস্যদেরকে সঠিকভাবে তালীম ও তরবিয়ত দেয়া। জন্মালগ্নে এ তাহরীকের গুরুত্ব বোঝাবার জন্য হ্যুর (রা.) বলেন, “এ তাহরীককে অব্যাহত রাখার জন্য আমার গায়ের কাপড়-চোপড়ও বিক্রি করতে হলে আমি তা করতে দ্বিধা করব না।” তরবিয়ত ও তবলীগের ময়দানে ওয়াকফে জাদীদের মোয়াল্লেমগণ যথেষ্ট অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) ১৯৮৫ সনে ওয়াকফে জাদীদের পরিসরকে সারা দুনিয়ায় বিস্তৃত করেন। (দীনি মালুমাত, ম.খো. আ. পাকিস্তান, পৃ. ৫৭)।

হ্যুর খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) ওয়াকফে জাদীদের সর্বনিম্ন চাঁদার হার নির্ধারণ করেছিলেন ১ পাউড বা এর সমপরিমাণ (বাংলাদেশী টাকার পায় ৭০/- টাকা)। কিন্তু পরে তিনি এ নির্ধারিত হার প্রত্যাহার করেছেন। এখন জামা'তের আবাল-বৃন্দ-বণিতা সবাইকে এমনকি সদেজাত শিশুকে পর্যন্ত আর্থিক ক্রুরানীতে শামিল করার নির্দেশ রয়েছে, তা যত নগণ্য পরিমাণই হোক না কেন। নও-মোবাইল তথা নবদীক্ষিতগণকেও যেন এ ওয়াকফে জাদীদের চাঁদায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় এ জন্যে খিলাফত থেকে বারবার তাগিদ দেয়া হয়েছে আর তাদেরও উচিত যেন তারা সাধ্যমত এ তাহরীকে অংশগ্রহণ করে।

ওয়াকফে নও

সারা বিশ্বে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের জন্য একবিংশ শতাব্দীতে মোবাল্লেগদের (ধর্ম প্রচারকদের) এক বিশাল কর্মাবহিনী প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) ১৯৮৭ সনে তৰা এপ্রিল ওয়াকফে নও (নব উৎসর্গ)-এর তাহরীক করেন। এ পবিত্র তাহরীকে সাড়া দিয়ে হাজার-হাজার পিতা ও গর্ভধারিণী মা তাদের ভাবী সন্তানকে ইসলামের সেবার জন্য উৎসর্গ করেন। বর্তমানে নব উৎসর্গীকৃত এ বাহিনীতে ৪৮ হাজারের অধিক শিশু যোগ দিয়েছে যারা পিতা-মাতা ও জামা'তের তত্ত্ববধানে তরবিয়ত পাচ্ছে। ভবিষ্যতে এরা জামা'তের মোবাল্লেগ বাহিনীসহ বিভিন্ন জামা'তী দায়িত্বে যোগ দিয়ে ইসলামের বিশ্বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, ইনশাআল্লাহ। হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে.) ১৯৮৭ সনের তৰা এপ্রিল তাঁর যুগান্তকারী খুতবায় বলেন, “আল্লাহ ও রসূলের প্রেমিকদের একটি কাফেলা আগামী শতাব্দীতে প্রবেশ করবে। এরা একেপ লোক হোক যাদের অন্তর ঐশীপ্রেম ও রস্লপ্রেমে পরিপূর্ণ, যাদের রক্তে ইতোমধ্যে এ প্রেম ও ভালোবাসা প্রবাহিত হতে শুরু করেছে।” “এ তাহরীক আমি এজন্যে করছি যেন আগামী শতাব্দীতে উৎসর্গীকৃত শিশুদের একটি মহান বাহিনী দুনিয়ার সব ধরনের দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে মুহাম্মাদুর রসূলল্লাহ (সা.)-এর খোদার দাসে পরিগত হয়ে আগামী শতাব্দীতে প্রবেশ করে। এ উদ্দেশ্যেই আমরা ছেট-বড় সব শিশুকে উপহার হিসেবে পেশ করছি।”

এছাড়া ওয়াকফে নও সন্তানদের উদ্দেশ্যে হ্যারত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) তাঁর ১৮ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখের খৃতবায় ওয়াকফে নও ছেলেদের সর্বপ্রথম পছন্দের স্থান হিসেবে জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হওয়ার জন্য নসীহত করেন।

জামা'তের অন্যান্য তাহরীক

বর্তমানে জামা'তে যে সমস্ত তাহরীক রয়েছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল:

- **মরিয়ম শান্তী ফাস্ত:** গরীব আহমদী মেয়েদের বিয়েতে তাদেরকে উপহার দেয়ার জন্য হ্যারত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) তাঁর মাতা হ্যারত সৈয়দা মরিয়ম সিদ্দিকার নামানুসারে এ ফাস্তের প্রবর্তন করেন।
- **সৈয়দনা বেলাল ফাস্ত:** জামা'তের শাহাদাতবরণকারী শহীদদের স্মৃতিকে অস্ত্রান রাখার জন্য এবং তাদের পরিবারের আর্থিক ও জাগতিক সহায়তার জন্য হ্যারত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) এ ফাস্তের প্রবর্তন করেন।
- **এমটিএ ফাস্ত:** সারা বিশ্বে অহোরাত্র ইসলামের সুশীতল বাণী পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে এমটিএ কাজ করে যাচ্ছে। তাদের এ বিশাল কর্মজরুরীকে আরো যথাযথভাবে সামনে এগিয়ে নেয়ার জন্য এ ফাস্তের প্রবর্তন হয়।
- **তাহের ফাউন্ডেশন:** হ্যারত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য তাঁর জীবনী, কর্ম ও চতুর্থ খিলাফতকালের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে জামা'তের সদস্যদের মাঝে পৌছে দেয়ার জন্য হ্যারত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) এ তাহরীকের ঘোষণা দেন।

চতুর্দশ পরিচেদ

ইজতেমার ইতিহাস এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

ইজতেমার ইতিহাস

মজলিস খোদামুল আহমদীয়ার ইজতেমা একটি বিশেষ অনুষ্ঠান—যেখানে আমাদের যুবসমাজ পরম্পরের সাথে মিলিত হবার ও সোহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে প্রতিযোগিতা করার সুযোগ পায়। প্রথম ইজতেমা ১৯৩৮ সনের ডিসেম্বর মাসে কাদিয়ান জলসার সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু শীত্রই এ অনুষ্ঠানটির জন্য আরো বেশি সময় এবং প্রচেষ্টার তাগিদ অনুভূত হয়। আর এভাবে ইজতেমা একটি পৃথক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। সেই ১৯৩৮ সনের পর যুবকদের এই সংগঠন সারা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে এবং প্রতি বছর বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন পর্যায়ে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বাংলাদেশে ১৯৬২ সালের ৫ নভেম্বর ত্রাক্ষণবাড়িয়ায় লোকনাথ ট্যাঙ্কের পাড়ে সর্বপ্রথম ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় ২০১২ সনে মজলিস খোদামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের ৪১তম ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়।

ইজতেমার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য:

১৯৩৮ সনের ২৫ ডিসেম্বর সর্বপ্রথম ইজতেমায় হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) খোদামুল আহমদীয়ার ভূমিকা ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন। সম্প্রদায়ের যুব সমাজের প্রতি তাঁর উপদেশ ছিল:

- ১। তাদের উচিত আহমদীয়াতের প্রতি গভীর সম্মান ও আনুগত্য হস্তয়ে বন্ধমূল করে নেয়া।
- ২। তার উপর অবিচল থাকা।
- ৩। কঠোর পরিশ্রমী হওয়া।
- ৪। অনুমান এবং মনগড়া ব্যাখ্যা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা।
- ৫। উদার মন-মানসিকতার অধিকারী হওয়া এবং সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ সম্বন্ধে অবগত হওয়া।
- ৬। বিশ্বস্ত হওয়া।
- ৭। মানবতার সেবায় সক্রিয় হওয়া।
- ৮। সত্যবাদিতা অবলম্বন করা।
- ৯। খোদামুল আহমদীয়ার লক্ষ্যকে সর্বদা সামনে রাখা।
- ১০। স্বীয় কৃতকর্মের ফলাফল মেনে নেয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়া।

- ১১। যেকোন ভুল কাজের জন্য শাস্তি মাথা পেতে নেয়া ।
- ১২। সর্বোত্তমাবে অনুধাবন করা, কোন ব্যক্তি যখন জাতির জন্য স্বীয় জীবন বিসর্জন দেয়, তখন সেই ব্যক্তি মরে না, বরং সে জাতি যতদিন টিকে থাকে সে-ও ততদিন বেঁচে থাকে ।
- ১৩। একজন খোদাম কেবলমাত্র নিজের সংশোধন করেই সম্প্রস্ত হবে না, যতক্ষণ না তার চারপাশের মানুষদের সংশোধন হয় ।
- ১৪। প্রজ্ঞার সাথে কাজ করা ।
- ১৫। কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুগত থাকা ।
- ১৬। এ বিষয়টি নিশ্চিত করা যে সর্বদা যেন সংগঠনের প্রগতিশীলতা সর্বাঙ্গে থাকে । এ সকল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ ইজতেমার সময় আরও বেশি বিস্তৃতি লাভ করে । এটি এমন একটি অনুষ্ঠান যেখানে যুবক ও কিশোররা ইবাদত ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে মনোনিবেশ করার জন্য একত্রিত হয় এবং উপরোক্তখিত গুণাবলীসমূহ প্রদর্শন করে ।

পঞ্চদশ পরিচেন

অঙ্গ-সংগঠনসমূহের আহাদনামা

খোদামুল আহমদীয়ার আহাদনামা

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহাদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। (৩ বার পড়তে হবে)।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহু তাল্লা ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, হ্যরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা এবং রসূল।

আমি প্রতিভ্রষ্ট করছি, ধর্মীয়, জাতীয় এবং দেশের স্বার্থ রক্ষার্থে নিজ প্রাণ, ধন, সময় এবং মান-সম্মান কুরবানী করতে সদা প্রস্তুত থাকব। একইভাবে আহমদীয়া খিলাফতকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকব এবং যুগ খলীফা যে ন্যায় মীমাংসাই প্রদান করবেন তা পালন করাকে অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করব, ইনশাআল্লাহু তাল্লা।

আহাদনামা পাঠের পদ্ধতি:

- ১) খোদামুল এ আহাদনামা নিজেদের প্রত্যেক সভা ও সমাবেশে একসাথে দাঁড়িয়ে পুনরাবৃত্তি করবেন।
- ২) সভা বা সমাবেশে খোদামুল আহমদীয়ার মধ্যে দায়িত্বের দিক থেকে যিনি জ্যেষ্ঠ হবেন তিনি আহাদনামা পাঠ করবেন।
- ৩) প্রথমে তাশাহুদ আরবিতে তিন বার পাঠ করা হবে। তারপর এর অনুবাদ পাঠ করতে হবে। পরে একবার শুধু বাংলাতে আহাদনামা পাঠ করা হবে। উল্লেখ্য, হ্যুর (আই.)-এর সাম্প্রতিক নির্দেশনা মোতাবেক এখন থেকে আহাদনামা মাত্তুভাষায় পাঠ করা হবে। উর্দ্দতে পাঠ করার প্রয়োজন নেই।
- ৪) ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কঙ্গি ধরে দাঁড়াতে হয়।

[খোদামের আহাদনামার উদ্দৃ অংশ: ম্যায় ইকরার কারতাহু কে দীনি, কওমী অওর মিল্লী মুফাদ কি খাতের ম্যায় আপনি জান, মাল, ওয়াক্ত অওর ইয়্যাত কো কুরবান কারনে কে লিয়ে হারদাম তাইয়ার রাহস্য। ইসি তারাহ খেলাফতে এ্যাহমদীয়া কে কায়েম রাখনে কি খাতের হার কুরবানী কে লিয়ে তাইয়ার রাহস্য। অওর খলীফায়ে ওয়াক্ত জো ভী মারুফ ফ্যায়স্লু ফারমায়েঙে উসকি পাবন্দী কারানি যাকুরী সাময়ুঙ্গ। (ইনশাআল্লাহু তাল্লা)]।

আতফালুল আহমদীয়ার আহাদনামা

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু । (৩ বার পড়তে হবে) ।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ তাঁলা ছাড়া কোন উপাস্য নেই । তিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই । আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, হ্যরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা এবং রসূল ।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি, ইসলাম ধর্ম এবং আহমদীয়াত এবং দেশ ও জাতির সেবা করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকব । সদা সত্য কথা বলব, কাউকে গালি দিব না এবং খলীফাতুল মসীহ (আই.)-এর সকল আদেশ পালন করার জন্য প্রচেষ্টা চালাব, ইনশাআল্লাহ্ তাঁলা ।

আহাদনামা পাঠের পদ্ধতি:

- ১) আতফালগণ এটা মুখ্যত্ব করবে ।
- ২) সভা বা সমাবেশে আতফালুল আহমদীয়া বা খোদামুল আহমদীয়ার মধ্যে যিনি দায়িত্বের দিক থেকে জ্যেষ্ঠ হবেন তিনি আহাদনামা পাঠ করাবেন ।
- ৩) প্রথমে তাশাহুদ আরবিতে তিন বার পাঠ করা হবে । তারপর এর অনুবাদ পাঠ করতে হবে । পরে একবার শুধু বাংলাতে আহাদনামা পাঠ করা হবে । উল্লেখ্য, হ্যুর (আই.)-এর সাম্প্রতিক নির্দেশনা মোতাবেক এখন থেকে আহাদনামা মাতৃভাষায় পাঠ করা হবে । উর্দ্দতে পাঠ করার প্রয়োজন নেই ।
- ৪) ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কজি ধরে দাঁড়াতে হয় ।

[আতফালের আহাদনামার উর্দু অংশ: ম্যাঁয় ওয়াদা কারতাহু কে দীনে ইসলাম অওর জামাতে এ্যাহমদীয়া, কওম অওর ওয়াতান কি খেদমাত কে লিয়ে হারদাম তাইয়্যার রাহঙ্গা, হামেশা সাচ বোলুঙ্গা, কিসি কো গালী নেহী দুঙ্গা । অওর হ্যরত খলীফাতুল মাসীহ কি তামাম নাসিহাতোঁ পার আমল কারনে কি কোশেশ কারঙ্গা, ইনশাআল্লাহ্ তাঁলা ।]

মজলিসে আনসারঢ্লাহুর আহাদনামা

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু । (৩ বার পড়তে হবে) ।

ম্যাঁয় ইকরার কারতাহু কে ইসলাম অওর এ্যাহমদীয়াত কী মাযবুতী অওর ইশায়াত অওর নেয়ামে খেলাফত কী হেফায়াত কে লিয়ে ইনশাআল্লাহ্ আখের দাম তাক জাদো জোহদ কারতা রাঙ্গা । অওর ইসকে লিয়ে বাড়ী সে বাড়ী কুরবানী পেশ কারনে কে লিয়ে হামেশাহ তাইয়্যার রাঙ্গা । নীয় আপনে আওলাদ কো ভী হামেশাহ খেলাফত সে

ওয়াবাসতা র্যাহনে কী তালকীন কারতা রাহঙ্গা। (ইনশাআল্লাহ্ তা'লা)।

অনুবাদ:

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীর নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি, ইসলাম ও আহমদীয়াতের দৃঢ়তা ও এর প্রচার এবং নিয়ামে খিলাফতের সংরক্ষণের জন্য শেষ নিঃশ্঵াস পর্যন্ত আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব এবং এর জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে দ্বিধা করব না। এছাড়া আমার সন্তান-সন্ততিদেরকে খিলাফতের প্রতি উৎসর্গীকৃত ও অনুরক্ত থাকতে সর্বদা তাগিদপূর্ণ উপদেশ দিতে থাকব। (ইনশাআল্লাহ্ তা'লা)।

লাজনা ইমাইল্লাহুর আহাদনামা

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। (৩ বার পড়তে হবে)।

ম্যাং ইকরার কারতিহুঁ কে আপনি মাযহাব অওর কওম কি খাতের আপনি জান, মাল, ওয়াক্ত অওর আওলাদ কো কুরবান কারনে কে লিয়ে হারদাম তাইয়্যার রাহঙ্গী। নীয় সাচ্চায়ী পার হামেশা কায়েম রাহঙ্গী অওর খেলাফতে এ্যাহমদীয়া কে কায়েম রাখনে কে লিয়ে হার কুরবানী কে লিয়ে তাইয়্যার রাহঙ্গী। (ইনশাআল্লাহ্ তা'লা)।

অনুবাদ:

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীর নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি, ধর্ম ও জাতির স্বার্থে আমার জীবন, সম্পদ, সময় ও সন্তান-সন্ততি কুরবানী করতে সদা প্রস্তুত থাকব। তদুপরি সর্বদা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকব এবং খিলাফতে আহমদীয়াকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকব। (ইনশাআল্লাহ্ তা'লা)।

নাসেরাতুল আহমদীয়ার আহাদনামা

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। (৩ বার পড়তে হবে)।

ম্যাং ইকরার কারতিহুঁ কে আপনি মাযহাব, কওম অওর ওয়াতান কি খেদমাত কে লিয়ে হার ওয়াক্ত তাইয়্যার রাহঙ্গী, নীয় সাচ্চায়ী পার হামেশা কায়েম রাহঙ্গী। অওর

খেলাফতে এ্যাহমদীয়া কে কায়েম রাখনে কে লিয়ে হার কুরবানী দেনে কে লিয়ে
তাইয়্যার রাহস্যী । (ইনশাআল্লাহ্ তা'লা) ।

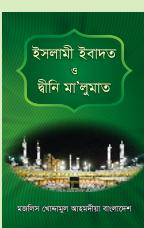
অনুবাদ:

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই । তিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোন
শরীক নাই । আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল ।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি আমার ধর্ম, জাতি ও জন্মভূমির সেবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত
থাকব, তদুপরি সত্যের ওপরে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকব এবং আহমদীয়া খিলাফতকে
প্রতিষ্ঠিত রাখতে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে জন্য প্রস্তুত থাকব । (ইনশাআল্লাহ্ তা'লা) ।

Islami Ibadat o Deeni Ma'lumaat (in Bangla) **(Islamic Worship and Religious Knowledge)**

This is the sixth edition of the widely acclaimed book Islami Ibadat (Islamic Worship). The book is now being published under the modified title Islami Ibadat o Deeni Ma'lumaat (Islamic Worship and Religious Knowledge) to correctly reflect its contents. Historically this book has been used as a reference book or a family companion for the rules and regulations related to Islamic worship in the form of daily prayers (Salat), fasting (Sawm), Zakat and Hajj and for general religious knowledge on Islam-Ahmadiyyat. Apart from the five pillars of Islam including the Kalima, the book contains a collection of prayers (Dua) of the Holy Qur'an, the Holy Prophet^{sa}, and the Promised Messiah^{as}, information on the schemes (Tahriks) of the Khulafatul Masihs and a significantly augmented section on religious knowledge. The previously included section on poetry (Nazm) is to be published now as a separate book.



Islami Ibadat o Deeni Ma'lumaat
(in Bangla)
(Islamic Worship and Religious Knowledge)

Published by:
Majlis Khuddamul Ahmadiyya Bangladesh
4 No Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

ISBN 978-984-994-003-6



9 7 8 9 8 4 9 9 4 0 0 3 6